বস্তুসমূহ সর্বাবস্থায় ব্রহ্মের শরীর, এই হেতু ব্রহ্মের নিয়ম্য। ব্রহ্ম নিয়ামক।

মধ্বমতে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ নিত্য। সুতরাং তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহেন। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে অনুপ্রবেশ করতঃ জগদ্রূপে পরিণত করিয়া পরিণামের নিয়ামকরূপে থাকেন। জগৎ অস্বতন্ত্র, জগৎ ব্রহ্ম-পরতন্ত্র, সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না।

আচার্য শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই জীবের অবিদ্যা দূর হয়। সুতরাং শুদ্ধ জ্ঞানই মুক্তিলাভের হেতু। রামানুজাচার্য ইহা স্বীকার করেন না। অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্যও ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রুতিতে যেখানে জ্ঞানদ্বারাই মুক্তির কথা আছে, সেখানে জ্ঞানের অর্থ ধ্যান, উপাসনা। 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যসমূহের অর্থ জ্ঞান মাত্র নহে।

বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে ভক্তি দ্বারা, ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা মুক্তি হয়। শ্রবণ মনন স্মরণ ইত্যাদি উপায়ে মুক্তিলাভ হয়। স্মরণের অর্থ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত নিরন্তর ঈশ্বর-ধ্যান। উহা করিতে করিতে তাঁহার দর্শন লাভ হয়। একান্তভাবে ভগবৎ-চরণে শরণাগত হইয়া এই উপাসনা করিতে হয়।

কেবলমাত্র শ্রবণ মনন স্মরণ দ্বারাও ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বর যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহারই নিকট ঈশ্বর আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন। প্রিয় ব্যক্তিই বরণীয় হয়। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয়, সেই ঈশ্বরের প্রিয় হয়। সর্বদা ভগবৎ-স্মরণ যাঁহার অতিশয় প্রিয়, তিনিই ভগবানের প্রিয়, সুতরাং বরণীয়। তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন।

আচার্য শঙ্করের মতে জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। বন্ধনদশাকালেও সে স্বরূপতঃ অভিন্ন। সুতরাং তাহার বন্ধনটা মিথ্যা। এই বন্ধনবোধ অবিদ্যাজাত। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যজ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে জীবের বন্ধন পারমার্থিক, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। পাপকার্য ও পুণ্যকার্য বশতঃ মনুষ্যাদি শরীর ধারণ ও কর্মফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখের অনুভবই জীবের বন্ধন। সুতরাং বন্ধনকে মিথ্যা বলার উপায় নাই। একমাত্র ভক্তিময়ী শরণাগতি ও উপাসনা দ্বারা পরিতুষ্ট শ্রীভগবানের প্রসাদেই জীবের বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। উপাসনার অর্থ: স্তুতি নতি কীর্তন অর্চনা ও ধ্যানাদি।

রামানুজ ও মধ্ব উভয়েই একথা স্বীকার করেন যে, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পরের ভেদ স্বাভাবিক ও নিত্য। তবে মধ্ব মনে করেন, মুক্তাবস্থাতেও জীবগণের পরস্পরের মধ্যে যে ভেদ তাহা বিদ্যমান থাকে। রামানুজ মনে করেন যে, সমস্ত জীব স্বভাবতঃ সমান। উহাদের ভেদ বদ্ধাবস্থায় শরীরোপাধিবশতঃ; মুক্তাবস্থায় ভেদ নাই,—শরীরোপাধি হইতে বিমুক্ত হয় বলিয়া সমস্ত জীব সমান।

রামানুজ ও মধ্ব উভয়ের মতেই মুক্ত জীব বহু ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। তবে রামানুজ মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দেহ ও দেহীর মত একটা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ স্বীকার করেন। মধ্ব তাহা করেন না। মধ্ব মুক্ত জীবগণের মধ্যেও তারতম্য ভেদ মানেন এবং মুক্ত জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধও নিয়ম্য-নিয়ামক বলিয়া স্বীকার করেন।

মধ্বাচার্য পঞ্চভেদবাদী। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবের ও জগতের ভেদ, জীবগণের পরস্পরের ভেদ, জগতের ও ঈশ্বরের ভেদ এবং জাগতিক বস্তুসমূহের পরস্পরের মধ্যে ভেদ। এই পঞ্চভেদ মধ্বাচার্যের মতে সত্য এবং নিত্য। এই

পঞ্চপ্রকার ভেদের জ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না। সুতরাং মুক্ত পুরুষ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে— ব্রহ্মের নিয়ম্যরূপে দর্শন করেন। রামানুজমতে মুক্ত পুরুষ জগৎকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন।

যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন ও জীব ও ব্রহ্মের একত্বের কথা বলেন, মধ্বাচার্য তাঁহাদিগকে নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরাধীন বদ্ধ স্বল্পজ্ঞ স্বল্পসুখযুক্ত স্বল্পশক্তি এবং সদোষ। আর পরমাত্মা স্বাধীন স্বতন্ত্র চিরমুক্ত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমামৃতময়। এই দুইকে যাহারা অভিন্ন দেখে তাহারা দুষ্কৃতকারী।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদবাদী। তিনি বলেন, জীব ও ঈশ্বরের কোন কোন অংশে অভেদ আছে; কোন কোন অংশে ভেদ আছে। ইহাই শ্রুতি-সম্মত সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রুতিমন্ত্র তুলিয়া বিশেষভাবে বিচার করিয়া নিম্বার্কাচার্য অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন যে, ভেদাভেদবাদই শ্রুতির প্রতিপাদ্য।

নিম্বার্কাচার্য কোথাও শঙ্করমতের সমালোচনা বা খণ্ডন করেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী। পরবর্তী হইলে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে বাধ্য হইতেন। সর্ব-দর্শনসংগ্রহে নিম্বার্কের নাম নাই। বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে নিম্বার্কের সময় একাদশ শতাব্দী নির্ণীত হইয়াছে। নিম্বার্কাচার্যের মতে ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ও সগুণ; আবার জগতের অতীত, এজন্য নির্গুণ।

ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নির্বিকার— এ কথায় সকল বৈষ্ণবাচার্যগণই একমত।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যযুগ ধরিয়া লইয়াছি। রামানুজাচার্য হইতে বল্লভাচার্য পর্যন্ত এই যুগ। এই পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই বৈষ্ণবদের চারি সম্প্রদায়ের প্রকাশ। ইহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এখন শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে বৈষ্ণবধর্মে যে মহাপ্লাবন আসে সেই কথা বলিব।

মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃঃ আবির্ভূত হন। তাঁহার মহাদান রাগভক্তি বা উজ্জ্বলরস-প্রধান প্রেমভক্তি এই পরম ধনের সন্ধান ইতিপূর্বে আর কেহ দেন নাই। তবে এই সম্পদকে যদি কৃষ্ণভক্তি-রস বলি, তাহা হইলে ইহা প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর জীবনে।

মহাপ্রভু মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য ঈশ্বর পুরীপাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি মহাপ্রভুকে আহ্বান করিয়া জগতে আনয়ন করেন, সেই অদ্বৈতাচার্যও মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সহায় সেই নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গেও দাক্ষিণাত্যে মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। মাধবেন্দ্রপুরীর কথা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন :

মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনমাত্র হয় অচেতন॥

এই যে মেঘদর্শনে অচেতন অবস্থা, ইহা একটি আশ্চর্য সংবাদ। জগতের ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি দর্শন স্পর্শনে ভূমার কথা মনে জাগ্রত হওয়া এবং তাঁহার প্রতি চিত্তের গভীর আকর্ষণে বাহ্য চেতনাশূন্য হইয়া যাওয়া, ইহা একটি অপূর্ব জীবন-দর্শন।

'স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি।' বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যে-বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, তাহাই চিত্তে পরমারাধ্য পরম বস্তুর কথা জাগাইয়া দেয়। তাঁহার কথা অন্তরে উদিত হওয়ায় এমন প্রবল ভাবের আবেশ আসে যে, আর সকল বিষয়বস্তু দূরে সুদূরে চলিয়া যায়। আনন্দে জীবন ভরিয়া উঠে। অনিত্যের মধ্য দিয়া নিত্যবস্তুর অনুভূতি ও সেই অনুভূতির নিবিড় আস্বাদনে জীবন ঈশ্বরভাবময়

হইয়া যাওয়া—ইহা এক অভূতপূর্ব সংবাদ। এই সংবাদ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনলীলার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

সত্যদর্শন জীবনসাধনা ও গভীর রসানুভূতি—এই তিনের মিলনময় এই যে আধ্যাত্মিক তপস্যা, ইহার শেষ রূপায়ণ রসপ্রস্থানে। শাস্ত্রে তিনটি প্রস্থানের অনুশীলন আছে—শ্রুতিপ্রস্থান স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। শ্রীচৈতন্যদেব রসপ্রস্থান নামক চতুর্থ প্রস্থানের আবিষ্কারক ও উদ্‌গাতা।

রসপ্রস্থানের ভিত্তি শ্রুতি। অস্তি ভাতি প্রিয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্মবস্তুর তিনটি প্রকাশ—অস্তিত্ব ভাতি ও প্রিয়ত্ব। অস্তি—ব্রহ্মবস্তু আছেন, চিরকাল আছেন চির বিদ্যমান আছেন। তাঁহার থাকার বাধ নাই, বিরতি নাই, শেষ নাই। ভাতি—ব্রহ্মবস্তু শোভমান, স্বস্বরূপে প্রকাশমান, সর্বাতিশায়ী উজ্জ্বলতায় দেদীপ্যমান। প্রিয়ম্—ব্রহ্মবস্তু প্রিয়, ভালবাসার বস্তু, অনুরাগের বিষয়, গভীর প্রেমের পাত্র। ব্রহ্ম কত প্রিয়? 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'—আত্মজ হইতে প্রিয়, সকল সম্পদ হইতে প্রিয়, সংসারে অন্য যাহা কিছু আছে সকলের অপেক্ষা প্রিয়। অর্থাৎ তিনি প্রিয়তম।

ব্রহ্মবস্তু সর্বাপেক্ষা বড়, ইহাই জানা আছে। এখানে জানা গেল, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তিনি শুধু শ্রেষ্ঠই নহেন, পরম প্রেষ্ঠও বটেন। তিনি শুধু পরম কারণ—কারণের কারণ নহেন, তিনি প্রেমময় মধুময় রসময়। তিনি রসস্বরূপ তিনি রসিক। তাঁহার সান্নিধ্যে নিরানন্দ প্রাণ আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়। এই রসতত্ত্বের উপর রসপ্রস্থানের ভিত্তি।

শ্রুতিপ্রস্থানের ভিত্তি অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্, স্মৃতিপ্রস্থানের ভিত্তি পদ্মনাভের মুখপদ্ম-বিনিঃসৃতা গীতা। ন্যায়প্রস্থানের ভিত্তি পঞ্চশত পঞ্চান্নটি ব্রহ্মসূত্র—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' হইতে 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' পর্যন্ত। রসপ্রস্থানের অবলম্বন পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্‌ভাগবত ও শ্রীরূপ-সনাতনের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, বৃহদ্ ভাগবতামৃত। ইহার দার্শনিক রূপকার শ্রীজীবগোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ। রসপ্রস্থানের আসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া ও তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পার্ষদগণকে লইয়া। পূর্ববর্তী মহাসাধক মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য; পরবর্তী শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ, নরোত্তম; পূর্ববর্তী রসজ্ঞ জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি; পরবর্তী শতাধিক বৈষ্ণব কবি। কোথা হইতে প্রেমের বন্যা আসিল। কোথায় সব ডুবিয়া গেল। কেমনে কি হইল, ইহা এক যুগবিস্ময়।

শ্রীজীবগোস্বামীর দার্শনিক মতের নাম অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। ইহাতে নূতন কথা যে খুব বেশী আছে, তাহা নহে। তৎপূর্বে ভাস্করাচার্য নিম্বার্কাচার্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন। 'অচিন্ত্য' শব্দটি যোগ করিয়া শ্রীজীব যে কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে বলিব। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ দান প্রীতিসন্দর্ভ। প্রীতি বা প্রেম চিত্তের একটি বৃত্তি বা emotion। শ্রীজীব প্রেমকে দার্শনিক ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপন করিয়াছেন। গুটিকতক সারাৎসার সত্যের উপর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দণ্ডায়মান:

১। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। ইহার ভিত্তি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' ভাগবতের এই উক্তি।

২। পরতত্ত্বের তিন রূপ—ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান।

৩। পরমতত্ত্বের পরা শক্তির তিনটি শক্তি—স্বরূপশক্তি জীবশক্তি মায়াশক্তি।

৪। আর শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার উপায়—'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা'।

শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান জীবের পরমারাধ্য। তিনি

অদ্বয়তত্ত্ব। তিনি বেদান্তের ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান। তিনি অবতারী, সর্ব কারণের কারণ। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে— নিত্য শাশ্বত হানোপাদানরহিত। তিনি সাকার নহেন, নিরাকার নহেন, চিদাকার— চিদ্‌ঘনাকার। 'ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।'

শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তি— অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গার অপর নাম স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি। বহিরঙ্গার অপর নাম মায়াশক্তি বা অবিদ্যাশক্তি। তটস্থা শক্তির অপর নাম জীবশক্তি। এই শক্তিগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক ভেদ ও অভেদ। এই ভেদাভেদ বুদ্ধিগম্য নয়। রস-ভূমিতে অনুভববেদ্য।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিন ভেদ— সন্ধিনী সংবিৎ ও হ্লাদিনী। ভগবান যে শক্তির দ্বারা সমস্ত সত্তাকে ধারণ করেন এবং করান, দেশকাল ও সকল বস্তুজগৎ যাহাতে প্রকটিত হয়, তাহা সন্ধিনী শক্তি। 'যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সর্ব-দেশ-কাল-দ্রব্যাদি-প্রাপ্তিকারিণী সন্ধিনী।' ভগবানের সত্তাবিষয়িণী সামর্থ্যই সন্ধিনী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা ভগবান নিজে জানেন ও অপরকে জানাইতে পারেন, সেই শক্তি সংবিৎ শক্তি। 'যয়া সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা সম্বিৎ।' ভগবানের জ্ঞানবিষয়িণী যে সামর্থ্য, তাহা সংবিৎ শক্তি। যে শক্তি দ্বারা শ্রীভগবান স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন করেন ও অপরকে আনন্দ উপভোগ করান তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। 'যয়া হ্লাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনী।' হ্লাদিনী শ্রীহরির আনন্দ-সম্বন্ধিনী শক্তি।

এই আনন্দ-শক্তিকে সম্যক্‌রূপে আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নাম শ্রীরাধা। শক্তি সকল সময়ই তাঁহার মধ্যে অমূর্তরূপে আছে। অমূর্তরূপে থাকায় আস্বাদনের পূর্ণতা হয় না। তাই শ্রীরাধারূপে মূর্ত করিয়া লইয়াছেন। যখন মূর্ত হইয়াছেন, তখনও অমূর্তরূপে আছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত, শ্রীরাধার বিগ্রহও তদ্রূপ আনন্দশক্তি-ঘনীভূত। আনন্দশক্তির মধ্যে সৎ ও চিৎ শক্তি সর্বদাই রহিয়াছে। কোন বস্তুর সত্তা আছে, কিন্তু চেতনা নাই, এমন সম্ভব ; কিন্তু চেতনা আছে সত্তা নাই, ইহা সম্ভব নয়। তদ্রূপ সৎ ও চিৎ আছে, আনন্দ নাই, ইহা সম্ভব ; কিন্তু আনন্দ আছে, সত্তা ও চেতনা নাই এমন সম্ভব নহে।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ। সুতরাং অচিন্ত্য ভেদাভেদ। রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু, শুধু আস্বাদনের জন্য দুই। আনন্দ আস্বাদনই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র কার্য। সুতরাং শ্রীরাধা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণই নহেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে শ্রীরাধা শ্রীরাধাই নহেন। একে অন্যের পরিপূরক, এই জন্যই ভেদাভেদ। এই ভেদাভেদ বুদ্ধিবিচারের অগম্য। দুই-ই যখন আনন্দ আস্বাদনে এক হইয়া যান এবং এক হইয়াও দুই থাকেন, তখনই ঐ ভেদাভেদ অনুভববেদ্য। চিন্তার অতীত, রসানুভবে বেদ্য, এই জন্য অচিন্ত্য।

জীবের সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অচিন্ত্য ভেদাভেদ। জীবও একটি ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দ। এই অংশে অভিন্ন। আর জীব অণুচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণ বিভুচৈতন্য। এই অংশে ভেদ। এই ভেদাভেদ-অনুভূতি রসভূমিতে লাভ করা যায়। ইহা বিচার বা চিন্তার অতীত। বিচার-বুদ্ধির মন্তব্য : ভেদ ও অভেদ বিরোধী, একই সময় সম্ভব নয়। এই যুক্তি দ্বারাই শঙ্করাচার্য ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য না হইলেও, অচিন্ত্য হইলেও, ভেদাভেদ রসভূমিতে অনুভববেদ্য। প্রেম দুটি বস্তুকে এক করে, আবার ভোগের জন্য পৃথক্

রাখে। সুতরাং অভেদরূপে একত্বের ও ভেদরূপে পৃথক্‌ত্বের আস্বাদন একই সময় ঘটে।

জীবকে রসভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে আনন্দঘনকে আস্বাদনের জন্য। জীব তটস্থা শক্তি। তট জলভাগের মধ্যেও নয়, জলভাগ হইতে দূরেও নয়। জীব তটস্থ — উভয় কোটিতে অনুপ্রবিষ্ট। অন্তরঙ্গা শক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্তী জীবশক্তি। মায়াশক্তির অভিমুখী হইলেই জীবের দুঃখ আরম্ভ। আর অন্তরঙ্গা হ্লাদিনীশক্তির অভিমুখী হইলেই আনন্দাস্বাদন।

আনন্দশক্তি-মূর্তি শ্রীরাধা। তাঁহার কার্য শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধান-রূপ আরাধনা। তাঁহার আর একটি কার্য ভক্তের সুখ-বিধান। শুদ্ধ প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারিলেই জীবের আনন্দ ও পরাশক্তি লাভ। শ্রীকৃষ্ণকে সেবা দ্বারা আনন্দ দিতে হইলে জীবের শ্রীরাধার সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে। রাধা-ভাবনায় রাধা-ভাবময় হইতে হইলে, চাই শ্রীরাধার আনুগত্য। আনন্দশক্তি শ্রীরাধার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও সুখবিধানই জীবের চরম পুরুষার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ অবতাররূপে জগতে প্রকট না হইলে রাগমার্গের ভক্তিধারা প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব হইত। জগতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দাস সখা পিতামাতা ও কান্তা প্রভৃতি পরিকরগণ লইয়া অপূর্ব প্রেমের লীলা প্রকটিত করেন। সেই সব লীলা শ্রবণ করিলে দেখা যায়, পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ছিল না— গভীর প্রেম এই ঈশ্বরবুদ্ধি ঢাকিয়াছিল— অথবা ঈশ্বরবুদ্ধি না থাকার জন্য প্রেম সুগভীর হইতে পারিয়াছিল। লীলাশ্রবণে দেখা যায় যে, পরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে একবিন্দুও নিজ সুখানুসন্ধান ছিল না। প্রেমের কৃষ্ণবশীকরণ-সামর্থ্য দেখিয়া, প্রেম সেবায় অসমোর্ধ্ব আনন্দের আস্বাদন অনুভব করা যায় বুঝিয়া, ভক্ত-সাধক শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-ভক্তগণের আনুগত্যে রাগানুগমার্গের ভজনে লুব্ধ হইয়া থাকেন। এই লোভই অনুরাগময় প্রীতির জনক। সুতরাং অবতাররূপে শ্রীভগবান প্রকট-লীলা না করিলে রাগমার্গ সুদৃঢ় সুন্দর ভিত্তিতে স্থাপিত হইতে পারিত না। এইজন্য অবতারবাদ মহাপ্রভুর ধর্মমতের প্রাণ।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু অপূর্ব অভূতপূর্ব অবতার। তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাও পূর্বে অজ্ঞাত, অনর্পিত। মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব অনুশীলনে জানা যায় শ্রীরাধার মহাভাব কত গভীর। সেই মহাভাব আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত লোলুপ। শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা—কৃষ্ণাস্বাদনে অতলস্পর্শী সুখের মাধুর্য— জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণেরও কামনা। ভক্তভগবানকে লইয়া প্রেমের লীলা কিরূপ, মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়।

অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই সকলই শাস্ত্রীয় মতবাদ।* কিন্তু মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শুধু শাস্ত্রীয় মতবাদ নহে। মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গৌরাঙ্গসুন্দরে মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

শ্রীরাধা আরাধিকা। শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য। ইঁহাদের মিলনের চরম ভূমিতে একাত্মতা। ইহা অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একদেহে একীভূত গৌরাঙ্গ হইয়াছেন — ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত

---

* এইগুলি শুধুই শাস্ত্রীয় মতবাদ নহে—শঙ্কর, মধ্ব ও নিম্বার্কের জীবনে ইহারা রূপায়িত। এই সকল মহান আচার্যগণ অনুভূতি না করিয়া কোন মতবাদই প্রচার করেন নাই। স্ব স্ব মতবাদের তাঁহারা মূর্তবিগ্রহ-রূপ।—সঃ

সার্থক হইয়াছে। আবার এক হইয়াও তাঁহারা দুই রহিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কখনও রাধাভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতেছেন—কখনও কৃষ্ণভাবে 'রাধে রাধে' বলিয়া অশ্রু স্নান করিতেছেন। সুতরাং দ্বৈতও রহিয়াছে। চরম মিলনেও দ্বৈত নাশ হয় না— ইহা দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত। সুতরাং মহাপ্রভুতে দ্বৈতসিদ্ধান্তও সার্থক হইয়াছে।

শঙ্কর বলেন, দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ হইতে পারে না, কারণ তাহা বিরোধী। বিরোধী দুই বস্তু একত্র থাকিতে পারে না—Law of contradiction অনুসারে বিরোধিতা একত্র থাকিতে পারে না।

এই যে পারে না— ইহা বুদ্ধি-বিচারের কথা। চিন্তারাজ্যের কথা। চিন্তারাজ্যে সম্ভব নয় এক হইয়াও দুই থাকা, কিন্তু প্রেমানুভূতির রাজ্যে মহাভাবের সমুদ্রে দুই থাকিয়াও এক হওয়া সম্ভব— ইহা অনুরাগভূমির গভীর অনুভূতিগম্য; 'অচিন্ত্য'-শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে।† গভীরতম প্রেমের শক্তিতে মাদনাখ্য মহাভাব ও রসরাজ দুই এক হইয়াও আস্বাদনে দুই রহিয়াছেন। এইজন্য বলিয়াছি, মহাপ্রভুর স্বরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদ মূর্তিলাভ করিয়াছে। [ক্রমশঃ]

---

† চিন্তারাজ্য আর প্রেমানুভূতির রাজ্য উভয়ই অন্তঃকরণের রাজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন: যখন ব্রহ্মে দ্বৈতাভাস হইয়া থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন সমস্ত আত্মাই হইয়া গেল তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, ইত্যাদি।

যতক্ষণ রসাস্বাদন ততক্ষণ মন সক্রিয়—ততক্ষণ ভেদ। মহাভাবের অবস্থায়ও মন কারণশরীরে—'ভাগবতী তনু'তে—তখনও ভেদ। ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা। অন্তর্দশায় তাঁহার মন মহাকারণে লীন হইত—বেদান্তে যাহাকে নির্বিকল্প সমাধি বলা হয়, তখনই অভেদ—প্রেম প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের 'ত্রিগুণভঙ্গ'। জীবের মহাভাব হয় না, কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি হইতে পারে। তবে জীব সেই সমাধি হইতে সাধারণ ভূমিতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। অবতার বা অবতারকল্প পুরুষরাই ভেদ হইতে অভেদ এবং অভেদ হইতে ভেদে— লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায়—যাতায়াত করিতে পারেন। জীবের পক্ষে এই ভেদাভেদ অবশ্যই—'অচিন্ত্য'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন: 'আমাদের ভেদ ও অভেদের মধ্যে একটা প্রাচীর নাই।' আমাদের মতে ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ।—সঃ

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথং চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভি র্বিমৃগ্যাম্॥
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ। যাসাং হরিকথোদ্‌গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৪৭।৬১,৬৩

(উদ্ধব বলিতেছেন:)— আমি এই গোপীগণের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা-ওষধিসমূহের মধ্যে যেন কোন একটি হই, কারণ ইঁহারা দুস্ত্যজ আত্মীয়স্বজন এবং সদাচাররীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণপদবী আশ্রয় করিয়াছিলেন। যাঁহাদের হরিকথা-গান ত্রিভুবনকে পবিত্র করিতেছে, সেই নন্দব্রজস্থ স্ত্রীগণের পাদরেণু আমি বারংবার বন্দনা করি।

যুগের প্রয়োজন—বিজ্ঞান না ধর্ম ?

ডক্টর জলধি কুমার সরকার*

সভ্যতার শিখরে আরোহণ করেও মানুষ যখন তার ঈপ্সিত সুখ ও শান্তি পাচ্ছে না, যখন তার নিজেরই গড়া নানা সমস্যার বেড়াজাল দিন দিন তাকে বেঁধে ফেলছে, তখন স্বভাবতই তাকে পিছনে ফেলা পথটার দিকে ফিরে দেখতে হচ্ছে···দেখতে হচ্ছে সে ঠিক পথে এসেছে কিনা ; যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে, তবে এখনও সংশোধনের পথ আছে কিনা।

বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কয়েক শত বৎসর আগে ঠিক এরূপ ছিল না। ধর্মকে প্রধান সাথী করেই সভ্যতা এগিয়ে আসছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হতেই ধর্ম তাকে যে শুধু সন্দেহের চোখে দেখেছিল তা নয়, ধর্মের অভিভাবকরা তাকে গলা-টিপে হত্যা করারও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আজ বিজ্ঞান তার নিজের জোরেই যে শুধু সগর্বে বেঁচে আছে তা নয়, ধর্মকে লাঞ্ছিত করে তাকে লোকচক্ষে হেয় করেছে ; এমন কি তার বাঁচবার অধিকারের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছে। তাই এখন বিচার করবার সময় এসেছে—কেন এমন হোল, কার আধিপত্য এ যুগের প্রয়োজন—বিজ্ঞানের, না ধর্মের, না উভয়েরই এবং সেই প্রয়োজন কি করে সিদ্ধ করা যায়।

প্রায় চারশত বৎসর আগে, ১৫৪৩ সালে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম বলে আমরা ধরে নিতে পারি, যখন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস (Copernicus) ঘোষণা করলেন যে, পৃথিবী আদি গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, সূর্য নিজে স্থির। রোমান ক্যাথলিক, প্রটেস্টান্ট প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর গির্জার ধর্মযাজকরা এই আবিষ্কারের মধ্যে ঘোর ধর্মবিরুদ্ধতার আভাস পেয়ে খড়্গহস্ত হয়ে পড়লেন,—এমন কি এই আবিষ্কারের একজন সমর্থক জিওরডানো ব্রুনো (Giordano Bruno)-কে জীবন্ত দাহ করতেও পিছপা হলেন না। কোপার্নিকাস তাঁর আবিষ্কারের কিছু পরেই মর-দেহ ত্যাগ করেছিলেন, তা না হলে তাঁকে যে কি নির্যাতন ভোগ করতে হোত, বলা যায় না। ব্রুনোর মৃত্যুর ৬৮ বৎসর পরে, ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিও (Galileo) যখন দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার করে কোপার্নিকাসের ঘোষণার সত্যতা প্রমাণ করলেন, তখন আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। কিন্তু তাতে ফল হোল বিপরীত। ধর্মের অভিভাবকগণ অন্য পথ না পেয়ে—গ্যালিলিওকে নাস্তিকতার অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত করেন। সত্যের জন্য গ্যালিলিওকে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৬৪২ খ্রীঃ তাঁর দেহান্ত হয়। কোপার্নিকাসের আবিষ্কারের সত্যতা মেনে নিতে লোকের আরও ১৫০ বৎসর লেগেছিল।

চারশত বৎসর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। বিজ্ঞান আজ গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। নূতন নূতন কৃতিত্বের স্বীকৃতি অর্জনের জন্য তাকে আর ধর্মযাজকের দ্বারে যেতে হয় না। বরং ধর্মকে তার সত্যতা প্রমাণের জন্য কখনও কখনও জবাবদিহি করতে হচ্ছে বিজ্ঞানের কাছে। আজকাল বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং তার বিচারের মাপকাঠিতে ধর্মের তথ্যগুলির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। আধুনিক যুগের মানুষ বিজ্ঞানের চোখ ঝলসানো আলোকে সম্মোহিত ; তার বিচারবুদ্ধিও এমনভাবে প্রভাবিত যে, সে ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক তথ্য—দুটিকেই একরকমের

---

* স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক। এম্. বি. বি. এস্. (কলিঃ), ডি. ব্যাক্ট. (লণ্ডন) ও পি এইচ. ডি. (কলিঃ)। এফ্.এম্. এ.

মানদণ্ডে যাচাই করতে চায়। আবার কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক যুক্তির কদর্থ করার জন্য ভুলের মাশুলও বইতে হয় ধর্মকে।

ধর্মের এরূপ হবার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, হয়তো বিজ্ঞানী ও ধর্মপথযাত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে কতকাংশে দায়ী। ধর্ম বললে কি বুঝায়? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'উপলব্ধিই ধর্ম। আত্মামাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। কর্ম উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান— এগুলির মধ্যে এক বা একাধিক বা সব উপায় দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ গৌণ অঙ্গ মাত্র।' স্বামীজী আরও বলেছেন, 'আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধনই ধর্ম; ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের স্বরূপ এবং এই স্বরূপের অভিব্যক্তিই জীবনের লক্ষ্য। কাজেই জীবনের উদ্দেশ্য সত্যোপলব্ধি, অন্য কিছু নয়।' এখন ধর্ম বলতে যদি উপলব্ধি—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা, তাঁকে জানা বোঝায়, তাহলে তো তা বৈজ্ঞানিক পর্যায়েই পড়বে। মুস্কিল হচ্ছে যে, ধর্মের যেগুলি গৌণ অঙ্গ, সেগুলিকেই অর্থাৎ মন্দির-মতবাদ-অনুষ্ঠানগুলিকেই আমরা অনেকে ধর্ম বলে মনে করি। ফলে কখনও কখনও আমরা এত সংকীর্ণমনা হয়ে যাই যে, আমরা যেভাবে চলছি, সেভাবে যারা চলে না,—আসল উপায়ে আসল ধর্মাচরণ, সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করে, তাদের আমরা অধার্মিক ভাবি। তা ছাড়া কতকগুলি স্বার্থপর লোক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মের অপব্যবহার করে, ভীতির আবরণে ধর্মকে প্রকাশ করতে চায়। ফলে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যগুলি চাপা পড়ে যায়, আর যখনই সেই ভীতিগুলি কার্যকরী হয় না, তখনই লোকচক্ষে ধর্ম হেয় হয়ে যায়। ধর্মকে পার্থিবজীবনে সুখভোগের যন্ত্র হিসাবে প্রচার করাও এর মূল্য হ্রাসের একটি হেতু। ধর্মের মূল লক্ষ্য—নির্বাণ, মুক্তি, ঈশ্বরলাভ। এই মূল লক্ষ্যের প্রাপ্তি খুবই কঠিন, প্রায় অসম্ভব—এইরূপ ধারণা প্রচার করাও অন্য একটি কারণ বলা যেতে পারে। ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরলাভ যে, এই জীবনে সম্ভব, এবং এটা যে স্বপ্নবিলাসীর কল্পনার ব্যাপার নয়, এই বিশ্বাসের আজ একান্ত অভাব। বর্তমানে ধর্মের মূলোচ্ছেদ করেছে এর অগভীরতা ও সংকীর্ণতা। ধর্মপথের বিভিন্নতা ধর্মকে ছোট করে না, বরং ভগবানের বিরাটত্ব বা মহিমা প্রচার করে। গোলাপ ভাল লাগে ব'লে পদ্মের সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় না। যুক্তিহীন বিশ্বাসের বশে অনেকে প্রচার করেন যে, তাঁদের ধর্মই সত্য, অন্য ধর্ম সত্য নয়। এই যুক্তি-হীনতাই অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে ধর্ম সম্বন্ধে বিরুদ্ধমনা করে তুলেছে।

যুক্তি ও বাস্তবের ওপর সত্যের প্রতিষ্ঠা—এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভুল করে বসলেন তখন, যখন তিনি ধর্মের তথ্যগুলি বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে লাগলেন। ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ বা অবতার যখন প্রচার করেন যে, ভগবান আছেন; তাঁকে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক তখন হেসে বলেন যে, এটা মস্তিষ্কের বিকার। কারণ তিনি তাঁদের পদ্ধতির সাহায্যে এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন না। তাঁদের ভুল হয় এইখানে যে, তাঁরা ঈশ্বরদ্রষ্টাদের পদ্ধতিটি পুরোপুরি নেন না। এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন অধ্যক্ষের সঙ্গে ডঃ মেঘনাদ সাহার বন্ধুত্ব ছিল খুব, তাঁরা সতীর্থও ছিলেন। একদিন ডঃ সাহা এবং আশ্রমাধ্যক্ষের সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ আরও কয়েকজন খ্যাত-নামা সতীর্থ ও বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

এসেছিলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে দুপুরে গল্প করছেন ঘরোয়া পরিবেশে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের প্রসঙ্গক্রমে ডঃ সাহা আশ্রমাধ্যক্ষকে বললেন,'কিন্তু স্বামীজী, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের কথা যদি কেউ না মানে আমরা তাহ'লে তাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে হাতে-নাতে তার সত্যতা দেখিয়ে দিই। তোমরা কিন্তু তা পার না।' আশ্রমাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ বাইরে মাঠে হালচাষরত একজন চাষীকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আজ ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে তোমার এস্ট্রোফিজিক্স-এর লেটেস্ট থিওরিটা বুঝিয়ে দিতে পার ?' একটু চিন্তা ক'রে ডঃ সাহা বললেন, 'না, প্রস্তুতি দরকার।' শুনে আশ্রমাধ্যক্ষ বললেন, 'এক্ষেত্রেও তাই।' ডঃ সাহা মেনে নিলেন কথাটা।[১] বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে এমন কিছু পদ্ধতি নেই যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, ঈশ্বর আছেন বা নেই। তবে, বিজ্ঞানীরা অবশ্যই বলতে পারেন যে, যুক্তি দিয়ে ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। বাস্তবিক 'যুক্তি সীমিত— আমাদের চেতন-স্তরের সীমার মধ্যেই যুক্তি ক্রিয়াশীল। যা অসীম, যুক্তি তাকে জানতে বা তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে না। মন দিয়ে আমরা অসীমকে ধরতে পারি না। যুক্তি মনের একটা বৃত্তি মাত্র, কাজেই যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে যদি আমরা "জানতে" পারি— চিন্তার মধ্যে সীমিত করতে পারি, তা হ'লে তাঁকে আর ঈশ্বর বলা চলে না; তিনি তখন আর অসীম নন, আমাদের মতই সসীম। …আমরা যদি যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করি, আমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান অপর কেউ যুক্তি দিয়েই তা খণ্ডন করতে পারে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঈশ্বরাস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ। …প্রশ্ন উঠতে পারে, অমুক যে সত্যোপলব্ধি করেছে, তার প্রমাণ কি ? তার জীবনে, বাহ্য আচরণেই তা প্রকাশ পাবে।'[২]

বিজ্ঞান বাহ্য ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানী ঘটনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে তাদের মধ্য হ'তে সমপ্রযোজ্য নিয়ম আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীর কাছে 'ঘটনা' মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা। ধর্মসাধকও ঘটনা নিয়েই চলেন, কিন্তু তাঁর কাছে 'ঘটনা' বাহ্য নয়—অতীন্দ্রিয়। এই অনুভূতি যদিও তাঁর ব্যক্তিগত, কিন্তু তা একেবারে নিজস্ব নয়, অন্য যে কেউ সেই অনুভূতি লাভ করতে পারেন। সে অনুভূতির বিবরণ দেওয়া যায় এবং অন্যেরা তার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। সেই হিসাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্র আলাদা হলেও তাদের বিচারপদ্ধতি একই। আমরা যদি উভয়ের উদ্দেশ্য খোঁজ করি, তো দেখব যে, উভয়েই সত্যানুসন্ধান করছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বেদ শব্দটির অর্থ জ্ঞান; ঈশ্বরও অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত— ঈশ্বরই এই জ্ঞানস্বরূপ। নূতন জ্ঞানের সৃষ্টি করতে পারে না কেউ, আবিষ্কার করে মাত্র। বিজ্ঞানীও সেই জ্ঞানান্বেষণে রত। যদি কেউ বেদপাঠরতকে প্রণাম করে, বিজ্ঞানীকে করে না, এটা ঠিক নয়।' অন্যত্রও বলেছেন, 'যে কোন ব্যক্তি বড় আবিষ্কার করেন, তাঁহাকেই উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত পুরুষ বলা যায়। কেবল যদি তিনি আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করেন, আমরা তাঁহাকে "ঋষি" বা "অবতার" বলি, আর যখন সেটা জড়জগতের কোন সত্য হয়, তখন তাঁহাকে "বৈজ্ঞানিক" বলি।' যেমন ধর্মসাধনার

---

১ উদ্বোধন, ৭৪।৬।১০-১ দ্রষ্টব্য।

২ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : ধর্ম, উদ্বোধন, ৭৩।৪।২৮ ৯

নৈতিক মূল আছে, বিজ্ঞানসাধনারও তা তেমনই আছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ এ্যাটম বোমা তৈরি করে—সেটা বিজ্ঞানের দোষ নয়—মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কাজে লাগায়, যেমন যুগে যুগে তথাকথিত ধার্মিকরা ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়ে এসেছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে অনেক সময়ে ধর্মের অবনতি হয়েছে সত্য, কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে তা নয়। ইউরোপে তা হয়েছে অনেকাংশে, কিন্তু ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকে যখন বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়েছিল, তখনই ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করবার জন্য জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ। ১৯০১ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু বিলাতে রয়েল ইন্স্টিটিউট-এ যখন জীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে সমপ্রতিক্রিয়া দেখিয়ে বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করলেন, তখনই ঘোষণা করলেন যে, সব অণুপরমাণুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে এমন একটি চিরন্তন সত্য যা তিন হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের ঋষিরা আবিষ্কার করে-ছিলেন। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বসু তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছিলেন যে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনেক উর্ধ্বে এক অদৃশ্য শক্তি কাজ করে চলেছে। এ বিষয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein) তাঁর শেষ জীবনের (১৯৫০ সাল) লেখা বই "Out of my Later years"-এ বিজ্ঞানের সীমিত শক্তির কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বিজ্ঞানীরা কোন ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ বার করতে পারেন, কিন্তু আমাদের কোথায় পৌছান মঙ্গলকর তা বলতে পারেন না। সেটা আসবে অন্য দিক হ'তে অর্থাৎ ধর্ম হ'তে। বারট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel)-ও বলেছেন যে, বিজ্ঞান যে-কোন পথের শেষে নিয়ে যেতে পারে আমাদের, কিন্তু কোন্ পথ আমাদের শ্রেয় তা বলতে পারে না।

বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্র বিভিন্ন। বিজ্ঞানীকে তার মন সদা জাগ্রত রাখতে হয়; ধর্মপথযাত্রীকে তার মনের আমূল পরিবর্তন করতে হয়। বিজ্ঞান যেমন বস্তুজগতের ভিতর নিহিত সত্যের সন্ধান করে, ধর্ম সেরূপ আধ্যাত্মিক জগতের সত্যের সন্ধানী। একজন প্রকৃতি হতে জ্ঞান আহরণ করে অন্যজন খোঁজে হৃদয় ও মনোরাজ্যে। একের সম্বন্ধে অন্যের অভিমত দেওয়া সম্ভব নয়। ধর্ম-জীবনের শুরুতেই প্রয়োজন বৈরাগ্য বা ত্যাগের ভাব, বৈজ্ঞানিকের জন্য তা অত্যাবশ্যক নয়। বিজ্ঞানী ও ধর্মপথিকের মধ্যে বিভেদের কারণ: ধর্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিচার করা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ধর্মজগতের গণ্ডিতে আনা, উভয়কে এক সূত্রে আনবার চেষ্টা করা, মনস্তাত্ত্বি-কের দর্শনকে ধর্মের অনুভূতি বলে চালু করা। এই বিভেদ রোধ করতে পারেন সত্যিকার ধার্মিক ও সত্যিকার বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক যেমন কেবল তাঁর বিষয়ে প্রমাণিত সত্য ছাড়া অন্য যে কোন ক্ষেত্রে প্রমাণিত সত্যকে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হবেন না, ধার্মিকও যে কোন বিষয়ে প্রমাণিত আবিষ্কারের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্যের বিকাশ দেখবেন, তাঁর দৃষ্টিক্ষেত্রের বহির্ভূত বলেই তাকে ধর্মবিরুদ্ধ ভাববেন না। বৈজ্ঞানিককে মনে রাখতে হবে যে, আমরা চোখ খুলে যেমন দেখি, চোখ বন্ধ রেখেও অনেক কিছুই দেখতে পাই। বিজ্ঞানী তাঁর ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা দেখেন; কিন্তু উপনিষদ্ বলেছেন, আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উঠা যায় তখন, যখন পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও মন স্তব্ধ থাকে। যাই হোক, এটা ঠিক যে, যে-কোন ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারেন। একদিকে মনের সংযম

গড়ে উঠলে তা অন্যদিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

বর্তমান যুগের প্রয়োজন ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই। একদিকে মানুষকে এ্যাটম বা পরমাণু ভাঙার কাজে এগিয়ে যেতে হবে, অন্যদিকে তাকে নিজের সম্বন্ধেও জানতে হবে। ধর্ম ও বিজ্ঞান—এদের কাউকেই বাদ দেওয়া যায় না। আমাদের ট্রাক্টারের যেমন প্রয়োজন ট্রাক্টর-চালক যাতে ট্রাক্টারটিকে ক্রীড়ারত শিশুর উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে না যায়, তার সে শিক্ষারও প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ আইনস্টাইন পূর্বোক্ত পুস্তকে বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খঞ্জ, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' কার প্রয়োজন বেশী, সে বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও, আইনস্টাইনের মতে একে অন্যের পরিপূরক বা নির্ভরশীল হওয়া উচিত। আবার আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে কি বলেছেন দেখা যাক। তাঁর মতে, 'বিজ্ঞান যেমন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মকে তাই হ'তে হবে। এই করাতে হয়ত ধর্মের অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু যা টিঁকে থাকবে তা হবে ধর্মের সারাংশ।' অন্যত্রও তিনি বলেছেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবিকই ধর্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করেছে।' অর্থাৎ আইনস্টাইন ও স্বামী বিবেকানন্দ, এ দুজনের বক্তব্য হ'তে বলা যায় যে, বহু সমস্যা জড়িত পৃথিবীতে যুগে যুগে উপলব্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি এবং সুপরিচালিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—উভয়েরই প্রয়োজন আজ। আগেই বলা হয়েছে যে, যে-কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিক উভয়ই হওয়া সম্ভব। এখন বৈজ্ঞানিক ও ধর্মবিদ্ দুজনারই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার আশু প্রয়োজন। মানুষকে তার বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ দুটিই জয় করতে হবে।*

* স্বামী বুধানন্দ লিখিত 'Can one be scientific and yet spiritual ?'-গ্রন্থ ও উদ্বোধনে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা (৩৪৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লেখিত) হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত।

হিংসা ও অহিংসা

শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়

অহিংসার বাণী ও মহিমা বেদ ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট, গান্ধী প্রভৃতি মহাপুরুষগণও পৃথিবীতে অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তথাপি জগৎ হইতে হিংসার ভাব দূরীভূত হয় নাই বা হইতেছে না। সৃষ্টির আদি কাল হইতে এই হিংসা ও অহিংসার (অসুর ও দেবতার) যুদ্ধ চলিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, হিংসা ও অহিংসার মধ্যে একটিকে একবারে মুছিয়া ফেলা যাইবে না—তবে কিছু দিন যাবৎ কোনটির প্রাধান্য থাকিতে পারে। উহাদের একটিকে একবারে মুছিয়া ফেলিতে গেলে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টিই থাকিবে না। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রমতে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে সমভাবে অবস্থিত ভগবানেরই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। "আত্মৈকরূপং পরমার্থতত্ত্বং ন হিংসকো বাপি ন চাপ্যহিংসা" (অবধূতগীতা ১।২৯) অর্থাৎ 'সর্বত্র একরূপ আত্মাই আছেন, উহাই পরমার্থতত্ত্ব—হিংসক (হিংসাকর্তা) বা অহিংসা বলিয়া কিছুই নাই।' ভগবদ্দৃষ্টি-বর্জিত অহিংসা পরে হিংসারও কারণ হইতে পারে।

সৃষ্টির মূল উপাদান হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও

তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি। এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তিনগুণের পরিমাণের তারতম্যানুসারে জগতে অসংখ্য নামরূপের সৃষ্টি হয়—যেমন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান; দেবগণ মিশ্রসত্ত্বপ্রধান; মনুষ্যগণ রজস্তমপ্রধান; পশু, পক্ষী, স্থাবরাদি তমঃপ্রধান। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থেই ঐ তিনটি গুণ থাকিবেই; উহাদের অনুপাত যতই কমবেশী হউক না কেন সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে আমরা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ জ্ঞান সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি অনুভব করি; রজোগুণের প্রাধান্যে হৃদয়ে অহংকার কাম ক্রোধ লোভ কর্মচাঞ্চল্য দুঃখ প্রভৃতি দেখা যায় এবং তমোগুণের প্রাবল্যে নিদ্রা আলস্য প্রমাদ আচ্ছন্নভাব মোহ প্রভৃতি আমাদিগকে আক্রমণ করে। ঐ তিনটি গুণ সর্বদা একত্র থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। কখনও সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে—একবারে চলিয়া যায় না। কখনও রজোগুণ প্রবল হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত থাকে। আবার কখনও তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করে, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হয়।

পূর্বে যে তিন গুণের পরিচয় দেওয়া হইল উহারাই দেবতা ও অসুরভাবের কারণ। দেবতাগণ মিশ্রসত্ত্বপ্রধান এবং অসুরগণ রজস্তমঃপ্রধান। সৃষ্টিতে কুত্রাপি তিনগুণের অভাব হয় না বলিয়া দেবতা ও অসুরও সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান। একটিরও সম্যক্ অভাব হইলে সৃষ্টিই থাকিবে না। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে দেবতা ও অসুরের মধ্যে এক সর্বব্যাপক ঈশ্বরে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে—এই দৃষ্টিই উদার ও সর্বব্যাপক এবং প্রকৃত অহিংসা উহাতেই প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য পূজার মন্ত্রে বলা হয় 'ধর্মায় নমঃ' 'অধর্মায় নমঃ,' 'জ্ঞানায় নমঃ' 'অজ্ঞানায় নমঃ' ইত্যাদি। তর্পণমন্ত্রে দেবতা অসুর ও শত্রু মিত্র সকলের উদ্দেশেই জলদান করিতে হয় এবং দুর্গাপূজায় অসুরেরও পূজা করা হয়। অসুরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব লইয়া অসুর জয় করা যায় না—ঈশ্বরদৃষ্টিতে উহাদিগকে জয় করা সহজ হয়। চণ্ডীতে দেখা যায়, ভগবতী অসুরনাশের জন্য বাহিরে সমর-নিষ্ঠুরতা দেখাইলেও অন্তরে তাঁহার অসুরগণের প্রতি কৃপাই ছিল—"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা"।

পূর্বে বলা হইয়াছে, দেবভাব মিশ্রসত্ত্বপ্রধান। এ বিষয়ে আচার্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—"মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্মাঃ, অমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ। শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ, দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ" (১২২ শ্লোঃ বসু সং) অর্থাৎ 'অমানিতা যম নিয়ম শ্রদ্ধা ভক্তি মুমুক্ষুত্ব দৈবী সম্পত্তি ও অসৎকর্মে নিবৃত্তি এইগুলি মিশ্রসত্ত্বের ধর্ম।' মিশ্রসত্ত্ব বলিয়া দেবতাগণ অসুরগণ দ্বারা আক্রান্ত হন। সেইজন্যই দেবতাগণের মধ্যেও কখন কখন অহংকার ও ভোগপ্রবৃত্তির প্রবলতা দেখা যায়। যদিও দেবগণ মিশ্রসত্ত্বপ্রধান, তথাপি সাধনরাজ্যে প্রথমে দেবভাবই অবলম্বনীয়। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা" (১৬।৫) অর্থাৎ 'দৈবী সম্পদ্ মুক্তির এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের কারণ।' দেবতাগণ মিশ্রসত্ত্ব বলিয়া অসুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শীঘ্রই আপনাদের দোষ ধরিতে পারেন এবং আপনাদের ব্যক্তিত্বের অভিমান বিসর্জন দিয়া ও সকলে একত্র হইয়া ত্রিগুণাতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসুরগণকে অতিক্রম করেন; কিন্তু রজস্তমঃপ্রধান অসুরগণ রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ সর্বব্যাপক ঈশ্বরদৃষ্টি হারাইয়া অহংকারবশে ভোগের জন্য যুদ্ধ করিয়া শেষে ধ্বংস হয়। আমরা চণ্ডীতে দেখিতে পাই দেবতাগণ অসুরগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভগবতীর বা বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবানের প্রপন্ন হইয়া অসুরগণকে জয়

করিয়াছিলেন— অসুরগণ উহা করে নাই; উহারা অহংকারবশে ভগবতী বা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শেষে ধ্বংস হইয়াছিল। রামায়ণেও দেখিতে পাই মিশ্রসত্ত্ব বিভীষণ রজস্তমোরূপ রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে ত্যাগ করিয়া আপন কল্যাণের জন্য বিশুদ্ধসত্ত্ব ত্রিগুণাতীত বা তিনগুণে নির্লিপ্ত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি বনে তিনজন ডাকাত ও পথিকের দৃষ্টান্তদ্বারা তিনগুণই যে বন্ধনের কারণ, এ বিষয়টি সুন্দর ও সহজবোধ্যভাবে বুঝাইয়াছেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুর অহিংসা ত্রিগুণাতীত ভগবানের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে ভাবাবেগের স্থান নাই। যুদ্ধে বহু লোক নিহত হইবে জানিয়াও ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন –"অথ চেৎ ··পাপমবাপ্স্যসি" (গীতা ২।৩৩) অর্থাৎ 'যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে তোমার স্বধর্ম ও কীর্তির নাশ হইয়া পাপ হইবে।' হিন্দুশাস্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে—"ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি অলৌকিক তত্ত্বের নিরূপণে বেদই বা বেদানুকূল শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ"—কোন ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধর্ম ও অধর্মের নিরূপণ করিতে গেলে পরিশেষে অনিষ্ট ও ধ্বংসের আশঙ্কা আছে। পূর্বে এই ভাবাবেগপ্রধান অহিংসার প্রাধান্য দেওয়াতেই ভারতের ক্ষাত্রশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উহার ফলে আমাদিগকে বহুদিন পরাধীন থাকিতে হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ" (১৬।২৪) অর্থাৎ 'কার্য ও অকার্য-নিরূপণে শাস্ত্রই তোমার নিকট প্রমাণ।' ধর্মরক্ষার্থ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ হিংসা বা পাপ নহে, বরং উহাই ধর্ম। আবার বেদে বলা হইয়াছে—"মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি" অর্থাৎ 'কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না।' ইহা সামান্য বিধি। আবার উহাতে কোন কোন যজ্ঞে পশুবধের বিশেষ বিধি আছে, যজ্ঞে সেই পশুবধ অধর্ম নয়, ধর্মই— ইহা মীমাংসাদর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং আচার্য কুমারিল ও শঙ্কর নানা যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থন করিয়াছেন।

সৃষ্টি স্থিতি যেমন জগতের নিয়ম, ধ্বংসও তেমনি একটি নিয়ম। সৃষ্টি স্থিতি ও লয় ঈশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়মে যথাসময়ে আসে ও চলিয়া যায়। ভগবান্ মহাপ্রলয়ে সকলকে ধ্বংস করেন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ" (গীতা ১১।৩২) অর্থাৎ 'আমি লোকক্ষয়কারী পরিপক্ব কাল'—সুতরাং ভগবান্ হইতে হিংসক আর কে আছে? তিনি মধুর হইতে মধুরতম এবং ভীষণ হইতেও ভীষণতম। সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের মধ্যে এক অদ্বৈত ভগবানকে দেখিতে হইবে, ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের উদার বাণী, ইহারই উপর হিন্দুর মূল অহিংসা প্রতিষ্ঠিত মিশ্রসত্ত্ব-প্রধান অহিংসা সর্বত্র সমদর্শনরূপ পূর্ণ অহিংসা লাভের উপায়মাত্র। সমাজদেহের রক্ষার জন্য সমাজদেহের বিষাক্ত অঙ্গুলিস্বরূপ পাপীর বিনাশ সময় সময় আবশ্যক হইয়া থাকে। দেহের অঙ্গ অঙ্গুলি বিষাক্ত হইলে প্রথমে চিকিৎসাদি দ্বারা উহার আরোগ্য-সাধনের চেষ্টা করা উচিত। উহা সম্ভব না হইলে উহাকে ছেদন করিয়াও দেহকে রক্ষা করিতে হয়। ভগবান্ যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে অর্জুনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন উহার কারণ, অহংকারী ও পাপী দুর্যোধন সমাজের বিষাক্ত অঙ্গুলিস্বরূপ। ভগবান্ উহাকে সংশোধনের যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং দূত হইয়া পাণ্ডবগণের জন্য পাঁচখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু উহাতেও মদমত্ত ও অহংকারী দুর্যোধন সম্মত না হওয়ায় শেষে শ্রীকৃষ্ণ-সারথি অর্জুন যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পাপী দুর্নীতি-পরায়ণ অহংকারী ও লোভী ব্যক্তিগণের উচ্ছেদ-সাধন না করিয়া অহিংসার দোহাই দিয়া উহাদিগকে প্রশ্রয় দিলে, মনুষ্য-সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

হিন্দুধর্মমতে সাধনহিসাবে অহিংসার খুব

প্রশংসা থাকিলেও সিদ্ধান্তহিসাবে উহাকে চরম স্থান দেওয়া হয় নাই। গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ে জ্ঞানের যে অমানিত্বাদি ২০টি সাধনের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে 'অহিংসা' একটি সাধনমাত্র। অহিংসাকে পাতঞ্জল-দর্শনে অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রথম সাধনরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—সমাধিতে অষ্টাঙ্গযোগের পরিসমাপ্তি। ঐ দর্শনে ইহাও বলা হইয়াছে—"অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" (২।৩৫) অর্থাৎ 'অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সেই অহিংসক যোগীর নিকট সকলে হিংসা ত্যাগ করে।' যদিও সূত্রে ঐ প্রকার বলা হইয়াছে, তথাপি ব্যক্তিগতভাবে অহিংসা-প্রয়োগের কতকটা সাফল্য দৃষ্ট হইলেও সমষ্টিগতভাবে অহিংসা-প্রয়োগের সাফল্য এতাবৎ দৃষ্ট হয় নাই। প্রহ্লাদের জীবনে অনেকটা অহিংসা-প্রয়োগের সাফল্য দৃষ্ট হয় বটে, কারণ হস্তী সর্প প্রভৃতি তাঁহার নিকট হিংসা ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহার উপর হিংসা ত্যাগ করেন নাই। সুতরাং ব্যবহারিক জীবনে হিংসা ও অহিংসা উভয়েরই প্রয়োজন আছে—কিন্তু ঈশ্বরদৃষ্টিবিবর্জিত হিংসা বা অহিংসা উভয়ই অনর্থের কারণ। ঈশ্বরদৃষ্টিবর্জিত অহিংসা কিরূপে অনর্থের কারণ হয়, উহা আমরা নিম্নে একটি গল্পদ্বারা দেখাইতেছি এবং আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি :

একটি পাহাড়ে কোন এক অহিংসক-সম্প্রদায়ের মঠ ছিল। ঐ মঠের একজন সংন্যাসী একদিন মঠের নিকট একটি বিষাক্ত সাপ দেখিতে পাইল এবং মঠাধ্যক্ষের নিকট সাপ মারিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। ইহাতে মঠাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সাধুগণ রাজী হইলেন না এবং তাঁহাদের মঠের নীতি-বহির্ভূত প্রস্তাবের জন্য প্রথম ব্যক্তির নিন্দা করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল, ঐ বিষাক্ত সাপের অনেক বাচ্চা হইয়াছে ও ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তখন প্রথম ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া অনেক সাধুই মঠাধ্যক্ষের নিকট সর্পবিনাশ করিবার অনুমতি চাহিল। কিন্তু উহাতেও মঠাধ্যক্ষ এবং কিছু সাধু রাজী হইলেন না। ক্রমে সংন্যাসিগণের মধ্যে দুইটি দল হইয়া গেল—একদল সাপ মারিবার পক্ষে, অপরদল সাপ মারিবার বিপক্ষে। উভয় দলের মধ্যে মন-কষাকষি দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং অবশেষে উভয়-পক্ষে একটা দাঙ্গা হইয়া গেল এবং উভয়-পক্ষের বহুলোক নিহত হইল— "অহিংসা পরমো ধর্মঃ!" 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—এই নীতিবাক্যের বেদান্তসংগত যথার্থ তাৎপর্য না বুঝার ইহাই ভয়াবহ পরিণাম।

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। প্রাচীনতম এই ভারতভূমির শাশ্বত ধর্মভাবনা এই একটি নামের মধ্যেই এ যুগে মূর্ত হয়ে আছে। প্রবঞ্চনাপ্রধান এই যুগে যখন নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ও গলিতে গলিতে পঙ্গপালের মতো অসংখ্য বাকচতুর ধর্ম-ধ্বজীদের সাধারণ লোককে অনায়াসে মোক্ষপ্রাপ্তির পথের উপদেশ দিতে দেখা যাচ্ছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণই ধর্ম ও ধার্মিকের যথার্থ স্বরূপটি চিনিয়ে দিতে সমর্থ। শ্রীরামকৃষ্ণই ধর্ম ও ধার্মিকের অপ্রতিম উপমান—এই আমাদের সিদ্ধান্ত। সেই পুরুষোত্তমের দ্বারা যা যা আচরিত হয়েছে, তাই ধর্ম, যা পরিত্যক্ত হয়েছে তা-ই অধর্ম। যে সকল

লক্ষণ তাঁর চরিত্রে দেখা গিয়েছে সেগুলিই ধার্মিকের লক্ষণ, বিপরীত যা তা নয়। 'যার ধন আছে সেই কুলীন' (যস্যাস্তি বিত্তং স নরঃ কুলীনঃ) এই যে ধারণা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল, যে ধারণায় ধনী পাপকেও পুণ্যে পরিণত ক'রে সংসারে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায়, যে ধারণা এ যুগে ন্যায়বোধের শৈথিল্যের মূল কারণ সেই ধারণাকে, টাকার স্পর্শমাত্রে সর্বশরীরে জ্বালানুভব ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণই সর্বথা তিরস্কার করেছিলেন। এই জন্য সেই মহাপুরুষই ছলনারহিত ধর্ম ও ধার্মিকাচারের উপমাহীন প্রতিপাদক।

কী এই ধর্ম যার যথার্থ স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিপাদন করেছিলেন? ধর্মের দুটি স্বরূপ আছে—সামান্যধর্ম ও বিশেষধর্ম। সামান্য হচ্ছে সেই ধর্ম যার সঙ্গে কারও বিরোধ সম্ভব নয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই যা আচরণীয় ও শ্রেয়স্কর মনে করেন তাই সামান্য এবং সার্বভৌম ধর্ম। মনে হয়, ভারতীয় মনীষীরা এই সামান্য ধর্মকেই নির্বিশেষ 'সনাতন' নামে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্ম থেকে তৃণাগ্র পর্যন্ত সর্বত্র অবিরুদ্ধ বলেই এই ধর্ম সনাতন। মনু দশলক্ষণসমন্বিত এই ধর্মের স্বরূপ বলেছেন—

চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥

৬।৯১-৯২

[চার আশ্রমেই দ্বিজগণের দশলক্ষণাত্মক ধর্ম যত্নপূর্বক পালন করা কর্তব্য। ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়সংযম ধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ—এই দশটি ধর্মলক্ষণ।]

ধৃতি ক্ষমা ইত্যাদি সকলকে ধারণ করে রাখে, তাই 'ধারণাদ্ধর্মঃ'—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে এগুলি ধর্মপদবাচ্য, এ বিষয়ে কারও আপত্তি সম্ভব নয়। জগতে যত ধর্মসম্প্রদায় আছে সবগুলিতেই এসবের মহত্ত্ব স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

এ ছাড়া বর্ণবিশেষের ও সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মকে বিশেষধর্ম বলা হয়। যদিও ধর্মের সামান্য লক্ষণ স্মরণে রেখেই বর্ণধর্ম ও সমষ্টিবিশেষের ধর্মের উদ্ভব হয়েছে, তবু প্রায়ই বিশেষের দ্বারা সামান্যের বিরোধ ও উচ্ছেদ হতে দেখা যায়। স্বভাবতই সাংসারিক মানুষ বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তারা অনায়াসে সূক্ষ্ম, সর্বগত ধর্মটিকে সম্যক্রূপে অনুভব করতে পারে না। তাই তারা নিজ নিজ ধর্ম নিয়ে বিবাদ করে। নির্বিশেষ সর্বব্যাপী আকাশকে যেমন ঘটাকাশ গৃহাকাশ ইত্যাদি রূপে পৃথক্ করে নিয়ে মানুষ পরস্পর বিবাদ করে, তেমনই স্বার্থকে আশ্রয় করে তারা পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। সামান্য ও সর্বগত এই ধর্মের স্বরূপটি যখন তিরোহিত হয়ে যায় তখনই ধৃতি অধৈর্যে, ক্ষমা হিংসায়, দম অসংযমে পরিণত হয়। তখন 'বিদ্যা বিবাদায়, ধনং মদায়, শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।' (বিদ্যা বিবাদের, ধন মত্ততার, শক্তি পরপীড়নের কারণ হয়ে ওঠে।)

উনিশ শতকে যে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন, তা ছিল ভারতবর্ষে বৈদেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠাপনকাল। ম্লেচ্ছাধিকার ক্রমে সব দিকে প্রসৃত হয়ে ভারতীয় জীবনধারাকে সমূলে আলোড়িত করে তুলেছিল। শাসনধারার পরিবর্তনে ঘটল বৃত্তিসাংকর্য আর যেহেতু বৃত্তিব্যবস্থার উপরই সমাজস্থিতি নির্ভর করে, তাই বৃত্তিসাংকর্যের ফলে সমাজব্যবস্থাই বিশৃঙ্খলিত হয়ে উঠেছিল। জাতিতে ব্রাহ্মণও জীবিকার জন্য অব্রাহ্মণ হতে লাগল। এভাবে সব বর্ণ-ই বিহিত আচার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কেবল জাতিকেই চরম ব'লে মেনে নিয়েছিল। গুণ এবং কর্মানুসারে প্রবর্তিত জাতিব্যবস্থা গুণ-ও কর্ম-রূপ দুটি পায়ের

অভাবে গতিহীন ও ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। শুধু জাতিনির্ভর ধর্মভাবনাও সংকুচিত ও বিরোধগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

এই রকম এক সময়ে গদাধরনামা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হন। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরবর্তিকালে শিষ্যদের বলেছিলেন—ত্রেতায় যে রাম, দ্বাপরে যে কৃষ্ণ, সেই এখন রামকৃষ্ণরূপ নিয়েছে। এই মহাপুরুষের পঞ্চাশবর্ষ-ব্যাপী জীবনটিকে আলোচনা করলে তাঁর এই উক্তির যাথার্থ্যে কারও সংশয় সম্ভব নয়। ইনি রামচন্দ্রের মতই প্রায় চৌদ্দ[১] বৎসর দক্ষিণেশ্বরে একান্তস্থানে তপস্যা করেছিলেন এবং কামকাঞ্চনলোলুপতারূপী রাবণকে হত্যা করে এমন এক জীবন উপহার দিয়েছেন যা সর্বজনের অনুকরণীয় এবং মর্যাদাসংস্থাপক। আবার শ্রীকৃষ্ণের মতই প্রধানত অর্জুনস্থানীয় নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে মনুষ্যমাত্রের কর্তব্যা-কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যেমন গীতায় সংগৃহীত তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত নামক গ্রন্থে সংকলিত। এই উপদেশগুলি ভাবগাম্ভীর্যে, দৃষ্টান্তের যথাতথতায়, সদ্ধর্ম প্রতিপাদন-কৌশলে শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রান্তদর্শিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। সব ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুই এই উপদেশরাশির সঙ্গে সুপরিচিত, সুতরাং এ বিষয়ে বেশি বলা অনাবশ্যক।

ধর্ম ও ধার্মিকের যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন করে শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষমাত্রের, বিশেষত ভারতীয়দের মহান উপকার করেছেন। গীতাকে অনুসরণ করে ধর্ম সম্বন্ধেও বলা যায়—কি ধর্ম আর কি অধর্ম, এ বিষয়ে বিদ্বানরাও মোহগ্রস্ত। ধর্মবিষয়ে এই মোহই ইনি দূর করেছেন। তাৎকালিক ভারতে একদিকে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতিরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা, অপরদিকে রানাডে প্রভৃতিরা সমাজসংস্কার এবং অন্যদিকে স্বামী দয়ানন্দ বেদো-পাসনাকে মানুষের লক্ষ্যরূপে নির্দেশ করে প্রসরণ-শীল খৃষ্টধর্মের নিরোধ ও রাষ্ট্রের ধার্মিক সমুত্থান করার চেষ্টা করছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষই এই মনীষিগণের চারিত্র ও বৈদুষ্যে পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়েছিল। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, এঁদের প্রয়াসে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন কয়েকটি সম্প্রদায়ই যুক্ত হয়। প্রাচীন রীতির সঙ্গে নবীনধারার কোনো সামঞ্জস্য হয়নি এবং ধর্মবিষয়ে মতভেদই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছিল।

এই ভূমিকাতেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বিচার-ণীয়। ধর্মের গ্লানি যখন দিগন্তপর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল তখনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। সবাই জানেন যে, পাঠশালায় অক্ষর পরিচয় করলেও এই ব্রাহ্মণটি তথাকথিত পণ্ডিত ছিলেন না। আত্মদর্শনের মধ্য দিয়েই ইনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ব্রহ্ম যেমন অনুচ্ছিষ্ট, এঁর জ্ঞানও ছিল তেমনই অনুচ্ছিষ্ট। সেই লোকোত্তর আত্মসমুত্থ জ্ঞান নিয়েই ইনি ধর্মের লক্ষ্য নিরূপণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন—'যত মত, তত পথ।' সূত্রের মতো এই বাক্যে ধর্মবিরোধের মূলই তিনি উচ্ছিন্ন করেছেন। ধর্ম উপেয় নয়, সে হচ্ছে উপায় পরম প্রাপ্তির; যে প্রাপ্তিকে বোঝাতে গীতা বলেন 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'। সাধ্য যদি সুনিশ্চিত হয়

১ 'সন ১২৬১ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্যন্তই যে তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সাধন-কাল, একথা সুনিশ্চিত। উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।' —লীলাপ্রসঙ্গ, ২।৮

তাহলে সাধনভূত প্রস্থান নিয়ে কিসের বিবাদ? যদি ব্রহ্মানুভবই লক্ষ্য হয় তাহলে সেই লক্ষ্যাভিমুখেই মানুষের প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'— এই শ্রুতি-অনুসারে ব্রহ্মের বিবর্ত ও পরিণাম উভয়ই সত্য। রুচিভেদই মার্গ-ভেদের কারণ। সুতরাং প্রস্থান ভেদ নিয়ে বিবাদ বিবেকী মাত্রেরই পরিহরণীয়। উপায়-মহত্বকে উপেক্ষা করে উপেয়-মহত্ব স্বীকার করলে জাতিবর্ণসম্প্রদায়গত ভেদসত্বেও ধৃতি থেকে অক্রোধ পর্যন্ত ধর্মের সামান্য লক্ষণগুলি সকলের মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে।

সকল ধর্মপথে বিচরণকারী শ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের এই উপদেশ মানবসমাজের জীবনৌষধ। এরই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশও সুসঙ্গত—

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥

(১৭।১৬)

সত্যাসত্যের নিরূপণে মনই প্রধান—এ বিষয়ে বেদান্ত থেকে জৈন-বৌদ্ধ পর্যন্ত সব সিদ্ধান্তই একমত। মানস তপকে প্রধানত আশ্রয় করে ভাবসংশুদ্ধি লাভের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি সকলের কর্তব্য—এই শ্রীরামকৃষ্ণের দেশনা।

যেমন কালান্তরে বিপ্লুত ধর্মের সংস্থাপনের জন্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য লোকের দর্শন বিশদ করেছিলেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা আচণ্ডাল সকলের চক্ষু উন্মীলিত করেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগের পূজ্যতম ভগবদবতার॥*

---

* ডঃ শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য অধ্যক্ষ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিগত ২৩শে মার্চ, ১৯৭৫ তারিখে বারাণসী রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০ তম জন্মতিথি উপলক্ষে সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের স্বলিখিত অনুবাদ।

সাধক কবি কুমুদরঞ্জন

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুগযুগান্তর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান অগণিত সাধু মহাপুরুষদের পদরজে আমাদের দেশের মাটি চিরপবিত্র, এক অখণ্ড সুষমামণ্ডিত আধ্যাত্মিক সৌরভে এই দেশের আকাশ বাতাস আমোদিত। সভ্যতার উষাকালে এই দেশের ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল আকুল প্রার্থনা :—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

—আমাকে অসত্য হইতে সত্যে উন্নীত করো, তমসা হইতে জ্যোতির রাজ্যে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে উত্তীর্ণ করো।

সভ্যতার উষাকাল হইতে এই প্রার্থনার একনিষ্ঠ সাধনার ধারা বিভিন্ন মত ও পথের অনুরাগী ভক্তদের মাধ্যমে বিরামহীন ক্লান্তিহীন অব্যাহতগতিতে চলিয়াছে।

এই দেশের মৃত্তিকার এই সহজাত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের ফলে জ্ঞান, শিল্প ও কৃষ্টির বিভিন্ন দিকের দিক্‌পালগণও তাঁহাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঈশ্বরত্বে উত্তীর্ণ হইবার সাধনায় একনিষ্ঠ। তাই বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক সমাজসেবী কবি সাংবাদিক রাজনীতি-বিদ্ শিল্পী সকলের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ঈশ্বরানুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। এই সুমধুর আবহাওয়ার পরিমণ্ডলের ফলেই আমরা দেখি বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথকে —যিনি তাঁহার অবিশ্রান্ত লেখনীর মাধ্যমে বেদ ও উপনিষদের সত্য ও অমৃতময় বাণীকে বাঙ্ময় ও মূর্ত

করিয়াছিলেন এবং এই অবিচল দৃঢ় ঈশ্বর-প্রত্যয়ে রবীন্দ্রোত্তর যুগের মহান কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্য-সাধনা চিরভাস্বর।

এই দেশের সাধকেরা তাঁহাদের জ্ঞানময় দৃষ্টিতে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সমস্ত জীবের মধ্যেই শিবত্ব তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। সেই মধুময় দৃষ্টিতে জাগতিক সমস্ত বাধাবিপত্তি, জীবনমৃত্যু তাঁহারা পায়ের ভৃত্য করিয়াছেন, চিত্ত দুঃখে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখে স্পৃহা-হীন হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে লালিত প্রাজ্ঞ কবি কুমুদরঞ্জন জীবন-সায়াহ্নে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

'পেয়েছিলাম মায়ের কৃপায় অমৃতময় দৃষ্টি,
দেখেছিলাম অভেদ আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি।
বেদন ব্যাথা ঢের পেয়েছি কাউকে নাহি দুষবো,
ফুটলো কাঁটার বৃন্তে আমার পারিজাতের পুষ্প।'

নির্বিকার নিরুদ্বেগ কালজয়ী এই প্রজ্ঞা তাঁহাকে পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক ঊর্ধ্বে রাখিয়াছিল। বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু সাহিত্যিক কবি এবং আত্মীয়ের অনুরোধেও তিনি তাঁহার জন্মভূমি কোগ্রাম ছাড়িয়া রাজধানী কলিকাতার আকর্ষণ অনুভব করেন নাই। কলকোলাহল বর্জিত প্রকৃতির শান্ত নিস্তরঙ্গ নিভৃত ক্রোড়ে তিনি তাঁহার সাধনায় ছিলেন অতন্দ্র—

'দীন বটি আমি যা চাই পেয়েছি
ধুলা-ধুসরিত পল্লীগ্রামে
শঙ্খ ঘন্টা খোল করতালে
শুনি হরিনাম ডাহিনে বামে,
জলবায়ু দিয়ে ঘিরে আছে নদী;
ফুলে ফলে বাড়ী ভরিয়া আছে
পেয়েছি কান্তিমতী বসুমতী;
শান্তিতে আছি মায়ের কাছে।'

তিনি তাঁহার মোহন যাদুদণ্ডে কাব্য-বীণায় যে সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন এবং নিবাত নিষ্কম্প সারস্বত সাধনায় নিজের মনপ্রাণ পূর্ণ সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা যে ঈশ্বরেরই সাধনা - এই প্রত্যয় ছিল তাঁহার সুদৃঢ়। তাই একশ্রেণীর মানুষ যখন—কাব্য শুধু ফাঁকা কথার ফুলঝুরি, কবিরা পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং কল্পনা-বিলাসী—এই অভিযোগ আনিয়াছিলেন তখন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর উপাসক, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-এর পূজারী সেই অভিযোগের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

'কবি বলে ক্ষমা কর হে বন্ধু,
যা করি করিব যদিন বাঁচি,
বৃহৎ ব্যাপার তোমাদেরি থাক,
আদার ব্যাপারী ভালই আছি।
অভাবের কথা কহিছ কিন্তু
গ্রাহ্য না করি বৃষ্টি হিমও,
সিনেমা গৃহেতে নিত্য দেখছি
লোকের ভীড় যে অপরিসীম।
রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিনে
উৎপাত করে যেহেতু হনু
বৃষ্টিতে ঘরে জল পড়ে বলে
দেখিব না নাকি ইন্দ্রধনু?
দেখো সুন্দর সত্য ও শিবে,
নয়ন মনের তৃপ্তি যাহা
একা তুমি অতো ভেবো না আহা!'

জীবননাট্যে যে ভূমিকা দিয়া ঈশ্বর যাঁহাকে পাঠান, তাহাই ঈশ্বর-অভিপ্রেত এবং সেই কর্মে অবিচল থাকাই ঈশ্বরের উপাসনা এই প্রত্যয়ে স্থিতধী কবি সেই অভিযোগকারীদের নস্যাৎ করিয়াছিলেন—

'রবে কি ময়রা সন্দেশ ছাড়ি
শুধুই 'মিঠাই' 'মুড়কি' নিয়া?
স্বর্ণকার আর মনিকারেরা কি
কাষ্ঠ কাটিবে কাননে গিয়া?

দেশটাকে দেখা পরিণত হতে
রুগ্ন মনের হাসপাতালে,
বিধাতা মোদের লেখেনি ভালে।'

পার্থিব ঐশ্বর্য, জাগতিক সুখ সমৃদ্ধি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি' এই ধ্যানধারণায় বিধৃত কবির দ্বিধাহীন ঘোষণা—

'এর চেয়ে মানি দামী
স্বপ্নের বেশে দেখা দেন যদি সনাতন গোস্বামী।
অর্থই আনে অনর্থ অবনীর
কুবেরের কাছে নোয়াই না মোরা শির।'

দুঃখদুর্দশা, হতাশা, অজ্ঞানতার অন্ধকারাচ্ছন্ন মরুভূমিসদৃশ পৃথিবীকে জলসিঞ্চিত করিয়া তাহাকে স্বর্গে রূপান্তরিত করার সাধনা চলে সাধকদের। তাঁহারাই মানুষের ত্রাণকর্তা, মুক্তি ও চিদানন্দের আলোকদিশারী। সেই সমস্ত সাধুসন্তের উদ্দেশে সাধক কবি কুমুদরঞ্জন নিবেদন করিয়াছেন তাঁহার ভক্তি-বিনম্র চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণতি—

'অপার্থিবের তাঁরা কারবারী,
অকথিত বাণী তাঁরাই কহে,
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে
পঞ্চদূতেরা দাঁড়ায়ে রহে।
কি করিতে পারে বিশ্বসংঘ
রাষ্ট্রপুঞ্জ মানবজাতি?
একটা অমন অকেজো মানুষ
ফিরাইয়া দেয় যুগের গতি।'

ধর্মে ধর্মে হানাহানি ও সাম্প্রদায়িকতা যে চরম নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা—বিভিন্ন পথ ও মতের মাধ্যমেই যে সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্মকে পাওয়া সম্ভব, একথা অসংখ্য সাধুসন্তের কণ্ঠে বারংবার উচ্চারিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার কুসংস্কার-মুক্ত ও গোঁড়ামিবর্জিত কবি তাই খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক, পরিত্রাতা যীশুখৃষ্টের চরণে অর্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন—

'খ্রীষ্টান নহি প্রভু
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি
অনুভব করি তবু।
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই,
ক্ষমাসুন্দর মূরতি তোমার
ভুলিতে কি পারি কভু?'

অর্থ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান—এই সমস্ত মোহ ও আসক্তির ঊর্ধ্বে ছিল কবির সাধক প্রকৃতি। 'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা'—সাধকগণের এই উপলব্ধিকে কায়মনোবাক্যে নিজ জীবনে বিধৃত করিবার ফলেই তাঁহার সংশয়হীন চিত্ত ঘোষণা করিয়াছে—

'কথাতে আর গরল নাহি,
কথার ভয়ে হইনে ভীত,—
সকল কথাই আমার কাছে
হয়েছে আজ কথামৃত।
নিন্দা যাঁরা করেন আমার—
করেন না তা বন্ধু বিনে
ধুলায় ধূসর যে-জন তারে
ধুলা দেওয়া স্নেহের চিনে।
যাঁরা করেন সুখ্যাতি মোর,
লই না, কারণ বিফল নেওয়া;
ন্যাংটা নাগা সন্ন্যাসীকে
পরিধানের বসন দেওয়া।
গৌরব আমি রাখব কোথা?
ক্ষুদ্র কুলায় আছি টিকে,
রে ভাই, ময়ূরপুচ্ছ দিতে
এসো না এ টুনটুনিকে।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন তাঁহার প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ 'জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক' দেওয়া হইল, তখন সেই স্থিতপ্রজ্ঞ কবির কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—

'বিনা মায়ের রাঙা চরণ কিছুই চাহি না,
খোকাকে ভুলাতে কি হাতে পদক দিলেন মা?'

আধ্যাত্মিক সৌরভে মণ্ডিত সাধক কবির কালজয়ী কাব্য অসত্য হইতে সত্যে, তমসা হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে উত্তরণের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। দেবাদিদেব মহাদেবের জটা হইতে উদ্ভূত কল্মষহারিণী, পতিতোদ্ধারিণী সুরশৈবলিনীর ন্যায় কবির কাব্য-গঙ্গায় যিনি অবগাহন করিবেন তিনি সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা, ভ্রান্তি ও মোহ হইতে মুক্ত ও বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়া কবির কথাতেই নিসংশয়ে বলিতে পারিবেন—

'ধন্য আমরা পুণ্য বিশাল ভারতের সন্তান,
শত দৈন্যেরও মাঝে মানি মোরা পরম ভাগ্যবান।
ব্রহ্মাণ্ডের তৃপ্তির লাগি মোরা করি তর্পণ
করি যে সর্ব কর্মের ফল নারায়ণে অর্পণ।
মধু রাত্রিন্দিব—
গোটা ভারতের আরতি করিয়া
জ্বালি মোরা গৃহদীপ।'

আনন্দ তোমারই নাম

শ্রীমতী বিভা সরকার

আনন্দ তোমারই নাম বলে সুধী জনে
বিতর্ক বিচার নাহি জানি ;
ব্রহ্মরূপে আছ তুমি নিখিল ব্যাপিয়া
এই সত্য মনে প্রাণে মানি।
পাই কভু অনুভবে, চকিতে হারাই কোনক্ষণে ;
চিত্তের চাঞ্চল্য প্রভু ক্ষমো মোর ক্ষমো।
সদাই অন্তরে থাকো ওগো দিব্যরূপ
দীনার প্রণতি লহ—নমো নমো নমো।
বিশ্বের বিশিষ্ট যজ্ঞে যজ্ঞপতি তুমি
দৃষ্টি দাও, বিশ্বরূপ তোমার দেখিতে
অনন্ত আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
পারি যেন কিছু তার প্রাণভরে নিতে।
চিনি না মৃত্যুর রূপ—নহি নচিকেতা
তুচ্ছ নিয়ে প্রতিপদে তুচ্ছ হয়ে যাই।
আকণ্ঠ পিপাসা জাগে, সুধাসিন্ধু কই
তৃষিতা চাতকী সম অসীমে তাকাই।
চিরপূর্ণ যে ভৃঙ্গার সুধায় তোমার
তাহার ধারায় স্নাত হোক বসুন্ধরা।
আনন্দ তোমারই নাম বিশ্বমরমিয়া
স্পর্শে তব এক কর ধরা ও অধরা।

পদার্থের গঠন

শ্রীধ্রুব মার্জিত*

বহু বহু যুগ আগে—অতীতের কোন এক শুভ প্রভাতে আমাদের পূর্বপুরুষের স্থূল হস্তের চকমকি ঘর্ষণে যেদিন প্রথম শিখা প্রজ্বলিত হয়েছিল, সেদিনের ইতিহাস লেখা নেই, তবে এটা বলা চলে, সেদিনের সেই ক্ষুদ্র শিখার আলোকে মানুষ তার অজ্ঞান দূরীকরণের যে ইঙ্গিত পেয়েছিল, তা আজকের বিজ্ঞানীর কাছে শপথে রূপান্তরিত। অজানাকে জানবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষকে সর্বদা তাড়িত করে নিয়ে চলে, সেই আকাঙ্ক্ষাই জন্ম দিয়েছে এই শপথের এবং এই অজানাকে জানবার শপথই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে জমা হয়েছে সীমাহীন জ্ঞানের পশরা। "চরৈবেতি চরৈবেতি"—মন্ত্রই হল অসভ্য বর্বর বন্য জীবন হতে সত্যকার পূর্ণাঙ্গ মানুষ হবার বীজমন্ত্র।

মানুষের জ্ঞান যখন অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তখন হতেই সে বস্তুময় এই পৃথিবীর বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করতে চেষ্টা করেছে গভীর ভাবে। সব কিছুই তাকে সাহায্য করতো ভাবতে। ঋতুবৈচিত্র্য সূর্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রের আনাগোনা, এর সব কিছুই মানুষকে ভাবিয়েছে, চিন্তা করার মূলধন জুগিয়ে তার চিন্তা-শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এভাবেই তার অজ্ঞাতে জন্ম নিয়েছে এক আশ্চর্য বিষয় যার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জন্ম সবার অজ্ঞাতে বলে কেউ জানে না ঠিক কবে হতে মানুষ বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছে এবং কবেই বা এই জানার শেষ হবে।

পূর্বপুরুষদের চকমকি ঘর্ষণের ফলে উদ্ভূত প্রথম শিখার আলোক তাদের বিস্ফারিত চোখে কি জাগিয়ে ছিল—উল্লাস না আতঙ্ক? হয়ত সেদিনের পৃথিবীতেও দু'ধরনের লোক ছিল—যাদের মধ্যে একদল আশাবাদী এবং অপর দল নৈরাশ্যবাদী। মাথার উপরের অন্তহীন মহাকাশ, পায়ের নীচের পৃথিবীর ধূলিকণার স্পর্শ, প্রবহমান বায়ু এবং সাগরের সুনীল বারিরাশি তাদের পরিচিত, হয়তো কিছুটা পুরানোও—মানুষ তার এই পরিচিত বস্তু-জগতে প্রবেশ করিয়েছিল তেজোরূপী অগ্নির। যে-অগ্নি এতদিন অশনি-সংকেতের চকিত চপল ভ্রূকুটি এবং দাবানলের ভয়াবহতার মধ্যে আসীন ছিল—সেই অগ্নি পারবে কি তার কল্যাণময় হস্ত প্রসারিত করতে? স্বাভাবিক কারণেই তাদের মনে ছিল এক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব।

পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা থেকে বিজ্ঞানের জন্ম। ব্যক্তি তথা সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞান এবং মানুষের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই তার সার্থকতা। কিন্তু যেহেতু কৌতূহলই হল বিজ্ঞানের প্রধান অনুপ্রেরণা, সেজন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রসূত সব কিছুই যে কল্যাণকর হবে, তার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। যেমন আর্টের জন্য আর্ট, ঠিক তেমনই বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কোন প্রকার সামাজিক স্বার্থ-প্রণোদিত বিষয় নয় বিজ্ঞান তার নিজের মহিমাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

---

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.। বর্তমানে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্সে উচ্চতর গবেষণায় নিরত। 'বর্ণালি তত্ত্ব' (spectroscopy) সম্পর্কে ইঁহার গবেষণা বিদেশেও উচ্চ প্রশংসিত।

আবহমানকাল হতে জ্ঞানপিপাসু মানুষ যত কিছু জেনেছে—যত কিছু আবিষ্কার করে সে মহান হয়েছে—সে-সব আবিষ্কারের প্রসঙ্গগুলি যে অত্যন্ত সরস অথবা আনন্দদায়ক তেমন মনে করার কোন কারণ নেই, বরং বলা যেতে পারে, মানুষের সৃষ্টির প্রসঙ্গগুলি হিসাব নিকাশের খাতার মত অত্যন্ত নীরস এবং সেই সঙ্গে কিছুটা একঘেয়েও বটে। নিদ্রাহীন রাত্রির মত অসহ্য অস্বস্তি, প্রসব-বেদনার মত কষ্টকর অনুভূতি চিন্তাশীল বিজ্ঞানীর নিত্য সাথী। বিচ্ছেদ বেদনা তীব্র হতাশা একাকিত্ব নৈরাশ্য—অনেক অশ্রুসজল কাহিনীও মানুষের আবিষ্কারগুলির সঙ্গে জড়িত—অতীতের ইতিহাস তার সাক্ষী।

বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা হল এই যে সেগুলি বিভিন্ন প্রকারের কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সাহায্যে তৈরী। এক এক শ্রেণীর কণাগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে সব বিষয়ে অনুরূপ। বস্তুর আভ্যন্তরিক এই সূক্ষ্ম কণাগুলি আবার আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি কণার সাহায্যে গড়ে উঠেছে।এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক এক শ্রেণীর কণাগুলিও আবার পরস্পরের সঙ্গে সব বিষয়ে অনুরূপ – অর্থাৎ একই শ্রেণীর দু'টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাকে আলাদা আলাদা করে চিনতে পারা কোন মতেই সম্ভব নয়—তারা সবাই এমনই যমজ ভাই। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে পদার্থ-বিজ্ঞানীগণ ভাঙবার চেষ্টা করেছেন অনেক ভাবে—কিন্তু সেগুলিকে আর ভাঙতে তাঁরা পারেননি। সুতরাং পদার্থ গঠনকারী সূক্ষ্ম কণাগুলিকে মিশ্র কণা (atom) এবং এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাগুলিকে মৌলিক কণা (fundamental particle) বলা যেতে পারে।

দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে ভাবলে হয়ত আমাদের মনে হতে পারে - বস্তুময় এই মহাবিশ্বে সবকিছুই কেবলমাত্র একটি মৌলিক কণিকার সাহায্যে গঠিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষালব্ধ তথ্য বলছে, এই মৌলিক কণিকাগুলির সংখ্যা একাধিক, শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগে মানুষের জ্ঞান-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে মৌলিক কণাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত এক ভীতিপ্রদ ব্যাপার। 'ভীতিপ্রদ' কথাটি ব্যবহার করেছেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইংরাজ পদার্থবিজ্ঞানী পল এ্যাডরাইল মিউরাইস ডিরাক।

পদার্থ গঠনকারী সূক্ষ্মকণা—পরমাণু অর্থাৎ অ্যাটম কথাটি গ্রীক ভাষা আমাদের উপহার দিয়েছে—এর অর্থ অবিভাজ্য। বিজ্ঞানে অ্যাটম অর্থাৎ অবিভাজ্য কথাটি স্থায়িভাবে আসন পেতে বসার কিছুদিনের মধ্যেই বিজ্ঞানীগণ তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন, এটি একটি মিশ্র কণা অর্থাৎ মৌলিক কণাদের সমষ্টি ছাড়া কিছু নয়। স্বীকার করা হল—পরমাণু হল একটি জটিল এককমাত্র। পরমাণুকে জটিল একক হিসাবে চিহ্নিত করার পর—বিজ্ঞানীদের পরমাণুকে ভাঙবার সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! পরমাণুকে প্রচণ্ড উত্তপ্ত করে দেখা গেল, পরমাণু ভাঙছে না; অতি-উচ্চ বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে পরমাণুকে রেখে দেখা গেল—সে নির্বিকার; অত্যন্ত উচ্চ চাপের মধ্যে পরমাণুকে রেখেও দেখা হল - সে উদাসীন। তাপ চাপ বিদ্যুৎক্ষেত্র চুম্বক-ক্ষেত্র এসব সম্পর্কে পরমাণু নির্বিকার এবং উদাসীন—সে যেন এগুলির কোন কিছুকে মানতেই রাজী নয়। এতদিনে বিজ্ঞানীরা প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন—পরমাণুর এই অনমনীয় ব্যবহারে। কিন্তু হতাশ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না, সেটা বিজ্ঞানী-জনোচিত হবে না, সুতরাং কিছু একটা করা দরকার—এই ভেবে নিয়ে, তাঁরা আবার কাজ শুরু করলেন। ইতালীর সব্যসাচী[১]

১ সব্যসাচী—কারণ পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগত এবং পরীক্ষামূলক উভয়দিকে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল।

বিজ্ঞানী এনরিকো ফেরমি একটি নিউট্রনের সাহায্যে পরমাণুকে আঘাত করে দেখলেন—কি হয়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! 'একরত্তি' নিউট্রন দিয়ে 'হুতবড়' একটা ইউরেনিয়ম পরমাণুকে আঘাত করামাত্র সেটি ভেঙ্গে গেল। একটি দুর্গের লৌহ কপাট কিছুতেই ভাঙ্গা যাচ্ছে না—আর দুর্গের ভিতর ঢুকতে না পারলে সেটাকে জয় করাও সম্ভব নয়। অনেক কামান দাগা হল, বোমা মারা হল কিন্তু লৌহকপাট আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। শেষকালে সেনাপতি বল্লেন—'একটি পিংপং বল দিয়ে দরজায় আঘাত করো।' সৈন্যরা সেনাপতির এই পাগলামিতে অবাক হল খুব, কিন্তু তবু বাধ্য হয়ে পিংপং বল দিয়ে সেই লৌহ কপাটকে তারা আঘাত করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তাসের ঘরের মত উল্টে পড়লো সেই ভীষণ দরজা। এটা যেমন ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে—পরমাণুকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করামাত্র সেটির ভেঙ্গে যাওয়াটাও তেমনি অবিশ্বাস্য। কিন্তু ব্যাপারটা জলজ্যান্ত সত্য—এটা তো ঠিক। যাই হোক, পরমাণুকে ভাঙতে পারামাত্র - অর্থাৎ পরমাণু যে একটি জটিল একক—পরীক্ষালব্ধ ভাবে এই সত্য উপলব্ধি হওয়ামাত্র অনেক অজানা বিষয়ের রাশি রাশি প্রমাণ—কত বিচিত্র নতুন নতুন সব প্রশ্ন আর সমস্যা এবং সেই সঙ্গে হতবাক্ করা তথ্যের এক বিস্ময়কর প্লাবন বিজ্ঞানীর সামনে হাজির হল। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

রাজা রানীর যুগ : জ্যোতির্ময়ী দেবী। পরিবেশক : গ্রন্থলোক, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২। (১৯৭৩), পৃ: ১৩৬ + ৭, মূল্য ৬·০০।

"একটি পর্বত (ডুঙ্গর) ও বালির পাহাড়ে তিনদিক ঘেরা। একধারে মরুপ্রান্তর ধূ ধূ করা হলুদ বালিতে ভরা। বিরল বৃক্ষ, হরিণ ময়ূর চরা। মরুসুন্দরী সে দেশটি যেন।"—এই দেশটি রাজস্থান। এই দেশেরই কয়েকটি চিত্র লেখিকা শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে বিভিন্ন সাময়িকীতে এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থখানি ঐগুলির একত্র গ্রথিত রূপ।

লেখিকা আশৈশব জয়পুর রাজ্যে তাঁর পিতামহের সঙ্গে কাটাবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঐ সূত্রেই রাজস্থানের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা। ১৯০৭ খ্রীঃ লেখিকার পিতামহ "তাজিমী" সর্দার হন। ঐ উপলক্ষে প্রথম রাজ-অন্তঃপুরে তাঁদের নিমন্ত্রণ। অবশ্য লেখিকা প্রথম বারে যাওয়ার সুযোগ পাননি। পরে অন্যান্য উপলক্ষে তাঁর ৪।৫ বার অন্তঃপুরে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। এই সময়ে তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন এই গ্রন্থ মোটামুটি তারই স্মৃতিচারণা।

অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবন-যাত্রা, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশার আলেখ্য দরদ দিয়ে লেখিকা বিবৃত করেছেন। মহারানী রানী দাসী বাঁদী কেউই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। রাজ-অন্তঃপুরে সকলে চির-বন্দিনী। এঁদের রূপ, চাকচিক্য ও জৌলুসের অন্তরালে এঁদের প্রকৃত রূপটি লেখিকার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি যথার্থই লিখেছেন—"এত প্রমোদ, উৎসব ফুল আলো সাজসজ্জা বাগান ফোয়ারা ঝরণা ফুল ফলের গাছ তারি মাঝে কি নিষ্ঠুর নিরাশাময় বন্ধ্যা জীবনযাত্রা। এক নির্মম বন্দীশালা।" অন্তঃপুরিকারা সত্যই এক বঞ্চিত নিষ্ঠুর অস্বাভাবিক জগতের অধিবাসিনী।

রাজস্থানের অন্য রূপটি হলো নানারকম পাল-পার্বণ ও উৎসবের সমারোহ। ঐ উপলক্ষে দেশটা রঙে রঙে ছেয়ে যায়। রঙ্গীন রঙ্গীন ওড়না ঘাগরা লুগড়ী পাগড়ীর রঙের লীলা— ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনের সমারোহ। উৎসবে উৎসবে পরিচ্ছদ বদল লেগেই আছে। দীপাবলী জন্মাষ্টমী হোলী ঝুলন রাখী-পূর্ণিমা নরসিংহের মেলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ও অন্যান্য নানা ছোটখাট পাল-পার্বণ সারা বৎসর ধরে লেগেই আছে। ধনী দরিদ্র সকলে আনন্দে বিভোর। 'তীজ গঙ্গোর' মেলায় বিরাট শোভাযাত্রা বেরোয়—রাজকীয় চতুরঙ্গ বাহিনীর হাতি ঘোড়া রথ গাড়ী পদাতিক অশ্বারোহী সৈন্য। রাজার নিজস্ব প্রিয় ঘোড়া হাতি উট রথ—আলাদা আলাদা সাজে বেরিয়ে সকলের আনন্দ বর্ধন করতো।

রাজস্থানে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব ভাবের ও মতের প্রবণতার দরুন প্রতিটি ভাবের মন্দিরের ও ভক্তের বেশ একটা সমাবেশ রয়েছে।

এই কাহিনী রাজারানীদের কাহিনী। এরা আজ আর নেই। সকলেই আজ সাধারণ। দেশটি দারিদ্র্য-পীড়িত। লোকেরা সরল ও হৃদয়বান। 'লেখিকার নিবেদনে' আছে: "দুঃখ এই যে জয়পুরের সাধারণ শ্রেণীর কথা এত কম জানি, এত কম দেখেছি যে বলতে পারা গেল না।"

প্রচ্ছদপটে দাবার ছক রাজা-রানীদের জীবনের প্রতীক। কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ নজরে পড়লো। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আর্ট কাগজে কয়েকটি সুন্দর ছবি আছে। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন: শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত; প্রকাশক—মহেন্দ্র পাব্লিশিং কমিটি, ৩ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৬; (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৯২, মূল্য ২.৫০।

লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা। কিন্তু একারণেই তিনি খ্যাতিমান নন— তাঁহার খ্যাতির পিছনে রহিয়াছে তাঁহার জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাধনা—ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্পাদি বহুতর বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও প্রচুর অধ্যয়ন। ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে তাঁহার দুর্লভ মহাপুরুষ-সংসর্গ ও ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনা। সুতরাং তাঁহার বক্তব্য পাঠকের চিত্তকে যে সত্যের গভীরে লইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচ্য পুস্তকখানি ১৯৩৯ সালের ৩১শে অক্টোবর হইতে ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে প্রদত্ত ২১টি ভাষণের সঙ্কলন। সকল ভাষণেরই বিষয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন। ভক্তের দৃষ্টি যেখানে কেবল লীলাবিলাস দেখিতেই ব্যস্ত, সেখানে লেখক আপনার ভক্তিকে প্রাধান্য না দিয়া বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে মহৎ জীবনের ক্রমবিকাশের বৈশিষ্ট্যটুকু বুঝিতে চাহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন: 'এই গ্রন্থে অতি উন্নত অবস্থার ব্রহ্মজ্ঞ ও সিদ্ধপুরুষ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জীবনের বিষয়ে··· কেবলমাত্র তাঁহার মনস্তত্ত্ব ও মনের ক্রমোন্নতিভাব দর্শান হইবে।'

লেখক আবাল্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গী ছিলেন— জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও ভাবে তাঁহাকে দেখিয়াছেন, সে সবই লেখকের বর্ণনাগুণে প্রত্যক্ষবৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দের বিরাটত্বকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। চারিটি প্রধান ভাব লেখক স্বামী ব্রহ্মানন্দের মধ্যে পরিস্ফুট দেখিয়াছেন: (১) 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তপস্যার [illegible] অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন জপ করা।' (২) 'স্বামীজীর [illegible] শক্তি অর্থাৎ ভাব-বিকিরণ করা···'। (৩) '···অর্থ-নীতির বিশেষ কোবিদ হওয়া···। শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের অর্থনীতিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন না,

ক্তু একটা রাজত্ব চালাইবার মত অর্থনীতির কাবিদ ছিলেন···। রামকৃষ্ণ মিশনের যে এত প্রসারণ ইহা তাঁহারই প্রভাবে হইয়াছিল,···'। ৪) 'সংগঠন বা Organising power। ···কোন্ ব্যক্তি কোন্ কার্যের উপযুক্ত, কিরূপে কোন কার্য করিতে হয় অর্থাৎ লোকচরিত্র চেনা ··· এবং বিভিন্ন ভাবে সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্মিলন রাখিয়া কিরূপে একটা মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয় স-বিষয়ে তাঁহার বিশেষ শক্তি ছিল।'

রামকৃষ্ণ মিশনের নিঃস্বার্থ সেবার ভাবটি লেখক সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন: 'নিঃস্বার্থ কর্ম কাহাকে বলে, গীতার আদর্শ কর্মী কাহাকে বলে — ই রামকৃষ্ণ মিশন তাহার পরিচয় দিয়াছে। মান ও প্রতিষ্ঠা সকলই ত্যাগ করিয়া মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সকলেই পরিশ্রম করিয়াছে। সমষ্টির উন্নতি বিকাশ— ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও নাম নাই। রামকৃষ্ণ মিশন জগৎকে এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছে।' ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার দেখা স্বামী ব্রহ্মানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৫ জন নিষ্কাম কর্মীর জীবনকে অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিয়াছেন, বলিয়াছেন: 'আমি সংক্ষেপে কয়েকজন কর্মীর নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম···। ···ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি যেন···ব্যক্তিদিগের নাম সন্নিবেশিত করিয়া একটি জীবন-তরঙ্গ লিখিয়া সকলকে বাধিত করেন। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জগৎ বুঝিবে যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা নির্বাক ও অরব ভাষায় কিরূপ মহান কার্য করিয়াছে, তাহা জগতে এক আদর্শ হইয়া থাকিবে।'

অনুরূপভাবে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি মিশনের ভাবধারা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যদিও সর্বক্ষেত্রে হয়ত সকল পাঠক তাঁহার বক্তব্যের সহিত একমত হইতে পারিবেন না, তথাপি তাঁহার দেখার আলোকে তাঁহার মনন-শীলতার স্বকীয়তাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না — এইখানেই লেখকের সাফল্য।

বইখানির ছাপা ও প্রচ্ছদপট রুচিপূর্ণ। গ্রন্থের প্রারম্ভে ১৭টি ভ্রম-সংশোধন দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আরো অনেক বানান ভুল রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে বইখানির মূল্য কম। গ্রন্থখানি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

খেতড়ি 'বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির'-এর ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের বহু স্মৃতিবিজড়িত খেতড়ি রাজপ্রাসাদে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য ১৮৯৪ সালেই স্বামীজীর প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ এই অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের উন্নতিকল্পে সেবাকার্য করিয়াছিলেন। বর্তমানে এই কেন্দ্রে চিকিৎসা শিক্ষা ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক সেবাকার্য করা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা: শহরে একটি পূর্ণাঙ্গ মাতৃ-সদন ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র আছে। ইহার বহির্বিভাগে ও অন্তর্বিভাগে প্রসবের অতিরিক্ত প্রাক্‌প্রসব ও প্রসবোত্তরকালীন চিকিৎসাদিও করা হয়। সকল প্রকার সেবাকার্যই ব্যয়মুক্ত অন্তর্বিভাগে দুধ, টনিক ও ঔষধাদিও বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। এই বর্ষে ১৩০ জন প্রসূতির সেবা করা

হয়। প্রাক্‌প্রসব ও প্রসবোত্তর প্রসূতিদের ৩,৬৭৮ জনকে এই কেন্দ্রের সেবিকাগণ বাড়ী বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসেন।

হোমিওপ্যাথি ঔষধও স্মৃতি-মন্দির হইতে দেওয়া হয়।

শিক্ষা: মিশন কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুসারে 'সারদা শিশু বিহার' নামে এক শিশু-বিদ্যালয় পরিচালনা করে প্রাক্-প্রাথমিক নার্সারি শাখায় দুইটি ক্লাস এবং প্রাথমিক শাখায় পাঁচটি ক্লাস হয়। মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৭২। ইহাদের মধ্যে ৭০ জনের উপর হরিজন ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির বালক-বালিকা। ৫২ জনকে বিনা খরচে এবং ১৩ জনকে অর্ধেক খরচে পড়িবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে।

সারদা শিশু বিহারে শিশুদের পুস্তকাগারে ৮৫৫টি পুস্তক আছে। বিহারের সংযুক্ত 'বাল উদ্যানে' শিশুদের উপযোগী দোলনাদি রহিয়াছে। সকল ছাত্রছাত্রীকে ভিটামিন ট্যাবলেট এবং বিস্কুট বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। গরীব ঘরের শিশুদের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন পোশাক এবং পুস্তকাদিও দেওয়া হয়। শিশুদের বাহিরে উন্মুক্ত পরিবেশে পিকনিকে লইয়া যাওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় দিবস, সাংস্কৃতিক উৎসবাদি ও জাতীয় দিবস শিশুরা পালন করে। ঐ সকল দিনে তাহারা কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা, বক্তৃতা ও নাটকাভিনয় করে।

মিশন একটি নিঃশুল্ক পাঠাগার ও পুস্তকাগার পরিচালনা করে। আলোচ্য বৎসরের শেষে উহাতে মোট পুস্তক ছিল ৫,২৬৮।

সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কার্যাবলী:

আশ্রমে গীতা ও উপনিষদের নিয়মিত অধ্যাপনা ব্যতীত বাহিরে নিয়মিত ধর্মীয় আলোচনা করা হয়। জয়পুর কিশনগড় আজমীঢ় যোধপুর উদয়পুর চিতোরগড় কোটা এবং রাজস্থানের অন্যান্য স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে, ব্যবহারজীবীদের সমিতিতে এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-দিনে সাধারণ সভা করিয়া তাঁহাদের পুণ্য জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো হয়। ইহা ছাড়া, জন্মাষ্টমী রামনবমী বুদ্ধজয়ন্তী এবং অন্যান্য ধর্মীয় দিবস যোগ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

দুই-তিন সপ্তাহব্যাপী বাৎসরিক উৎসবে বক্তৃতা রামায়ণপাঠ সঙ্গীত ছায়াছবি প্রদর্শন নাটকাভিনয় শিশু-হস্তশিল্পের প্রদর্শনী প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা রচনা আবৃত্তি আদি প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৯ই ফেব্রুআরি হইতে ৬ই মার্চ, ১৯৭৩ পর্যন্ত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে ফেব্রুআরি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এই কেন্দ্রে শুভাগমন করেন। ২৫শে শীরমহলে তিনি স্বামীজীর শিকাগো ভঙ্গিমার একখানি আবক্ষ ৫´ × ৪´ ফুট চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন ও 'দরবার হলে' দূরদূরান্ত হইতে সমাগত ভক্তগণের উদ্দেশে আশীর্বাদী ভাষণ দেন।

(২)

শ্যামলাতাল বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে এই আশ্রমটি সন্ন্যাসীদের সাধন কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু স্থানীয় ব্যাধি পীড়িত অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণের অবর্ণনীয় কষ্ট দেখিয়া ১৯১৫ সালে 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়।

আশ্রমে সাধু এবং ভক্তদের ধ্যান ভজনাদি অধ্যাত্ম-সাধনার সুযোগ দান, অবতার পুরুষগণের জন্মদিন পালন, ধর্মালোচনা ও পুস্তকাগার ও পাঠাগার পরিচালনা করা হয়। পুস্তকাগারে পুস্তক-সংখ্যা: ২,৩৭৭।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে একটি অন্তর্বিভাগ ও একটি বহির্বিভাগ এবং একটি পশু চিকিৎসালয় আছে। অন্তর্বিভাগের ১২টি শয্যায় সারা বৎসরে ১১৭ জন এবং বহির্বিভাগে ১২,০২৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ১,৬৬৬ জনকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, রোগীদের ঔষধপত্র ও খাদ্যাদির সব খরচই আশ্রম বহন করিয়া থাকে।

পশু চিকিৎসালয়ে পশুদের অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসাও করা হয়। আলোচ্য বর্ষে গোরু ঘোড়া মহিষ ছাগল কুকুর প্রভৃতি মোট ২৭৯টি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছিল।

কেন্দ্রটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে আশ্রম কর্তৃপক্ষ দাতব্য বাটীটির মেরামতাদির জন্য মোট ৮০,০০০ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন।

উৎসব

বাগেরহাট (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক গত ২৫, ২৬ ও ২৭শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিথি-স্মরণে বিশেষ উৎসব পালিত হয়।

২৫শে পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম কথামৃত পাঠ ইত্যাদি হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ' সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রীবিনোদ বিহারী সেন, জনাব শাহ্ হালিমুজ্জমান, শ্রীঅমিয় কুমার মজুমদার, জনাব মীর মোশারেফ আলী, শ্রীঅমরেন্দ্র মজুমদার এবং স্বামী অমৃতত্বানন্দ (সভাপতি)।

২৬শে পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি বেদপাঠ শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও অপরাহ্ণে ধর্মসভা হয়। 'নারী-সমাজে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান' সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রীমতী অঞ্জলি দাস, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, শ্রীঅমিয় কুমার মজুমদার, ডাঃ এম. এ. সবর, শ্রীকুবের চন্দ্র বিশ্বাস এবং শ্রীবিমল চন্দ্র বসু (সভাপতি)।

২৭শে পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত আলোচনা ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবা হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভায় 'বিশ্ব মানব সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর প্রভাব' সম্পর্কে ভাষণ দেন জনাব মোজারুল ইসলাম, শ্রীপরমানন্দ রায়, শ্রীসন্তোষ কুমার ইন্দু, শ্রীবিমল চন্দ্র বসু, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, জনাব আতাহার আলী খাঁন ও শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা (সভাপতি)। এই দিন সভার প্রারম্ভে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দ আশ্রমের কার্যাবলী পাঠ করেন। প্রতিদিনের সভায় সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন ও ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করিতে বক্তাগণ জনগণকে আহ্বান জানান। উক্ত তিন দিনই স্থানীয় কীর্তনীয়াগণ রামায়ণ গান ও পদাবলী কীর্তন করেন।

পুরী: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত ২রা ফেব্রুআরি ও ২০শে হইতে ২৬শে ফেব্রুআরি—এই দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২রা জন্মতিথি স্মরণে মঙ্গলারতি পূজা ভজন এবং প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২০শে শ্রীসদাশিব রথশর্মা 'জগন্নাথ ও উপনিষৎ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ২১শে স্বামীজীর বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের উপর 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর মাধ্যমে আলোকপাত করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত স্তব ও সংগীত এবং 'চিকাগো বক্তৃতা' আবৃত্তির পর শ্রীধনঞ্জয় দাস ভাষণ দেন। ২২শে ডঃ এম্. ডি. বালসুব্রহ্মণ্যমের সভাপতিত্বে 'বিবেকানন্দ

ও সমাজবাদ'—এই আলোচনা-চক্রে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌গণ অংশগ্রহণ করেন। ২৩শে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ এবং সভাপতি শ্রীঅজয় ভূএ্যা 'মানব-পূজারী বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে ভাষণ দেন। ২৪শে স্বামী জীবশিবানন্দের ভক্তিমূলক সংগীতের পর শ্রীবামদেব মিশ্রের সভাপতিত্বে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য' বিষয়ে ভাষণ দেন। ২৫শে সকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন এবং সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্রের সভাপতিত্বে তিনি 'বিবেকানন্দে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন' সম্পর্কে ভাষণ দেন।

২৬শে সকালেও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ সকলকে ধন্যবাদ দেন।

ফরিদপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১লা মে অপরাহ্ণে স্বামী অটলানন্দ এবং স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্মসভার প্রারম্ভে মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণ উদ্বোধনী সঙ্গীত ও গুরুস্তব করেন। সভায় ভাষণ দেন প্রধান অতিথি বাংলাদেশের সংসদ সদস্য জনাব সামসুদ্দিন মোল্লা, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, জনাব মোসার রফ হোসেন, অধ্যাপক আবু ছোবান, মঞ্জু মিঞা এবং ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব এ. বি. সরকার (সভাপতি)।

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

হায়দরাবাদ রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারটি গত ২৯শে জুন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জে. বেঙ্গল রাও-এর সভাপতিত্বে আহূত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সমাবেশে উৎসর্গীকৃত হয়। পৌর প্রশাসন মন্ত্রী শ্রীচান্না সুব্বারায়ুডু গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগটির এবং গ্রন্থাগার ও ভ্রমণ-বিভাগীয় মন্ত্রী ডঃ চ. দেবানন্দ রাও সাধারণ বিভাগটির উদ্বোধন করেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের কৃতিত্ব

১৯৭৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ১২৯ জন পরীক্ষার্থী সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রগণের সংখ্যা ৬৮। জাতীয় বৃত্তিলাভ করিয়াছে ২১ জন ছাত্র। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ রিভিউ করার পর এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিজ্ঞানে একাদশ, বাণিজ্যে তৃতীয়, কৃষিবিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং কারিগরিতে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এ বৎসর আই. আই. টির নির্বাচনী পরীক্ষায় ভারতের পূর্বাঞ্চলে তৃতীয় ও নবম স্থান অধিকার করিয়াছে এই বিদ্যালয়েরই দুইটি ছাত্র।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী চিদাত্মানন্দ** গত ১৭ই জুন বেলা ১·১০ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৬৫ বৎসর বয়সে শ্বাস- ও হৃদ্‌-যন্ত্রের বিকলতাহেতু দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৭ই জুন সকালে বেলুড় মঠে হৃদ্‌রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠান হয়। সেখানে তাঁহাকে এই-জাতীয় রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কক্ষে (Intensive care unit) রাখা হয়। তিনিও ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন এবং ১৭ই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া কেবিনে লইয়া যাওয়া হয়। ঐখানেই তিনি হৃদ্‌রোগের পুনরাক্রমণে অতি স্বল্প-সময়ের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের কানপুর কেন্দ্রে

যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। তিনি কানপুর এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদক ছিলেন। ইহার পর ১৯৬৫ সালে তিনি বেলুড় মঠের অছি ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য এবং ১৯৬৯ সালে অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁহার দেহত্যাগে সংঘ একজন দায়িত্বশীল, অকপট ও শ্রদ্ধালু কর্মীকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সে হারাইল।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

কসবা দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে গত ৬ই মার্চ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম শুভ জন্মোৎসব সাড়ম্বরে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি ভজন পূজা পাঠ ও লীলাকীর্তনের পর প্রায় ১৫০০ ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী চিৎসুখানন্দ ডঃ প্রণব রঞ্জন ঘোষ ও সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ।

ধুম (বাংলাদেশ) বিবেকানন্দ সমিতিতে গত ৯ই ও ১০ই চৈত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি ভজন শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ নগর-পরিক্রমা কীর্তন বিশেষ পূজা হোম ধর্মসভা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুথিপাঠ উৎসবের অঙ্গ ছিল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও স্বামী মুকুন্দানন্দ গিরি। সভায় সমিতির সেবক-সেবিকারা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রায় দুই হাজারেরও বেশী লোক বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান।

১০ই চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ভুপাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০ তম জন্মতিথি-উৎসব মহাসমারোহে পালিত হইয়াছে। ঐদিন বিশেষ পূজা হোম ভজন কীর্তন হয় ও ১২০ জন ভক্ত ও সাধু বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২১শে সর্বসাধারণের মহোৎসবে প্রায় ১২০০ নরনারায়ণ বসিয়া অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কর্তৃক গত বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

বস্ত্র- ও পুরস্কার-বিতরণ উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। মহাষ্টমীর দিন প্রায় দশ হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদ পান।

হুগলী জেলা বিবেকানন্দ সংঘ কর্তৃক গত ৯ই মার্চ হইতে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত পূর্ব-নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী জেলার গঙ্গঘণ্টা ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া ভোঁপুর মগরা শক্তিগড় ও কোলা কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

পরলোকে চপলাসুন্দরী দত্ত

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ (ইং ২৫শে মে, ১৯৭৫) বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন রাত্রি ৯-৩৫ মিঃ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা চপলাসুন্দরী দত্ত (শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ও উদ্বোধনের প্রাক্তন কর্মী ৺ চন্দ্রমোহন

দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিণী। শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে মর্তধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯০ বৎসর।

উদ্বোধনের বর্তমান বাড়ীতে ২৫ বৎসর বয়সে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহামন্ত্র লাভ করেন। তাহার পর সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসর তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সহজ সরল অনাড়ম্বর সেবাপরায়ণ ধর্মজীবন যাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অভয় পাদপদ্মে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

আবির্ভাব-তিথি

বাংলা ১৩৮২ সাল, ইংরাজী ১৯৭৫-৭৬ খ্রী:

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ :	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী,	১০ শ্রাবণ,	মঙ্গলবার,	৫ অগস্ট ১৯৭৫
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ :	শ্রাবণ পূর্ণিমা,	৪ ভাদ্র,	বৃহস্পতিবার,	২১ অগস্ট "
স্বামী অদ্বৈতানন্দ :	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী,	১৮ ভাদ্র,	বৃহস্পতিবার,	৪ সেপ্টেম্বর "
স্বামী অভেদানন্দ :	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী,	১২ আশ্বিন,	সোমবার,	২৯ সেপ্টেম্বর "
স্বামী অখণ্ডানন্দ :	মহালয়া,	১৮ আশ্বিন,	রবিবার,	৫ অক্টোবর "
স্বামী সুবোধানন্দ :	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী,	২৯ কার্তিক,	শনিবার,	১৫ নভেম্বর "
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ :	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী,	১ অগ্রহায়ণ,	সোমবার,	১৭ নভেম্বর "
স্বামী প্রেমানন্দ :	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী,	২৬ অগ্রহায়ণ,	শুক্রবার,	১২ ডিসেম্বর "
শ্রীশ্রীমা :	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী,	৯ পৌষ,	বৃহস্পতিবার,	২৫ ডিসেম্বর "
স্বামী শিবানন্দ :	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী,	১২ পৌষ,	রবিবার,	২৮ ডিসেম্বর "
স্বামী সারদানন্দ :	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী,	২২ পৌষ,	বুধবার,	৭ জানুআরি ১৯৭৬
স্বামী তুরীয়ানন্দ :	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী,	২ মাঘ,	শুক্রবার,	১৬ জানুআরি "
শ্রীশ্রীস্বামীজী :	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী,	৯ মাঘ,	শুক্রবার,	২৩ জানুআরি "
স্বামী ব্রহ্মানন্দ :	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া,	১৯ মাঘ,	সোমবার,	২ ফেব্রুআরি "
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ :	মাঘ শুক্লা চতুর্থী,	২১ মাঘ,	বুধবার,	৪ ফেব্রুআরি "
স্বামী অদ্ভুতানন্দ :	মাঘ পূর্ণিমা,	২ ফাল্গুন,	রবিবার,	১৫ ফেব্রুআরি "
শ্রীশ্রীঠাকুর :	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া,	১৯ ফাল্গুন,	বুধবার,	৩ মার্চ "
স্বামী যোগানন্দ :	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী,	৫ চৈত্র,	শুক্রবার,	১৯ মার্চ "

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ] ১লা ভাদ্র। (১৩০৬) [১৫শ সংখ্যা।]

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

[পূর্বানুবৃত্তি]*

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাণা কুম্ভ শুনিলেন, কিশোরী আজ পাঁচদিন অন্নজল স্পর্শ করে নাই ; মীরাবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহাও জানিয়াছেন। রক্ষীরা মীরা, অক্কা ও বক্কাকে ধৃত করিবার মানসে, বন খুঁজিতেছে। এমন সময় রাজ-আদেশ পাইল, "বন খুঁজিবার আবশ্যক নাই, তাহারা যথায় যায় যাক্।"

কুম্ভ রাণার মর্ম্মে মর্ম্মে বাজিয়াছে, "আমি রাজপুত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, আমি একটী রমণীর প্রাণবধের কারণ হইলাম। দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, রমণী ইহাদিগকে রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম ! সে ধর্ম্ম আর কোথায় ? পরপ্রণয়িনী রমণী বন্দী করিয়াছি। পবিত্র প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি। এই কি রাজধর্ম্ম ? রাণাবংশে কি এই কার্য্য ?" বলিতে বলিতে চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল। দুর্গম রণসন্ধিমধ্যে শক্রপ্রহরণ যাঁহাকে কখনও কাতর করে নাই, সেই রাণা বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কিশোরীর রূপলাবণ্য শিরায় শিরায় বসিয়াছে, কিশোরী তাহার নয়, তাহাও মর্ম্মে মর্ম্মে পশিয়াছে। রাণা ধীরপদে কিশোরীর গৃহাভিমুখে চলিলেন। পা ওঠে না, আতঙ্কে হৃদয় কম্পিত হইতেছে, বার বার আন্দোলন করিতেছেন, কি বলিয়া কিশোরীর সহিত সম্ভাষণ করিবেন ? প্রেমকথা ফুরাইয়াছে, স্তুতি, মিনতি, প্রার্থনা সকলই শেষ হইয়াছে। আর কি কথা বাকি ? ভাবিতে লাগিলেন,—"পরাজিত শক্রর নিকট, আমি পরাজিত ! রাজমুকুট, শৌর্য্য বীর্য্য, যশ, প্রতিভা, কিশোরীর প্রেমে সমস্ত বিনিময় করিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু সকলই কিশোরী পায়ে ঠেলিয়াছে। আমার জীবনে সুখ কি ? বহুকাল সিংহাসনে বসিয়াছি ; রণভূমি, বিলাসভবন, মৃগয়াকানন, অর্থাকাঙ্ক্ষীরমণীকটাক্ষ বিস্তর দেখিয়াছি ; বন্দী, চাটুকার, পরাজিত রাজাগণের প্রশংসাবাদ বিস্তর শুনিয়াছি ; সুকণ্ঠ সঙ্গীত, বীণার ঝঙ্কার, তালে তালে সুন্দর নূপুর-ধ্বনি, পুরাতন হইয়াছে ; কিন্তু যারে চাই, সে ত আমার নাই। আমি কি কিশোরীকে ভালবাসি ? কৈ ? ভালবাসার যন্ত্রণা বুঝিয়া তবে কেন তাহাকে যন্ত্রণা দিতেছি ? সয়,—স'ক,—আমার প্রাণেই স'ক।"

---

* মাঘ, ১৩০১ সংখ্যার পর।—বর্ত্ত

কিশোরীর গৃহে কুম্ভ রাণা প্রবেশ করিলেন। কম্পিতস্বরে কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কিশোরী শোন। আর প্রেমকথা কহিতে আসি নাই; কোনও মর্ম্মবেদনার প্রার্থনাও জানাইতে আসি নাই; আমি এতদিনে বুঝিয়াছি, আমি বড় অপরাধী; অপরাধের মার্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। তোমার দেবী মূর্ত্তি! তোমার হৃদয়ে যদি মার্জ্জনা না থাকে, মার্জ্জনা আর কোথায় থাকিবে? আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি। পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয় নিয়ম, তুমি ক্ষত্রিয়কুমারী অবগত আছ, বীর্য্যপ্রকাশে রত্নাদি গ্রহণ করে। তুমি নারীরত্ন, আমি সেই নিয়মের অনুসারে তোমায় অপহরণ করিয়াছিলাম; মনে মনে স্পর্দ্ধা রাখিতাম, আমি রাণা, আমার প্রতি অনুরাগিণী হইবে না, এমন রমণী কে আছে? কিন্তু দেখিলাম, না! দেবতাই দেবীর উপযুক্ত, আমি তোমার উপযুক্ত নই। উপযুক্ত হইলে, তোমায় পাইতাম। আমি অন্য অপরাধে অপরাধী নই, কিশোরী! এই অঙ্গুরী লও, এই অঙ্গুরীদর্শনে কেহ তোমায় প্রতিরোধ করিবে না। তুমি স্বাধীন! তোমার প্রণয়ীর নিকট যাও! চিন্তা দূর কর,—যদিচ মন্দারপর্ব্বতে আলোক জ্বলিতেছে না, তোমার প্রণয়ীর জীবনালোক নির্ব্বাণ হয় নাই। যথায় তোমার প্রণয়ী আছে, পর্ব্বত নিম্নে রাজদূত অবস্থান করিতেছে, তোমায় তথায় লইয়া যাইবে। কখনও কখনও অভাগা রাণাকে মনে করিও। আর যদি কখনও কুম্ভ রাণার মৃত্যু সংবাদ পাও, স্থির জানিও, তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিশোরী! যাও, আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।" রাণার কণ্ঠরোধ হইল। কিশোরী শয্যার বসিয়া শুনিতেছিল। স্বপ্নকথার ন্যায় কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাণা আত্মসংবরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "কিশোরী! কেন অবিশ্বাস করিতেছ? এই অঙ্গুরী রাখিলাম। রাণা মিথ্যাবাদী নহে, কিশোরী তুমি স্বাধীন।"

রাণার মস্তক ঘুরিয়া গেল, "হা কিশোরী" বলিয়া পতিত হইলেন। মহা উদ্বিগ্ন হইয়া কিশোরী শয্যাত্যাগ করিলেন। উদ্বিগ্ন হইয়া দাসদাসীকে ডাকিলেন, দাসদাসীর সহিত রাণার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাণা চৈতন্য লাভ করিলেন, দেখিলেন কিশোরী সেবায় নিযুক্তা! বলিলেন, "কিশোরী এখনও রহিয়াছ কেন?" কিশোরী উত্তর করিলেন, "মহারাণা আমায় মার্জ্জনা করুন।" রাণা বলিলেন, "মার্জ্জনা করিয়াছি। আমার প্রার্থনা—এই দূত তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তোমায় লইয়া বীরেন্দ্র সিংহের নিকট যাইবে। এ প্রার্থনা আমার পূরণ কর। যাও, যদি প্রার্থনা না রাখ,—ত রাজাজ্ঞা পালন কর।"

কিশোরী বলিলেন, "মহারাণা! যদি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, তবে আর একবার অভাগিনীকে রাজসম্মুখে আসিতে দিবেন।"

কিশোরীর হৃদয়ে অনুতাপ আসিয়া বসিল। রমণীর চঞ্চল স্বভাব, চঞ্চল মন,—চঞ্চলতা রমণীর জীবন বলিলেও হয়,—কিন্তু একবার অনুতাপ আসিয়া বসিলে, চিতানল ব্যতীত সে অনুতাপের তাপ দূর হয় না।

রাজদূত কিশোরীকে লইয়া পিঙ্গলার আবাস স্থানে উপস্থিত। দেখিলেন, বীরেন্দ্র সিংহ শয্যায়! কিশোরী ডাকিলেন, "বীরেন্দ্র!" বীরেন্দ্র চক্ষু মেলিল। কিশোরীকে দেখিল, চিনিল। উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কিশোরী! কিশোরী! হৃদয়নিধি! হৃদয়ে আইস!" যে কিশোরী মন্দার-পর্ব্বতের আলোক নিরীক্ষণ করিয়া, দিন রাত্র অতিবাহিত করিয়াছে, এখন আর প্রণয়ীর প্রেম-

সম্ভাষণে বিচলিত হইল না। স্থিরস্বরে বলিল, "কাহাকে হৃদয়নিধি বলিতেছ? যে শত্রুর অসি তোমায় বার বার পরাজয় করিয়াছে, যে শত্রু পরাজিত শত্রু হাতে পাইয়া বন্দী করে নাই—ক্ষত্রিয়-নিয়মপালনে সেই শত্রু আমায় পিতৃগৃহ হইতে আনিয়াছে। যদি আমি তোমার হই, তাহা হইলে আমি ষিচারিণী। বীরেন্দ্র! মনে মনে আমি দ্বিচারিণী সত্য, কিন্তু দেবারাধনায় আমার প্রায়শ্চিত্ত করিব। পারি যদি, আমার উদার পতির মঙ্গল কামনায় নিয়ত নিযুক্তা থাকিব। তোমার সহিত এই আমার শেষ দেখা! বীর আচরণে মনের ব্যথা সম্বরণ কর।" কিশোরী দ্রুতপদে বহিষ্কৃতা হইল। একবার বীরেন্দ্র উঠিয়া যাইতেছিল,—স্থির হইয়া দাঁড়াইল, বলিল,—"আমি কি ক্ষত্রিয়? ক্ষত্রিয়ের প্রতিশোধ,—ব্যথা সম্বরণ কি! প্রতিশোধ!!"　　[ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ-মিশন।

গত ২৫শে আষাঢ় হইতে পুনরায় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ১৫ই শ্রাবণ হইতে প্রতি রবিবারে স্বামী সারদানন্দ "পতঞ্জলি ও যোগ ধর্ম্মের" উপর অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতেছেন। সাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। স্থান—রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার; সময়—অপরাহ্ণ ৬টা।

ভগবদ্গীতা

শাঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[২য় অধ্যায়ের ২১ শ্লোকের ভাষ্য ও অনুবাদ হইতে ২২ শ্লোকের ভাষ্য পর্যন্ত।—বর্তমান সম্পাদক]

[১ম বর্ষ।]　　১৫ই ভাদ্র। (১৩০৬ সাল)　　[১৬শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)

১। সাদা কাপড়ে যদি একটু কাল দাগ থাকে, তবে বড়ই বেশী দেখায়। পবিত্র লোকের হৃদয়ে অল্প দোষই বেশী দেখায়।

২। কাঁচা মাটীতে গড়ন হয়, পোড়া মাটীতে আর গড়ন চলে না। যাহার হৃদয় একেবারে বিষয়বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে, তাতে আর পারমার্থিক ভাব ধরে না।

৩। সাপের মুখে বিষ আছে, সে যখন আপনি খায় তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায় তখন বিষ লাগে। তেমনি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ করতে পারে না, অন্যকে সেই মায়া মুগ্ধ করে।

৪। আগে সাদাসিদে জ্বর হ'ত, স... পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেত; এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ডিঃ গুপ্ত ঔষধ। আগে লো... যোগ যাগ তপস্যা করত; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্ব্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হয়ে কল্লে সব সংসার-ব্যাধি নাশ পায়।

৫। জ্ঞান্তে অজ্ঞান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, তাঁর নাম কল্লেই ফল হবে—যেমন কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, আর যদি কাহাকেও জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, তারও তেমনি স্নান হয়—আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কার্য্য হয়ে যায়।

৬। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হ'ক একবার পড়্তে পার্লেই অমর হওয়া যায়, কেউ যদি স্তব স্তুতি ক'রে পড়ে সেও অমর হয়, আর কাহাকেও যদি কোন রকমে ঠেলে সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয়; তেমনি ভগবানের নাম যে প্রকারে হ'ক, লইলে তার ফল হইবেই হইবে।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্বানুবৃত্তি]*

হুগলি নদী।

এতবড় পদ্মা ছেড়ে, গঙ্গার মাহাত্ম্য, হুগলি নামক ধারায় কেন বর্ত্তমান, তাহার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ করে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার "টলিস নালা" নামক খাল ও আদি গঙ্গা হয়ে, গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কন পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্ব্বে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিদ্দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীন কাল হ'তেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগ্‌ল। ১৫৩৭ খৃঃ ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে পর্ত্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আস্‌বার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়্বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু করে উঠ্‌তে পারে না। মা গঙ্গা ক্রমশঃই বুজে আস্‌ছেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদরী লিখ্‌ছেন, সূতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময় বুজে গিয়েছিল। অন্ধকূপের

---

* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ।

হলওবল, মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না ব'লে, ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখ্‌ছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জেলেঙ্গি নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার সমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। খৃষ্টাব্দের ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলীর ১ মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগর স্থাপন করলে। জর্ম্মান অষ্টেণ্ড কোম্পানী আর ৫ মাইল নীচে ১৭২৩ খৃঃ অব্দে অপর পারে চন্দননগরের ৫ মাইল নীচে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড্ডা খুল্‌লে। ১৬১৬ খৃঃ অব্দে দিনেমারেরা চন্দননগর হতে ৮ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে আড্ডা করলে। তারপর ইংরাজেরা কল্‌কেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কল্‌কেতা এখনও খোলা, তবে "পরেই বা কি হয়" এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটীর মধ্য দিয়ে চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পারের জমী হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটী বসে উঁচু হয়ে ওঠে তা হলেই মুস্কিল। আর এক ভয়ের কিম্বদন্তি আছে; কল্‌কাতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে নাকি ঐ রকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৪ খৃঃ অব্দের ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বার বেলায় এইটে ঘটলে কি হতো তোমরাই বিচার কর—গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না!

'জেম্‌স্‌ ও মেরী' চড়া।

এই ত গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয়—জেম্‌স্‌ আর মেরী চড়া। পূর্ব্বে দামোদর নদ কল্‌কেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়্‌তো, এখন কালের বিচিত্র গতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায় ৬ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালচেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাযেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখন বা নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি? দিন রাত্র তার মাপ জোপ হচ্চে, একটু অন্যমনস্ক হলেই, দিন কতক মাপ জোপ ভুল্লেই, জাহাজের সর্ব্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উল্টে ফেলা; না হয়, সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধ ঘণ্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদরের মুখ থেকে রূপনারায়ণই বটেন। দামোদর এখন সাঁওতালি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি চাটুনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কল্‌কেতা থেকে কাউন্টি অফ ষ্টারলিং নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই "খোঁজ খবর নহি পাই"। ১৮৭৪ সালে ২৪০০ টন বোঝাই একটী ষ্টীমারের ২ মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি প্রণাম করি। তু—ভায়া বললেন, মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে; আমিও "তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।" পরদিন তু—ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মশায় তার কি হল?

সে দিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তেই খাবার সময় তু—ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চল্‌ছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "ওতো আপনি খাচ্চেন। তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হলো যে, কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কল্‌কেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়, সেথায় খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ির বেজায় জেদ, "আগে একটু দুধ খাও।" জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার; দুধের বাটিতে যেই চুমুকটী দেওয়া অম্‌নি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে উঠা। তখন তার শাশুড়ি আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্লে, "বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়াকরা,—শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।" অতএব হে ভাই! আমি কল্‌কেত্তার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়্‌ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল বোঝা গেল না।

জাহাজের ক্রমোন্নতি—ইহার 'উৰ্দ্ধমূলম্' ও 'অধঃশাখা প্রশাখা'।

এ জাহাজ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে সমুদ্র ডাঙ্গা থেকে চাইলে ভয় হয়, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেছে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্য্য মামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে যান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ। এ জাহাজ কর্‌লে কে? কেউ করেনি। অর্থাৎ, মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কল কব্‌জা আছে, যা নইলে একদণ্ড চলে না, যার ওলট পালটে আর সব কল কারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায়; সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কায চলে? হ্যাকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে জয় জগন্নাথের রথ পর্য্যন্ত, সুতো-কাটা চর্কা থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানার কল পর্য্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম কর্‌লে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ, সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আন্‌ছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হলো, ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি—আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে, ঐ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হ'ক না কেন, যত পরিবর্ত্তন হ'ক না কেন, নীচের ধাপগুলিতে ওঠ্‌বার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হলো; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা হলো, ক্রমে কত রূপ বদল হলো, কত তার হলো, তাঁত হলো, ছড়ির নাম রূপ বদলাল, এস্‌রাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়ার গাছকতক বালাঞ্চি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের ঠেঙ্গা বসিয়ে ক্যাঁকোঁ করে "মজওয়ার কাহারের" জাল বুনবার বৃত্তান্ত জাহির করে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে এখনও নিরেট চাকা গড়্‌গড়িয়ে যাচ্ছে। তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে, বিশেষ এ রবর-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ অর্থাৎ সত্যযুগের যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখানা ও বাহিরে আর একখানা হয় ব'লে কাপড় পর্য্যন্ত পর্‌তেন না; পাছে স্বার্থপরতা আসে ব'লে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া লুড়ির সহায়ে সর্ব্বদাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ কর্‌তেন; তখন জলে বিচরণ কর্‌বার জন্য তাঁরা গাছের

মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা দুচার খানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্য্যন্ত কট্টুমারণ দেখেছ ত? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্য্যন্ত চলে যায় দেখেছ ত? উনিই হলেন—"উর্দ্ধমূলম্"।

আর, বাঙ্গাল মাঝির নৌকা যাতে চ'ড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাকৃতে হয়। চাটগেঁয়ে মাঝি অধিষ্ঠিত বজরা যা একটু হাওয়া উঠ্‌লেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন দ্যাব্‌তার নাম নিতে বলে। ঐ যে ভড় যার গায়ে নানা চিত্র বিচিত্র আঁকা পেতলের চোক দেওয়া, দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে। ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কনের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বান্‌চাল হয়ে, ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাহি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরে ছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙ্গি—উপরে সুন্দর ছাওয়া, নীচে বাঁশের পাটাতন, ভিতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা ("মেতুয়া গঙ্গাসাগর" খুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ার গুঁতোয় "ডাব নারিকেল চিনির পানা" খাও না)। ঐ যে পান্‌সি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ, কোন্নগুরে মেঘ দেখেছে কি কিস্তি সামলাচ্ছে; এক্ষণে যা জওয়ানপুরিয়া জওয়ানের দখলে চলে যাচ্চে, যাদের বুলি — আইলা গাইলা বানে বানি, যাদের ওপর তোমাদের মহন্ত মহারাজের "বঘাসুর" ধরে আন্‌তে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল "এ স্বামিনাথ এ বঘাসুর কাঁহা মিলেব? ইত হাম জানব না"। ঐ যে গাধাবোট, যিনি সোজাসুজি যেতে জানেনই না। ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল, লঙ্কা মালদ্বীপ বা আরব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে। আর কত বল্‌ব; ওঁরা সব হলেন "অধঃশাখা প্রশাখা।"

পালজাহাজ ও যুদ্ধজাহাজ।

পালভরে জাহাজ চালান একটী আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যেদিকে যাউক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে পৌঁছিবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হ'লে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখ্‌তে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষীরাজ আকাশ থেকে নাম্‌ছেন। পালে জাহাজ কিন্তু সোজা চল্‌তে বড় পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চল্‌তে হয়; হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই পাখা গুটিয়ে বসে থাকৃতে হয়। মহাবিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়। এখন পাল-জাহাজেও কাঠ কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্ম্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা বা মালাগিরি করা, ষ্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত; পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাকৃলে, ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতিপদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জায়গার জন্ম হুঁসিয়ার হওয়া, ষ্টীমার অপেক্ষা এ দুটী জিনিষ পাল-জাহাজে অত্যাবশুক। ষ্টীমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্ত্তমধ্যে বন্ধ করা যায়। সাম্‌নে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরান যায়। পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুল্‌তে বন্ধ কর্‌তে হাল ফেরাতে, হয়ত জাহাজ চড়ায় লেগে যেতে পারে, ডুবো পাহাড়ের উপর চড়ে যেতে পারে, অথবা অন্ম জাহাজের সহিত ধাক্কা কর্‌তে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না, কুলী ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায়, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল; অথবা

ছোট ছোট পাল-জাহাজে, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজখালের মধ্য দিয়া টান্‌বার জন্য ষ্টীমার ভাড়া করে হাজার হাজার টাকা টেক্‌স দিয়ে পাল-জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ মাসে ইংলণ্ডে যায়। পাল-জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জলযুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার এদিক ওদিকে, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগ্‌ত। আর সে আগুন নিবুতে হত। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক ছিল চেপ্‌টা, আর অনেক উঁচু, পাঁচতলা ছতলা। যেদিকটা চেপ্‌টা তারই উপর-তলায় একটা কাঠের বারান্দা বার করা থাক্‌ত। তারি সামনে কমাণ্ডারের ঘর বৈঠক। আশে পাশে আফিসারদের। তার পর একটা মস্ত ছাত—উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু চারটী ঘর। নীচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দুপাশে তোপ বসান, সারি সারি দেলের গায়ে কাটা, তার মধ্য দিয়ে তোপের মুখ—দুপাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নীচু ছিল; মাথা হেঁট করে চল্‌তে হত। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় কর্‌তেও অনেক কষ্ট পেতে হত। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পায়, ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে, লোক নিয়ে যায়। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী, জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একবার জাহাজে তুল্‌তে পার্‌লে হয়, তার পর বেচারা কখন হয় ত জাহাজে চড়েনি, একেবারে হুকুম হল, মাস্তলে ওঠ্‌। ভয় পেয়ে হুকুম না শুন্‌লেই, চাবুক! কতক মরেও যেত। আইন কর্‌লেন আমীরেরা, দেশ দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট; রাজস্ব ভোগ করবেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আস্‌ছে!! এখন ওসব আইন নেই, এখন আর "প্রেস গ্যাঙ্গের" নামে চাষা ভূষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুসির সওদা; তবে অনেকগুলি চোর, ছ্যাচড়, ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে, এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম শেখান হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই ব'দলে ফেলেছে। এখন 'পাল' জাহাজে প্রায় অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড় ঝাপটার ভয়ও অনেক কম। কেবল জাহাজ না পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা খায় এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধজাহাজ ত একেবারে পূর্ব্বের অবস্থার সঙ্গে বেল্‌কুল পৃথক্। দেখে ত জাহাজ ব'লে মনেই হয় না। এক একটী, ছোট বড় ভাসন্ত লোহার কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলে খেলা বই ত নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি? সব চেয়ে ছোটগুলি "টরপিডো" ছুড়িবার জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল কর্‌তে, আর বড় বড় গুলি হচ্চেন বিরাট যুদ্ধের আয়োজন। [ক্রমশঃ।]

দিব্য বাণী

স্বতন্ত্রঃ সর্বফলদঃ সর্বোপাস্যো হি যো হরিঃ।
কর্তৃত্বং সর্বজীবানাং তত্তন্ত্রমিতি নিশ্চয়াৎ ॥
শ্রেয়স্কামো মুমুক্ষুর্বা তমেব শরণং ব্রজেৎ।
স্বাভিমানং পরিত্যজ্য হ্যেতদন্তে দৃঢ়ীকৃতম্ ॥
সংসারাম্বুধিমগ্নানাং স্বভক্তকৃপয়া হরিঃ।
চকার গীতানাবং তং বন্দে সর্বগরীয়সম্ ॥

—কেশব কাশ্মীরী : তত্ত্বপ্রকাশিকা, উপসংহার-শ্লোক, ১-৩

স্বাধীন স্বতন্ত্র সর্বফলপ্রদ সবার উপাস্য হরি,
জীবের কর্তৃত্ব তাঁহার অধীন—নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ক'রি
মুমুক্ষু অথবা অভ্যুদয়কামী তাঁহারি শরণ লবে
ত্যজি স্বাভিমান, গীতার চরমে শ্রীকৃষ্ণ কহেন সবে।
সংসার-সাগরে নিমজ্জিত তবু হৃদয়ে ভকতিমান—
তাদের লাগিয়া শ্রীগীতা-তরণী করিলেন ভগবান।
করুণানিধান ধরম-স্থাপনে যুগে যুগে অবতার,
পরম-পুরুষ বাসুদেব হরি তাঁহারে নমস্কার।

কথাপ্রসঙ্গে

গীতায় দর্শন ও ধর্ম

আচার্য শংকর তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহ-স্বরূপ দুর্বিজ্ঞেয় অর্থবিশিষ্ট গীতার তাৎপর্য তাঁহার পূর্ববর্তী অনেক আচার্য পদের অর্থ, বাক্যের অর্থ ও যুক্তি ইত্যাদি সহায়ে নির্ণীত করিলেও, সাধারণ লোক গীতার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরস্পর-বিরোধী অনেক অর্থ করিতেছে দেখিয়া তিনি অসংকীর্ণ যুক্তিসহায়ে গীতার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন যে, গীতার ভাষ্যসমূহের মধ্যে শংকরের ভাষ্যই সুন্দরতম। তথাপি শংকর ভাষ্যভূমিকায় যে-সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সমাধান অদ্যাবধি হয় নাই— শংকরের পর বহু আচার্যই পরস্পর-বিরোধী ভাষ্য-টীকা লিখিয়াছেন, সুতরাং সাধারণ মানুষ আজও যে গীতার প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

শংকর গীতাতে অদ্বৈতবাদ দেখিয়াছেন; রামানুজ দেখিয়াছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; মধ্ব দ্বৈতবাদ; বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ। নিম্বার্কের ভাষ্য আজ বিলুপ্ত— কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী আচার্য কেশব কাশ্মীরী সেই ভাষ্যাবলম্বনে যে-টীকা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, নিম্বার্ক গীতায় দেখিয়াছেন ভেদাভেদবাদ।

ইহা সুবিদিত যে, মুখ্যতঃ উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র ও গীতাকে ভিত্তি করিয়াই মহান আচার্যগণ নিজ নিজ দার্শনিক মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ্গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির অনুভূতিসমূহ ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবা[দ] স্পষ্টতই সেখানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র বা গীতা সে-জাতীয় গ্রন্থ নহে। ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা একজনই — তিনি বাদরায়ণ। গীতার বক্তাও একজনই— তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বাদরায়ণের নিশ্চয়ই নিজস্ব একটি দার্শনিক মতবাদ ছিল এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব মত যাহাই থাকুক না কেন, তিনি অর্জুনকে অধিকার অনুযায়ী নিশ্চয়ই একটি বিশেষ মতবাদই শিক্ষা দিয়াছিলেন— তিনি যে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের অবতারণা করিয়াছিলেন, ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে অদ্বৈতবাদী হইয়াও সচরাচর অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতেন না— কথামৃতের অধিকাংশ স্থলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথাই পাওয়া যায়, দ্বৈতবাদেরও। বেদান্তদর্শন সূত্রাকারে লিখিয়াছিলেন বলিয়া বাদরায়ণকে অনেক মতবাদের বোঝা অদ্যাবধি বহিতে হইতেছে, কিন্তু গীতার ভাষা স্পষ্ট। গীতার সকল শ্লোক সহজবোধ্য না হইলেও এবং একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া কিছু জটিলতা সৃষ্টি করিলেও, অধিকাংশ শ্লোকই সরল এব[ং] সাংখ্য-দর্শনের বহু কথাই যে গীতায় পাওয়া যায় তাহা সকলেরই সুবিদিত।

তবে গীতায় সেশ্বর সাংখ্য-দর্শন আছে, বি বেদান্ত-দর্শন আছে এবং বেদান্ত-দর্শন থাকিলে অদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা বেদান্তভিত্তিক অন্য কোনও মতবাদ আছে, অথবা গীতায় পুরুষোত্তমবাদ নামে একটি নূতন দার্শনিক মতবা[দ] প্রচারিত হইয়াছে, যাহাতে অদ্বৈতবেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্ম, সাংখ্যের পুরুষ এবং পুরাণের সগুণ

ঈশ্বরের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে— এই সকল বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র এতই বিশাল যে, সে-বিষয়ে কোনও প্রয়াস করা এখানে সম্ভব নয়। আমাদের বক্তব্য শুধু ইহাই যে, গীতার এই সকল বিভিন্ন ভাষ্যটীকা পড়িয়া মানুষ দার্শনিক মতবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া যায়। যদি কেহ যে কোনও কারণেই হউক, একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া নিষ্ঠার সহিত সেই মতবাদের প্রবক্তা আচার্যের ব্যাখ্যা ভিন্ন অন্য কোনও ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ না করেন, তাহা হইলে তিনি বহু সমস্যার দ্বারা চিত্তের যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহা হইতে রক্ষা পাইবেন এবং সেই হেতু তাঁহাকে ভাগ্যবান বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই তুলনামূলকভাবে সকল বিষয়ই বুঝিবার প্রবণতা দেখা যায়। ভাষা ধর্ম ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা আজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত— কেহই আর কূপমণ্ডূকের ন্যায় থাকিতে ইচ্ছা করে না। গীতার ক্ষেত্রেও অধিকাংশ মানুষই আজ একটিমাত্র ব্যাখ্যাকারকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহে— যথাসম্ভব সকলেরই মতামত জানিতে চায় ও বিচার করিতে চায়।

ইহার ফলস্বরূপ মানুষ সহজে ঠিক করিতে পারে না, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন্ দার্শনিক মতবাদ শিক্ষা দিয়াছেন।

মনে পড়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে Hamilton-এর উক্তির উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'A learned ignorance is the end of Philosophy and the beginning of Religion.' এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উহার অর্থ জানিতে চাহিলে— 'ফিলসফি (দর্শনশাস্ত্র) পড়া শেষ হ'লে মানুষটা পণ্ডিতমূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করে; তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।'—এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে 'Thank you' 'Thank you'— এই সস্নেহ আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলেন।

বাইবেলে লিখিত আছে, সেণ্ট পল্ পরিণত হইবার পূর্বে সল পথিমধ্যে দিব্যজ্যোতি দর্শনের ফলে ভূপতিত হইয়া বলিয়াছিলেন: What shall I do, Lord ?—প্রভো, আমি কী করিব ?

গীতার অধ্যেতারও হ্যামিলটন-কথিত পণ্ডিত-মূর্খের অবস্থা হয় এবং সলের ন্যায় তাঁহারও অন্তরের অন্তস্তল হইতে ব্যাকুল প্রশ্ন জাগে: প্রভো, আমি কী করিব ?

'আমি কী করিব ?'— ইহাই মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। দর্শন ছাড়িয়া ধর্মে মতি হওয়ার ইহাই অবিসংবাদিত অভিজ্ঞান। কথামৃতের গল্পের সেই প্রসিদ্ধ কথা— 'আমি সাংখ্য পাতঞ্জল জানি না, কিন্তু সাঁতার জানি'—। যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ প্রত্যয়ে বলিতে পারা যায়, ততক্ষণ মানুষের স্বস্তি নাই। সেই প্রত্যয়ে পৌঁছিতে হইলে কিছু করা চাই— শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-কথা বারংবার বলিতেন: দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে চার ফেলতে হয়, দুধে মাখন আছে, মন্থন করতে হয়; সরিষার ভিতর তেল আছে, সরিষা পিষতে হয়; মেথিতে হাত রাঙ্গা হয়, মেথি বাটতে হয়, সিদ্ধি সিদ্ধি মুখে বললে নেশা হয় না, সিদ্ধি খেতে হয়।

গীতায় এই করার কথা—ধর্মের কথা— বহু আছে। তবে মূল কথা হইল ত্যাগ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: "গীতার অর্থ কি ? দশবার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' দশবার বলতে গেলে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা— হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর।" বাস্তবিক ত্যাগ ভিত্তিস্থানীয়— ত্যাগের উপরই জ্ঞান বা ভক্তির সৌধ রচিত হইতে পারে। এই ত্যাগের অর্থ কী ? স্বামী বিবেকানন্দের অনবদ্য দেবভাষায়:

'ত্যাগঃ মনসঃ সংকোচনম্ অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণং চ ঈশ্বরে বা আত্মনি'— ত্যাগের অর্থ অন্য-বস্তুসমূহ হইতে মনকে গুটাইয়া আনা এবং ঈশ্বর বা আত্মায় সংলগ্ন করা। ত্যাগের এই সংজ্ঞা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, কারণ ত্যাগ সম্বন্ধে সাধারণ্যে অনেক অদ্ভুত ধারণা প্রচলিত আছে। মন অন্তর্মুখ হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকেও অনায়াসে জয় করা যায়, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই অধীন। সুতরাং ত্যাগী হওয়ার অর্থ হইল, ঈশ্বরার্থে জিতেন্দ্রিয় ও জিতমনা হওয়া। এই জিতেন্দ্রিয়ত্বের কথা, মনোনিগ্রহের কথা গীতায় বারংবার বলা হইয়াছে। 'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ'— সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে। রামানুজ ইহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন: শুভাশ্রয় ভগবানে মনকে নিবিষ্ট না করিয়া যদি শুধু নিজেরই প্রযত্নে ইন্দ্রিয়জয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অনাদি-সংস্কারবশে বিষয়ধ্যান অবর্জনীয় হইয়া পড়ে, কিন্তু ভগবানে সংলগ্ন হইলে মনের সমস্ত পাপ দগ্ধ হওয়ায় সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ সহজেই বশীভূত হয়।

পূর্বোক্তভাবে ত্যাগী না হইলে কর্মযোগ রাজযোগ ভক্তিযোগ বা জ্ঞানযোগ— কোনও যোগে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ এই চতুর্বিধ যোগের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করিতে বারংবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, এই সমন্বিত সাধনই বর্তমান যুগের আদর্শ। সহস্রদ্বীপোদ্যানে তিনি বলিয়াছিলেন: মুক্তি লাভের জন্য তোমার যত প্রকার শক্তি আছে সব প্রয়োগ কর; জ্ঞানবিচার, কর্ম, উপাসনা, ধ্যান— সমুদয় অবলম্বন কর. সব পাল একসঙ্গে তুলে দাও, সব কলগুলি পুরাদমে চালাও, আর গন্তব্যস্থলে উপনীত হও। যত শীঘ্র পারো, ততই ভাল।

এই চারিটি যোগের সাধনার কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বিশদভাবে বলিয়াছেন। অনেকে বলেন. শ্রীকৃষ্ণ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মযোগ, মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং অন্তিম ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছেন। এই ধরনের বিভাগ-করণের মধ্যে যুক্তি থাকিলেও, প্রত্যেকটি বিভাগ যে একেবারেই স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুপ্রবেশহীন বিভাগ (Watertight Compartments) তাহা নহে, কারণ দ্বিতীয় হইতে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত প্রায় প্রতি অধ্যায়েই কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের কথা পাওয়া যায় এবং রাজযোগের কথা মুখ্যতঃ ষষ্ঠাধ্যায়ে বিবৃত হইলেও, পঞ্চম, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক সাধকই সংস্কারবশে একটি যোগকেই মুখ্য সাধন হিসাবে গ্রহণ করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক, তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্য তিনটিও অনুশীলনীয়— এই শিক্ষাও স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানেই দিয়াছিলেন। সুতরাং যিনি যে-যোগটি মুখ্যভাবে অবলম্বন করিবেন, তিনি প্রথমতঃ গীতার কোথায় কোথায় সেই যোগ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবেন। তাহার পর অন্যান্য যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিবেন এবং তদনুযায়ী সাধন করিবেন। ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কর্মযোগ-অধ্যায়েই কর্মযোগের সব কথা সীমাবদ্ধ নহে-ভক্তিযোগ-অধ্যায়, জ্ঞানযোগ-অধ্যায় ও ধ্যানযোগ-অধ্যায় সম্পর্কেও ঐ একই কথা। গীতা জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও ধ্যানের এমন অতুলনীয় সমন্বয়-শাস্ত্র যে, গীতাসহায়ে স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত চতুর্বিধ যোগের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা দুষ্কর নহে, যদি কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক টীকাভাষ্যের দ্বারা আমরা পূর্ব-প্রভাবিত না হই।

চতুর্বিধ যোগের কথা ছাড়াও গীতায় আমরা বহু নৈতিক গুণের উল্লেখ পাই, যাহার অনুশীলনও

ধর্মেরই এলাকায় পড়ে। মহাভারতকার বলেন, 'ধারণাদ্ ধর্ম ইত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ'—যাহা ধারণ (রক্ষণ বা পালন) করে তাহাকেই মনীষিগণ ধর্ম বলেন, ধর্মই প্রজাগণকে ধারণ করে। মহর্ষি মনুর মতে, 'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্'— ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্য ও অক্রোধ— এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। গীতায় আমরা ধর্মের এই লক্ষণগুলি তো পাই-ই, ইহাদের অতিরিক্ত আরও অনেক লক্ষণই পাই। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান মাত্র তিনটি শ্লোকে ২৬টি গুণের উল্লেখ করিয়া দৈবী সম্পদের বর্ণনা করিয়াছেন; ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পাঁচটি শ্লোকে অমানিত্বাদি ২০টি গুণকে জ্ঞানের সাধন হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন; সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে শ্রদ্ধা আহার যজ্ঞ তপস্যা দান ত্যাগ জ্ঞান কর্ম কর্তা বুদ্ধি ধৃতি ও সুখ— এই দ্বাদশটি বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিযাছেন; দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিদ্ধ জ্ঞানীর ও দ্বাদশ অধ্যায়ে সিদ্ধ ভক্তের লক্ষণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে সাধকগণ উক্ত লক্ষণসমূহ সাধন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন; চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন এবং অন্যান্য অধ্যায়েও অনুষ্ঠেয় ধর্ম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অনেক কথাই বলিয়াছেন। এইগুলি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'—ধর্মকে রক্ষা করিলে ধর্মই আমাদিগকে রক্ষা করে, মহর্ষি মনুর এই বাণীর সত্যতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। কারণ গীতোক্ত এই ধর্মই জ্ঞান ও ভক্তির ভিত্তিস্থানীয়। এই ভিত্তি স্থাপিত না হইলে চতুর্বিধ যোগের কোনটিরই সাধন সম্ভব নহে। আর সাধন ব্যতিরেকে জীবনের লক্ষ্য জ্ঞান বা ভক্তি কোনটিই প্রাপ্তব্য নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীকে তাঁহার আত্মস্বরূপ বলিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তের যে বিনাশ নাই, সেই নিত্য কালের সঞ্জীবনী প্রতিশ্রুতিও আমাদের দিয়াছেন। সেই অমোঘ বাণী সর্বদা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত ধর্মের অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হইলে আমরা নিঃসন্দেহে জীবনের লক্ষ্যাভিমুখে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে পারিব এবং ভগবৎ-কৃপায় চরমে পরা শান্তি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারিব।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : **যস্মিন্** অজ্ঞাতে বিষ্ণৌ অধিষ্ঠানে, **এতৎ** অনুভূয়মানং **সংসৃতিচক্রং**, সংসরতি অনয়া জীবঃ ইতি সংসৃতিঃ অহংকারাদিপ্রপঞ্চঃ, স এব চক্রং, **ভ্রমতি** প্রত্যহম্ আবির্ভাব-তিরোভাবাভ্যাং চ পুনঃ পুনঃ আবর্ততে। **ইত্থং** কর্তৃত্বাদিপ্রকারেণ।

অথবা **সংসৃতিচক্রম্** অহংকারাদিপ্রপঞ্চজাতং কর্ম, জীবো **ভ্রমতি**, ভ্রান্ত্যা গৃহ্নাতি ইত্যর্থঃ। অয়ম্ অভিসন্ধিঃ। 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ' (ঐ. ১।১।১), 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' (ছা. ৬।২।১), 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈ. ২।১।১), কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' (মু. ১।১।৩), 'অন্যত্র ধর্মাদ্ অন্যত্রা-ধর্মাৎ' (কঠ ১।২।১৪), 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' (কৌ. ৪।১, বৃ. ২।১।১), 'যৎ সাক্ষাদ্ অপরোক্ষাদ্

ব্রহ্ম' (বৃ. ৩।৪।১), 'যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরামৃত্যুম্ অত্যেতি' (বৃ. ৩।৫।১), 'ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্র আত্মনো ব্রহ্ম বেদ' (বৃ. ২।৪।৬, ৪।৫।৭), 'অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে' (বৃ. ১।৪।১০), মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (বৃ. ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১১), 'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরম্ অন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি' (তৈ. ২।৭।১), 'তত্ত্বমসি' (ছা. ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃ. ১।৪।১০), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃ. ২।৫।১৯, ৪।৪।৫), 'তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্' (বৃ. ২।৫।১৯), ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো হি উপক্রমোপসংহারাদিভিঃ লিঙ্গৈঃ তৎপরাঃ সন্ত্যঃ প্রত্যগাত্মানম্ অশনায়াদ্যতীতম্ অপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিকং সচ্চিদানন্দাত্মকং নির্বিশেষং ব্রহ্ম ভেদনিন্দাপূর্বকং বোধয়ন্তি।

অনুবাদ: **যস্মিন্**—যে অজ্ঞানাবৃত অধিষ্ঠানস্বরূপ বিষ্ণুতে, **এতৎ**- এই অনুভূয়মান, **সংসৃতিচক্রং**—যাহার দ্বারা জীব সংসরণ করে (সংসারে গতায়াত করে), তাহাই সংসৃতি অর্থাৎ অহংকারাদি-প্রপঞ্চ, তাহাই চক্র, **ভ্রমতি**—প্রত্যহ আবির্ভাব-তিরোভাব দ্বারা (জাগ্রৎ ও স্বপ্নে আবির্ভাব এবং সুষুপ্তিতে তিরোভাব) পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে (উপস্থিত হয়), **ইত্থং**—কর্তৃত্বাদি প্রকারে (কর্তা ভোক্তা ইত্যাদি রূপে)।—

অথবা জীব সংসৃতিচক্র অর্থাৎ অহংকারাদিপ্রপঞ্চরূপ কর্ম ভ্রান্তিবশতঃ গ্রহণ করে, ইহাই অর্থ। [ইহার অভিপ্রায় এই : 'সৃষ্টির পূর্বে (নামরূপাত্মক) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় আত্মারূপেই ছিল', 'হে সৌম্য (প্রিয়দর্শন)! সৃষ্টির পূর্বে (নামরূপাত্মক) এই জগৎ এক সৎ-স্বরূপই ছিল,' 'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,' 'হে ভগবন্! কোন্ বস্তু বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে দৃশ্যমান সব কিছুই বিজ্ঞাত হইয়া যায়?', '(ব্রহ্মতত্ত্ব) ধর্ম ও অধর্ম—উভয়েরই অতীত', 'তোমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে বলিতেছি', 'যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, তাহাই ব্রহ্ম', 'যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু (প্রাণ মন ও শরীরের এই ধর্মসমূহ) অতিক্রম করিয়া থাকেন', 'যে ব্রহ্মকে আত্মা হইতে ভিন্নরূপে জানে, ব্রহ্ম তাহাকে পরাভূত করেন (মোক্ষবহির্ভূত করিয়া থাকেন)', 'আর যে আত্মাতিরিক্ত দেবতাকে উপাসনা করে (সে তত্ত্ব জানে না),' 'যে ভেদের ন্যায় (ভেদ সত্য, এইরূপ) দর্শন করে, সে মৃত্যু হইতে পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (বারবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়),' 'যখন এই পুরুষ এই আত্মাতে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে, তখনই তাহার ভয় হয়', '(হে শ্বেতকেতো!) তুমিই সেই ব্রহ্ম', 'আমি ব্রহ্ম', 'এই প্রত্যগাত্মাই (জীবই) ব্রহ্ম', 'এই সেই ব্রহ্ম পূর্ববর্তি-কারণবিহীন, পরবর্তি-কার্যশূন্য, অন্তরহীন অর্থাৎ স্বগত-ভেদরহিত, অবাহ্য অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসমূহ উপক্রম-উপসংহারাদি* লিঙ্গসহায়ে ব্রহ্মবোধক হইয়া ভেদদর্শনের নিন্দা-পূর্বক প্রত্যগাত্মাকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি-রহিত, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি-জাতিত্ববিহীন, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে জ্ঞাপন করিয়া থাকে।

---

* উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কথন), অপূর্বতা (অর্থাৎ প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অর্থ অন্য প্রমাণের বিষয়ীভূত না হওয়া), ফল (অর্থাৎ প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অর্থের অথবা তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন), অর্থবাদ (অর্থাৎ প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অর্থের প্রশংসা) এবং উপপত্তি (অর্থাৎ প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অর্থ নিরূপণের অনুকূল যুক্তি)— এই ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারাই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

৪ শ্রাবণ*

চিরঞ্জীবেষু—

বাবাজীবন,

তোমাদিগের প্রেরিত টিকিট ও পোষ্টকার্ড ইত্যাদি অদ্য পাইলাম। তোমার স্তবমালা সত্যি সুন্দর হইয়াছে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ঠাকুর করছেন জেনো। তোমরা দীর্ঘায়ু [হও] ও নিরাপদে কালাতিপাত করিতে থাক। এখানকার কুশল। তোমাদের কুশল লিখিবে। ইতি

তোমাদিগের মাতা

---

* পোস্টকার্ডটিতে 'শিলং' ডাকঘরের ছাপ আছে : 27 JL 11 (27th July 1911)।—সঃ

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

১৮ ভাদ্র*

চিরঞ্জীবেষু

বাবাজীবন, তোমার এইমাত্র টিকেটসহ সাদা পোষ্টকার্ড পাইলাম। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ঠাকুর যেন মঙ্গল করেন। এখানকার কুশল। তোমাদের কুশল লিখিবে।

তোমাদের মাতা

---

* পোস্টকার্ডটিতে রমনা (ঢাকা) ডাকঘরের ছাপ আছে : 11 SE. 11 (11th September 1911)।—সঃ

(৩)

শ্রীশ্রীগুরু-শ্রীপাদপদ্মভরসা *

পরমশুভাশীর্ব্বাদ

তোমাদের পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। বৃহস্পতিবার দিন থেকে রাধুকে সাহেব ডাক্তার দেখিতেছে, তিনি হাসপাতালের বড় ডাক্তার। আর তুমি শিশু তৈল যদি যোগাড় করিতে পার, পাঠাইয়া দিও। আর কালাকালের জন্য বসিয়া না থেকে শুভ কার্য্য শীঘ্রই করিবে। কালে পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিনাশ হয়, আবার দর্শনেও পুণ্য আছে। শিশু তৈল পার ত পাঠাইও, আমার পায়ের ব্যাথার জন্য দরকার। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

মাতাঠাকুরাণী

---

* পোস্টকার্ডটিতে দৌলতপুর ডাকঘরের ছাপ আছে: 12 MAR 15 (12th March 1915)।—সঃ

(৪)

জয় মা

জয়রামবাটী

২৭শে বৈশাখ*

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ২৫৲ টাকা পাইলাম। ঐ পুষ্করিণী ২২৫৲ টাকায় আমাদের খরিদ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা হইলে শীঘ্রই পানা পরিষ্কার করা হইবে। এখন আমি ভাল আছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার মা

---

* পোস্টকার্ডটিতে আনুড় (হুগলী) ডাকঘরের ছাপ আছে : 10 MAY 17 (10th May 1917) —সঃ

(৫)

জয় মা

জয়রামবাটী

১২ কার্ত্তিক*

কল্যাণবরেষু—

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইলাম। আমি ও রাধু ভাল আছি। তুমি আমার বিজয়ার স্নেহ আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার "মা"

---

*পোস্টকার্ডটিতে আনুড় ডাকঘরের ছাপ আছে : 31 OCT 17 (31st October 1917)।—সঃ

(৬)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী

১৩২৪/৮ পৌষ

আশীষ অন্তে সমাচার

বাবা তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর ভাল আছে, তবে ঠাণ্ডা একটু বেশী হওয়ায় বাতের বেদনা একটু বাড়িয়াছে। রাধু প্রভৃতি এখানকার অন্যান্য সকল ভাল। তোমাদের কুশল বাঞ্ছনীয়। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীঃ

তোমার মাতাঠাকুরাণী

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমায়ের কত মেয়েই কত কষ্ট করিয়া প্রায়ই জয়রামবাটী আসিতেন। তাঁহাদের আগমন দেখিয়া লোকে অবাক্ হইয়া ভাবিত—ঘরের কোণের মেয়েরা এতদূর ছুটিয়া আসিতেছেন, ভয় নাই, ভাবনা নাই! এমনিই ছিল মায়ের আকর্ষণ। মায়ের কাছে তাঁহার সন্তান-ছেলেরা যেমন দু'একজন থাকিতেন, মেয়েরাও তেমনি দু'তিনজন প্রায়ই থাকিতেন—তাঁহার ভাইঝি তিনটি ছাড়াও। তাঁহার নিকটে থাকার ফলে দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও স্বভাবতই সকল সন্তানের অন্তর একটা ভগবদ্ভাবের উচ্চভূমিতে সর্বদা অবস্থান করিত। আমরা ভগবান ও ভগবদ্ভজনকে দৈনন্দিন জীবন হইতে একটু পৃথক্ করিয়া রাখিতে চাই, যেন আমাদের জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে উহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। সেজন্য ভগবানলাভের সাধনাকে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বলিয়াও আমাদের মনে হয়।

শ্রীশ্রীমার জীবনে তো নয়ই, তাঁহার সমীপাগত, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সন্তানগণের জীবনেও কোনরূপ অস্বাভাবিকতা দেখা যাইত না। কাজ-কর্মে দক্ষতা সততা সত্যনিষ্ঠা সংযম স্নেহ-প্রীতি ভালবাসা সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী তাঁহার স্নেহ-মাধুর্যে সন্তানগণের হৃদয়েও সঞ্চারিত হইত। ভগবানে বিশ্বাস আর ভজন - উহা তো জীবের প্রাণধারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত। দুনিয়ার সকল ব্যাপার, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যে শক্তিতে চলিতেছে, সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বর পরমকরুণাময় ঠাকুর সদা সর্বত্র বিরাজমান— অন্তরে বাহিরে। এই বিশ্বাস সন্তানদের অন্তরে দৃঢ় হইতে থাকিত। সংসার ভগবানেরই, তাঁহার খেলার জন্য তিনি গড়িয়াছেন, আমরা তাঁহার হাতের খেলার পুতুল; যখন যেখানে রাখিবেন, যেমন করাইবেন, চিত্তে সন্তোষ রাখিয়া তাহাই করিয়া যাও; দুঃখ আমরা নিজ নিজ কর্মফলে ভোগ করি, অন্যকে এজন্য দোষী করা অন্যায়; আমরা সকলে ভাই ভাই, এক পিতামাতার সন্তান; ভগবানে বিশ্বাস, নিষ্ঠা-ভক্তি, শরণাগত হইয়া পড়িয়া থাকা, সৎভাবে জীবন যাপন করা, সাধ্যমত পরের সেবা করা, কাহাকেও কোন প্রকারের দুঃখ না দেওয়া;— এসব শিক্ষা মা সন্তানগণের অন্তরে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই প্রদান করিতেন। সন্তানদের ক্ষণভঙ্গুর দেহে আত্মবুদ্ধি ও মোহ তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইত।

হয়তো অপরের দেখাদেখি কোন অশান্ত ছেলের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগিল, 'সাধনা করিব'। মা তাহাকে প্রবোধ দেন, মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বলেন, 'ঠাকুরকে ডাকো, তাঁর ওপর নির্ভর করো, সব হয়ে যাবে।' আবার উচ্চ অধিকারী বুঝিয়া শক্তিসামর্থ্য দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা উপদেশ দেন, কাহারও কাহারও ব্যাকুলতা দেখিয়া কদাচিৎ বিশেষ কৃপাও করেন। কিন্তু এ-সকলই অতি স্বাভাবিকভাবে ঘটে। সংসারে, সমাজে মানুষে-মানুষে, স্ত্রী-পুরুষে, ধর্মে-ধর্মে, সন্ন্যাসে-গার্হস্থ্যে, সাধনভজন ও বিষয়-কর্মে—যত রকম ভেদবুদ্ধি আছে, যেগুলি বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া মানুষের জীবন দুঃখবহুল ও দুর্বিষহ করিয়া তোলে, মা সেগুলির মূলোচ্ছেদ

করিয়া বিভিন্ন অধিকারীকে প্রীতির সহিত সামঞ্জস্য ও সহাবস্থানের পথ দেখাইয়া দিতেন। কত সহজভাবেই না শিখাইতেন—'বাবা, ঠাকুর কি আর খণ্ড, তিনিই অখণ্ড-বস্তু। জগতে ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন বস্তু নাই, সর্ববস্তু ব্রহ্ম-প্রকাশ, তাঁরই শক্তি সর্বদেবদেবীতে বিরাজিত। তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। ঠাকুর ভাঙতে আসেন নাই।' এইরূপে ঠাকুরকেই চিন্তা করার জন্য জিজ্ঞাসু সন্তানদের উপদেশ দেন—অধিকারী বুঝিয়া বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ইষ্ট নির্দেশ করিয়া বিভিন্ন মন্ত্র দিলেও। কোন অবুঝ সন্তান তাঁহাকেই পূজা-আরাধনা করিতে ব্যগ্র। মা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'বাবা, ভক্তেরা বলেন আমার মধ্যে ঠাকুরই আছেন।' সন্তানের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রাচীন জ্ঞানী ছেলেরা অজ্ঞান বালকদের মায়ের শরণাগত হইবার জন্য বুঝাইয়া বলেন, তাহারা বুঝিতে না চাহিলে ধমক দেন, 'মা আর ঠাকুর কি আলাদা?' 'যথাগ্নে-র্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা। সর্ববিদ্যা-স্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥' মায়ের ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ সব রকমের সন্তানই আছেন। কেহ মাকে ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী মহাশক্তিরূপে প্রণাম করেন, স্তবস্তুতি করেন। কেহ কিছু জানে না, কেবল বোঝে যে, 'ইনি আমার মা, ইহ-পরকালের রক্ষাকর্ত্রী, ইঁহার কৃপাতে আমার কোন ভয়-ভাবনা নাই।' মার সকল সন্তানের প্রতি সমান স্নেহ-আদর; মা বুঝেন, যাহার যেমন শক্তি সে সেভাবে তাঁহাকেই তো ডাকিতেছে—'কেউ বলে বা, কে বলে পা'।

মার জন্য অনেকেই সাধ্যমত জিনিসপত্র লইয়া আসে, মা সেইসব জিনিস সামান্য হইলেও পরম হর্ষে গ্রহণ করেন, আর তার কত সুখ্যাতিই না করেন! লোক দেখানো আদর বা মুখের কথামাত্র নহে, সত্যসত্যই দেখা যায়, বুঝা যায়, তিনি খুশী হইয়াছেন। অন্তরের টানে দেওয়া ভক্তের সামান্য জিনিসটাতেও কত তাঁহার প্রীতি! ডহরকুণ্ড গ্রামে তাঁহার কয়েকজন গরীব চাষী সন্তানের বাস। একবার তাহারা তাহাদের বহু দূরবর্তী গ্রাম হইতে পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছে, মাথায় বহিয়া আনিয়াছে তাহাদের নিজের হাতে-ফলানো শাক-তরকারী প্রভৃতি। মা পাইয়া কত খুশী! তাহারা গরীব লোক, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, দরিদ্রের পোশাক-পরিচ্ছদ। অতি সঙ্কোচে এই সব জিনিসপত্র মায়ের কাছে রাখিয়া সন্তর্পণে দাঁড়াইল। মাকে কত লোকে কত ভাল ভাল জিনিস দেয়, তাহাদের সামান্য দ্রব্য মা কিভাবে গ্রহণ করিবেন, অন্তরে এই শঙ্কা! মা পরমাদরে সব জিনিস গ্রহণ করিয়া স্বয়ং হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন, আর স্নেহার্দ্র স্বরে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন, 'বাবা, তোমরা কত কষ্ট করে এতদূর থেকে ব'য়ে নিয়ে এসেছো!' তন্মধ্যে একটা সুবৃহৎ পাকা চালকুমড়া ছিল আর একটা চমৎকার মানকচু। ঐসব জিনিস জয়রামবাটীতে মেলে না, মা ভারি খুশী। সন্তানদের পরমাদরে খাওয়াইলেন, রাত্রে রাখিলেন, তাহাদের প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল।

একদিন একটি সন্তান সকালবেলাই এক ঝুড়ি শাক-তরকারী বহিয়া লইয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়া মায়ের দুয়ারে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। মা তাঁহার নিত্য-নিয়মে আসন বিছাইয়া কুটনো কুটিতে বসিয়াছেন মাত্র। অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'বাবা, আজ ঘরে বিশেষ কিছু ছিল না, বঁটি নিয়ে ভাবছি কি কাটবো। আর তুমিও এই সব নিয়ে হাজির! ঠাকুর নিজেই তাঁর প্রয়োজন মতো সব যোগাযোগ করে দেন।' ভক্তটির হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল, তাঁহার পরিশ্রম সার্থক।

মায়ের মুসলমান সন্তান ডাকাত আমজদ অতি

গরীব। জীবিকা চলে না বলিয়াই ডাকাতি ব্যবসা। মজুরীর কাজে আসিয়া দুর্ধর্ষ ডাকাত মায়ের স্নেহের আস্বাদ পাইয়াছে; সময় সময় আসে, মা স্নেহাদর করেন অন্যান্য ছেলের মতোই। আমজদেরও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মায়ের সেবা করে, কিছু দেয়, তাই সময় সময় শাক-তরকারী যাহা জুটে লইয়া আসে। অতি সঙ্কোচের সহিত সামান্য জিনিস লইয়া চুপি চুপি গিয়া দাঁড়ায়। আমজদ জিনিসপত্র মায়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া নীরব নিস্পন্দ হইয়া থাকে। মা পরমাদরে সে-সব গ্রহণ করেন আর কত সুখ্যাতি করেন। মায়ের বাড়ীর ভিতরে সে সম্ভ্রম সঙ্কোচের সহিত যাইত, ভয়ে ভয়ে, শুক্‌নো চোকমুখে, যেন পা চলিতেছে না; কিন্তু মায়ের আদর-যত্ন পাইয়া, খাইয়া-দাইয়া, মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে বুক ফুলাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বাহির হইত। কোয়ালপাড়ার গরীব চাষী ভক্তগণ, জয়রামবাটী-গ্রামের কেহ কেহ ঘরের চাসের সামান্য সামান্য জিনিসপত্র মাকে দিত। মা পরম সমাদরে সব গ্রহণ করিতেন, আর বিনিময়ে অতুলনীয় স্নেহের সঙ্গে কোন-না-কোন জিনিস, প্রসাদী ফলমিষ্টি ইত্যাদি দিতেনই।

মা মূল্যবান জিনিসপত্র বা ফলমিষ্টি অপেক্ষা দৈনন্দিন ব্যবহারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস অধিক পছন্দ করিতেন। কোয়ালপাড়ার কেশবা-নন্দ মহারাজ ভক্তগণকে মায়ের সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিবার জন্য বলিয়া দিতেন। একবার বরিশাল হইতে আগত জনৈক সন্তান এইরূপ পরামর্শ শুনিয়া এক টিন কেরোসিন আনিয়াছিলেন; মার কত আনন্দ তেল পাইয়া! ছেলেদের অন্তরের সেবার আকাঙ্ক্ষা মা সর্বদাই পূর্ণ করিতেন। অনেকে অনেক জিনিস আনিতেন, মা শুধু তাহাদের তৃপ্তি ও কল্যাণের জন্যই তাহা গ্রহণ করিতেন, নিজের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন না থাকিলেও। ভক্তেরা অনেক কাপড় দিতেন, মায়ের কাপড়ের প্রয়োজন কম, কারণ যেখানি ব্যবহার করিতেন তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়া যতদিন চলে পরিতেন, এমন কি একটু ছিঁড়িয়া গেলেও সেলাই করিয়া পরিতেন। অনেক সময়ে ভক্তদের আনীত বস্ত্র দেহে জড়াইয়া, কি স্পর্শ করিয়া, সেই প্রসাদী বস্ত্র অপর সন্তানগণকে অথবা প্রয়োজন মতো গরীব দুঃখীকে অকাতরে দান করিতেন। ফল-মিষ্টিও ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া অপরকে বিলাইতেন, নিজে জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিতেন মাত্র, খাওয়া-পরাতে সর্বদা অতি সংযত, সসংকোচ ব্যবহার।

কোন ভক্ত মায়ের প্রসাদের জন্য অতীব আগ্রহান্বিত, মা একটি সন্দেশ হাতে নিলেন, ঠাকুরকে দৃষ্টিভোগ দিয়া তারপর নিজের জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করাইয়া, পরমাদরে সহর্ষে দিলেন সন্তানকে,— 'বাবা! খাও প্রসাদ।'

জনৈক সন্তান ঠাকুর-মার দেশ দেখিয়া কলিকাতা ফিরিতেছেন। মা তখন উদ্বোধনে। নবাসনের ভক্তগণ তাঁহার হাতে কয়েকটি 'ভাব-দিঘি' নামক স্থানের মূলা দিয়াছেন। মা ঐ মূলা পছন্দ করেন, কড়া মাটির মিষ্টি মূলা। তিনি জয়রামবাটী থাকিলে ভক্তগণ ঐ মূলা দিয়া আসেন। এবার মা দেশে নাই, তাহাদের মূলা দিবার সুযোগ হইবে না, বড়ই দুঃখের বিষয়। এখন সুযোগ পাইয়া, বহু খোঁজখবর করিয়া কয়েকটি মূলা সংগ্রহ করিলেন —এখনও মূলার সময় হয় নাই, মূলা পুষ্ট হয় নাই— বহু অনুসন্ধানে কয়েকটি মাঝারি রকমের পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সযত্নে বাঁধিয়া দিলেন। ভক্তটি আরামবাগ হইয়া চাপাডাঙ্গা গিয়া মার্টিনের গাড়ী ধরিবেন। কলিকাতা হইতে আসাকালীন মা বলিয়া দিয়াছিলেন, 'বৌমা'র (মণিবাবুর মার) সঙ্গে

দেখা করিয়া যাওয়ার জন্য, কাজেই আরামবাগ হইতে বায়ুগ্রামে মণিবাবুর বাড়ীতে গেলেন। মণিবাবুর মা ভারি খুশী, বিশেষ যখন শুনিলেন মা বলিয়া দিয়াছেন 'তাঁকে দেখে যেতে'। পরম সমাদরে নানাপ্রকার রন্ধনাদি করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন এবং অনুনয় করিয়া একরাত্রি থাকিয়া যাইতে বলিলেন— তিনি মায়ের জন্য একটি খাবার জিনিস তৈয়ার করিয়া দিবেন; মা সেই জিনিসটি ভালবাসেন। এখন মায়ের শরীরও তেমন ভাল নহে— আমবাতে কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য মণিবাবুর মার প্রাণ ছটফট করিতেছে। কিন্তু উপস্থিত যাওয়ার সুবিধা হইবে না, কন্যা অসুস্থা; তাই মায়ের জন্য তাঁহার হাতে কিছু পাঠাইবেন। মায়ের জিনিস নেওয়া ভাগ্যের কথা, তিনি পরমানন্দে পূর্ব পরিচিত বন্ধু মণিবাবুর সঙ্গে ঠাকুর-মায়ের প্রসঙ্গে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন সকালেই বাহির হইলেন। যাইবার সময় মণিবাবুর মা অতি সন্তর্পণে খুব ভাল করিয়া বাঁধা একটি বিস্কুটের টিন দিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় উদ্বোধনে উপস্থিত হইয়া দেখেন, মা বিছানায় শুইয়া—আমবাতে কষ্ট পাইতেছেন; সেবিকা ঔষধ মালিশ করিতেছেন। মা তাঁহাকে দেখিয়া ভারি খুশী, উঠিয়া বসিলেন। কুশল সমাচারাদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জয়রামবাটী, কামারপুকুর ও অন্যান্য স্থানের ভক্তগণের প্রণাম ও কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া মূলার বাণ্ডিল ও টিনটি তাঁহার হাতে দিলেন। সেই মূলা দেখিয়া মার কি আনন্দ! যেন কত দুর্লভ বস্তু! পরে ছোট বালিকার ন্যায় আনন্দে অধীর হইয়া সেই টিনটি খুলিলেন— দেখিয়া কি খুশী! মায়ের আনন্দ দেখিয়া বস্তুটি কি দেখিবার জন্য সন্তানের আগ্রহ জন্মিল, তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিলেন, সেই মহামূল্য বস্তুটি 'চাল ভাজা'!

আর একবার, সেবারও মা উদ্বোধনে, কামারপুকুর হইতে ভক্তটি ফিরিবার সময়, ঠাকুরের নিজ হাতে লাগানো গাছের কয়েকটি আম ও কোয়ালপাড়া আশ্রমের কিছু পটোল লইয়া গিয়াছিলেন। এসব জিনিস পাইয়া মা কত খুশী! আমগুলি ডাঁসা—তখনও পাকে নাই; অম্বল করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইল। সেবার তিনি বিষ্ণুপুরে ৺সুরেশ্বরবাবুর বাড়ী হইয়া যান। সেখানকার ভক্তগণ দিলেন কতকগুলি খাবার শালপাতা। বিষ্ণুপুরের শালপাতা বড় ভাল, পাতলা কলাইয়ের ডালও নীচে গড়ায় না, তাই মা পছন্দ করেন। ভক্তদের দেওয়া জিনিস পাইয়া মার এমনি আনন্দ যে, কোন শিশু যেন পুতুল কিংবা মোয়া পাইয়াছে! এই সকল তুচ্ছ জিনিসে তাঁহার এত সন্তোষ, আর কত মূল্যবান জিনিসের দিকে তিনি লক্ষ্যও করেন না দেখিয়া অনেকের বিস্ময় জন্মিত। মাও বলিতেন, 'জিনিসের কি আর দাম! যে দেয় তার প্রাণের টান, ভক্তিই ত দেখতে হয়।'

একটি সন্তান প্রায়ই মায়ের বাড়ীতে নানা জিনিসপত্র লইয়া আসেন। ঐ সকল সংগ্রহ করিতে তাহাকে অনেক বেগ পাইতে হয়, পরের কাছে হাত পাতেন। তাঁহার বন্ধুদের কেহ কেহ উহা পছন্দ করেন না। তাঁহারা জানেন মা এই সব ভালবাসেন না, তিনি গ্রহণ করেন সামান্যই, বেশীর ভাগই অপরে পায়। এইজন্য তাঁহারা কটাক্ষও করিতে ছাড়েন না। সময় সময় তিনি মাকে খাওয়াইবার জন্য ভাল ভাল জিনিসও তৈরী করিয়া, করাইয়া লইয়া যান। মা প্রসন্না হন, ঠাকুরকে ভোগ দিয়া, সন্তানদেরই পেট ভরিয়া প্রসাদ খাওয়ান, নিজের মুখে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করাইয়া খুব প্রশংসা করেন। বন্ধুগণের সমালোচনায় সন্তানটি তাঁহার উত্তম হইতে নিবৃত্ত না হইলেও তাঁহার মনে একটু ক্ষোভ জন্মিয়াছিল,

বোধ হয়। একদিন মায়ের বাড়ীতে জিনিসপত্র লইয়া গিয়াছেন। উপস্থিত কেহ তাঁহার এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট করিয়া সর্বদা জিনিসপত্র বহিয়া লইয়া যাওয়া দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কেন এত কষ্ট করা?' মা কিন্তু তাঁহার কথায় সায় না দিয়া সন্তানের দিকে চাহিয়া ভাববিমিশ্র আর্দ্রস্বরে বলিলেন, 'ভক্ত না দিলে ভগবানকে কে দেবে, বাবা।' সন্তানের হৃদয় অতীব পুলকিত হইল, তিনি জিনিসপত্র লইয়া পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার এক ভীষণ মুস্কিলে পড়িলেন। মাকে খাওয়াইবার জন্য খুব সুগন্ধ সরু চাউল দূর-দেশ হইতে জনৈক ভক্তের সহায়তায় সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জনৈকা ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তায় খুব ভাল পিঠা তৈয়ার করাইয়াছেন। বিকালে যখন সেই সকল লইয়া রওনা হইয়াছেন, তখন জনৈক ব্রাহ্মণ ভক্ত জানাইলেন যে, মা ব্রাহ্মণের বিধবা, নিষ্ঠাচারে থাকেন, রাত্রে চাউলের জিনিস মুখে দিবেন না। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, চোখে অন্ধকার দেখিলেন। বিমর্ষ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অন্যেরা বলিলেন, লইয়া না যাওয়াই ভাল; নিজের কষ্ট, মায়েরও মনে দুঃখ হইবে। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, মায়ের জন্য তৈরী জিনিস মায়ের কাছেই লইয়া যাই, তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। চিন্তিত দুঃখিত হৃদয়ে পিঠা বহন করিয়া সাত মাইল চলিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জয়রামবাটী উপস্থিত হইয়া মায়ের কাছে জিনিস রাখিয়া সভয়ে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলেন। মা সব স্থিরভাবে শুনিলেন। সন্তান অশ্রুপূর্ণ লোচনে জানাইলেন, তাঁহার বহুদিনের সাধ ছিল, মা এই পিঠা মুখে দেন। মা সহর্ষে বলিলেন, 'বাবা! মুখে দেব বইকি! তুমি এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে এসেছ, কত কষ্ট করে তৈরী করিয়েছ, আর একজন দূরদেশ থেকে কষ্ট করে পাঠিয়েছে। রাত্রে ঠাকুরকে দিয়ে মুখে দেব। তুমি এজন্য চিন্তা করো না।' তারপর উপস্থিত আর একজন সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, 'ছেলেদের জন্যে আমার কোন নিয়মকানুন ঠিক থাকে না।' সন্তানগণের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। রাত্রে তাহারা পিঠা প্রসাদ খুব খাইলেন, মা পেট ভরাইয়া খাওয়াইলেন, সন্তানের খাওয়াই মায়ের খাওয়া—মাও সন্তানের জন্যই খান।

একটি সন্তানের ভানু পিসীর সঙ্গে খুব ভাব। পিসী মায়ের সন্তানদের 'দাদা' ডাকেন। তিনি মায়ের পিসী, মায়ের ছেলেরা তাঁহার আদরের 'লাতি'। ('ন'কে 'ল' উচ্চারণ করেন ঐ অঞ্চলের লোক)। লাতিকে চুপি চুপি বলিয়াছেন, 'মায়ের পায়ের ছাপ নেয় ছেলেরা, তাই যোগাড় ক'রে নিও।' সন্তানটি মাকে ধরিলেন, মাও সম্মতি দিলেন। তদনুসারে দিন কয়েক পরে তিনি এক শিশি লাল রং ও কয়েকখানা সাদা রুমাল লইয়া আসিয়া মাকে নিবেদন করিলেন। তখন বড়-দিনের ছুটি নিকটবর্তী। মা ছেলেকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'বাবা, বড়দিনের ছুটি আসছে, অনেকে আসবে, পায়ে রং দেখে তারা কি মনে করবে। এখন এসব রেখে যাও আমার কাছে। কিছুদিন পরে সুবিধামত আমি ছাপ তুলিয়ে দেবো এখন।' তারপর মৃদু হাস্যে স্বগত-উক্তি করিলেন, 'ছেলেরা প্রণাম করতে এসে পায়ের দিকে চেয়ে মনে করবে—মা আলতা পরেছেন।' সন্তান রং-এর শিশি, রুমাল মায়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিছুকাল গত হইয়াছে, ঐ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ খেয়াল নাই। একদিন আসিয়া দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইয়া বিকালে প্রণামান্তর বিদায় লইয়া বাহিরে যাইতেছেন। মা তখন বড় মামার বাড়ীতে থাকেন। সন্তানটি একটু অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন, মা পিছনে পিছনে আসিতেছেন, হয়ত

ঘাটে যাইবেন। পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন মায়ের দিকে মুখ করিয়া। মা মৃদুস্বরে সহাস্যে উচ্চারণ করিলেন, 'বাবা!' সেখানে সদর দরজার আড়ালে লোকজন কেহ দেখিল না, মা কাপড়ের নীচ হইতে একটি ছোট প্যাকেট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া সহাস্যে স্নেহার্দ্রস্বরে বলিলেন, 'বাবা! নাও গো তোমার জিনিস।' তাঁহার বুক ধড়াস করিয়া উঠিল, বুঝিতে পারেন নাই, খুলিয়া বিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার সেই বাঞ্ছিত বস্তু 'রাঙা পদচিহ্ন'—চির পবিত্র। প্রাণ জুড়াইল, আনন্দিত হইয়া মাথায় ঠেকাইয়া বুকে ধরিলেন। মাকে প্রণাম করিলেন, মা প্রসন্ন বদনে আশীর্বাদ করিয়া ঘরে ফিরিলেন। সে সময়ে মায়ের দুয়ারে অনেকে ছিল, তাই মা সকলের সামনে বাহির করেন নাই। গোপনে ছেলের হাতে ছেলের প্রিয় অভিলষিত দ্রব্য দিলেন। ছেলে পরে শুনিলেন নলিনীদিদিকে দিয়া মা ছাপ তুলাইয়াছেন। নলিনীদিদি একদিন মুখ ঝাড়া দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কি রং এনেছিলেন? খুন-খারাবি, লোকে কি বলত! তাই দেখে আল্‌তা ঘষে রং করা হয়েছে।' ছেলে পদচিহ্ন পাইয়া পরম পুলকিত, দিদির ভর্ৎসনা মিষ্টি লাগিল। তাঁহার মনে উঠিল 'আর ভুলালে ভুলব না মা, হেরেছি ঐ চরণ রাঙা।'

মায়ের হস্ততল রক্তাভ ছিল, অনেকেই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। পদতলও ছিল লাল—ঠিক স্থলপদ্মের আভা, সুস্থ অবস্থায় তাঁহার কৃপায় কাহারো কাহারো ভাগ্যে দর্শন মিলিয়াছে। মস্তকের সুদীর্ঘ ঘন কেশরাশি উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ, মসৃণ, যেন সূক্ষ্ম রেশমসূত্র, অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কুটিল বক্র। সুগঠিত মুখমণ্ডলে দীর্ঘনাসা সত্যই তিল ফুলের মতো, ডগার দিকে। প্রশান্ত স্থির কৃপাদৃষ্টি, যাহা সকলেরই অন্তরে সর্বদা করুণা বর্ষণ করিত। প্রশস্ত উজ্জ্বল কপাল, প্রসন্ন বদনমণ্ডল—দেখিলেই চিত্ত শান্ত হইত। শ্যাম-গৌর রং প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, শেষ বয়সে ম্লান হইয়াছিল। দীর্ঘাবয়ব, হস্তপদযুগলও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, একটু বাঁ দিকে কাৎ হইয়া চলিতেন ধীরে ধীরে। পরে হাঁটুতে বাত ধরে। তাঁহার খুড়ো অবিবাহিত ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত মন প্রাণ দিয়া পরম স্নেহাদরে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করেন। পরবর্তী কালে ভক্তগণ মায়ের পদে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলে তাঁহার অসহ্য হইত—খুড়োর স্নেহ-পুতলীর পায়ের না অসুখ বাড়ে, এই ভাবনা! খুড়োর দেহত্যাগের পর মা বিশেষ শোকগ্রস্তা হইয়া খুব বিলাপ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মায়ের সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার উপদ্রবও সহ্য করিতে হইত। ভক্তির আতিশয্যে অনেকে পায়ে মাথা লুটাইতেন, মায়ের কষ্ট হইত— নিষেধ করিতেন। অনেকে শুনিত, সাবধান হইত; কেহ কেহ ভক্তির আতিশয্যে নিষেধ গ্রাহ্য করিত না। মা মানব-শরীরে মানবী ছিলেন, লৌকিক ব্যবহার রীতি-নিয়ম মানিয়া চলিতেন। ভক্তিমান কোন কোন ভক্ত তাঁহার পদতলে তুলসী-বিল্বপত্র দিতে চাহিলে আতঙ্কিতভাবে নিষেধ করিতেন। উদ্বোধনে গোলাপ মা সতত দৃষ্টি রাখিতেন যাহাতে কেহ উপদ্রব না করে। জয়রামবাটীতেও সাবধান থাকিতে হইত সেবক-সেবিকাকে। নিজেই সময় বিশেষে তাহাদের হুঁশিয়ার করিয়া দিতেন। 'অবোধ সন্তান তরে কত না যাতনা সহিলে জননি নরদেহ ধরি।'—মার এই সহনশীলতা না থাকিলে সন্তান পালন পোষণ করা সম্ভব হইত না।

মার সন্তান-বাৎসল্য তাঁহার বয়স্ক ছেলেদেরও শিশু করিয়া তুলিত। তাঁহারা নিজেদের বয়স বিদ্যা বুদ্ধি ভুলিয়া মায়ের কাছে ছোট শিশুর মতোই আচরণ করিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে মায়ের বাড়ীতে বালকের ন্যায় আনন্দে রঙ্গ-রস-

তামাসা করিতে দেখিয়া মনে হইয়াছে— এই কি উদ্বোধনের সেই হিমাচল-সদৃশ গম্ভীরমূর্তি স্বামী সারদানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কর্মাধ্যক্ষ! জনৈক যুবক সন্তান ডান হাতের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছেন— খাইতে কষ্ট। বাঁ হাতে চামচ দিয়া কষ্টে খাইতেছেন। দেখিয়া মায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, কাছে বসিয়া নিজে খাওয়াইয়া দিলেন। যতদিন হাত না সারিল, সেই জোয়ান অশান্ত দুর্ধর্ষ ছেলেও ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় বসিয়া মায়ের হাতে খাইতেন পরম তৃপ্তির সহিত।

মায়ের দুইটি সন্তান বাল্যবন্ধু— পরস্পর খুব হৃদ্যতা, মা সব জানেন। তাহারা দুইজন মায়ের বাড়ীতে একত্র হইলে, বাহিরের বেশী লোকজন না থাকিলে, মা তাঁহার দুয়ারে দুইজনকে বসাইয়া এক থালায় খাবার দিতেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিতেন। তাহারাও দুইটি সহোদর শিশুর ন্যায় বসিয়া পরম পরিতোষে গল্প-গুজব করিতে করিতে ধীরে ধীরে খায়। মা দোর-গোড়ায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখেন, কথা বলেন, 'কি চাই, কোন্‌টা ভাল হয়েছে, পেটভরে খাও, আরও একটু দিই,' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহারাও সত্য সত্যই নিজের বয়সাদি ভুলিয়া ছোট ছেলের মতো হইয়া যায় তখন।

একদিন পায়েস হইয়াছে, দুই ভাই এক পাতেই খাইতেছেন। বেলা হইয়াছে, মা ঠাকুরকে ভোগ দিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের খাইতে দিয়াছেন— গরম পায়েস বড় থালায় দিয়াছেন। খাওয়া দেখিতেছেন, কথা বলিতেছেন, আর গরম বলিয়া অল্প অল্প করিয়া বারবার আনিয়া দিতেছেন। বোধ হইল যেন ছেলেরা সঙ্কোচ করিতেছে, পেট ভরিয়া খাইতেছে না। মা তাই ব্যস্তভাবে পাতের উপর উপুড় হইয়া, পায়েসের কাছে হাত আনিয়া দেখাইয়া বলিতেছেন, 'পায়েস খাও, খুব পেট ভরে খাও।' এমনি ভাব যে, হাতে তুলিয়া মুখে দিবেন! তৃপ্তির সহিত জোয়ান ছেলেরা খুব খাইল দেখিয়া ভারি খুশী হইয়া বলিতেছেন, 'চেঁছে পুঁছে খাও।'

ছেলেরা একপাতে শিশুর মতো খাইলে মায়ের ভারি আনন্দ। বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের কাজ হইতে অবসর লইয়া জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মায়ের কয়েকটি সন্তান মায়ের বাড়ী আসিয়াছেন। পূজায় ছেলেরা উপস্থিত, মায়ের খুব আনন্দ। ছেলেরা কেহ কেহ খুব ভাল গাহিতে পারেন। তাঁহারা খুব উৎসাহ-আনন্দে ভরপুর হইয়া ভজন করিতেছেন। প্রাণের আবেগে মাতৃ-সঙ্গীত গাহিতেছেন। মা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও ছেলেদের ভজন গান শুনিতেছেন। অতি সুকণ্ঠে একটি সন্তান গাহিতেছেন, 'মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর, সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার', ইত্যাদি। গানটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী, তাহার একটি পদ "ছেলের মুখে 'মা' 'মা' বাণী, শুনবেন বলে ভবরাণী, আড়াল থেকে শুনেন পাছে দেখিলে না ডাকে আর।" সুকণ্ঠে উচ্চারিত, তাল মান লয়ে গীত, সুমধুর স্বর-লহরী মায়ের অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। জনৈক সন্তান ভিতর হইতে আসিয়া জানাইলেন, মা দরজার পিছনে বসিয়া স্থিরনয়নে গান শুনিতেছেন। একথা শুনিয়া গায়কের ও সকল সন্তানের প্রাণ মাতিয়া উঠিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া বারংবার এই গানটি, এই পদটি গীত হইল।

পূজা শেষ হইলে মা অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন, ভক্তগণও প্রণত হইলেন। মধ্যপূজা ভোগারতির পর, সকলে প্রসাদী সিন্দুর চন্দনের কৌটা ধারণ করিয়া প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। ভোগরাগের আয়োজন খুব, মা আড়ালে বসিয়া ছেলেদের খাওয়া দেখিলেন— বারে বারে এটা ওটা দিতে বলিলেন। পূজাশেষে মা জগদ্ধাত্রীকে অঞ্জলি প্রদান ও গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া প্রতিমার

দিকে চাহিয়া যখন জোড়হস্তে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার সেই উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল প্রতিমা অপেক্ষাও ভক্তহৃদয় অধিক আকর্ষণ করিত। তন্ত্রধারক পিতৃবংশের কুলগুরুকে মা ভক্তিভরে প্রণাম করিলে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া জোড়হস্তে প্রতি-প্রণাম করিয়া কাতরভাবে বলিতেন, 'মা, আপনার আবার এরূপ করা কেন ?'

পূজার পরদিন সকালে মা জলখাওয়ার জন্য অদ্ভুত ব্যবস্থা করিয়াছেন। কামারপুকুর হইতে ফরমাস দিয়া সেখানকার বিখ্যাত ভাল জিলিপি আনাইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ ও যথেষ্ট মুড়ি একই পাতে দিয়াছেন- সব ছেলেরা একত্র খাইবে। মায়ের অভিপ্রায় শুনিয়া ছেলেদের প্রাণের উল্লাস বাড়িয়া গেল। সকল শিশু একপাতে খাইতেছে, মা আড়ালে বসিয়া দেখিতেছেন। সে বৎসর কালী মামার বৈঠকখানায় পূজা হয়, পুরাতন বৈঠকখানা (বড় মামার অংশে ছিল) হইয়াছিল ভক্তদের বাসস্থান।

মা অত্যন্ত সংগোপনে সম্পূর্ণভাবে সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মতো জীবনযাপনের চেষ্টা করিলেও অনুগত ভক্তদের নিকট তাঁহার নিজ রূপ সময় সময় প্রকাশ পাইত এবং সেই সকল ভাগ্যবানকে তাঁহাদের অভীপ্সিত রূপে ও ভাবে কৃপা করিয়া তাঁহাদের অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ করিতেও দেখা যাইত। শ্রীমতী রাধারাণীর বিবাহের সময় জনৈক ভক্ত নিজের আহার নিদ্রা ভুলিয়া প্রাণপণে কাজ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা-ভক্তিতে পূজনীয় শরৎ মহারাজ অতিশয় প্রীত হন এবং বিবাহের পরদিন রাত্রে সকল কার্য সুসম্পন্ন হইবার পর সকলে যখন বিশ্রাম ও আলাপাদি করিতেছিলেন, সেই সময় মহারাজ সেই ভক্তটির অদ্ভুত সেবা-কার্যের প্রশংসা করিয়া বলেন, 'এখন যদি একশ আটটি কমল সংগ্রহ করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিতে পার, তাহলে তোমার পরিশ্রমের ও এই সেবার চরম পূর্ণতা লাভ হবে।' অদ্ভুত ভক্ত মহারাজের কথা শুনিয়া অপরের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেলেন এবং অনেক চেষ্টাযত্নে প্রবল আগ্রহ-উদ্যমে একশত আটটি পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়া মাকে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলেন। দয়াময়ী আজ এই একনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি পরম সদয়া, আসনে বসিয়া তাঁহার অভিলাষানুযায়ী পূজা গ্রহণ ও স্নেহাশীর্বাদ প্রদান করিয়া মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার মানব-জন্ম সার্থক হইল। সময় সময় বিশেষ বিশেষ দিনে কোন কোন প্রিয় সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া বিশেষভাবে পূজা গ্রহণ করিতেন। সন্তানের আগ্রহে কদাচিৎ আহারে নিয়ম-নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হইত। মা বরাবর সিদ্ধ চালের ভাত খাইতেন, উহা তাঁহার সহ্য হইত। জয়রামবাটীর মন্দিরে এবং বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে (উদ্বোধনে) এখনও সিদ্ধ চালের অন্নভোগ হয়। ব্রাহ্মণ বিধবারা সিদ্ধ চালের ভাত খান না।

মায়ের মর্ত্যলোকে নরলীলা-সম্বরণের পর তাঁহার জন্মস্থানে মন্দির নির্মিত হয়, নিত্য নিয়মিত পূজা ও ভোগেরও ব্যবস্থা হয়। বিশেষ বিশেষ দিনে খুবই সমারোহে পূজা-ভোগ হয়, আমিষ ও নিরামিষ। ছোট মামী একদিন মন্দিরের সেবককে বলিলেন, 'বাপু, তোমাদের পূজা-ভোগ বড়ই চমৎকার, খুব ভাল লাগে দেখতে। তবে তোমরা ঠাকুরঝিকে আমিষ দাও কেন ? সে ত খেতোনি ?' সেবক হাসিয়া বলিলেন, 'মামী, তুমি দেখেছ তাঁকে ঠাকুরের থেকে আলাদা ছিলেন যখন। ঠাকুরের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে তিনি কি খেতেন তা ত দেখনি। এখন তিনি ও ঠাকুর এক সঙ্গে থাকেন।' মামী চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া চলিয়া গেলেন। [ক্রমশঃ]

বাংলাসাহিত্যে রামমোহন বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতিতে বিশিষ্ট ভূমিকার অধিকারী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা রামমোহন— এঁদের মধ্যে বাংলা গদ্যের রূপায়ণে কার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এ নিয়ে অনেকে বিচার করেছেন। ভাষারীতিতে নিশ্চয় বিদ্যালঙ্কারই আগে স্মরণীয়, যদিচ যে মননশীলতার উপর বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা, তার আদি রূপকার রামমোহন। আর অনুজ বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রচেষ্টা সর্বার্থসাধক হয়ে উঠলেও সমকালীন বুদ্ধিজীবী-মানসে রামমোহনই সবচেয়ে আলোড়নসৃষ্টিকারী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাসংঘাতে যে দ্বন্দ্বচেতনা আমাদের নবজাগরণের স্বধর্ম, রামমোহনের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীতেই তার অপর্যাপ্ত উপকরণ।

সেইসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ধর্মান্দোলনের প্রবক্তা ও যোদ্ধারূপে রামমোহন সে যুগের বাদ প্রতিবাদ ও অনুবাদমূলক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সেই ধারাটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র এমনি নানা জনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। লিখিতরূপের এই রচনাবলী কখনো সচেতন, কখনো অচেতন ভাবে বাংলা গদ্যকে দৃঢ়, ভারবহনক্ষম ও স্থিতিস্থাপক করে তুলেছে।

যদি বলা যায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়কদের ধর্মীয় ধ্যানধারণার ঘাতসংঘাত অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মননে ও বাণীভঙ্গিমায় এক সংহত পূর্ণতা লাভ করেছে, তা শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য বিচার নয়, প্রত্যক্ষ সাহিত্য-রূপেই আমাদের লক্ষণীয় কেউ কেউ অবাক হবেন। কিন্তু ইতিহাসের ভিতরে অনেক ইতিহাস নিহিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বেশীর ভাগ এ বিষয়ে অমনোযোগী বলেই এই বিষয়টির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। অবশ্য ইচ্ছাকৃত অমনোযোগ বা অজ্ঞানকৃত বিরুদ্ধতার কথা মনে রেখেই এ আলোচনায় ব্রতী হতে হবে। কিছুকাল আগে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনার সময় আমাদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত এই শিক্ষার আলোকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম সূত্র—লিখিতরূপের সঙ্গে কথিতরূপের সাহিত্যকে সমান স্বীকৃতি দেওয়া। পৃথিবীর সব প্রাচীন সাহিত্যই আগে কথনশিল্প, পরে লেখনীস্পৃষ্ট। এ যে কেবল প্রাচীনকালেরই কথা তা নয়, একালেও যাঁরা 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' বা এসবের কিছু আগে প্রকাশিত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বইটি পড়েছেন, তাঁরাই বাণীরূপের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন। বাংলাসাহিত্যে

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' বিষয়ে তাঁহার গবেষণাগ্রন্থের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অপর দুইটি বিশিষ্ট গ্রন্থ—'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'।

এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও অনতিক্রান্ত উদাহরণ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'।[১]

বাংলা গদ্যে রামমোহন বেদান্তকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। পরবর্তী কালে তাঁর মসিযুদ্ধের অধিকাংশই শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্কের সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজী—এমনি বহু ভাষায় রামমোহনের অবাধ বিচরণক্ষমতা। সমকালীন পণ্ডিতদের তুলনায় তাঁর পড়াশুনোর বিস্তার ও গভীরতা বিস্ময়কর; আর সেই সঙ্গে তাঁর সদা-জাগ্রত ক্ষুরধার বুদ্ধি, যার বিশ্লেষণী ক্ষমতায় চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্য ও জীবনবাদ নতুন অর্থ ও সামঞ্জস্য নিয়ে দেখা দেয়। কতো দিক থেকে কতো গ্রন্থের উদ্ধৃতি, উদাহরণ, কতো মনীষীর চিন্তা ও সিদ্ধান্তের গ্রহণ-বর্জন, সর্বোপরি নিজস্ব বক্তব্যের উপস্থাপনায় সংযত স্থির বুদ্ধির আত্মস্থতা। এসব কিছুর মূলে এমন একটি মানুষ, যিনি শুধু নিজের দেশের নয়, সমস্ত পৃথিবীর যুগান্তর আসন্ন—একথা জেনে সর্বপ্রথম বিশ্বনাগরিকতার পথে অগ্রসর।

সময়সীমার দিক থেকে রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থক্য ষাট বছরেরও বেশী। মাঝখানে যে সব ব্যক্তিত্ব বাংলাসাহিত্যে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুজন— মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর— দু'জনের সঙ্গেই রামকৃষ্ণদেবের দেখা হয়েছিল। মধুসূদনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধিতে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম পথপ্রদর্শক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মধুসূদনের তেমন কোন আলাপ হয়নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎকারের কথাটি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র জবানবন্দীতে চিরকালের সাহিত্য হয়ে আছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, রামমোহনের ধর্মমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে বরং রামকৃষ্ণদেবের চিন্তাধারার একটি ধারাবাহিকতা ভাবা চলে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ বলেই অনেকের ধারণা। অথচ মানবকল্যাণব্রতী এই মহামানবকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে থেকে দেখতে এসেছেন, কারণ এই নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার মধ্যেই নবযুগধর্মের আভাস। শুধু এই সেবার সঙ্গে জ্ঞানভক্তির সম্মেলন ঘটলেই পরিপূর্ণ জীবন-সত্যের প্রকাশ।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগর-সাহিত্য কোনো প্রশ্নই তোলেনি। 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'— কথাটিও বিদ্যাসাগরের আগেই দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং পরবর্তী কালে শিশুপাঠ্য গ্রন্থে সংযোজিত। সুতরাং ভাবাদর্শগত দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ পূর্বসূরী রামমোহন। বুদ্ধিগত মননচর্চায় রামমোহন সর্বমানবের ঈশ্বরানুধ্যানের মূলগত ঐক্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা গদ্যের সেই আদিপর্বে। তাঁর বেদান্তব্যাখ্যানের দুঃসাহসের মতোই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পট-ভূমিকায় মানবজাতির ঐক্যানুভবও কম বিস্ময়কর নয়। রামমোহনের 'প্রার্থনা পত্র' বা 'অনুষ্ঠান' নামে ছোট্ট লেখা দুটিতে সেই বিশ্বমনা উদার-প্রাণের পরিচয়।

রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের তুলনামূলক আলোচনা অবান্তর। কিন্তু সমগ্র 'রামকৃষ্ণকথামৃত' যাঁরা খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁরা শাস্ত্রীয় পরিভাষা ও ধ্যান-ধারণার আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজ

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'সুবর্ণলেখা'-স্মারকগ্রন্থে লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দক্ষতার অজস্র উদাহরণ দেখে এই সিদ্ধান্তেই আসবেন যে, বিভিন্ন সাধু মহাপুরুষদের শাস্ত্রীয় আলোচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ এত যুক্তি- ও তথ্য-নির্ভর, সেইসঙ্গে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে মহিমান্বিত।

প্রথম দর্শনের দিনটিতে মাষ্টার মশাই রামকৃষ্ণদেবের ঘরের সামনে দাঁড়ানো বৃন্দে ঝিকে প্রশ্ন করেছিলেন— "আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন ?"

বৃন্দে— "আর বাবা বই-টই। সব ওঁর মুখে।" এর পরে নিজের সম্বন্ধে মাষ্টার মশায়ের মন্তব্য— "মাষ্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন।" (কথামৃত : ম : প্রথম দর্শন : ২৬শে ফেব্রুআরি ১৮৮২)

আপন অজ্ঞাতেই বৃন্দে ঝি বুঝতে পেরেছিল, তাঁর মুখের কথাই বইয়ের সমান, বা তাঁর মুখের কথা থেকেই বই। যে অর্থেই ধরি না কেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' যে পাঁচ ভাগে মাত্র শেষ হয়েছে, সে কথা ভেবে বেদনাবোধ জাগে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শাস্ত্রপ্রামাণ্য অনুসারে কথা বলেছেন, এ একান্ত বহিরঙ্গ সিদ্ধান্ত ; তার চেয়ে অনেক বড়ো কথা বাংলাভাষায় তাঁর দ্বারা নব উপনিষদ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ দার্শনিক আলোচনার সীমাবদ্ধতায় তাঁকে ধরা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর বাণী অনুসরণ করে এক সামগ্রিক দর্শন সৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক—বিবেকানন্দ রচনাবলীতে তার সূচনা।

সম্প্রতি প্রকাশিত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'Scholar Extraordinary' (অসাধারণ মনীষী) নামে ম্যাক্সমূলরের অসামান্য জীবনী গ্রন্থখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ইংরেজী ভাষায় প্রথম জীবনী রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা দেখা গেল। ম্যাক্সমূলরের মতে, বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদবৃন্দ তাঁদের গুরুদেবের উক্তিসমূহের সঙ্গে বাদরায়ণের সূত্রাবলীর পার্থক্যের কথা মনে রাখলেই ভালো করবেন। ম্যাক্সমূলরের ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ভক্ত' ; জ্ঞানযোগ তাঁর পথ নয়। অপরপক্ষে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং এ জাতীয় শাস্ত্রের শঙ্কর বা রামানুজকৃত ভাষ্যকে যতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী মান্য করে চলবেন, ততদিনই নিঃস্বার্থ ভক্তি ও স্বচ্ছ আদর্শের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত।[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও বাণীতে তাঁকে শুধুমাত্র 'ভক্ত' হিসাবে দেখার সুযোগ যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর বেদান্তসিদ্ধান্ত অথবা কর্মযোগে অনুপ্রেরণার কথাও রয়েছে। তিনি একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত, যোগী ও কর্মপ্রেরণার উৎস। ম্যাক্সমূলরের কাছে তাঁর বাণীর অতি সামান্যই পৌঁছেছিল, তাঁর জীবনের সামগ্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন বিবেকানন্দ বা

---

২ "Vivekananda and the other followers of Ramakrishna ought, however, to teach their followers how to distinguish between the perfervid utterances of their teacher, Ramakrishna, an enthusiastic Bhakta (devotee) .. and the clear and dry style of the Sutras of Badarayana. However as long as these devoted preachers keep true to the Upanishads, the Sutras, and the recognized commentaries, whether of Samkara or Ramanuja, I wish them all the success they deserve by their unselfish devotion and their high ideals." Nirod C. Chowdhury: Scholar Extraordinary : The Life of Professor the Rt. Hon. Friedrich Max Muller, P. C. : p. 329. উল্লেখিত গ্রন্থে ম্যাক্সমূলরের মন্তব্যরূপে উদ্ধৃত।

ব্রহ্মানন্দের মতো সাধকেরা। আর 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় ম্যাক্সমূলরের অমূলক আশঙ্কা অপ্রমাণিত। বেদ-উপনিষদ-তন্ত্র-পুরাণের পট-ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর প্রকাশ— যা একদিকে শাস্ত্রপ্রামাণ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অপরদিকে নতুন শাস্ত্ররূপেও স্বমহিমায় দীপ্ত। তাঁর অনেক বাণীই নবযুগের ব্রহ্মসূত্র বা ভক্তিসূত্র। ঋষি বা ভাষ্যকারেরা কেবল পুরাকালেই আসেননি, যুগে যুগেই আসেন। শাস্ত্রব্যাখ্যায় শুধু নয়, উপলব্ধিময় 'শ্রুতি'-প্রমাণরূপেও শ্রীরামকৃষ্ণবাণী বিশেষভাবে বিচার্য।

গভীরতম প্রজ্ঞা, সুন্দরতম প্রকাশ, সহজতম ভঙ্গী— শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের এই তিনটি মূল লক্ষণ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই লক্ষণ। এর এক একটি অংশমাত্র অবলম্বন করে সাহিত্যে শিল্পে অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপিত হয়। কোথাও জ্ঞানচর্চার দৃষ্টান্ত বেশী, কোথাও প্রকাশভঙ্গিমাই প্রাধান্য পায়, কোথাও বিষয়-অনুসারে ভঙ্গীর তারতম্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণবাণী সর্বক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত তিনটি গুণের সামঞ্জস্যে বিধৃত। তিনি তো সাহিত্য-স্রষ্টাদের মতো নানান্ ঘষামাজার মধ্য দিয়ে বক্তব্য সাজাতে চাননি। সাধু এবং চলতি, বাংলা এবং ইংরেজী — বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর জীবৎকালে এবং পরবর্তী কালে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে সব কথার অনবদ্য বাণীরূপ সবসময়ই মানুষকে মুগ্ধ বিস্মিত করে চলেছে।

রামমোহন বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে ভাষায় শাস্ত্রালোচনা করেছেন, তা নিঃসংশয়ে পাঠকের শাস্ত্রজ্ঞান ও বহুদর্শিতার উপরেই নির্ভরশীল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার উপলক্ষ্য সর্বস্তরের মানুষ— সেখানে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী. প্রতাপ মজুমদার, শশধর তর্কচুড়ামণি, মহেন্দ্রলাল সরকার যেমন আছেন, তেমনি আছেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, আবার সারদাদেবী, গোপালের মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, লক্ষ্মীদিদি, ভানু পিসী প্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীরা, তেমনি আছেন নরেন, রাখাল, নিরঞ্জন, তারক, বাবুরাম, কালী ভবনাথ, ছোট নরেন প্রমুখ সেকালের ইয়ং বেঙ্গল, কখনো বা ভৃত্যরূপে অন্তরঙ্গ সেবক লাটু, কখনো বা শরণাগত রসিক মেথর, কখনো বা বৃন্দে ঝি। এমন বিভিন্ন ও বিচিত্র স্তরের শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে যে ভাষায় পরমসত্যের উপলব্ধি সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে, সেই ভাষায় প্রতিটি দিন এমন কথার অমৃত বিতরণ করা যে কতো বড়ো শিল্পসাধনার পরিণতি সে কথা সাহিত্যের দিক থেকেই আমাদের চিন্তনীয়।

বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে রামমোহনের প্রথম বাংলা রচনা 'বেদান্তগ্রন্থ' (১৮১৫)— এ বইয়ের ভূমিকা থেকে আংশিক উদ্ধৃতি শ্রীরামকৃষ্ণসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির জন্য উপস্থাপিত করি। নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রামমোহনের যুক্তির একটি নমুনা— "যাঁহারা সকল বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক ২ কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া তাঁহার প্রতিমূর্তি জানিয়া ওই সকল বস্তুর পূজাদি করেন ইহার উত্তরে তাঁহারা ওই সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না যেহেতু ওই সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাঁহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন ।" (বেদান্তগ্রন্থ : সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ : পৃঃ ৬) বাংলা গদ্যের প্রথম পর্বে ভাষাভঙ্গীর আড়ষ্টতা সত্ত্বেও রামমোহনের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গী এখানে পরিস্ফুট। পরবর্তী কালে রামমোহনের গদ্যভঙ্গী

উন্নততর।

মাষ্টার মশাই বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনলাভের দ্বিতীয় দিনটিতে (১৮৮২) ব্রাহ্মমনোভাবাপন্ন মাষ্টার মশাইয়ের উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন রামমোহনসমেত সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনের উদ্দেশেই প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে?' মাষ্টার (অবাক হইয়া স্বগতঃ) 'সাকারে বিশ্বাস থাকলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি মাষ্টার— 'আজ্ঞা নিরাকার, আমার এইটি ভালো লাগে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ— তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হল। নিরাকারে বিশ্বাস, তাতো ভালোই। তবে এ বুদ্ধি করো না যে,—এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।'

মাষ্টার 'আচ্ছা যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা ক'রো, মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া) — 'তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক। কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া। আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন।...তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে, কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হ'ন।... তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজার প্রয়োজন আছে। নানা রকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন।...যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।'

(কথামৃত : ১ম)

একদা আলোচনা প্রসঙ্গে অশ্বিনী দত্ত প্রশ্ন করেছিলেন— 'হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি?' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অপূর্ব তুলনা— 'তফাৎ আর কি? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে, আর একজন তারই ভিতর "রাধা আমার মান করেছে", ইত্যাদি রং পরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে। আর হিন্দুরা রং পরং তুলে নিচ্ছে।'

'জল আর বরফ— নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।'

(কথামৃত : ১ম : পরিশিষ্ট)

প্রতিদিনের কথ্যভাষায় যে দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র সবই একদিন প্রকাশিত হবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষা কি তারই পূর্বাভাস নয়? ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধারদের সবচেয়ে জটিল অঙ্কটির এমন সমাধান এমন ভাষায় কে ভাবতে পেরেছিল? অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সমাধানে সবাই যে সন্তুষ্ট হবেন, এমন আশা করা কঠিন। কিন্তু অশ্বিনী দত্ত হয়েছিলেন এবং সেকালের ও একালের অনেক মানুষই হ'ন। তার কারণ ব্রহ্ম যে শুধুমাত্র বিচার-বিতর্কে প্রতিপাদ্য নন। তিনি যে প্রত্যক্ষ অনুভব ছাড়া আর কিছুতেই প্রতীয়মান হতে পারেন না, সে কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, উপমায়, তন্ময়তায় পদে পদে প্রমাণিত। কিন্তু সেজন্যে ধর্মীয় বিষয়ে বিচার-বিতর্ক, এমন কি ঈশ্বর আছেন কি না এ বিষয়ে মৌলিক সন্দেহ— এ সবেরও বুদ্ধিগত প্রয়োজন আছে। সত্য-লাভের জন্যই মানুষের সত্যকে যাচাই করে নেওয়ায় অধিকার।

আবার সেইজন্যই ঈশ্বরপ্রসঙ্গে আপাত নিরুৎ-সুক ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ঈশ্বরতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলাপনটুকু বারম্বার স্মরণযোগ্য। ১৮৮২-র

৫ই অগস্টের এই আলাপচারীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে শ্রীম মন্তব্য করেছেন— "বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড়্দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন বুঝি ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু প্রাথমিক আলাপচারীর পরেই সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মগ্ন। 'ষড়্-দর্শনের পণ্ডিতে'র কাছে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে বলছেন— "ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে— তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।"

• বন্ধুদের দিকে চেয়ে বিদ্যাসাগর বলেছেন— 'বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।' (কথামৃত : ৩য়) এই স্বীকৃতি বিদ্যা-সাগরের পাণ্ডিত্যের নিঃসংশয় অভিজ্ঞান।

উপযুক্ত শ্রোতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সেদিন তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার মণিভাণ্ডারটি উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির কথা কি জানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ? হয়তো কিছুটা শুনে থাকবেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি চিনেছিলেন তাঁর কথায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুদ্ধসত্ত্ব রসিকতার অমন সুন্দর প্রত্যুত্তর দিতে 'কথামৃতে' আর কাউকে দেখি না। আবার বিদ্যাসাগরের হৃদয়, চরিত্র, মনুষ্যত্ব সবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাই সেদিন নির্বারিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তর্জগৎ।

ব্রহ্মোপলব্ধির সেই বাক্যমনাতীত জগতের আভাস দিতে গিয়ে সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে— সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—"ও! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল!" ব্রহ্মের কথাও সেই রকম।...নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিছলো। কত গভীর জল তাই খপর দেবে! খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?'

আবার বিদ্যাসাগরের নিষ্কাম কর্মের সমর্থনে বললেন—'তুমি যে সব কর্ম করছো, এ সব সৎকর্ম। যদি "আমি কর্তা" এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পারো, তাহলে খুব ভালো। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে।' সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন— 'তুমি যে সব কর্ম করছো, এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে।...অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে।'

একদিকে আধুনিক মানবিকতাবাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী, আর একদিকে নিখিল সংসারে ব্রহ্মময় উপলব্ধির 'বিজ্ঞানী'দৃষ্টি – এ দুই প্রান্তের যোগ-সূত্রটি যেন সেদিনের আলোচনায় ধরা দিল। একদিকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয়ের ফলে শুধু-মাত্র জগৎ ও জীবনকে গ্রহণের চেষ্টা, আর এক-দিকে জগৎকে চিরন্তন সত্যের দিক থেকে মিথ্যা জেনে ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে আবার সর্বজীবে সর্ববস্তুতে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ উপলব্ধি করা— আন্তরিকতা থাকলে এ দুই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই চিন্তার স্তর-পরম্পরা গড়ে উঠতে পারে।

কিন্তু শুধু কি ঈশ্বর- বা ব্রহ্ম-প্রসঙ্গই সেদিনের আলোচনার লক্ষণীয় বিষয় ছিল? অবশ্য শ্রীরাম-কৃষ্ণসাহিত্যের মূল বিষয় বা রসবস্তু এক ঈশ্বর। ভগবানলাভ যখন মানবজীবনের উদ্দেশ্য, তখন

সাহিত্যেরও সেই পরম উদ্দেশ্য। তবু, যে সৌন্দর্যে, সরলতায়, চিত্রধর্মে, ধ্যানস্পর্শে একে একে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাগুলি ফুটে উঠছিল, তাও কি লক্ষণীয় ছিল না ?

'আজ সাগরে এসে মিললাম।'

'তুমি ক্ষীরসমুদ্র।'

'ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়েছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন।'

'...সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে; আবার কথা কয়। যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে বসে মধু পান করতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কখনও কখনও গুনগুন করে।'

'বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই!'

সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কাছে সেদিন চলতি গদ্যের মহাশিল্পী কথা বলেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে প্রস্থানোদ্যত (বয়ঃকনিষ্ঠ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিদ্যাসাগর সেদিন প্রণাম করেছিলেন।*

* বর্তমান লেখকের 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে।

ভাবনা কিসের ?

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

ভয়ংকরের পথে নেমে
ব্রতী রে তোর ভাবনা কিসের ?
এগিয়ে যাওয়ার প্রবল বেগে
ছিঁড়ুক মায়া বেভুল দিশের !
যেখান থেকে শঙ্কা আসে
'অভীঃ' আছে তারই পাশে !
নির্ভয়ে আজ পান ক'রে নে
ফেনিয়ে-ওঠা পাত্র বিষের !
ভয়ংকরের পথে নেমে
ব্রতী রে তোর ভাবনা কিসের ?

বাজে যে তোর অস্থি গড়া
বিদ্যুতে তোর শক্তি প্রাণের,
বিশ্বাসে তোর জাগ্‌বে হঠাৎ
মন্ত্র মহা-পরিত্রাণের !
সংঘাতের ওই প্রতিঘাতে
যে উৎসবে মৃত্যু মাতে,
সেইখানে যে ফসল ফলে
এই জীবনের সোনার শীষের !
ভয়ংকরের পথে নেমে
ব্রতী রে তোর ভাবনা কিসের ?

পদার্থের গঠন

ডক্টর ধ্রুব মাজিত

[পূর্বানুবৃত্তি]

ইউরোপের গবেষণাগারগুলিতে তখন শুরু হল এক দারুণ ব্যস্ততা। পরমাণু হতে মৌলিক পদার্থগুলিকে খুঁজে পেতে সবাই ব্যস্ত। জার্মানীর গটিংগেনে — ম্যাক্সবর্ন, হিলবার্ট, জেমস্ ফ্রাংক প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে; কোপেনহেগেনে —অধ্যাপক নীলস্ বোরের তত্ত্বাবধানে এবং সর্বোপরি কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস্ লেবরেটরিতে রাদারফোর্ডের প্রেরণায় তখন নবীন গবেষকের দল দিবারাত্র ব্যস্ত সৃষ্টিরহস্য উন্মোচন করতে। শোনা যায় রাদারফোর্ড প্রায়ই গবেষণাগারে কর্মব্যস্ত ছাত্রদের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করতেন, "আজকে নতুন কোন মৌলিক কণার সন্ধান কি পাওয়া গেল ?" ভাবলে রোমাঞ্চ লাগে কি আশ্চর্য উদ্দীপনা এবং আকণ্ঠ জ্ঞানপিপাসা নিয়ে বিজ্ঞানীগণ সে দিনগুলিতে কাজ করতেন।

পরমাণুকে ভেঙে প্রথমেই পাওয়া গেল ইলেকট্রনকে। এটির অস্তিত্ব পরমাণুর খোলস পর্যন্ত এগোতেই পাওয়া গেল। ইলেকট্রনের প্রায় কোন ভর নেই বল্লেই চলে—যদিও সেটি একক ঋণাত্মক চার্জ-সম্পন্ন। পরমাণুর খোলস পেরিয়ে আর একটু এগোতে পাওয়া গেল পরমাণুর কেন্দ্রক-কে (nucleus)। কেন্দ্রক গঠিত হয় প্রোটন এবং নিউট্রন—এই দু'টি মৌলিক কণিকার সাহায্যে। প্রোটন একক ভর এবং একক ধনাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট কণা। নিউট্রনের কোন চার্জ নেই অর্থাৎ সে নিরপেক্ষ, যদিও সে একক ভর-সম্পন্ন। বস্তুত পরমাণুর ভর মানেই হল তার কেন্দ্রকের ভর। কিন্তু সম্পূর্ণ পরমাণুর আকারের তুলনায় কেন্দ্রকের আকার অত্যন্ত নগণ্য। বিরাট একটি হল ঘরের মধ্যে একটি মাছি বসে থাকলে—কল্পনা করা যেতে পারে, হল ঘরটি পরমাণু এবং মাছিটি কেন্দ্রক। অথচ সেই পরমাণুর যাবতীয় ধনাত্মক চার্জ এবং ভর ঐ ক্ষুদ্র কেন্দ্রকের মধ্যেই আছে। পৃথিবীর যাবতীয় পরমাণুর কেন্দ্রকগুলির সম্মিলিত আয়তন একটি বলের চেয়ে বড় হবে না, - যদিও বলটির ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় সমান হবে। ব্যাপারটা 'দুধ মেরে ক্ষীর অথবা ক্ষীর মেরে খোওয়া' করার চেয়েও কিছুটা সাংঘাতিক। পরমাণু কি কি মৌলিক কণা দিয়ে তৈরী সেটা জানতে পারা গেলেও—সব মিলিয়ে পরমাণু কি রকম 'দেখতে' তাই নিয়ে চলল আরেক দফা গবেষণার বন্যা। 'পরমাণু' কথাটি আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত, হয়তো কিছুটা পুরাতন বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু তার গঠন এবং সেটিকে কেমন দেখতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। পরমাণুর গঠন আকার ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন রকমের মডেলের কথা বলতে শুরু করলেন। রাদার-ফোর্ডের শিক্ষক এবং ইলেকট্রনের আবিষ্কারক বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জে. জে. টমসন ১৮৯৮ সালে প্রথম পরমাণুর একটি মডেল তৈরী করেন। জে. জে. বল্লেন, পরমাণু যেন একটি ধনাত্মক চার্জের মেঘপুঞ্জ - যার মধ্যে ঋণাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলি যথেষ্ট সংখ্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলির গতি কেন্দ্রক দ্বারা সৃষ্ট ধনাত্মক চার্জ-সম্পন্ন মেঘপুঞ্জের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ক্রমে ক্রমে মন্থর হয়ে পড়ে। তাঁর এই ব্যাখ্যা ধোপে টিকল না বেশী দিন। বিতর্ক বাঁধলো এই নিয়ে যে, ঋণাত্মক ইলেকট্রন ধনাত্মক মেঘপুঞ্জে মিশে গিয়ে নিজেদের চার্জকে নিরপেক্ষ করে

তুলতে তো পারে, তা হলে তারা তা করছে না কেন? জে. জে.[1]-র পরমাণুর মডেল হতে মুষ্টিমেয় কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল—পর্যালোচনা করার সময় দেখা গেল পরীক্ষালব্ধ সত্যের সঙ্গে এই উত্তর মোটেই মিলছে না—ববং ঘটছে দারুণ সংঘাত।

এরপর আরেকটি মডেল তৈরি করলেন লর্ড রাদারফোর্ড, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটিও ধোপে টিকলো না। অবশেষে নীলস্ বোরের দেওয়া পরমাণুর মডেল স্বমহিমায় এখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁর দেওয়া হাইড্রোজেন পরমাণুর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষালব্ধ সত্যের সঙ্গে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য রেখে চলে। পরমাণুর মধ্যে ক'টি ইলেকট্রন আছে, সেটাই বড় প্রশ্ন— কারণ কোন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা হল তার মধ্যে থাকা ইলেকট্রনের সংখ্যা। ইলেকট্রনের সংখ্যা জানা থাকলে বিজ্ঞানীগণ সেগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে সাজিয়ে বলতে সক্ষম পরমাণুটির ধর্ম কিরূপ। যেহেতু ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট এবং প্রোটন ধনাত্মক চার্জ-বিশিষ্ট কণিকা এবং পরমাণুতে সর্বদা ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকে তাই পরমাণু নিজে নিরপেক্ষ। কোন পরমাণুর ভর অর্থাৎ তার পারমাণবিক গুরুত্ব হল তার কেন্দ্রকের মধ্যে থাকা প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যার যোগফল।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রত্যেকটি মৌলিক কণার একটি করে বিপরীত কণা বর্তমান। বিপরীত কণাগুলি প্রকৃত মৌলিক কণাগুলির দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেন। অর্থাৎ সব কিছুই নিখুঁতভাবে উল্টানো। ইলেকট্রনের বিপরীত কণার নাম হল পজিট্রন; এটির অস্তিত্ব প্রথমে তাত্ত্বিক উপায়ে নিরূপণ করেন—ডিরাক। পরে পরীক্ষার সাহায্যে এটির অস্তিত্ব যাচাই করা সম্ভব হয়েছে। অধ্যাপক ডিরাক একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন—তিনি বলেছেন, এই বিশ্বে যেগুলি মৌলিক কণিকা এবং যেগুলিকে তাদের বিপরীত কণিকা হিসাবে আমরা 'দেখতে' পাচ্ছি—এই অসীম সৃষ্টির মধ্যে এমনও কোন বিশ্ব থাকতে পারে, যেখানে আমাদের বিপরীত কণাগুলি সেখানকার মৌলিক কণিকা এবং আমাদের মৌলিক কণিকাগুলি সেখানে বিপরীত কণিকা। ব্যাপারটা ভাবলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়া ছাড়া আর কিছু কি করার থাকে?

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীগণ যখন পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টায় ব্যস্ত—ঠিক তখনই প্যারিসে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনরী বেকেরেল একটি বিস্ময়কর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই বৈজ্ঞানিক সমস্যাটিকে বলতে গেলে মনে হবে যেন কাঁচা হাতের লেখা কোন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী। সেটা ১৮৯৬ সাল—সমস্যাটি হল তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কীয়। হেনরী বেকেরেলের গবেষণাগারের একটি আলমারিতে কালো কাপড়ে মোড়া কতকগুলি ফটোগ্রাফিক প্লেট রাখা ছিল বেশ কয়েক মাস ধরে এবং অসাবধানতাবশতঃ সেগুলির উপর রাখা ছিল কয়েক টুকরো ইউরেনিয়ম ধাতুর লবণ। এই ঘটনার কিছুদিন আগে জার্মান বিজ্ঞানী রুত্গেঁ (Rontgen) একটি অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত আলোকরশ্মির সন্ধান পান। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন সাধারণ আলোকে যা অস্বচ্ছ, এই অজ্ঞাত রশ্মি অবলীলাক্রমে সেগুলিকে ভেদ করে চলে যেতে পারে। বীজগণিতের সমীকরণে অজ্ঞাত রাশিটিকে ইংরাজীর x-অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত

১ ক্যাভেনডিস্ লেবরেটরির ছাত্র-শিক্ষকগণ তাঁকে এই নামে ডাকতেন।

করার রীতি অবলম্বন করে রুত্‌গেঁ তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত এই অজ্ঞাত রশ্মির নাম রাখলেন—এক্স রশ্মি। বেকেরেল ঐ ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলি রেখেছিলেন রুত্‌গেঁর আবিষ্কৃত এক্স-রশ্মির অনুরূপ আর কোন রশ্মি পাওয়া যায় কিনা তা দেখবার জন্য। কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলি ক'মাসের পুরাতন বলে তিনি একটি প্লেট ডেভেলপ করে দেখলেন সেগুলি ঠিক আছে কিনা। ডেভেলপ করার পর ফটো প্লেটটির দিকে তাকিয়ে তিনি তো হতভম্ব। প্লেটের উপর রাখা ইউরেনিয়মের লবণ-টুকরোগুলির প্রতিচ্ছবি ফটোগ্রাফিক প্লেটে একেবারে হুবহু ফুটে উঠেছে। অথচ প্লেটগুলি রাখা ছিল অন্ধকারে, কালো কাগজে মোড়া—তবু কোথা হতে আলো এলো? এ আলো কি বাহিরের, নাকি ইউরেনিয়ম লবণগুলি নিজেরাই বের করলো আলো? পরীক্ষাটি তিনি বার কয়েক করে দেখলেন, একটি অ্যালুমিনিয়ম পাতের উপর ইউরেনিয়ম লবণের টুকরো রেখে তিনি দেখলেন—প্লেটে অ্যালুমিনিয়ম পাতের ছবি ফুটে উঠেছে। অথচ ইউরেনিয়ম টুকরো-গুলির এই 'সেল্‌ফ পোর্ট্রেট' তৈরি করার কোন ব্যাখ্যা তিনি পাচ্ছেন না। অন্ধকারে অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে পেলেন তিনি কিছুটা শক্ত মাটি, যাতে পা দিয়ে তাঁর যুক্তি দাঁড়াতে পারে। লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে তিনি তাঁর পরীক্ষার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বল্লেন—ইউরেনিয়মের মধ্যে এমন একটি গোপন উৎস আছে, যা হতে ক্রমাগত রশ্মি নির্গত হচ্ছে এবং সেই রশ্মি কাগজ, অ্যালুমিনিয়ম-পাত ভেদ করে যেতে পারে এবং সাধারণ আলোকের মত সেটি আবার ফটোগ্রাফিক প্লেটে তার চিহ্ন রেখে যেতে পারে। আবিষ্কৃত হল: তেজস্ক্রিয়তা— মৌলিক পদার্থের যে পর্যায় তালিকা (Periodic Table) আছে তার শেষের দিকে থাকা কতকগুলি পদার্থের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনকে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল—তিনি বলেছিলেন, ইউরেনিয়ম ধাতুর লবণগুলি হয়ত দিনের বেলা সূর্যের বিকিরণ শোষণ করে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সেই শোষিত তেজ বিকিরণ করে দেয়। আজকালকার একটি নবীন বিজ্ঞান পড়ুয়ার কাছেও ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হবে এবং তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে এ ধরনের কোন মন্তব্য পরীক্ষার খাতায় কেউ করলে তাকে অবশ্যই শূন্য পেতে হবে। লর্ড কেলভিনের মতন একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীর অনুমানমূলক সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিয়ে বিজ্ঞান অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বহু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই আপাতসিদ্ধান্ত, তবে তারও মূল্য আছে—তাকে অবলম্বন করেই যে নূতন তথ্যের আবিষ্কার ঘটে, তা-ই সেই আপাতসিদ্ধান্তের মিথ্যাত্ব নির্ণয় করে থাকে। এইভাবেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের কয়েক বছর বাদে ফ্রান্সে মাদাম কুরি এবং তাঁর সখা, গুরু এবং স্বামী পীয়ের কুরি ইউরেনিয়মের লবণ পীচব্লেণ্ড নিষ্কাশন করে পেলেন এক বিস্ময়কর মৌলিক পদার্থ—রেডিয়ম। এই নতুন আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থটি ইউরেনিয়মের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয়। রি-ইনফোর্স্‌ড কংক্রিটের মেঝের চালায় তাঁরা স্বামী স্ত্রী যখন দিশাহারা হয়ে নতুন কোন একটি পদার্থকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছিলেন—তখনও তাঁরা তেজস্ক্রিয়তার গুরুত্বটি সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পারেননি। নিরলস কাজের শেষে বৃদ্ধ বয়সে মাদাম কুরির হাত এবং পা ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। গভীর ক্ষত শরীরের অন্যান্য স্থানেও দেখা গিয়েছিল। তবু গবেষণা থামেনি—উট কাঁটাগাছ খায় যদিও কাঁটার আঘাতে তার মুখ

হতে রক্ত ঝরে। বেকেরেল-ও তাঁর ভেতরের জামার (vest-এর) পকেটে একটি সীল করা কাঁচের নলে কিছুটা ইউরেনিয়মের লবণ নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর দেহের ঐস্থানে কালো পুড়ে যাওয়া দাগ লক্ষ্য করেছিলেন। তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে নানান ধরনের গবেষণা চলতে লাগল—এবং ক্রমে ক্রমে জানা গেল, পদার্থ হতে নির্গত রশ্মিসংখ্যা একাধিক। আরেকবার নূতন করে চিন্তায় পড়তে হলো বিজ্ঞানীদের—কারণ এই রশ্মিগুলির কোনটিই আগের পরিচিত রশ্মির মত ধর্মবিশিষ্ট নয়। একেবারে ভিন্ন জাতের—যেন কতকগুলি অচেনা অতিথি এলো পদার্থবিজ্ঞানী-দের সংসারে। রুত্‌গেঁর এক্স রশ্মির চেয়েও জোরালো কোন রশ্মি এতে আছে। বিশ্লেষণ করে এদের নাম দেওয়া হলো—আলফা, বিটা এবং গামা রশ্মি। প্রথম দুটি অর্থাৎ আলফা এবং বিটা রশ্মি হল যথাক্রমে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ-সম্পন্ন কণার প্রবাহ এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ গামা রশ্মি হল দৃশ্যমান আলোকের মত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং এটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্পন্ন।

আজকে মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১০৫টি—যার মধ্যে ৯২টি পর্যন্ত প্রকৃতিতে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় এবং বাকিগুলি পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী। আপাতত আমাদের জানা মৌলিক কণিকার সংখ্যা কম নয়—হাজার হাজার। সম্প্রতি গেল-ম্যান (Gell-Mann) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে প্রাথমিক ভাবে মাত্র তিনটি কোয়ার্কের[২] বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত হয় মৌলিক কণা—এবং এই তিনটি মাত্র কোয়ার্কের সাহায্যে গঠিত মৌলিক কণিকার সংখ্যা সহস্র সহস্র হতে পারে; অপরপক্ষে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী চিউ (Chew) এবং ম্যাণ্ডেলষ্ট্যাম-এর (Mandelstam) মতে 'বুটস্ট্র্যাপ[৩] (Bootstrap) তত্ত্ব' অনুযায়ী প্রতিটি মৌলিক কণিকায় সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট সংখ্যায় এরা থাকতে পারে। মৌলিক কণিকার সংখ্যা শত সহস্র— ব্যাপারটা ভীতিপ্রদ নয় কি ?

মাদাম কুরি রেডিয়ম আবিষ্কারের নেশায় যখন মত্ত তখন মাঝে মাঝে স্বামী পীয়েরকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'পীয়ের, রেডিয়মকে কেমন দেখতে হোক তুমি চাও ?' পীয়ের বলতেন—'শান্ত নীল দুটি চোখের মত উজ্জ্বল অথচ মমতাপূর্ণ সেটি দেখতে হোক, আমি তাই চাই'। সত্যই রেডিয়ম নীল— হয়ত কুরি-দম্পতির মনের রঙ নিয়েই সে জন্মেছে বলেই। পরমাণু বিজ্ঞানের সূত্রপাত এত শান্তিপূর্ণ এবং কাব্যিকভাবে শুরু হলেও এর শেষটা কিন্তু সমরবিশারদের হাতে পরে হিরোসিমা নাগাসাকির রক্তাক্ত অশ্রুসজল কাহিনী রচনা করেছে। সেদিনের সেই চকমকির শিখা দেখে আমাদের আদিম পূর্বপুরুষ যেমন সংশয়ের দোলায় দুলেছিলেন—এই

---

২ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী গেলম্যান কোয়ার্ক (Quark) নামে তিনটি পরম কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যৎ বাণী করেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী এই তিনটি মাত্র কোয়ার্কের সাহায্যেই যাবতীয় মৌলিক কণিকা গঠিত হতে পারে। গবেষণাগারে এ ধরনের কোন কোয়ার্কের সন্ধান বিজ্ঞানীগণ এখনও পাননি। —যদিও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীগণের ধারণা, অনুসন্ধান চালিয়ে গেলে এই কোয়ার্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

৩ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি কণাগুলিকে যাদের আমরা মৌলিক কণিকা বলে থাকি—এই তত্ত্বে তাদের মৌলিক কণা বলে স্বীকার করা হয় না। এই তত্ত্ব অনুযায়ী তথাকথিত কোন "মৌলিক কণা"-ই মৌলিক নয়।

আগুনের শিখা আমাদের ভালো করবে না খারাপ করবে?—ঠিক তেমনি পরমাণু-বিজ্ঞান আমাদের কি দেবে অফুরন্ত স্বাচ্ছন্দ্য, নাকি তুলাখ, চার লাখ, আট লাখ, মানুষ কিভাবে মারতে হয় তার জন্য নিত্য নতুন ব্রহ্মাস্ত্র? আমরা বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রসারিত হাতের দিকে লক্ষ্য রেখে—আশায় বুক বাঁধবো এই কেটে যাওয়া পুড়ে যাওয়া রক্তাক্ত পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে আমাদের নূতন উদয়গিরিতে উত্তীর্ণ করে দেবে।

পূরবী

শ্রীঅশোক কুমার রায়

শালবনে নেমে এলো অন্ধকার অলক্ষিতে ধীরে,
যে পাখি হারালো নীড় পুনঃ কভু আসিবে কি ফিরে?
কাহারে জিজ্ঞাসা করি, কোথাও কি রচিল সে নীড়—
শান্ত সুনিবিড়?
স্রোতহারা শীর্ণা নদী শৈবালেতে নিঃশেষিত প্রাণ,
বক্ষে বহে গৌরবের স্মৃতি,
বাম তীরে শ্মশানেতে গৃহছাড়া সাধকের গান—
প্রেমমাখা অশ্রুজলে তিতি।
মৃত্যুরূপী নিষাদের তীক্ষ্ণশর কী আঘাত হানে
মানুষের প্রাণে!
যে বিধবা কাঁদে বসি' বিনাইয়া মৃত পুত্র তরে—
কে তারে বুঝাবে বল, যাত্রা তার নূতনের ঘরে!
গান কি হারায় সুর, ধ্বনি তার সকল ঝঙ্কার?
সব যাত্রা করে শেষে, শেষ-যাত্রী ভাবে কভু আর—
নীলাকাশে ধ্রুবতারা দিবে তারে পথের নির্দেশ—
যেথা তার দেশ?
মরে না মরে না সুর, জন্ম যারে দিল প্রাণ-বীণ,
আবর্তিয়া ফিরে বিশ্বময়,
যে গান হলো না শেষ, ধ্বনি তার হইবে না ক্ষীণ
মহাশূন্যে হইবে না লয়।
পিছনের দীর্ঘশ্বাসে নবতম যাত্রার পুলকে
সুধা-অভিষিক্ত করি' গাঁথে কেহ সঙ্গীতের শ্লোকে,
অতীত জীবন হ'তে ছোট বড় সব সুর টানি—
পূরবীতে আনি।

ভাগবত-ধর্ম

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভগবান ভালবাসার ধন, তাঁহাকে শুদ্ধ ভালবাসার দ্বারা পাওয়া যায়। এই মতবাদকে সাধারণতঃ মরমিয়াবাদ বলে। খৃষ্টান ধর্মে এই বাদের নাম মিস্টিসিজম (Mysticism)। ইসলামে এই মতের নাম সুফীমত। সুফীবাদের সঙ্গে ভাগবত-ধর্মের কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সুফীমত ইসলামের অন্তরের সংবাদ। অন্তরের সংবাদ অনুধাবন করিতে বাহিরেরও কিছু জানা দরকার। হিন্দুধর্মের ভিত্তি যেমন শ্রুতি ও গীতা, ইসলামের ভিত্তি সেইরূপ কোরান ও হাদিস। মুসলিম দার্শনিকগণ চরম সত্য লাভের জন্য যে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহার মূল প্রেরণা নিহিত রহিয়াছে কোরানে ও হাদিসে। কোরান ঈশ্বরের বাণী, হাদিস প্রেরিত পুরুষ হজরতের বাণী। ওহি আর এলহাম প্রত্যাদেশ ও অনুভূতি। কোরানে ওহি রসুলের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রত্যাদেশ, আর এলহাম ধ্যানীর ধ্যানে প্রকটিত অপরোক্ষানুভূতি। এই দুইই অতীন্দ্রিয়। সুতরাং ইসলামের ভিত্তি অপ্রাকৃত সত্য।

হিন্দুধর্মে যেমন একই শ্রুতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা অবলম্বনে দ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি বহু মতের প্রকাশ, অনেকটা সেইমতই কোরান ও হাদিসের যথার্থ তাৎপর্য অনুসন্ধানের ফলে মুসলিম চিন্তাবিদ্‌গণ মুরজিয়া জাবারিয়া কাফেরিয়া মুতাজিলা ও আশারিয়া — এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। তবে কোরান ও হাদিস যে সত্যের উৎস, এই বিষয়ে মতভেদ নাই।

ইসলামের মূল বাণী তওহীদ। তওহীদের অর্থ খোদার একত্ব। যে এক খোদা বিশ্বাস করে না সে মুসলমান নয়। ইসলামে পুরোহিত নাই, অর্থাৎ ভগবান ও মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় কোন মধ্যস্থ নাই। ইসলাম মতে প্রত্যেক মানুষ সমান, জাতি বা বর্ণের ভেদ নাই। এই সাম্যবাদ ইসলামের মধ্যে। ইসলামের বাহিরে যে, সে কাফের।

পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম দণ্ডায়মান। কলমা, নমাজ, রোজা, জাকাত ও হজ। ঈশ্বরের একত্ব ও হজরতের নবীত্বে বিশ্বাস হইল কলমা। কলমা মন্ত্রের অর্থ, এক আল্লা ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ। এইটি ইসলামের মূল মন্ত্র। বাকি চারটি শান্তি-রাজ্যে পৌঁছাইবার প্রণালী। ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।

নমাজের অর্থ উপাসনা, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের যোগাযোগের উপায়। নমাজ শুধু নমস্কার করাই নয়। ভোগতৃষ্ণামুক্ত হইয়া আত্মশুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্তিতা লাভ করাই হইল নমাজের প্রকৃত লক্ষ্য। সংঘবদ্ধ হইয়া নমাজ পড়াই সর্বোত্তম।

রোজা—রমজান মাসে রোজা করণীয়। আরবী রমজ ধাতু হইতে রমজান; রমজ ধাতুর অর্থ, দাহন করা। রমজান দাহন করিবার মাস। কাম ক্রোধ, লোভ লালসা প্রভৃতি রিপুগণকে দগ্ধ করিবার মাস রমজান। ব্রাহ্মমুহূর্ত হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ত্যাগই রোজা। সংযম তিতিক্ষা ধৈর্য আদি শিক্ষার জন্যই রোজা।

জাকাত—আয়ের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দরিদ্রকে দান করার নাম জাকাত। সমাজের সকল মানুষের উন্নতিকল্পে ইসলামের জাকাত। হজরত বলিয়াছেন, 'যে লোকের প্রতিবেশী অনাহারে আছে সে ব্যক্তি মুসলমান নয়।'

হজ—প্রত্যেক মুসলমানকে জীবনে একবার মক্কায় গিয়া হজ ব্রত পালন করিতে হয়। তখন সমস্ত দেশের মুসলমান একত্র মিলিত হয়। ইহাতে ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় হয়।

কোরানের মতে মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বৈষ্ণব আচার্যেরা বলেন, 'নরবপু তাঁহার স্বরূপ'। *ঈশ্বর সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী। ইচ্ছামাত্রই* তাঁহার ঈপ্সিত সিদ্ধ হয়। তাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও সৃষ্টির মধ্যে অবকাশ নাই। তিনি আগে চিন্তা করিলেন, তাহার পর সৃষ্টি করিলেন, এরূপ নহে। তাঁহার চিন্তা করামাত্রই সৃষ্টি।

খোদাতালা সর্বদর্শী। সব জানেন—এক মুহূর্তে সব জানেন। তাঁহার কাছে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ নাই। সবই চিরবর্তমান। ইহাতে ভগবানের জ্ঞান ক্রিয়াহীন হইয়া পড়ে। ঐশীজ্ঞান যদি নিষ্ক্রিয় হয়, তাহা হইলে জগতে নূতনত্বের সম্ভাবনা থাকে না। ইহা লইয়া বিস্তর আলোচনা আছে।

ঈশ্বর সকল শক্তির কেন্দ্র। জগতের তিনি আদি কারণ। মানুষ পরতন্ত্র, ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত। মানুষের স্বনিয়ন্ত্রণের শক্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বরের শক্তি খর্ব হয়। ইসলাম খোদার সর্বশক্তিমত্তাও মানে, আবার মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাও স্বীকার করে। ইহাতে অসামঞ্জস্য হয়। তবে এই অসামঞ্জস্য শুধু ইসলামে নয়— সকল ধর্মেই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব ধর্মের যেমন বিধিমার্গ ও রাগমার্গ দুইটি দিক, ইসলাম ধর্মের সেইরূপ জাহেরী ও বাতেনি দুই দিক। একটি বাহিরের দিক—বহিরঙ্গ সাধন বা শরিয়ত, আর একটি অন্তরের দিক—অন্তরঙ্গ সাধন, যাহার অপর নাম মারেফাত। বাহিরের দিকটি বহু বিধি-নিষেধমূলক। অন্তরের দিকটি অনুরাগমূলক। শরিয়তের ভিত্তি অনুষ্ঠান। মারেফাতের ভিত্তি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি।

পরমসত্তা শ্রীভগবানকে অন্তরের অন্তস্থলে নিবিড়ভাবে পাইবার যে প্রচেষ্টা তাহার নাম মরমিয়াবাদ। এই মতের পরিপূর্ণ প্রকাশ বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ-সঙ্গে গোবিন্দের লীলায়। অন্যান্য ধর্মেও ইহার অভিনব প্রকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টধর্মে এই মরমিয়াবাদের *নাম Mysticism, ইসলাম ধর্মে ইহারই নাম* সুফীবাদ।

সুফী শব্দটি সুফ হইতে উৎপন্ন। সুফ অর্থ পশম। অষ্টম শতকের শেষভাগে একদল মুসলমান ইসলামের গোঁড়া মতবাদ ত্যাগ করিয়া অনাড়ম্বর কৃচ্ছ্রতার পথ অবলম্বন করেন। তাঁহারা লৌকিক জাঁকজমকের রাস্তা উপেক্ষা করিয়া সহজ সাদাসিধা জীবন যাপন করেন। তাঁহারা শ্বেতবর্ণ পশমী পোশাক পরিধান করিতেন। এই পশমী পোশাক পরিধানকারীরা ইসলামের ইতিহাসে সুফী নামে খ্যাত। তাঁহাদের আসল নাম তাসাউক সম্প্রদায়।

ইসলামী সাধনার গুপ্তদিকের নাম তাসাউক। তাসাউক সম্প্রদায়ের ভিত্তি যদিচ কোরান ও হাদিস, তথাপি ইহাদের শিক্ষা ও অনুভব বহুলাংশে অভিনব। ইহাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জালাল-উদ্দিন রুমি রচিত মসনবী। ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত আলগজ্জলী। আলগজ্জলীর সর্ব-শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পারসী ভাষায় 'ক্রিমিয়ে সওগাত'—'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' তাহার বঙ্গানুবাদ।

হিন্দুধর্মের সন্ন্যাস আশ্রমের মত ইসলামে বৈরাগ্য নাই। কোন কৃচ্ছ্র সাধন মুসলমান ধর্মে নাই। মানুষের প্রজ্ঞাও আছে, প্রবৃত্তিও আছে।

প্রবৃত্তিকে উৎপাটন করিতে হইবে না। হীন প্রবৃত্তিকে বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনকে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহা ইসলামের নীতি।

ইসলাম মানবের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। সৃষ্টির পূর্বেও আত্মা ছিল, মরণের পরেও থাকিবে। সে পাপপুণ্য অনুসারে শেষ বিচারের পর স্বর্গ-নরক ভোগ করিবে। হিন্দুগণ বিশ্বাস করে, আত্মা কর্মফল ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ দেহধারণ ও দেহত্যাগ করে। ইহা ইসলাম-শাস্ত্রে নাই।

ঈশ্বর এই জগৎকে খেয়ালমত সৃষ্টি করেন নাই। ইহার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা আছে। ইহার মূলে বিশেষ কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। এই লক্ষ্য বাহির হইতে আরোপিত কিছু নয়। ইহা তাঁহার স্বরূপের মধ্যেই অন্তর্নিহিত।

আত্মা অমর। হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে ইসলামেরও এই মত। কোরানে বলা হইয়াছে, 'আমরা আল্লার জন্য এবং আল্লার কাছে প্রত্যাবর্তন করিব—ইন্না লিল্লাহ অ ইন্না ইলাল্লাহে রেজউন।' কোনও মুসলমানের মৃত্যু হইলে এই কথা উচ্চারণ করিয়া তাহার আত্মা আল্লার কাছে প্রত্যাবর্তন করুন—ইহা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরের প্রার্থনা। পরস্পর অভিবাদন কালেও উচ্চারণ করিতে হয়: আপনার উপর খোদা-তালার শান্তি বর্ষিত হউক। অপর ব্যক্তি বলেন: আপনার উপরও বর্ষিত হউক।

সুফীমত অনুসারে খোদাতালা প্রেমময়। তিনি আমাদের ভালবাসার ধন। শুদ্ধ ভালবাসা বা প্রেম দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। প্রেমই প্রকৃত ধর্ম। মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু—খোদাতালার প্রেম লাভ। জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য, সেটি হইল ঈশ্বরের প্রেমের শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া, বৈষ্ণব আচার্যেরা যেমন বলিয়াছেন, "পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন।"

খোদা কঠোর বিচারক মাত্র নহেন। কেবল পাপীর শাস্তি বিধানই তাঁহার কাজ নহে। তিনি প্রেমের দেবতা, পরম দয়ালু রহমানির রহিম। সকল সৌন্দর্য সুসমা ও স্নেহের তিনি আধার। ধর্মের বাহিরের অনুষ্ঠান খুব মূল্যবান কিছু নহে। তিনি সাড়া দেন অন্তরের গভীর অনুরাগের আহ্বানে। তিনি সংবাদ রাখেন আমাদের হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দনের। তাঁহার সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র অন্তরের অন্তস্থলে অতি গোপন পথ দিয়া।

বাহিরের অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ওগুলির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আগে দেহ মন প্রাণ প্রস্তুত না হইলে গুপ্তপথে প্রবেশ করা যায় না। প্রস্তুতির উপায়—কলমা নমাজ রোজা জাকাত ও হজ। ইসলামের এই পাঁচটি স্তম্ভ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি। ইসলামী সাধনার গুপ্তদিকের প্রসঙ্গে ইহাদের পুনরুল্লেখ করিতেছি, বাহ্য ও আন্তর অনুষ্ঠানের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য। আত্মিক উন্নতি নমাজের মাধ্যমেই হাসিল হয়। কুপ্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্ত হইয়া আত্মশুদ্ধি লাভ করাই নমাজ পড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। রোজা দ্বারা হয় সংযম শিক্ষা ও ক্ষুধার্ত দীন দরিদ্রের সঙ্গে মনের একাত্মতা। রোজার সার্থকতা হইল আত্মশোধনে। অর্থ-লালসা সংযত করার জন্য জাকাত। সমাজের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে চিত্তের একপ্রাণতা জাগাইতে জাকাতের অনুষ্ঠান। হজ যাত্রার উদ্দেশ্য পয়গম্বরের জীবনের সঙ্গে নিজ জীবনের ভাবনার মিলন ও বিশ্বের সকল মুসলমানের সঙ্গে সৎসঙ্গ লাভে জীবন পবিত্র করা। এসকল অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার চিত্ত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে তিনিই গুপ্তমার্গে প্রবেশের যোগ্য হন।

ভাগবত-সন্দর্ভে জীবগোস্বামী বলেন, ভক্তি

দ্বিবিধা—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রোক্ত বিধিতে প্রবর্তকের ভক্তি বৈধী। উহা একাদশবিধ—শরণাপত্তি গুরুসেবা শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য এবং আত্মনিবেদন। ইহার মধ্যে বন্দন দাস্য ও আত্মনিবেদন-এর সঙ্গে নমাজের তুলনা চলে। শ্রবণ কীর্তন স্মরণ-এর সঙ্গে রোজার কতকটা তুলনা চলে। রোজার মধ্যে কোন কোন দিন আছে, বিশেষভাবে কোরান পাঠ ও ঈশ্বর স্মরণে থাকিতে হয়। ইসলামের জেকের সঙ্গে বৈষ্ণবের স্মরণাঙ্গ ভক্তি তুলনীয়। বৈষ্ণব ভক্তের নামজপের মত ইসলামে তবজী জপ আছে।

এই পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন—কলমা নমাজ রোজা হজ ও জাকাত অনুশীলন করিয়া সুফী খোদার দিকে প্রথম উন্মুখ হন। এই বহিরঙ্গ সাধনকে বলে শরিয়তের শাসন।

শরিয়তের পরবর্তী স্তর তরিকত। এই স্তরে সুফী পীর বা মহাপুরুষের সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সাহায্যকারী পীরই মুর্শিদ বা গুরু। সুফী মুর্শিদকে ভালবাসিবেন এবং অবিচারে মুর্শিদের আজ্ঞা পালন করিবেন। বৈষ্ণবদের গুরুসেবা ও পাদসেবন ইহার অনুরূপ। শিষ্য যখন গুরুর আজ্ঞা পালনদ্বারা তাঁহার তুষ্টি বিধান করেন তখনই শিষ্য সুফী নামের যোগ্য হন।

বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে প্রেমলাভের স্তরগুলি এইরূপ: শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ ভজনক্রিয়া অনর্থনিবৃত্তি নিষ্ঠা রুচি আসক্তি ভাব—প্রেম। এই স্তরগুলির সহিত সুফীগণের সাধনস্তরের সাদৃশ্য আছে। প্রথম স্তর শ্রদ্ধা—শরিয়তের তুল্য।

দ্বিতীয় স্তর সাধুসঙ্গ—তরিকতের সমান। তরিকতের পর তৃতীয় স্তর মারেফাত। এই স্তরে আধ্যাত্মিক আলোকের উদয় হয়। তখন সাধক খোদাতালার প্রসঙ্গ লইয়া ডুবিয়া থাকে। 'আন কথা' 'আন চিন্তা' ভাল লাগে না। এই স্তর বৈষ্ণবাচার্যদের নিষ্ঠা ও রুচির সহিত তুলনীয়। এই স্তরে সুফীকে শরিয়তের প্রতি উদাসীন মনে হয়। নিয়মিত রোজা নমাজ সে আর করে না। বিধিমার্গ দূরে পড়িয়া থাকে। ভগবানের নাম ও কথা এত মধুময় মনে হয় যে আর কিছুতেই মন নিবিষ্ট হইতে চায় না।

সর্বোচ্চ স্তর হকিকত। এই স্তরে সত্যের উপলব্ধি হয়। সত্য দর্শন হয়। এই স্তরে নিজ চেষ্টায় পৌঁছান যায় না। খোদাতালার অনুগ্রহ ছাড়া এই স্তরে পৌঁছান অসম্ভব। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'— পরমাত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া বরণ করেন, তিনিই পরমাত্মাকে লাভ করেন। সুফী অগ্রসর হইয়া যায়, খোদাতালা তাহার নিকট নামিয়া আসেন। ইহা বৈষ্ণবাচার্যগণের আসক্তির স্তর। ঈশ্বরাসক্তি হইলেই ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ হয়। বিষয়ীর যেমন বিষয়াসক্তি, ভক্তের সেইরূপ কৃষ্ণাসক্তি, সুফীর সেইরূপ খোদাপ্রীতি। এই গভীর প্রীতির ভূমিতেই খোদাতালা সুফীর হৃদয়ে অবতরণ করেন। হজরত বলেন, যাঁহারা খোদাকে একান্তভাবে অনুসন্ধান করেন, খোদা তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে টানিয়া লন। তখন তাঁহারা খোদা-প্রেমিক হন। বৈষ্ণব সাধক শ্রদ্ধা আদি আটটি স্তর পার হইয়া প্রেম লাভ করেন। সুফীও শরিয়ত তরিকত মারেফাত ও হকিকত এই মঞ্জিলগুলি পার হইয়া খোদাতালার নির্মল প্রেমময় লোকে উপনীত হন।

গোঁড়া মুসলমান শরিয়ত পালন করিয়াই তৃপ্ত হন। কলমা নমাজ রোজা জাকাত ও হজ দ্বারাই সাধ্য লাভ হইবে, বিশ্বাস করেন। সুফীগণ মনে করেন, ঈশ্বর বা খোদার প্রতি প্রেম ব্যতীত কোন অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হইলেই চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সকল কার্যই শুভদ। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সকল অনুষ্ঠানই ব্যর্থ।

সুফীগণ খোদাকে ভালবাসেন, আর খোদার সৃষ্ট জীবকে ভালবাসেন। 'নামে রুচি জীবে দয়া'। সাধারণ মুসলমান খোদাকে বিশ্বাস করেন আর সৃষ্ট জগতের প্রতি উদাসীন থাকেন।

সুফী ভাবতন্ময়তায় খোদার দর্শন লাভ করেন। প্রেমিক প্রেমে কৃষ্ণদর্শন লাভ করেন। সাধারণ হিন্দু বা মুসলমান ইহা কল্পনাও করিতে পারে না।

হিন্দুধর্মে ও খৃষ্টানধর্মে অনেক সাধক আছেন যাঁহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য কৃচ্ছ্র সাধন করেন। সুফীগণ কৃচ্ছ্র সাধনায় বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা জানেন খোদার প্রেমে মশগুল থাকাই একমাত্র তপস্যা।

প্রায় সকল ধর্মের সাধকদেরই দেহের প্রতি উপেক্ষা দেখা যায়। দেহধর্মকে উপেক্ষা করিলে আত্মিক উন্নতি হইবে, ইহা অনেক সাধকেরই বিশ্বাস। কিন্তু সুফী সাধক দেহকে উপেক্ষা করেন না। সুফীগণ বাহ্যিক জাঁকজমককে উপেক্ষা করেন বটে, কিন্তু আহারে বিহারে দেহের উপর অত্যাচার করেন না।

বৈষ্ণবাচার্যগণের ভাবনায় কৃষ্ণপ্রাণা গোপীগণ দেহধর্ম উপেক্ষা করেন না। তাঁহারা দেহকে কৃষ্ণসেবার অঙ্গ মনে করেন। 'যদ্যপি দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহপ্রীত, সেইতো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত।' প্রেমিক নিজের দেহকে কৃষ্ণসেবার উপকরণ ভাবিয়া যত্ন করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইসলামধর্মে বৈরাগ্য নাই, সুতরাং সন্ন্যাস নাই। সুফীদেরও সন্ন্যাস নাই। সুফী সাধক কখনও পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন না।

পুনর্জন্ম সম্পর্কে হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের ধারণার কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুফীগণ পূর্বজন্ম পরজন্ম মানেন না। মানুষের এই একটি মাত্র জন্ম এবং সকল মানুষেরই পাপপুণ্যের বিচার এক কেয়ামতের দিনে হইবে।

হিন্দুধর্ম অবতারে বিশ্বাস করে। ভগবান যুগে যুগে আসেন। স্বয়ং ভগবান মানুষ হইয়া আসেন। সুফীবাদ ইহা মানে না। সুফীগণ খোদাতালার ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস করেন, কিন্তু অবতরণ স্বীকার করেন না। অবতার হইয়া ভূমিতে আসিলে ভূমা ছোট হইয়া যান, ইহাই তাঁহাদের ধারণা।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছেন, প্রেমের ঠাকুর হইয়া নরলীলা করিতেছেন, এই বিশ্বাসে শ্রীকৃষ্ণকে আপনজন করিয়া পাইবার ফলে বৈষ্ণব সাধকের কৃষ্ণানুরাগ গভীরতম স্তরে পৌঁছায় :

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

এই মান প্রণয় বা ভাব মহাভাবের অনুভূতি সুফীসাধকগণ লাভ করিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। সমগ্র বিশ্ব সংসারটাই ব্রহ্মময়—অর্থাৎ সর্বেশ্বরবাদ ইসলাম স্বীকার করেন না। সুফীসাধকগণও করেন না। বৈষ্ণবাচার্যগণ ঐরূপ বিশ্বাস করায় তাঁহারা অন্তরেও কৃষ্ণদর্শন করেন, আবার 'যাঁহা যাঁহা নেত্রে পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্তি'-ও হয়। এই ধরনের অনুভব সুফীসাধকের হয় কিনা বলা যায় না। সুফীধর্ম প্রেমধর্ম। সুফীদের দৈনন্দিন সাধনা প্রেমপূর্ণ। তাঁহাদের সাধনার কয়েকটি অঙ্গ বলা যাইতেছে :

১। তওবা— খোদা ভিন্ন আর সকল বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লওয়া। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ-ভিন্ন তৃষ্ণা ত্যাগ।

২। এখলাম— সর্বদা খোদার ধ্যানে ডুবিয়া থাকা। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণনিষ্ঠা—'স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ'।

৩। ইশকে খোদা— খোদার অনুরাগে সর্বতোভাবে আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া।

৪। তাওয়াবকুল— সর্বদা সকল অবস্থায়

একমাত্র খোদাই রক্ষাকর্তা, এই বিশ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা। বৈষ্ণবাচার্যদের 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।'

৫। জেকের— সর্বদা তাঁহার স্মরণে থাকা। স্মরণে স্থির থাকার জন্য জপ। কখনও উচ্চৈঃস্বরে জপ—জেকের জলি, কখনও নীরবে জপ— জেকের খাফী। সুফীদের প্রধান জপমন্ত্র : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আর কেহ উপাস্য নাই আল্লা ব্যতীত।

৬। কাশফ— খোদাতালার নূর বা জ্যোতির দর্শন।

৭। সবর— সহস্র আঘাতেও ধৈর্যচ্যুতি না হওয়া। যাহাই ঘটুক সুফী সাধক খোদার দিকেই উন্মুখ থাকেন, কৃপা নিশ্চয়ই আসিবে, এই বিশ্বাসে। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে'—বৈষ্ণবাচার্যদের অনুরূপ কথা।

৮। কৃতজ্ঞতা*—ইসলামের ইমানই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতার জ্ঞাপক। ভাল-মন্দ সুখদুঃখ যাহা কিছু সবই খোদার দান। ইহা অনুভব করিয়া সকল কর্মের মাধ্যমেই খোদার সুখবিধান।

৯। আত্মদর্শন*—আপনাকে সম্পূর্ণভাবে খোদার নিকটে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া। আত্মনিক্ষেপ। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার চরণে অর্পণ করা। 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।'

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বুঝা গেল - সুফীর পথ আর বৈষ্ণবের রাগানুগা পথ একই উপাদানে তৈয়ারী ও একই লক্ষ্যাভিসারী। অথচ বৈষ্ণব-ধর্ম সুফীদের উপর কোনও দিন কোন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে- ইতিহাসে ইহার নজির নাই।

একজন শ্রেষ্ঠ সুফী মনসুর আলি সত্যের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করিয়া বলিয়াছিলেন : 'আনাল হক'— আমিই সত্য— I am the truth. এইজন্য গোঁড়া মুসলমানরা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল— কাটা মুণ্ডটি মাটিতে পড়িয়াও বলিয়াছিল : 'আনাল হক।' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে মনে করেন সুফীবাদে অদ্বৈতবেদান্তের প্রভাব প্রবল। কিন্তু একথা ইতিহাস দ্বারা প্রমাণ করা কঠিন।

সুফীবাদ গ্রীক দর্শনের প্রভাবে জন্মিয়াছে, Neoplatonist-দের প্রভাবে হইয়াছে, এইরূপ বহু মত আছে। এই সকল কথা প্রমাণ করা কঠিন। সুফীবাদ ইসলাম হইতেই উদ্ভূত—বলাই দুষ্কর।

শ্রীভগবানের সঙ্গে সকল জীবের প্রীতিরসের সম্বন্ধ যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত জাতিধর্ম-নির্বিশেষে নরচিত্তের গভীরানুভূতির অভিব্যক্তিতেই তাহা সুস্পষ্ট। এই সত্যই সুফীধর্ম ও ভাগবত-ধর্মের সাদৃশ্যের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রমাণীকৃত হইল। খৃষ্টধর্মের Mysticismও এই সত্যের সাক্ষ্য বহন করে। ভাগবত-ধর্ম শ্রীভগবান ও জীবের স্বাভাবিক প্রীতিরসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা সকল মানবের শাশ্বত ধর্ম। এই প্রেমের ধর্ম জয়যুক্ত হউক।

* সাতটি সংস্কৃতেতর শব্দের পর দুইটি সংস্কৃত শব্দ কেন ব্যবহৃত হইল তাহা পরিষ্কার নহে।—সঃ

আলম বিথ্‌বানদ হরদম নাম ই পাক।
ইন আমল না কুনদ চুন না বুদ ইশ্‌ক্‌-নাক॥

—মসনবী, ৬।৪০৩৮

—জগতের মানুষ সতত ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় না, কারণ সে উচ্চারণ প্রেমপূর্ণ নহে।

ভারত-সাবিত্রী

শিবদাস

বহুবিধ উপাখ্যান ইতিকথাদি সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণের জীবনেতিহাস বিশালকায় মহাভারত রচনা করে সর্বশেষে ব্যাসদেব 'ভারত-সাবিত্রী' নামে চারটি শ্লোক রচনা করেছেন। 'ভারত' অর্থে এখানে মহাভারত ; 'সাবিত্রী' শব্দের অর্থ 'গায়ত্রী' —যে মন্ত্র যুগ যুগ ধরে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় ভারতগগন মুখরিত করে আসছে, ভারতের অগণিত হৃদয়কে ভগবদ্‌ভাবে ভরিয়ে তুলছে। এই শ্লোক চারটিকে 'সংহিতা'ও বলা হয়েছে। এই শ্লোকগুলির পূর্বের শ্লোকেই রয়েছে, 'ব্যাসদেব এই চারটি শ্লোকবিশিষ্ট সংহিতা রচনা করে নিজ পুত্র শুকদেবকে তা শিখিয়েছিলেন।' সংহিতা শব্দের অর্থ, যাতে বিষয়সমূহ সংহিত বা মিলিত। 'ভারত-সাবিত্রী'র অর্থ, এদিক থেকে, সমগ্র মহাভারতের সারকথা ; এত বিশাল গ্রন্থে, এত উপাখ্যান ইতিহাসাদির মাধ্যমে ব্যাসদেব কি বলতে চেয়েছেন, কোন্ কথাটি মানুষের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছেন, তাই-ই যেন প্রকাশ করছেন 'ভারত-সাবিত্রী'র চারটি শ্লোকে। অন্যদিক থেকে, 'গায়ত্রী' অর্থে, একে ভারতবর্ষেরই প্রাণবাণী বলা যায়—যা মনে করিয়ে দেয় নবযুগের ঋষি স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠনিঃসৃত মন্ত্র 'ধর্মই আমাদের জাতির প্রাণ।'

'ভারত-সাবিত্রী'র ছন্দোবদ্ধ ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

(দেহ হতে দেহান্তর করিয়া গ্রহণ
জীবগণ এ সংসারে করিছে ভ্রমণ।
প্রতি জন্মে প্রতি দেহে জীবন ভুঞ্জিয়া
অপর জীবনে যায় নবদেহ নিয়া।
নব নব মাতা পিতা পুত্রাদি স্বজনে
পাইয়াছি মোরা সবে প্রত্যেক জীবনে।)
এভাবে পেয়েছি বহু সহস্র পিতায়,
সহস্র মাতায়, কত পুত্র ও জায়ায়
তাহাদের সঙ্গসুখ অনুভব করি
ছাড়ি এক, ধরিয়াছি অন্য দেহ-তরী।
এ-জীবনও সেইরূপ ভুঞ্জিয়া আবার
কেহ গেছে, অন্যে যাবে জীবনের পার।

অশ্রু-হাসি-ভরা শত ঘটনার রাশি
প্রতি জীবনেরই মাঝে ভিড় করে আসি।
হর্ষ-শোকান্বিত তাহে হয় মূঢ় যারা,
জ্ঞানিগণ নাহি হন তাহে আত্মহারা—
জীবনের হর্ষ-ভয় পারে না পশিতে
জ্ঞানীদের অনাসক্ত শুদ্ধ শান্ত চিতে।

জীবনে যা চাও তুমি, অর্থ কাম আদি
সবই পাবে, ধর্মপথ ধরি চল যদি—
ঊর্ধ্বে তুলি দুই বাহু একথা সবারে
কহিতেছি উচ্চকণ্ঠে ডাকি বারে বারে ;
তবু লোকে একথা যে শুনিতে না চায়!
কেন সবে ধর্মপথ ধরি নাহি যায়!

(নব নব দেহরথে করি আরোহণ
জন্ম-জন্মান্তর যিনি করেন ভ্রমণ
নব নব জীবনেতে সুখে-দুখে ভরা,
আমরা সবাই তাই—জীব সবে মোরা।)
জীবন বিনষ্ট হয়, সুখ-দুখও যায়,
জীবনের হেতু দেহ-আদিও না রয় ;
এ সবই অনিত্য। কিন্তু আমরা অমর—
জীব নিত্য ; ধর্ম নিত্য, নহে বিনশ্বর।
তাই কামবশে, কিংবা ভয়ে, প্রলোভনে,
জীবনরক্ষারও তরে—কোনও কারণে
ধর্মপথ ছাড়িও না· ছেড়ো না ধর্মেরে—
অনিত্যের তরে ত্যাগ কোরো না নিত্যেরে।

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

শ্রীমতী আশা রায়

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মূল উৎস বৈদিক সাহিত্য। এর সংকলন কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—৬০০ অব্দ। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগেও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হলেও, মুখ্যতঃ উপনিষদসমূহেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের সংখ্যা অনেক, তন্মধ্যে একাদশটি প্রধান— যথা, ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয় ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর। উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা অনুভূতিভিত্তিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বনিচয়। জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভেদ, অজ্ঞানতাবশতই ভেদজ্ঞান হয়। ব্রহ্ম ও আত্মা একার্থবাচক, আত্মজ্ঞান লাভ হলেই জীব ব্রহ্ম বা মোক্ষ লাভ করে। এই লাভ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নয়- প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি। জীবের স্বরূপ-বিস্মৃতি দূর হলেই মোক্ষলাভ।

উপনিষদ-সাগর মন্থন করে যে অমৃত উত্থিত হয়েছে, তাই ভগবদ্গীতোপনিষদ অর্থাৎ গীতা। গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র— বেদান্তের তিনটি শাখা। বিভিন্নকালে সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্যগণ ও বহু বিদগ্ধব্যক্তি নিজ নিজ মতানুযায়ী গীতার বহু ভাষ্য-টীকা রচনা করে গেছেন। গীতা মহাভারতের অংশ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে আত্মীয়-স্বজন হত্যায় অনিচ্ছুক হতোৎসাহ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও যুক্তি সহায়ে যুদ্ধে প্রবুদ্ধ করতে যে সকল অমূল্য উপদেশ দেন, তাই গীতা। এর আঠারোটি অধ্যায়। গীতার উপদেশ— কর্মের দ্বারাই ঈশ্বরোপাসনা ক'রে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে, জ্ঞানলাভের জন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। গীতার বৈশিষ্ট্য— কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়। গীতা হিন্দুদের সার্বজনীন সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ।

উপনিষদে সৃষ্টির যে রহস্য উদ্ঘাটিত, ষড়্দর্শন ছয়টি পৃথক্ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাকেই যুক্তি-প্রমাণ বিতর্ক-বিচারের দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করেছে। অধ্যাত্ম-চিন্তা বিকাশের বলিষ্ঠতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাহিত্য-সৃষ্টির অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে হিন্দুদের এই ষড়্দর্শনরূপী মোক্ষশাস্ত্রে। ধারাবাহিকতার* সৌকর্যে উল্লেখ করা যেতে পারে, ন্যায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম বা অক্ষপাদ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫৫০), পূর্বমীমাংসাদর্শন-প্রণেতা জৈমিনি (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০—২০০), সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা কপিল (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী), বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা কণাদ (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী) এবং যোগদর্শন-প্রণেতা পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী)। বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসাদর্শন-প্রণেতা বাদরায়ণ বা ব্যাসদেবের কাল খ্রীঃ পূঃ ১২০০—১৪০০ বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন; কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন তাঁর কাল খ্রীঃ পূঃ ৫০০ হতে খ্রীষ্টোত্তর ২০০। ব্যাসদেব চারিবেদ সংকলন মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণ ও পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যও রচনা করেছেন বলে প্রচলিত মত, কিন্তু বিভিন্নকালে এগুলি রচিত হওয়ায় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ব্যাস বলে কোনও অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি থাকায়

---

* ষড়্দর্শনকারগণের কাল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে।—সঃ

'ব্যাস'-শব্দটি একটি উপাধিতে পরিণত হয়েছিল বা নিজেদের কৃতিকে জনপ্রিয় করবার জন্য ব্যাসের নাম নিয়ে একাধিক ব্যক্তি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

বেদান্ত-দর্শন অন্য পাঁচখানা দর্শনের বিভিন্ন যুক্তিধারায় প্রতিষ্ঠিত মতসমূহের খণ্ডন-মণ্ডন ক'রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এটি হিন্দুর পরম গৌরবের ধন। এই বেদান্ত-দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাকাশে শঙ্কর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় চির-দীপ্যমান। আচার্য শঙ্কর উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ক'রে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর বেদান্তভাষ্য রচনার পর পূর্বরচিত অপর ভাষ্যসকল অনাদৃত ও ক্রমলুপ্ত হয়ে যায়।

শঙ্কর নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশে কেরল দেশের (মালাবার) কালাডি নামক স্থানে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম বিশিষ্টা দেবী। তিনি অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন। শৈশবকাল হতেই তিনি শ্রুতিধরত্ব ও অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় দেন। তিনি আচার্য গৌড়পাদশিষ্য আচার্য গোবিন্দপাদের শিষ্য ছিলেন। শঙ্কর আট বছর বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আট থেকে বারো বছর পর্যন্ত তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কাল। তারপর চার বছর তিনি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লেখেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ষোল বছর সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ক'রে অদ্বৈতবাদ আসমুদ্রহিমাচলে প্রচার করেন। তিনি ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে চারটি মঠ ও দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ভারতের এই গৌরবরবি হিমালয়ের কেদারধামে † অস্তমিত হন, কিন্তু প্রায় বারোশ বছর পরেও সে দীপ্তসূর্যের ভাতি ভারত-গগনকে ভাস্বর ক'রে রেখেছে।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ (নবম শতাব্দী), রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (একাদশ শতাব্দী), নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (একাদশ শতাব্দী), বেদান্ত-দর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নিম্বার্ক নিয়মানন্দ বা নিম্বাদিত্যের জীবনী সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। তিনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ-বংশে একাদশ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম জয়ন্তী বা সরস্বতী, পিতার নাম অরুণ বা জগন্নাথ। তিনি বৃন্দাবনে বাস করতেন। নিম্ববৃক্ষের উপর একটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেবার পর তাঁর নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য হয়। তিনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তার নাম 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ'। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন তিনি একাদশ শতাব্দীর পূর্বের লোক এবং নারদ ঋষির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং তাতে শঙ্করপ্রমুখ আচার্যদের মত খণ্ডনের প্রয়াস নেই; এথেকেই বোধ হয়, পণ্ডিতগণের ধারণা যে, শঙ্করের পূর্বে যে সকল বেদান্তভাষ্য প্রচলিত ছিল শুধু তা থেকেই তিনি নিজ ভাষ্য রচনায় সাহায্য পেয়েছিলেন এবং সেজন্য তিনি শঙ্করের পূর্ববর্তী— যদি তিনি শঙ্করের পরবর্তী হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই শঙ্কর-মতের খণ্ডন করতেন।

রামানুজাচার্য মাদ্রাজের নিকট শ্রীপেরুমবুদুরে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং শ্রীরঙ্গমেই তিনি অধিকাংশ কাল বাস করেন। তিনি বৈষ্ণব

† শঙ্করের দেহত্যাগের স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।—সঃ

মতানুযায়ী বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য রচনা করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বেদান্তসূত্রের উপর তাঁর ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য'।

রামানুজের গ্রন্থাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন মধ্বাচার্য বা আনন্দতীর্থ। ইনি ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কানাড়ায় এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাঙ্গালোরের নিকট উদীপিতে কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেদান্ত গীতা উপনিষদ প্রভৃতির ভাষ্য রচনা ক'রে দ্বৈতবাদ প্রচার করেন।

এছাড়া ভাস্কর (নবম শতাব্দী), যাদব প্রকাশ (একাদশ শতাব্দী), কেশব (ত্রয়োদশ শতাব্দী), নীলকণ্ঠ (চতুর্দশ শতাব্দী), বল্লভ (পঞ্চদশ শতাব্দী), বিজ্ঞান ভিক্ষু (ষোড়শ শতাব্দী) এবং বলদেব (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রভৃতি আচার্যগণ টীকাভাষ্যাদি রচনা ক'রে নিজ নিজ মত প্রকাশে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন।

রামানুজ মধ্ব রামানন্দ নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্যগণ ভক্তিধর্মের প্রবর্তন করেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্যগণ প্রাক্-আর্য দ্রাবিড় সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রাবিড় ধর্ম-মতের জন্মান্তরবাদ, কাব্যের প্রচলন, ভক্তিবাদ, শৈবধর্ম, সন্ন্যাস ও যোগচর্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বৈদান্তিক শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রবর্তনের প্রেরণা পান গৌড়পাদের কাছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, গৌড়পাদ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের শূন্যবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সেরূপ রামানুজ সম্ভবতঃ প্রেরণা পান তামিলি আলোয়ারদের কাছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, প্রাচীন আলোয়ারদের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। তাঁদের রচিত বিষ্ণুস্তোত্র ও সঙ্গীতগুলি বৈষ্ণব ভক্ত নাথমুনি কর্তৃক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সংকলিত হয়। এটি লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগে ভক্তি-ধর্মের প্রবর্তন প্রসার ও প্রতিষ্ঠা যাঁরা করলেন অর্থাৎ রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক প্রভৃতির অনেকেই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী।

ভক্তিধর্ম অবলম্বন করে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব প্রমুখ আচার্য-গণের পর জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য কবীর নানক তুলসীদাস মীরাবাঈ তুকারাম সুরদাস দাদু প্রভৃতির আবির্ভাব।

ভগবান শ্রীচৈতন্য, চিতোরের কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈ, বারাণসীর রামভক্ত তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তির বন্যায় দেশকে প্লাবিত করে দিলেন, তাঁদের লোকোত্তর জীবনের মাধুর্য, পদাবলী ভজন দোহা ভারতবাসীর চিত্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করল। ভক্তিবাদের—বৈষ্ণব সাহিত্যের সুধাক্ষরী রসসাহিত্য ভারতে নব বসন্তের সঞ্চারণ এনে দিল।

ইংরাজ আগমন ও শাসনের কালে ঊনবিংশ শতকে যখন রক্ষণশীল হিন্দু সনাতনপন্থীদের কঠোর বিধি-নিষেধের বন্ধন-মুক্ত হতে ভারতবাসীর বিদেশী ধর্ম আশ্রয়ের প্রবণতা দেখা দিল তখন রাজা রামমোহনের হল আবির্ভাব। জাতির পথ-নির্দেশে হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদান্তের শিক্ষাই ভারতবাসীর নিকট নতুন করে তুলে ধরলেন তিনি। সে শিক্ষার আলোকবর্তিকা ধারণ করে একে একে অগ্রসর হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম আচার্যগণ। আর্যসমাজের দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দের আবির্ভাব হল। এলেন শ্রীঅরবিন্দ।

আর একদিকে ভাগীরথীর পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরের দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে দেখা দিলেন মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ— জগতের সবাই একই

'ব্যাস'-শব্দটি একটি উপাধিতে পরিণত হয়েছিল বা নিজেদের কৃতিকে জনপ্রিয় করবার জন্য ব্যাসের নাম নিয়ে একাধিক ব্যক্তি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

বেদান্ত-দর্শন অন্য পাঁচখানা দর্শনের বিভিন্ন যুক্তিধারায় প্রতিষ্ঠিত মতসমূহের খণ্ডন-মণ্ডন ক'রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এটি হিন্দুর পরম গৌরবের ধন। এই বেদান্ত-দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাকাশে শঙ্কর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় চির-দীপ্যমান। আচার্য শঙ্কর উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ক'রে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর বেদান্তভাষ্য রচনার পর পূর্বরচিত অপর ভাষ্যসকল অনাদৃত ও ক্রমলুপ্ত হয়ে যায়।

শঙ্কর নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণবংশে কেরল দেশের (মালাবার) কালাডি নামক স্থানে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শিবগুরু ও মাতার নাম বিশিষ্টা দেবী। তিনি অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন। শৈশবকাল হতেই তিনি শ্রুতিধরত্ব ও অসাধারণ ধী-শক্তির পরিচয় দেন। তিনি আচার্য গৌড়পাদশিষ্য আচার্য গোবিন্দপাদের শিষ্য ছিলেন। শঙ্কর আট বছর বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আট থেকে বারো বছর পর্যন্ত তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কাল। তারপর চার বছর তিনি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য লেখেন এবং জীবনের অবশিষ্ট ষোল বছর সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ক'রে অদ্বৈতবাদ আসমুদ্রহিমাচলে প্রচার করেন। তিনি ভারতের পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে চারটি মঠ ও দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ভারতের এই গৌরবরবি হিমালয়ের কেদারধামে † অস্তমিত হন, কিন্তু প্রায় বারোশ বছর পরেও সে দীপ্তসূর্যের ভাতি ভারত-গগনকে ভাস্বর ক'রে রেখেছে।

শঙ্করের অদ্বৈতবাদ (নবম শতাব্দী), রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (একাদশ শতাব্দী), নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (একাদশ শতাব্দী), বেদান্ত-দর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

নিম্বার্ক নিয়মানন্দ বা নিম্বাদিত্যের জীবনী সম্বন্ধে অল্পই জানা যায়। তিনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ-বংশে একাদশ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম জয়ন্তী বা সরস্বতী, পিতার নাম অরুণ বা জগন্নাথ। তিনি বৃন্দাবনে বাস করতেন। নিম্ববৃক্ষের উপর একটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেবার পর তাঁর নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য হয়। তিনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন তার নাম 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ'। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন তিনি একাদশ শতাব্দীর পূর্বের লোক এবং নারদ ঋষির নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং তাতে শঙ্করপ্রমুখ আচার্যদের মত খণ্ডনের প্রয়াস নেই; এথেকেই বোধ হয়, পণ্ডিতগণের ধারণা যে, শঙ্করের পূর্বে যে সকল বেদান্তভাষ্য প্রচলিত ছিল শুধু তা থেকেই তিনি নিজ ভাষ্য রচনায় সাহায্য পেয়েছিলেন এবং সেজন্য তিনি শঙ্করের পূর্ববর্তী— যদি তিনি শঙ্করের পরবর্তী হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই শঙ্কর-মতের খণ্ডন করতেন।

রামানুজাচার্য মাদ্রাজের নিকট শ্রীপেরুমবুদুরে ১০২৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং শ্রীরঙ্গমেই তিনি অধিকাংশ কাল বাস করেন। তিনি বৈষ্ণব

† শঙ্করের দেহত্যাগের স্থান ও কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।—সঃ

মতানুযায়ী বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বেদান্তসূত্রের উপর তাঁর ভাষ্যের নাম 'শ্রীভাষ্য'।

রামানুজের গ্রন্থাবলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন মধ্বাচার্য বা আনন্দতীর্থ। ইনি ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ কানাডায় এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই বৈদিক শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাঙ্গালোরের নিকট উডীপিতে কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেদান্ত গীতা উপনিষদ প্রভৃতির ভাষ্য রচনা ক'রে দ্বৈতবাদ প্রচার করেন।

এছাড়া ভাস্কর (নবম শতাব্দী), যাদব প্রকাশ (একাদশ শতাব্দী), কেশব (ত্রয়োদশ শতাব্দী), নীলকণ্ঠ (চতুর্দশ শতাব্দী), বল্লভ (পঞ্চদশ শতাব্দী), বিজ্ঞান ভিক্ষু (ষোড়শ শতাব্দী) এবং বলদেব (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রভৃতি আচার্যগণ টীকাভাষ্যাদি রচনা ক'রে নিজ নিজ মত প্রকাশে ভারতের আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে গেছেন।

রামানুজ মধ্ব রামানন্দ নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্যগণ ভক্তিধর্মের প্রবর্তন করেন। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্যগণ প্রাক্-আর্য দ্রাবিড় সভ্যতায় প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রাবিড় ধর্ম-মতের জন্মান্তরবাদ, কাব্যের প্রচলন, ভক্তিবাদ, শৈবধর্ম, সন্ন্যাস ও যোগচর্যায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের পর হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বৈদান্তিক শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রবর্তনের প্রেরণা পান গৌড়পাদের কাছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, গৌড়পাদ বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের শূন্যবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সেরূপ রামানুজ সম্ভবতঃ প্রেরণা পান তামিলি আলোয়ারদের কাছে। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন, প্রাচীন আলোয়ারদের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। তাঁদের রচিত বিষ্ণুস্তোত্র ও সঙ্গীতগুলি বৈষ্ণব ভক্ত নাথমুনি কর্তৃক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সংকলিত হয়। এটি লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগে ভক্তিধর্মের প্রবর্তন প্রসার ও প্রতিষ্ঠা যাঁরা করলেন অর্থাৎ রামানুজ মধ্ব নিম্বার্ক প্রভৃতির অনেকেই দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী।

ভক্তিধর্ম অবলম্বন করে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব প্রমুখ আচার্যগণের পর জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্য কবীর নানক তুলসীদাস মীরাবাঈ তুকারাম সুরদাস দাদু প্রভৃতির আবির্ভাব।

ভগবান শ্রীচৈতন্য, চিতোরের কৃষ্ণপ্রাণা মীরাবাঈ, বারাণসীর রামভক্ত তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তির বন্যায় দেশকে প্লাবিত করে দিলেন, তাঁদের লোকোত্তর জীবনের মাধুর্য, পদাবলী ভজন দোঁহা ভারতবাসীর চিত্তকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করল। ভক্তিবাদের—বৈষ্ণব সাহিত্যের সুধাক্ষরী রসসাহিত্য ভারতে নব বসন্তের সঞ্চারণ এনে দিল।

ইংরাজ আগমন ও শাসনের কালে ঊনবিংশ শতকে যখন রক্ষণশীল হিন্দু সনাতন পন্থীদের কঠোর বিধি-নিষেধের বন্ধন-মুক্ত হতে ভারতবাসীর বিদেশী ধর্ম আশ্রয়ের প্রবণতা দেখা দিল তখন রাজা রামমোহনের হল আবির্ভাব। জাতির পথনির্দেশে হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদান্তের শিক্ষাই ভারতবাসীর নিকট নতুন করে তুলে ধরলেন তিনি। সে শিক্ষার আলোকবর্তিকা ধারণ করে একে একে অগ্রসর হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম আচার্যগণ। আর্যসমাজের দয়ানন্দ, শ্রদ্ধানন্দের আবির্ভাব হল। এলেন শ্রীঅরবিন্দ।

আর একদিকে ভাগীরথীর পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বরের দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করে দেখা দিলেন মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ—জগতের সবাই একই

মায়ের সন্তান, জীবই শিব, সর্ব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ— এই মন্ত্রনিচয়ের উদ্গাতা, ভারতের কালজয়ী আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের নূতন দিশারী। তারপর জীবনের মহাজিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁরই পদপ্রান্তে উপস্থিত হলেন নরেন্দ্রনাথ উত্তর-কালের জগদ্‌বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে (১৮৯৩) চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ভারতের বেদান্ত-তূর্যের উদাত্ত নিনাদে জগতকে বিস্মিত বিমোহিত আলোড়িত ক'রে অবজ্ঞাত হিন্দুধর্মকে নব-গরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলেন ভারত তথা বিশ্বের গৌরব বেদান্ত-কেশরী স্বামী বিবেকানন্দ।

ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ মহান পুরুষদের জীবন বাণী ও রচনা সম্বন্ধে অতি সামান্য আলোচনাই করতে পেরেছি এই স্বল্প-পরিসর নিবন্ধে। স্থানাভাবে প্রসিদ্ধ আরও অনেকের জীবন-কথা বা কৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। আবার নীরবে যাঁরা জীবন-চর্যার দ্বারা ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলে গেছেন— ইতিহাসে যাঁদের নাম নেই, তাঁদের সংখ্যা গণনার অতীত, কারণ ভারত ধর্মভূমি এবং স্মরণাতীত কাল হতে যুগে যুগে এদেশে মহামানবগণের আবির্ভাব ঘটেছে। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের কথা বলা সম্ভব হয়নি। যাঁদের কথা বলা হ'ল এবং যাঁদের কথা বলা হ'ল না— সকলেরই চরণে আমার ভক্তিপ্রণতি জানাই। প্রার্থনা করি, আজকের এই সর্বতোব্যাপী নৈতিক অবক্ষয়ের দিনে ভারতবাসী আমরা সবাই যেন আমাদের চিরমহিমান্বিত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাই এবং নতুন ভারত গঠনের পথে পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হই। ভারতভাগ্যবিধাতা আমাদের সহায় হোন।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ: শিবনাথ সান্যাল। প্রকাশিকা: শ্রীমতী মিনতি সান্যাল, ৪১ সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৪; (১৯৭৪) মূল্য: চার টাকা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' পরলোকগত শিবনাথ সান্যাল মহাশয়ের প্রথম রচিত যাত্রাভিনয়োপযোগী নাটক। লেখক কলিকাতার সিকদারবাগান সঙ্গীতসমাজের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং এই জাতীয় আরও তিনটি নাটক রচনা করিয়া সবগুলিই মঞ্চস্থ করিয়াছিলেন। আলোচ্য নাটকটি বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে অভিনীত হইয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। লেখকের অকালমৃত্যুতে নাটকগুলির অভিনয় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। প্রথম নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়াতে, আশা করা যায় ইহা ব্যাপকভাবে অভিনীত হইবে। বর্তমানের নৈতিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় নাটক যতই অভিনীত হয় ততই দেশের কল্যাণ, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গতঃ পাঠকবর্গের স্মরণীয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থাদির সহিত আলোচ্য নাটকের কোন কোন স্থলে যে বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই জাতীয় যাত্রা-নাটকে ধর্তব্য ত্রুটি নহে। তবে ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রয়োজনমত সংশোধন বাঞ্ছনীয়। লেখকের 'পরিব্রাজক বিবেকানন্দ', 'শ্রীশ্রীমা' এবং 'সাধক বামাক্ষ্যাপা' নাটক তিনটিও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া ধর্মমূলক যাত্রাভিনয়ের সহায়তা করুক, ইহাই কামনা করি।

শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত

যজুর্বেদীয় তর্পণ-বিধি : পণ্ডিত সুকৃতীশ্বর ভট্টাচার্য কাব্য-সাংখ্যতীর্থ-স্মৃতিজ্যোতিবিশারদ কর্তৃক সঙ্কলিত ও শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য কাব্য-কৃত্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক : ডাঃ বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীরামনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য, ভুবনেশ্বর চতুষ্পাঠী, ৫৯/১ সি, বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫, পৃষ্ঠা ১৮; (১৩৮১) মূল্য : উল্লিখিত হয় নাই।

হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যকৃত্য পিতৃতর্পণের সকল বিধি-নিষেধই সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্র সকলের অন্বয় ও বিশদ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানের ব্যস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে অবশ্যকরণীয় এই দিকটির প্রতি মানুষ যথোচিত মনোনিবেশ করিতে পারে না। ফলে অজ্ঞতার জন্য যে কোন ভাবে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ আচরণে পিতৃতর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই পুস্তিকাটি মাত্র ১৮ পৃষ্ঠার—যে কোন ব্যস্ত মানুষেরই এইটুকু পড়িবার সময় হইবে এবং কার্যকালে ইহার সাহায্যে অনায়াসে শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র পিতৃতর্পণ করা সম্ভব হইবে।

'নিবেদনে' প্রকাশক যথার্থই বলিয়াছেন : 'যাহাতে সকলেই অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তর্পণের ক্রম ও পদ্ধতি অর্থসহযোগে সহজ ও সরল ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুদ্ধভাবে তর্পণ করিতে পারেন এই সংস্করণে তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।'

পুস্তিকাটি প্রকাশ করিয়া প্রকাশকগণ হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে ঢাকা বাগেরহাট নারায়ণগঞ্জ এবং শ্রীহট্ট কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশু-খাদ্য এবং বস্ত্রাদি পূর্বের মতই বিতরিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত কেন্দ্রগুলির চিকিৎসালয়ে চিকিৎসাও পূর্ববৎ চলিয়াছে।

রায়পুর কেন্দ্র গত জুন ও জুলাই মাসে ১৯,০০১ কেজি খাদ্যদ্রব্য, ২,৪০০ কেজি বীজ, ১,৫৩৬টি পুরাতন বস্ত্রাদি, ৫৮,০১২.০৩ টাকা এবং শ্রমিকদিগের মধ্যে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে' ৮০,৮৫৯ কেজি খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করে।

নওয়াপাড়ায় (ওড়িশা) খয়রাত্রাণ কার্য ১৮ই জুলাই পর্যন্ত চলে এবং ১০,৭০০ কেজি গম বিতরিত হয়।

ভিত্তি-স্থাপন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী গত ১৭ই জুলাই বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস হোমের অতিথি-ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

কার্যবিবরণী

অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার নরোত্তম নগরে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৭১-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ৩রা অক্টোবর ১৯৭১, প্রস্তাবিত আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রথম হোস্টেলটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং ৩রা মার্চ ১৯৭২, আসামের রাজ্যপাল শ্রীবি. কে. নেহেরু উহার উদ্বোধন করেন। ঐ দিনই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সাধারণ সম্পাদক, স্বামী চিদাত্মানন্দ দ্বিতীয় হোস্টেলটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত করেন।

বিদ্যালয়টি প্রাথমিক ও উহার কার্যক্রম ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়। মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১১১, তন্মধ্যে ২৫টি বালিকা— তাহারা নরোত্তমনগর হইতে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দেওমালীতে তাহাদের স্বতন্ত্র হোস্টেল হইতে মিনিবাসে বিদ্যালয়ে আসে। ছাত্রদের মধ্যে নক্‌টে, ওয়াঙ্কু, টংসা ও সিংপো জাতির বালক আছে। ছাত্রদের খাওয়া-থাকা-পরার ও বিদ্যাশিক্ষার আনুষঙ্গিক যাবতীয় খরচ মিশন বহন করিয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষার মাধ্যম ইংরাজী। ইংরাজীর সহিত হিন্দী, অংক, সাধারণ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

একটি বিদ্যালয় ভবন, কর্মিগণের বাসগৃহ, রুগ্ন ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ভবন, রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণ, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিটটির কাজ সম্প্রসারিত করা, আদর্শ কৃষি কেন্দ্র ও পোলট্রি স্থাপন এবং দূর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য চলচ্চিত্রাদির মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা— এইগুলি আশু প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

উৎসব

বলরাম মন্দির: গত ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা দিবসের বার্ষিকী উপলক্ষে স্বামী চিদাত্মানন্দের সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। উদ্বোধন সংগীতের পর স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের প্রারম্ভিক ভাষণের পর স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা হইতে উক্ত দিবসের ঘটনা পাঠ করিয়া

শোনান শ্রীবীরেশ্বর দত্ত। পরে স্বামী চিদাত্মানন্দ ঐ দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া ভাষণ দেন।

রথযাত্রার দিনে বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের গভীর ভাবাবেশ, আনন্দনৃত্য, কীর্তন ও রথটানার ঘটনা স্মরণে প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবারও গত ১০ই জুলাই রথযাত্রা উৎসব যথারীতি পালিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ভাইস্-প্রেসিডেন্ট স্বামী কৈলাসানন্দজী বহু ভক্তের জয়ধ্বনি ও কীর্তনের মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করিয়া রথ টানেন। ইহার কিছু পরে অন্যতম ভাইস্-প্রেসিডেন্ট স্বামী ভূতেশানন্দজী আসেন ও রথে শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। এতদুপলক্ষে প্রায় তিন সহস্র ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ১৮ই জুলাই রথের পুনর্যাত্রা উৎসবও অন্যান্যবারের ন্যায় যথারীতি পালিত হয়।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী প্রণবাত্মানন্দ** গত ৩২শে আষাঢ় রাত্রি আন্দাজ ৩'৩০ মিনিটে ৭১ বৎসর বয়সে গৌহাটি আশ্রমে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগ দেন ও ১৯৩০ সালে স্বীয় গুরুর নিকটে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি গৌহাটি ও পূর্বে কাঁথি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহা ছাড়া গড়বেতা সোনারগাঁ দিনাজপুর রেঙ্গুন ও রহড়া কেন্দ্রেও সংঘ-সেবা করেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন-এর সাহায্যে প্রচার-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ [প]রমহংসদেবের জন্মোৎসব গত ১৮ই হইতে ২১শে [মা]র্চ পর্যন্ত অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তন, কীর্তন, দরিদ্র-[না]রায়ণ-সেবা এবং ধর্মসভাধিবেশনের মাধ্যমে [উ]দ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী [আ]লোচিত হয়।

চেতলা শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ কর্তৃক গত ৮শে মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন [ব্য]াপী পূজা পাঠ ভজন কীর্তনাদির মাধ্যমে [শ্রী]শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম শুভ জন্মোৎসব [ম]হাসমারোহে পালিত হইয়াছে। ২৮শে মার্চ [স]ন্ধ্যায় স্বামী চিন্ময়ানন্দের ভাষণের পর শ্রীকার্তিক [চ]ন্দ্র দাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যলীলা গান করেন। ২৯শে প্রাতঃ হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত অখণ্ড নামকীর্তন ও পরে শ্রীমতী শেফালী সাহা ও সম্প্রদায় কর্তৃক নৌকাবিলাস লীলাকীর্তন হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়। প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩০শে সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী জিতাত্মানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তাগণ ভাষণ দেন। পরে দেবদাস ব্রহ্মচারী মহারাজ গীতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ৩১শে সন্ধ্যায় শ্রীলছমন প্রসাদ চক্রবর্তী রামায়ণ-গান করেন। ১লা এপ্রিল ভারত সরকারের সৌজন্যে "পথের বাউল" প্রদর্শিত হয় ও গীতিনাট্য সম্প্রদায় কর্তৃক "রামকৃষ্ণ সারদা" গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

কলিকাতা শ্রীসারদা সঙ্ঘ কর্তৃক বিগত এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪০তম জন্মোৎসব একডালিয়া রোডে দুর্গাপূজা-মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ২৩শে এপ্রিল মঙ্গলারতি ও স্তোত্র পাঠাদির পর সকাল ৬টা হইতে ২৭শে এপ্রিল বেলা ১১টা পর্যন্ত অখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করা হয়। এই পাঠে অগণিত মহিলাভক্ত পালা করিয়া যোগদান করেন। প্রতিদিন সকালে পূজা ও সন্ধ্যায় আরতি হয়। শেষদিন শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা হয় এবং প্রায় ৪০০ জন মহিলা বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন; দরিদ্রনারায়ণ-সেবাও হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণ ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সর্বশ্রীমতী অরুন্ধতী রায় চৌধুরী, গীতশ্রী প্রতিমা দাসগুপ্তা, ইলা গাঙ্গুলী প্রভৃতি গায়িকাগণও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরলোকে দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর মন্ত্রশিষ্য দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত ৩০.১.৭৫ তারিখে ৭০ বৎসর বয়সে অশোকগড়স্থ নিজ বাসভবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও নাম শুনিতে শুনিতে ঈপ্সিত ধামে গমন করেন।

দমদম বিমানঘাঁটির নিকট কাদিহাটী গ্রামে এক ভক্ত পরিবারে তিনি ৭ই জুন ১৯০৪ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবদ্দশাতে কয়েকবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হন। দাশরথিবাবু রামকৃষ্ণ মিশনের কলিকাতা-শাখার অনেকগুলির—বিশেষতঃ দমদমস্থ ও পরে বেলঘরিয়াস্থ স্টুডেণ্টস হোমের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিতেন। অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চা করিতেন। তাঁহার রচিত 'স্বামীজী কখন ও কেন আসিয়াছিলেন' এবং 'মহামায়া ও শক্তিপূজা' এই গ্রন্থদ্বয় তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন।

পরলোকে জিতেন্দ্রনাথ পাল

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ পাল বিগত ৩০.১.৭৫ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে চণ্ডীতলায় তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেণ্টস হোমে বাসকালীন এবং তাহার পরেও শ্রীশ্রীরাজামহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের অনেকের সঙ্গ ও কৃপালাভে তিনি ধন্য হন। যতদিন সুস্থশরীরে ছিলেন মঠ-মিশনের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী ছিলেন।

ইঁহাদের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ] ১৫ই ভাদ্র। (১৩০৬ সাল) [১৬শ সংখ্যা।]

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের অখণ্ডনীয় ফল—'অধিকার'-বিপ্লব। জ্ঞানের বিমল আলোকে মনের অন্ধকার দূর হইলে দুঃখের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে লোকে ভয় পায় না ইহা সত্য; কিন্তু জগতের সকল মনুষ্যই যে জ্ঞানলাভে অধিকারী হইবে তাহা সম্ভবপর নহে, অথচ অধিকারী না হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিতে গেলে যে অনধিকার-চর্চ্চা-নিবন্ধন বহুতর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। যে ধর্ম্মে অধিকারীর বৈলক্ষণ্যে অনুষ্ঠানের বৈলক্ষণ্য নাই ও সাত্বিক রাজসিক ও তামস-প্রকৃতি অধিকারীর পক্ষে এক ভিন্ন দুইটী পথ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে ধর্ম্ম ভারতের সকল সম্প্রদায়কে এক করিয়া এক অপার্থিব শান্তিময় সুমহান্ লক্ষ্যের দিকে কখনই পরিচালিত করিতে পারে না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের লীলাভূমি, সাম্প্রদায়িকতার বিলাসনিকেতন এই ভারতে অধিকারী-ব্যবস্থা-হীন কোন ধর্ম্মই বদ্ধমূল হইতে পারে না। এই অধিকার-শৃঙ্খলার অভাবেই বৌদ্ধধর্ম্মের সুবিশাল সাম্রাজ্য ভারত হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল। অধিকারি-ব্যবস্থারূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম, আবার নবজীবন লাভ করিতেছিল; এই ভারতীয় সমাজের ধর্ম্মনৈতিক বিশেষ ভাবটী আচার্য্য শঙ্করের হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত হয়। হিন্দুজাতির সৌভাগ্যবলে, বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের সন্ধিক্ষেত্রে আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী অথচ সর্ব্ব-হিতকারী মহাপুরুষ এই বিশাল সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বীয় অমানুষী-প্রতিভার সাহায্যে চিরদিনের জন্য পুনর্বিকাশোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা করিবার জন্য যে নূতন দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন, মায়াবাদ সেই দর্শনের একমাত্র সার। মায়াবাদের অন্তস্তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিলে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি, হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বরত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী বিরাট ভাব বুঝিতে পারা যায়। মায়াবাদ এবং বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম এই উভয়ের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, এত প্রয়োজনীয় এবং এতই বিশেষরূপে আলোচনীয় যে, মায়াবাদ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া পরিচয় দিবার স্থান এই স্বল্পাবয়ব উদ্বোধনে পর্য্যাপ্তরূপে হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি যথাসাধ্য অল্পের মধ্যে যতদূর সম্ভব তাহাই প্রদর্শন করিতে প্রযত্ন করা যাইতেছে।

* মাঘ, ১৩৮০ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; নামহীন রূপহীন সত্তাহীন অসীম শূন্যই, এই নাম ও রূপে বিভক্ত বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চের পূর্ব্বে ছিল। এজগতে প্রলয়ের পরে আবার সেই, না আলোক, না অন্ধকার, এক অচিন্ত্য অভাবময় শূন্যই অনন্তকালের জন্য থাকিবে। সৃষ্টির পূর্ব্বে বা পরে, জড় বা চৈতন্য, প্রকাশ বা অন্ধকার, কিছুই ছিল না ও থাকিবে না। এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র প্রপঞ্চ ঐন্দ্রজালিকের কুহকের ন্যায় তুচ্ছ। ইহার আদি ও অন্ত যখন শূন্য, তখন শূন্যের অন্তরে প্রবিষ্ট এই ক্ষণবিকাশি জগৎ, ধরিতে গেলে, কিছুই নহে; ইহা ভেল্কী, ইহা ছায়া-বাজি। ইহা কল্পনা-কাননের প্রতিভাস-ময় প্রসূন ছাড়া আর কিছুই নহে। এই প্রকার অচিন্ত্য অভাবনীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তই বৌদ্ধধর্ম্মের মূলভিত্তি। এই সর্ব্বশূন্যময় মহাভিত্তির উপরে স্থাপিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সংসারের তাপত্রয় হরণ করিবার জন্য যে সকল মনীষিগণ প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রযত্ন কতদূর সফল হইয়াছিল, সে বিষয়ে সমালোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে নিঃসঙ্কোচে একথা অনায়াসেই বলিতে পারা যায় যে, তাঁহারা আত্মার দুঃখ মিটাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া যে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিনাশ করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। দুঃখময় জগৎ হইতে উদ্ধার পাইতে গিয়া তাঁহারা যে আজন্মসঞ্চিত অপরিহরণীয় সুখের বাসনার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, তাহাও স্থির। দুঃখের আকস্মিক তীব্র আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, পূর্ব্ব পশ্চাৎ ভুলিয়া, আত্মহত্যা করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইতে পারে, তাঁহাদের প্রযত্ন যেদিন সকল মানুষ্যের নিকট সমাদরণীয় হইবে, সেই দিনই বৌদ্ধধর্ম্মের এই সর্ব্বশূন্যময় নির্ব্বাণ সকলের অভিলষিত হইতে পারে; সুখ-দুঃখের তরঙ্গে ডুবিতে ডুবিতে সংসার-সমুদ্রের সুদূর পারে শান্তিময় অনন্ত আলোকের দিকে লক্ষ্য করিয়া যে মনুষ্যজাতি আবহমান কাল হইতে সন্তরণ দিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিকট বুদ্ধদেবের এই নির্ব্বাণ কোন দিনই আদরের ধন হইতে পারে না, তাহা স্থির।

বৌদ্ধদর্শনের এই বিভীষিকাময় গভীর শূন্যভাবের তীব্র সমাজনাশিনী শক্তিকে বিনষ্ট করিবার জন্য ভারতে আর একটী নূতন অথচ পুরাতনাভিমানী সম্প্রদায় আচার্য্য শঙ্করের জন্মের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধদর্শনের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম করিয়া আসিতেছিল। আমরা এই সম্প্রদায়কে কর্ম্মবাদী বলিয়া থাকি। এই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণও প্রকৃতপক্ষে ভারতের ধর্ম্মবিপ্লব মিটাইয়া সমাজের চির বিনষ্ট শান্তির রাজ্য পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত মীমাংসাসূত্রকে অবলম্বন করিয়া শবরস্বামী ও কুমারিল ভট্ট যে কর্ম্মবাদ প্রচার করেন, তাহার তীব্রযুক্তি-সূর্য্যের প্রখর রশ্মি সহিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতগহ্বরে ও ভারতের বাহিরে গিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্মবাদের কঠোর কর্ত্তব্যপালনের তীব্র আলোক ভারতের আজন্ম সঞ্চিত শান্তির পিপাসা মিটাইতে পারিয়াছিল, ইহা কেহই স্বীকার করেন না।

বৌদ্ধদর্শনের সর্ব্বশূন্য-বাদের খণ্ডনকারী কর্ম্মমীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন এই সংসারের প্রত্যেক বস্তুই সৎ। সুখ ও দুঃখ দুইটীই সৎ; কোনটীই আকাশপ্রসূন নহে। সৎকর্ম্মের ফল সুখ; অসৎ কর্ম্মের ফল দুঃখ। বেদে যাহা করিতে বলিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান কর; সেই কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল শুভাদৃষ্ট যতই বাড়িবে, সুখও সেই পরিমাণে বাড়িবে। বেদে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহা করিও না; করিলে দুরদৃষ্ট হইবে। দুরদৃষ্টের ফল—দুঃখ, নরক, জ্বালা, যন্ত্রণা।

দুরদৃষ্ট ক্ষয় করিয়া শুভাদৃষ্টের অর্জ্জন কর—দুঃখ চিরদিনের জন্য মিটিবে; শুভাদৃষ্টের প্রসাদে চিরদিন সুখভোগ করিবে। মানুষ নিজকর্ম্মের ফলেই সুখ দুঃখ ভোগ করে; ঈশ্বর বা দেবতার অস্তিত্ব নাই। যাগ, হোম, দান প্রভৃতি বিহিতকর্ম্ম কর; অদৃষ্ট সঞ্চিত হইবে; তাহারই বলে সুখভোগ করিবে। কায কি তোমার দেবতা লইয়া? এই পরিদৃশ্যমান বিশাল অনাদি ও অনন্ত প্রপঞ্চ—কর্ম্মেরই ফল; অদৃষ্টই ইহার নিয়ামক, ঈশ্বর ইহার নিয়ন্তা নহেন; দেবতা বা ঈশ্বর কল্পিত মাত্র। কর্ম্মই দেবতা; সুখলাভ করিতে চাও, সৎকর্ম্ম কর। অজস্র অর্থব্যয় কর, বহু বর্ষ ব্যাপিয়া তীব্র তপস্যা কর; পুরোহিত-মণ্ডলীর ভাণ্ডার ভরিয়া সুবর্ণমণিমুক্তা বর্ষণ কর—তুমি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, অনন্তকালের অভিলাষোপনীত বিচিত্র স্বর্গসুখভোগ করিবে। আবার অদৃষ্ট ক্ষয় হইবে, আবার ভূমণ্ডলে আসিবে। এই প্রকার সৎকর্ম্ম করিবে, আবার স্বর্গে যাইবে; এই হইল সৃষ্টির নিয়ম। এই নিয়মের কোন সচেতন নিয়ন্তা নাই। জড় কর্ম্মই এই জীবজগতের নেতৃত্ব করিতেছে। অতএব ঈশ্বর ভাবিবার প্রয়োজন নাই, দেবতাপূজার কোন আবশ্যকতা নাই; আবশ্যক কেবল কর্ম্ম, দান, হোম, যাগ, চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্য, পরাক, প্রভৃতি তীব্র তপস্যা। সৃষ্টির আদি নাই, সুতরাং বেদেরও আদি নাই; বেদ কেহও নির্ম্মাণ করে নাই, বেদ স্বয়ংপ্রকাশ। সুতরাং বেদে অবিশ্বাস হইতে পারে না। মনুষ্যের প্রণীত শাস্ত্র ভ্রম প্রমাদাদি দোষ বশতঃ অপ্রমাণ হইতে পারে। বেদ মনুষ্যের প্রণীত নহে, সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা কি? বেদ যখন কর্ম্মই করিতে বলিতেছে তখন কর্ম্ম ছাড়া মানুষের আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে।

কর্ম্মমীমাংসকগণের এই কর্ম্মবাদ শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল, সে পরিমাণে ভারতের বিশৃঙ্খল সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

কর্ম্মবাদের অত্যধিক প্রসারে অজ্ঞ পুরোহিতসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠুরতায় জ্বালাতন হইয়াই ভারতীয় সমাজ একবার হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, একথা পূর্ব্বে আভাসে বলা গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মহীন সর্ব্বশূন্যবাদের আশ্রয়েও শান্তি লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আবার ভারতীয় সমাজ পশ্চাদিকে ফিরিয়া দেখিতেছিল। [ক্রমশঃ]

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্র সিংহের নিকট বিদায় লইয়া পিঙ্গলার বাটী হইতে কিশোরী বাহির হইলেন। বাহিরে রাজদূত শিবিকা লইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু কিশোরী শিবিকারোহণ না করিয়া অন্যমনে লক্ষ্যহীন চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখভাব দেখিয়া রাজদূতেরা সহসা কোন

* শ্রাবণ, ১৩০৮ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

কথা বলিতে পারিল না। শিবিকা সঙ্গে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দূতদিগের প্রতি রাজাদেশ ছিল যে, ঝালোয়ার, মন্দার বা অপর যে কোন স্থানে কিশোরী যাইবে, তথায় লইয়া যাইবে। আজ্ঞা অপেক্ষায় পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। কিশোরী জীবনশূন্য, প্রাণশূন্য, সংসারশূন্য, লক্ষ্যশূন্য চলিতে লাগিলেন। দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই, কখন দ্রুতপদে, কখন ধীরপদে, কখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা, দূরে রাজদূত রাজাজ্ঞায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। কিশোরী ক্রমে নগর হইতে পল্লীতে, পল্লী হইতে প্রান্তরে, ক্রমে বনাভিমুখে চলিলেন। নিজ মনোভাব নিজে অবগত নন, জাগ্রত নিদ্রায় চলিতেছেন। সহসা স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। আপনার অবস্থার ছবি স্মৃতিতে উদয় হইয়া তাঁহাকে চঞ্চল করিতে লাগিল। কি করিতেছেন, কোথায় যাইবেন, পরিণাম কি? এই সকল চিন্তা পুনঃ পুনঃ হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হইল না, একবার ভাবিলেন, রাণা কুম্ভর নিকট যান,—অভিমান মানা করিল। পিত্রালয়—লোকনিন্দা, তথায় প্রতি-রোধ। আবার বীরেন্দ্র সিংহের মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত দেখিলেন। পথশ্রান্তে পদ আর চলে না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া পথক্লান্তা রাজরাণী ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। দেখিলেন, তথায় একটী ঝরণা বহিয়া যাইতেছে। নির্ম্মল জল ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিতেছে। মনে হইল, ঐ নির্ম্মল সলিলের ন্যায় তাঁহার অন্তরও নির্ম্মল ছিল। ভাবিতে লাগিলেন, ধারা বহিতেছে—প্রশস্ত হইবে, কর্দ্দমিত—তরঙ্গিত হইবে,—সাগরে লয় পাইবে; চিন্তাতরঙ্গ অপ্রতিহত প্রভাবে বহিতে লাগিল। এতক্ষণ রাজদূতেরা কথা কহিতে সাহস করে নাই। সূর্য্যদেব পশ্চিমগগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন—সন্ধ্যা সমাগত। দূতের অধ্যক্ষ ভরসা করিয়া নিকটে যাইল। জানু পাতিয়া কর-জোড়ে নিবেদন করিল, "মহারাণি! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?" স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" দূত কহিল, "মহারাজের আজ্ঞায় আপনার রক্ষক। কোথায় যাইবেন আদেশ করুন, শিবিকা প্রস্তুত রহিয়াছে। কিম্বা যদি আজ্ঞা হয়, এইখানেই শিবির প্রস্তুত করি, রজনী আগত প্রায়।" কিশোরী শুনিতে শুনিতে অন্যমনা হইলেন। দূতও নিস্তব্ধ হইল।

পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে। তরুশির, দূর উচ্চ গৃহচূড়া রজতমুকুটে শোভিত হইল। এমন সময়ে দূর হইতে নাচিতে নাচিতে, গাহিতে গাহিতে একটী কৃষ্ণকায় পুরুষ উপস্থিত। কেশপাশে চূড়া বাঁধিয়াছে। চূড়া ফুলের মালায় বেষ্টিত। অঙ্গে নানাবর্ণে চিত্রিত সীবিত বসন। হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রে নিম্নভাগ আচ্ছাদিত। তৃণনির্ম্মিত পাদুকা, হঠাৎ দেখিলে যেন বল্কলনির্ম্মিত পাদুকা বলিয়া বোধ হয়। নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে যুবা পুরুষ উপস্থিত হইল। রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা, তুই হেতায় কেন? তোর বেটার বাড়ীতে আয়।" কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" যুবা কহিল, "তোর বেটা, চিনিস না? আয়।" বলিবামাত্র কিশোরী উঠিলেন ও আগন্তুকের পশ্চাৎ চলিলেন। রাজদূতেরা পশ্চাৎ যাইতেছিল, আগন্তুক নিবারণ করিল, বলিল "মীনা কোথায় থাকে, কোথায় যায়, এ কেউ দেখে না। যদি কেহ দেখিতে যায়, তাহা হইলে মীনার তীরে প্রাণ খোয়ায়। তোরা ফিরে যা, রাজাকে বল্‌বি যে, একজন তার মীনা বিটা আসিয়া তার রাণীমাকে সাথে নিয়ে গেছে। রাজা কিছু বল্‌বে না।" এই কথায় রাজদূতেরা ফিরিল। ধনুর্দ্ধারী মীনা আগে আগে চলিল, কিশোরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, বনের ভিতর রাজপথের ন্যায় সুন্দর পথ, লতায় লতায় আচ্ছাদিত, সুবাসিত তৈলের বাতি

জলিতেছে, কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছি ?" মীনা উত্তর করিল, "কেন ? তোর বাড়ী।" কিশোরী বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথায় ?" মীনা কহিল, "আর দুইটী ব্যাঁক ফিরিলেই দেখিবি।"

কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সঙ্গে চলিল। কিছুপরে অনুভব হইল, পথ ভূগর্ভে চলিতেছে। সুন্দর আলোকিত অট্টালিকা। সুন্দর আবাস স্থান। কিছু পরে দূরে যেন একটী দেওয়াল ফাটিয়া গেল। দুই দিকে দুয়ার হইয়া খুলিয়া গেল। কিশোরী দেখিলেন, অসীম রত্ন ভাণ্ডার। হীরার পাহাড়, মুক্তার পাহাড, পান্না, চুনি স্তূপাকার স্তূপাকার রহিয়াছে। সবিস্ময়ে কিশোরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় আসিয়াছি ?" মীনা উত্তর করিল, "তোরই বাড়ীতে। এসব তোর ! তুই একটু ঠাণ্ডা হ'না। তার পর যেখানে বল্‌বি সেখানে লইয়া যাইব। আমরা তোর মীনা ছেলে, কিছুই ভয় করি না।" কিশোরী কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না। অগত্যা সেইখানে রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুজন পিঙ্গলার বাটীর নিকট অপেক্ষা করিতেছিল। দেখিল, ধীরপদে সুরদাস বাহির হইল। অন্যমনে চলিতেছে, সুজনকে লক্ষ্য করে নাই। সুজন সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বলনা, বলনা, বঙ্কাকে খুঁজিতেছিলে কেন ? অঙ্কা বঙ্কা যা পারে, সুজন কসাইও তা পারে। কিন্তু সুজন কসাই এমন কাজ জানে যে, অঙ্কা বঙ্কা তা জানে না। সুজন কসাই সব পারে ; ভাল পারে, মন্দ পারে। কারুর কথা কারুর কাছে বলে না। তুমি অঙ্কা বঙ্কাকে জান, সুজন কসাইকে জান না ?"

সুরদাস শুনিল, কসাইএর কথার মর্ম্মও বুঝিল, কিন্তু পিঙ্গলার গৃহ হইতে বাহির হইয়া, তাহার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। 'বেশ্যাসক্ত বেশ্যাদাস হইয়া অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি; ধনব্যয়, আত্মসমর্পণ, মান বিসর্জ্জনে মনের আগুন কিনিয়াছি, আবার নরহত্যা কেন করি ? পিঙ্গলা পদতলে পড়িয়া, করুণ স্বরে বলিয়াছে, "আমি নারী, আমার মন ফিরাইতে শক্তি নাই।" এতে তার দোষ কি ? কই আমিও ত এত কষ্টে মন ফিরাইতে পারিতেছি না। মন ফিরাইলেই ত সকল যন্ত্রণা ঘোচে! রোগীর প্রাণবধ করিলে কি পিঙ্গলা আমার হইবে ?' ধীরে ধীরে মীরার ছবি মানসনেত্রে উপস্থিত হইল, সুরদাসের মনে নানাভাব উঠিতে লাগিল। মীরার কথায় বুঝিয়াছিল, "রোগী পিঙ্গলার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নয়। তবে কেন তার প্রাণ বধ করিব ?" ভাবিতে লাগিল, "সে সুন্দরী কে ? অঙ্কা বঙ্কা তাহার সঙ্গী কেন ? রোগীর সহিত যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারই বা মর্ম্ম কি ?" মীরার মূর্ত্তি সম্মুখে একবারও অন্তর্হিত হইতেছে না। প্রশান্ত মূর্ত্তি, দেবী মূর্ত্তি হৃদয়ে বসিয়াছে, হৃৎপদ্ম প্রসন্ন হইতে লাগিল। দুর্দ্দম দুশ্চিন্তাতরঙ্গমালা ক্রমে স্থির হইতে লাগিল। ভাবিল, "সুন্দরী আসিয়াছে কেন ?" রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন দেখিয়াছে। হঠাৎ সুজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুমি না সব কাজ পার ? মানুষ, গরু মারিতে পার, বুঝিয়াছি। কাহারও অসাধ্য রোগ আরাম করিতে পার ?" কসাই চমকিত হইল, উত্তর করিতে

পারিল না। সুজন বুঝিয়াছিল, সুরদাস কাহার প্রাণবধ মানসে অঙ্কা বঙ্কা অনুসরণ করিতে যায়। দুষ্প্রবৃত্তির চিহ্ন সম্পূর্ণ তাহার মুখে দেখিয়াছে। সুজনের কখন ভুল হয় না। ভুল হওয়ায় সুজন বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কাহাকেও আরোগ্য করিতে পারি কি না তোমায় পশ্চাৎ বলিব, কিন্তু একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বঙ্কাকে খুঁজিয়াছিলে কেন?" সুরদাস জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার অত প্রয়োজন কি? তুমি ত টাকা চাও, আরোগ্য করিয়া টাকা লও।" কসাই বলিল,—"টাকা চাই সত্য, টাকার জন্যই তোমার পাছু পাছু আসিয়াছি, কিন্তু যে বিদ্যাবলে আমি টাকা রোজগার করি, তাহা যদি আজ বিফল হয়, পরে টাকা রোজগার করিব কিরূপে? আমি অব্যর্থ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানব হৃদয় ভেদ করিতে পারি। তোমার দুরভিসন্ধি তোমার চক্ষের ভাবে পড়িয়াছিলাম, খুনের ছাপ তোমার মুখে দেখিয়াছিলাম। যখন পিঙ্গলার বাড়ী প্রবেশ কর, তখনও দেখিয়াছি, যখন বাড়ী হইতে বাহিরে আইস, তখনও তাহার চিহ্ন দেখিয়াছি। কিন্তু অকস্মাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ হয়, আমি জানিতাম না। তুমি যদি তোমার অবস্থা স্বরূপ বল, আমি তোমার কাছে নূতন শিক্ষা পাইব।"

[ক্রমশঃ]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

চলিতে লাগিলাম—খানিক দূর গিয়াই একটী ক্ষুদ্র গৃহ দেখিলাম; আলেখিয়া বন্ধুগণ এইখানে একটু বসিল, এটী নেপালের চৌকিদারী অর্থাৎ পুলিশ। একটী হাবেলদারের সহিত আলাপ হইল, এই চৌকিদারী ইহারই তত্ত্বাবধানে। লোকটী বড় সৎ—নেপালী লোকের চেহারায় এখনও মহা তেজ, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা বিরাজমান। ইহাদের মূর্ত্তি দেখিলে মনে বড় আনন্দের সঞ্চার হয়। এ লোকটীর সাধুর প্রতি বড় ভক্তি দেখিলাম। ইহার সহিত আমাদের বেশ আলাপ হইয়া গেল।

চলিতে লাগিলাম—খানিক দূর গিয়াই একটি খুব খাড়া চড়াই আসিল। পাহাড়ে যাঁহারা কখন চলা ফেরা করেন নাই, তাঁহাদের পাহাড়ে কিরূপে চলা ফেরা করা যায়, তাহার কোন জ্ঞানই নাই, কেহ কেহ হয় ত মনে করেন, পাহাড়ে উঠিতে গেলে খাড়া অনেকটা উঠিতে হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। পাহাড়ে পথ প্রস্তুত করিতে হইলে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমন করিয়া পথ প্রস্তুত করে,

---

* পৌষ, ১৩০০ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

যাহাতে একটু একটু করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে হয়। কোন কোন স্থলে এত অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতে হয় যে, একেবারে অনুভব হয় না বলিলেই হয়, ক্রমশঃ উপরে উপরে এইরূপ উঠাকে চড়াই কহে, আর ক্রমশঃ নীচে নামাকে উৎরাই বলে। এইরূপ চড়াই করিতে করিতে খানিকক্ষণ গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম—সকলে বিশ্রামার্থ একটু উপবেশন করিলাম। এখানে একরূপ পার্ব্বত্য গাছ দেখিয়া আমাদের সঙ্গী আলেখিয়াগণ চক্ষুরোগের ঔষধের জন্য তাহা সংগ্রহ করিল।

পুনরায় চলিতে লাগিলাম—অল্পক্ষণ পরেই ছাংরু পঁহুছিলাম, পাধান তাহার ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালায় আশ্রয় দিল। যাঁহারা কিছু ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভারতের অন্যান্য স্থানে কত ধনিনির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ধর্ম্মশালারূপে বিরাজমান। অতিথিদের অবস্থানের জন্য গৃহকে ধর্ম্মশালা কহে। কোন কোন স্থানে আহারাদিরও ব্যবস্থা আছে, পাহাড়ে যত ধর্ম্মশালা দেখিলাম সকলগুলিই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহসমষ্টিমাত্র, কোন কোন স্থলে ঐ সকল গৃহের মধ্যে একখানি অপেক্ষাকৃত ভাল চুনকামকরা; সেই সকল গৃহে সময়ে সময়ে কোন কোন সাহেব শিকারার্থ আসিয়া নিবাস করেন।

এই ধর্ম্মশালায় ২।৩ দিন কাটিল, পাধান ও অন্যান্য লোকেরা আহারার্থ চাল ডাল প্রভৃতি দিত, আলেখিয়াদ্বয় তাহা রন্ধন করিত, সকলে খাইতাম। একদিন একটী কৃষ্ণকায় বালক সেই গৃহে আশ্রয় লইল; শুনিলাম, এ হুনিয়া অর্থাৎ তিব্বতীয়—সে প্রথম দিন আসিয়াই যে উপাসনার ঘটা জুড়িয়া দিল, তাহা আর কি বলিব, কত রকম কথা আওড়াইতে লাগিল, শেষে 'মানি পানি হুম্', ক্রমাগত'বলিতে লাগিল, সে উচ্চারণ করিতে লাগিল—যেন মাম্ পাম্ হুম্—অতি শীঘ্র—দ্রুত উচ্চারণ মাম্ পাম্ হুম্, মাম্ পাম্ হুম্,—আমাদের বড় কৌতূহলজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আলেখিয়ারা বলিল, মানি অর্থে মহাদেব ও পানি অর্থে পার্ব্বতী। ইহারা হরপার্ব্বতীরই উপাসনা করিয়া থাকে। আধুনিক পণ্ডিতেরা কিন্তু অনুমান করেন, ইহা বৌদ্ধদের 'মণি পদ্মে হুম্' এই মন্ত্রের অপভ্রংশ।

ফিরিয়া আসিবার সময় এক বৃদ্ধকে বৌদ্ধ স্তব-চক্র (Prayer-wheel) ঘুরাইতে দেখিয়াছিলাম। এই বালকটীকে পরে আমাদের মুটে ও পথপ্রদর্শকরূপে মানস-সরোবরে লইয়া গিয়াছিলাম, যতদূর দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তাহাকে বড় সৎ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। তাহাকে 'মানি পানি হুম্' করিতে ঐ একদিনই দেখিয়াছিলাম, তারপর আর একদিনও স্তবাদি করিতে দেখি নাই। সে অল্প অল্প হিন্দী জানিত তাহাতে দোভাষার কায হইত। তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম, বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত 'বরা খারাপ কাম'; সে কখন বিবাহ করিবে না। বলিত, তাহাদের দেশের স্ত্রীলোকের দুই তিনটী করিয়া বিবাহ হয়। আলেখিয়াগণ আমাকে ব্রহ্মচারিজী বলিয়া ডাকিত, সে অতখানি কথা বলিতে পারিত না, ব্রহ্মজী বলিয়া ডাকিত। আমাদের হাতে কমণ্ডলুটি পর্য্যন্ত রাখিতে দিবে না, সে সব নিজে লইবে। মাঝে মাঝে পথে চলিতে চলিতে আলেখিয়াগণের অনুকরণে 'অলখ' 'অলখ' করিত। নাম জিজ্ঞাসিলে বলিয়াছিল, নাম দাওয়া সিং।

আর অন্য কথা বলিয়া পাঠকবর্গকে বিরক্ত করিব না। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, ইহাতে কেবল আমাদের দৃষ্ট অপূর্ব্ব গুহাটীর বিবরণ লিখিব, কিন্তু অন্যান্য কথা আসিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত

হইয়া পড়িয়াছে। প্রবন্ধে পূর্ব্বতন অংশের তুলনায় এই গুহার কথা অতি অল্প হইবে। কিন্তু কেবল কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য অধিক চেষ্টা অপেক্ষা ভিন্ন দেশের রীতিনীতিসম্বন্ধে সাধ্যমত সাধারণকে জানানই আমার উদ্দেশ্য হওয়ায় এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' বচন অনুসারে গুহার কথা বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে পণ্ডিত লছমীদাসের নিকট হইতে যে গুহার বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি জানিয়া আমাদের উহা দেখিবার কৌতূহল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।* এখানে একটী সূত্রধরকে দেখিলাম, সে জোহার-নিবাসী। আলমোড়া হইতে তিব্বতে যাইবার প্রধানতঃ যে তিনটী পাশ আছে, তাহার মধ্যে জোহার একটী পাশ; এটীকে ব্যাস পাশ ও আর একটী পাশকে দরমা পাশ বলে। ইহার একটী ছেলে ছিল, সে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে বলিল। যাইবার দিন স্থির হইলে, বৈকালে আমরা দুইজন, দুইজন আলেখিয়া, ঐ ছুতারের ছেলে ও ছুতার যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বোক্ত নেপালী হাবেলদারটীও আমাদের সহিত যাইবে বলিয়াছিল; কিন্তু আমরা তাহার আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কারণ বেলা বেশী পড়িয়া গেলে যাওয়া ও আসা উভয়ই দুরূহ হইবে। আমার গায়ে জামা ও চাদর দেওয়া এবং একটী লাঠি হস্তে। আলেখিয়াগণের মধ্যে একজন একটী কমণ্ডলু করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইল, কারণ পাহাড়ের উপর চড়াই করিতে গেলে পিপাসা পাইবে। আমরা অল্পদূর সমতলের উপর দিয়া গিয়াই পাহাড়ের তলদেশে উপনীত হইলাম। ক্রমশঃ চড়াই করিতে লাগিলাম। এ চড়াইটী একটু বেশী খাড়া রকমের। যাহা হউক, এই থানিকটা যাহা চলিলাম তাহা বড় বিপদ্‌সঙ্কুল নহে; কিন্তু এইরূপ থানিক দূর যাইতে যাইতে আমাদের বালক পথ-প্রদর্শক পথ হারাইয়া ফেলিল। এখন সামনে আর পথ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কেবল একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ। এই গাছের ভিতর দিয়া গাছের উপর পা রাখিয়া চলিতে হইল। সদা বিপদের আশঙ্কা, পা একটু পিছ্‌লাইয়া পড়িলেই কোথায় যাইব কিছুই ঠিক নাই!! তথাপি সকলে চলিয়াছি—কৌতূহলের এমনি প্রভাব। মাঝে মাঝে ঘোর অন্ধকারে চপলাচমকের ন্যায় একটু অপেক্ষাকৃত ভাল পথ—আবার সেই গাছ গাছড়া। গাছড়াগুলির কিন্তু বড় মনোরম অপরূপ আশ্চর্য্য সুগন্ধ। প্রকৃতির অনন্ত রাজ্যে কোথায় কি জিনিষ কি ভাবে কোন্ কাজের জন্য রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, ক্রমশঃ পথ দুর্গম হইতে দুর্গমতর হইতে লাগিল। ইহার কিছু পূর্ব্বেই আমাদের হাবেলদার বন্ধু আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দ্বারা আমাদের বড় সাহায্য হইতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

---

* বাক্যটি অসম্পূর্ণ।—বর্ত্তমান সঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা (বেলুড় মঠ)

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

দিব্য বাণী

মালা-সর্পবদাভাতি যস্যাং সর্বচরাচরম্।
সর্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্যৈ হ্রীংমূর্তয়ে নমঃ ॥
ত্বত্তঃ সর্বমিদং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অন্যে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্তারস্তব নির্মিতাঃ ॥
নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্বেষাং জননী স্মৃতা।
কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥

—দেবীভাগবত, ৪।১৫।৩৪-৩৬

(মালা দেখি আঁধারেতে কখন কখন
সাপ বলি মনে হয় ভ্রমেতে যেমন,
সেইরূপ এই চরাচরে সব ঠাঁই
জগৎ-জননী ছাড়া বস্তু আর নাই ;
তাঁহাকেই জীব আর জগৎ বলিয়া
আমরা দেখিয়া থাকি ভ্রমেতে পড়িয়া।)
মাল্যে অহি-জ্ঞান সম বিশ্ব বলি' যাঁরে
মনে হয়, নমি সেই জগৎ-মাতারে—
হ্রীঁ-বীজ-রূপা, বিশ্ব-আধার-রূপিণী,
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব সৃজিলেন যিনি।
সৃষ্টিকর্তা বলি' ব্রহ্মা-আদি যাঁহাদেরে
মনে হয়, সৃজেছেন তিনিই তাঁদেরে—
সৃজনের তাঁরা মাত্র নিমিত্ত-কারণ।
বন্দি মহামায়া তব রাতুল চরণ !
দেব-দৈত্যে নাহি তব কোন ভেদজ্ঞান
তারা যে সবাই মাগো তোমারি সন্তান !

কথাপ্রসঙ্গে

মনোময়ী মূর্তি

একটি স্তবে আছে:

ধ্যেয়ং বদন্তি শিবমেব হি কেচিদন্যে
শক্তিং গণেশমপরে তু দিবাকরং বৈ।
রূপৈস্তু তৈরপি বিভাসি যতস্ত্বমেব
তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম শঙ্খপাণে॥

—কেহ কেহ বলেন, শিবই ধ্যেয়; অপরে বলেন, শক্তি গণেশ বা সূর্যই ধ্যেয়; হে শঙ্খপাণি, যেহেতু ঐ সকল রূপে আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই হেতু আপনিই আমার শরণ্য।

বলা বাহুল্য, স্তবটির রচয়িতার ইষ্টদেব শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। কিন্তু এক ঈশ্বরই যে বিভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমান, এই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্তে তিনি বিশ্বাসী এবং তাঁহার সেই বিশ্বাসকেই তিনি স্বীয় ইষ্টনিষ্ঠা বজায় রাখিয়াই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন উদ্ধৃত শ্লোকটিতে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এক ঈশ্বরের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ কাহার কল্পনা? উত্তরে বলিতে হয় —মানুষেরই। প্রতিপ্রশ্ন হইবে: তাহা হইলে 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা'—সাধক-গণের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপকল্পনা—কথাটি কি মিথ্যা? প্রত্যুত্তরে বলা যায়, যদিও কর্তায় ষষ্ঠী না ধরিলে ঐ কথাটি সরাসরি আমাদের পূর্বোক্ত মতের অনুকূলে সহজেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে, তথাপি কথামৃতে শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্মুখে কর্তায় ষষ্ঠী ধরিয়া উহার যে-ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তদনুসারেই আমরা অগ্রসর হইতেছি। 'ব্রহ্মের রূপকল্পনা যে শাস্ত্রে আছে, সে কল্পনা কে করেন?'— এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতজী বলিয়াছিলেন: 'ব্রহ্ম নিজে করেন— মানুষের কল্পনা নয়।' অর্থাৎ ব্রহ্মই রূপকল্পনার কর্তা। পণ্ডিতজীর কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে, 'কল্পনা'-শব্দটি বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃতে মুখ্যতঃ সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃতে উহার ব্যুৎপত্তিগত প্রধান অর্থ হইতেছে— সম্পাদনা, রচনা অর্থাৎ সৃজন বা সৃষ্টি। মনে হয়, পণ্ডিতজীও 'কল্পনা'-শব্দটির ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন— একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। সাধকগণের হিতার্থে ব্রহ্মই বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেন। যে-সাধক যে-রূপ দেখিতে ইচ্ছা করেন — যে-রূপের ধ্যান করেন, ব্রহ্মও সেই সাধকের জন্য সেই রূপ কল্পনা করেন অর্থাৎ সৃষ্টি করেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' — আমাকে যাহারা যেভাবে আশ্রয় করে, আমিও তাহাদের সেইভাবেই ভজনা করি— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটি বর্তমান প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আদিত্যে যদি হিরণ্ময়বপু হিরণ্ময়শ্মশ্রু হিরণ্ময়কেশ পুংরূপে পরমেশ্বরকে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে তিনি সেইরূপেই দর্শন দিবেন; আবার যদি সেই আদিত্যেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী বনমালা-বিভূষিতা চতুর্ভুজা গায়ত্রীদেবীর ধ্যান করা হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরও সেইরূপেই সাধককে অনুগৃহীত করিবেন। আচার্য শংকর বলেন, 'স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপং সাধকা-নুগ্রহার্থম্' - সাধকগণের প্রতি অনুগ্রহহেতু পরমেশ্বরও স্বেচ্ছায় মায়াময় রূপ ধারণ করেন। 'মায়াময়ং রূপম্'— 'মনোবিলাসং' রূপম্—অর্থাৎ সাধকেরই ধ্যেয় মনোময়ী মূর্তি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখি—ব্রহ্মা নারায়ণের স্তব করিতেছেন :

'যদ্ যদ্ ধিয়া উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তৎ তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।'

—হে বিশ্রুতকীর্তি, সাধকগণ মনের দ্বারা আপনার যে যে মূর্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, আপনিও তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই সেই রূপই ধারণ করিয়া থাকেন।

কথামৃতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সাকার-নিরাকারের প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। কথাসূত্রে ভক্ত কেদার বলিলেন : 'ভক্তের জন্য সাকার। প্রেমে ভক্ত সাকার দেখে। ধ্রুব যখন ঠাকুরকে দর্শন করলেন, বলেছিলেন, কুণ্ডল কেন দুলছে না? ঠাকুর বললেন, তুমি দোলালেই দোলে!' নারায়ণের কুণ্ডল-বিষয়ক এই প্রসঙ্গ কোন্ পুরাণে আছে জানা নাই, তবে বিষ্ণুপুরাণে বা শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইহা নজরে পড়ে নাই। পুরাণ-উপপুরাণে থাকুক আর নাই থাকুক, কাহিনীটিতে নিঃসন্দেহে তত্ত্ব নিহিত আছে। কাহিনীটির তাৎপর্য : 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী'— যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সিদ্ধিও তদ্রূপ। সাধক যদি নারায়ণের শ্রবণ-কুণ্ডল দোলায়মান দেখিতে অভিলাষী হন, নারায়ণও দোলায়মান কুণ্ডলই দেখাইবেন, যদি স্থির কুণ্ডল দেখিতে ইচ্ছা করেন, তো নারায়ণ স্থির কুণ্ডলই দেখাইবেন।

কথামৃতের পাঠকমাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত গামলার গল্পটি অবগত আছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত বস্ত্র একই গামলার রঙে ডুবাইয়া প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী লাল নীল পীত ইত্যাদি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিত গামলার মালিক। বলা বাহুল্য, কাহিনীটি একটি রূপক। গামলার মালিক হইতেছেন ঈশ্বর। যে-সাধক যে-রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সেইরূপই দর্শন করান।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহদাকার মহিষরূপেই দেখিবে, মৎস্য যদি ভগবানকে দেখিতে চায়, তবে সে তাঁহাকে এক বিশাল মৎস্যরূপে দেখিলেই পরিতৃপ্ত হইবে। আর মানুষও ঈশ্বরকে মানুষরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। তবে যে-মানুষ সর্ববিধ মানব-ভাবের ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছেন, দেহ-মনের বোধ সম্পূর্ণ-রূপে বিসর্জন দিয়া প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন, সেই পরমহংস-পদবীতে আরূঢ় মানুষের কথা স্বতন্ত্র— তিনি ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপেই দর্শন করিতে পারেন। অপর সকল মানুষই ঈশ্বরের মানবীয় রূপ কল্পনা করিতে বাধ্য।

এই মানবীয় রূপের মধ্যে আবার মানুষ নারী বা পুরুষের ভেদ করিয়া থাকে এবং সেই নারী বা পুরুষের মধ্যেও রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী রূপ-বৈচিত্র্যের কল্পনা করিয়া থাকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, যতই তাঁহার বয়স বাড়িতেছে, ততই 'মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিতেছেন। দেবদেবীগণ নিশ্চয়ই আছেন—তাঁহাদের দেহ সূক্ষ্ম হইলেও বস্তুতঃ হস্তপদাদিবিশিষ্ট মানব-দেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহারা আরেকটি আকাশে (আমরা যে জগতে আছি, তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর জগতে) বাস করেন এবং আমাদের দৃষ্টির একান্ত অগোচরও নহেন— মন সূক্ষ্ম জিনিস দেখিবার অবস্থায় আসিলে তাঁহাদের দেখিতে পায়। তাঁহারাও চিন্তা করেন, আমাদের ন্যায় তাঁহাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সব কিছুই আছে— সুতরাং তাঁহারাও মানুষ।

দেবদেবীগণের নিজস্ব আকৃতি অবশ্যই আছে। কিন্তু দুর্গা অন্নপূর্ণা কালী তারা শিব বিষ্ণু প্রভৃতি 'দেবতা' তথাকথিত দেবদেবী নহেন, যদিও 'দেব' 'দেবী' ও 'দেবতা' শব্দ তাঁহাদের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বরই। এক অসীম অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে মানুষের সসীম মন ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনিবার জন্য যে আপ্রাণ প্রয়াস করিয়াছে, দুর্গা অন্নপূর্ণা কালী তারা ইত্যাদি ঈশ্বরীয় রূপসমূহ তাহারই পরিচয়বাহী।

উল্লিখিত ঈশ্বরীয় রূপগুলি আবার যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানুষেরই রুচি অনুযায়ী ও অন্যান্য কারণে বিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। তন্ত্র ও পুরাণাদিতে একই ঈশ্বরীয় স্ত্রী বা পুরুষ বিগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধ্যানের বিধান হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। শারদীয়া পূজার প্রাক্‌কালে শ্রীশ্রীদুর্গার রূপেরই আলোচনা করা যাক্।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্গামূর্তি কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও ষড়্‌ভুজা, কোথাও অষ্টভুজা, কোথাও দশভুজা, কোথাও দ্বাদশভুজা, কোথাও বা অষ্টাদশভুজা দেখা যায়।

তন্ত্রসারে সংকলন-কর্তা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দুর্গাকে চতুর্ভুজা ও মহিষাসুরমর্দিনীকে অষ্টভুজা-রূপে ধ্যান করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তন্ত্রগুলিতে তিনি যাহা পাইয়াছেন, তদনুসারেই বিধান দিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক একটি স্বতন্ত্র ধারাও রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্যতম। উহার ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশটি অধ্যায়ই দুর্গাসপ্তশতী বা শ্রীশ্রীচণ্ডী নামে প্রখ্যাত। উহাতে দুর্গা ও মহিষাসুরমর্দিনী অভিন্না এবং সহস্রভুজারূপেই বর্ণিতা। তবে বৈকৃতিক রহস্যে বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, 'অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী'—সেই দুর্গাদেবী সহস্র-ভুজা হইলেও অষ্টাদশভুজারূপেই পূজ্যা। গরুড়-পুরাণের মতেও দুর্গা অষ্টাদশভুজা। বৃহৎ নন্দিকেশ্বরপুরাণমতে দুর্গা দশভুজা এবং তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী।

বঙ্গদেশে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ ও শিব (চালচিত্রে) সমন্বিতা দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতেই শারদীয়া দুর্গাপূজা প্রচলিত। স্পষ্টতই বুঝা যায়, বাঙালীর মন দেবীর অসুরনাশিনী মূর্তির ধ্যানেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। তাই নারায়ণের লক্ষ্মীকে এবং ব্রহ্মার সরস্বতীকে দেবীর দুই কন্যারূপে পূজামণ্ডপে সমাসীন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দুর্গা যে লক্ষ্মী-সরস্বতীর জননী এ বিষয়ে পুরাণ-তন্ত্রে কোনও উল্লেখ আছে কি? আমাদের তো নজরে পড়ে নাই। তবে পুরাণ-বিশেষজ্ঞগণই এই বিষয়ে সঠিক তথ্য পরিবেশন করিতে পারিবেন।

এখন প্রশ্ন এই—কেহ যদি বঙ্গদেশে কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত পরিবার-সমন্বিতা দুর্গা-মূর্তির ধ্যান করিতে চায়, তাহা হইলে উহা অশাস্ত্রীয় হইবে কি? মহর্ষি পতঞ্জলির 'যথাভি-মত-ধ্যানাদ্ বা' সূত্র স্মরণ করিয়া আমরা বলি—না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'শ্রীদুর্গামূর্তি ধ্যান করতে হলে প্রতিমায় যেরূপ মূর্তি আছে ঐ মূর্তি একমনে চিন্তা, ধ্যান করবে।' ইহাতে অবশ্য বিষয়টি পরিষ্কার হইল না। প্রতিমায় তো লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশও আছেন—যুগপৎ তাঁহাদেরও ধ্যান করিতে হইবে কি? আমাদের মনে হয় ঐরূপ পরিবার-সমন্বিতা দেবীর ধ্যানে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না; কোন ধ্যানমূর্তিই—কোনও পূজাপদ্ধতিই অশাস্ত্রীয় নহে, যদি আসল জিনিস থাকে। আসল জিনিস হইল ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনও প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন: ভক্তিই সার, তারা কি ভক্তি খোঁজে? আমাদেরও নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত—আমরা কি ভক্তি

খুঁজি? সকল পূজার যাহা সার, সেই ভক্তি যদি থাকে তবে যে-ভাবে ও যে-মূর্তিতেই আমরা মায়ের পূজা করি না কেন, মা সেই পূজা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবেন।

ভক্ত 'প্রেমিক' গাহিয়াছেন: 'মন-ছাঁচে তোমাকে ফেলে / মনোময়ী মূর্তি আজ ল'ব তুলে।' সকল সাধককেই মন-ছাঁচে ফেলিয়া মনোময়ী মূর্তি গঠিত করিতে প্রয়াস করিতে হয়। ইহারই নাম ধ্যান। তাবৎ ঈশ্বরীয় মূর্তিই মনোময়ী। মা দুর্গারও তাহাই। মা কিন্তু স্বরূপে মনোময়ী ন'ন, তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী। সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী মা অপার করুণায় আমাদের শুদ্ধ মনের ভাবানুযায়ী মূর্তিতেই আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন —এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া আমরা যেন মায়ের পূজায় ব্রতী হইতে পারি, শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শত নাম, এক পরিচয়

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী *

খুঁজে যদি পাওয়া যেত তাঁকে
চিরকাল মুনি ঋষি যাঁকে
বলেন অব্যক্ত, তবু
আকাশ ভুবন সবই তাঁহারই আকার!
ঈশ্বর? আনন্দ? প্রেম?—কি যে নাম তাঁর।

খুঁজে যদি পাওয়া যেত তাঁকে
পুণ্যগন্ধা পৃথিবীর প্রতি অণু ভ'রে
আকাশে অরণ্য-নদী-পর্বত-সাগরে
জল-মাটি-ফুল-গাছ-গন্ধে মেশা
তাঁর সেই পুণ্য রূপটিকে!
বিশ্বভরা যে সৌরভ প্রাণে দেহে মেশে অহরহ
সাথে ক্ষুদ্র নশ্বরের বেদনা বিরহ—
চোখে যার ভয় ও বিস্ময়!
শুনিতেছি, শত নাম তাঁর কিন্তু এক পরিচয়!

দু-ফোঁটা চোখের জলে ঝাপসা নয়নে
খোঁজে তাঁরে ধরণী গগনে!—
কোন্ মহা বিরহের মহাশূন্যে কুয়াশার
নীল সাদা কালো মেঘে ঢাকা।
কিংবা মোহময়ী ধরণীর জীব-তনু-লোকে
মহা-আনন্দেরি গায়ে ধরণীর মাটি কাদা মাখা।

---

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল বাংলা সাহিত্যের সেবিকা। ১২টি গ্রন্থের লেখিকা। 'সোনা রূপা নয়'-গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত—

শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম্

স্বামী জীবানন্দ

সংসারসংসৃজনপালননাশকর্ত্রী
বিশ্বাত্মিকা সকলবন্ধনমোচয়িত্রী।
ত্বং পাসি মানবগণং হি বিপত্তিকালে
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ১

শক্তিঃ পরা হি নিখিলার্তিবিনাশয়িত্রী
ত্বং শাশ্বতী চ শরণাগত ভক্তিদাত্রী
ভ্রান্তং জনং চ সুপথে ভুবি চালয়িত্রী
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ২

শক্রৌ কৃপাপি তব বৈ ভুবি লক্ষণীয়া
মাধুর্যমণ্ডিতদয়া যুধি বীর্যবত্তা।
প্রাপ্তা সুদুর্লভগতির্মহিষাসুরেণ
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৩

যো মাতৃনাম বদনেন সদা গৃহীত্বা
দূরঞ্চ গচ্ছতি বহির্জননীং স্মরন্ বৈ।
কাচিদ্ বিপদ্ ভবতি তস্য ন তে প্রভাবৈ-
র্দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৪

মুগ্ধং জগদ্ভবতি নির্মিতমায়য়া তে
মায়া চ যাতি কৃপয়া তব মাতৃদেব্যাঃ।
বিশ্বাশ্রয়া সকলদুর্গতিনাশিনী ত্বং
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৫

ত্বং তিষ্ঠসীতি জগদস্তি বদন্তি বিজ্ঞা-
স্ত্বং ভাসি তর্হি নিখিলং হি বিভাতি বিশ্বম্।
স্নেহেন তে সমুদয়ং ভুবনঞ্চ পূর্ণং
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৬

নিত্যামৃতং পিবতু তে পদয়োর্মনো মে
জাতা চ যা মনসি গচ্ছতু সা হি পীড়া।
মাতঃ সদা প্রকুরু মাং তব হস্তযন্ত্রং
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৭

আনন্দদা চ সুখদা তব দেবি পূজা
চানন্দিতাঃ শরদি সন্তি হি ভক্তবৃন্দাঃ।
দুঃখং বিপৎ সপদি গচ্ছতু নঃ সুদূরং
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৮

রামস্তবৈব কৃপয়া হতবান্ মহারিং
ভক্তো নরেশসুরথশ্চ সমাধিবৈশ্যঃ।
জ্ঞানে সুখী ভবতি তে সততং সুভক্তো
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ৯

ত্বং সারদা বিধৃতবিগ্রহমাতৃরূপা
বিদ্যা পরা জনহিতায় কৃপাবতীর্ণা।
সর্বৈর্জনৈরনুপমা করুণা চ লব্ধা
দুর্গে জগজ্জননি মামব শারদীয়ে॥ ১০

নমস্তুভ্যং মহাদুর্গে সর্বদুঃখবিনাশিনি।
শরণ্যে জ্ঞানদে মাতশ্চরাচরবিধারিণি॥ ১১

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

(১)

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী

৮।১২।১৯

শ্রীমান্—,

গতকল্য তোমার একখানা পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইয়াছি। তোমার শরীর তত ভাল নয় জানিয়া দুঃখিত হইলাম। বৃথা মনকে অস্থির করিয়া লাভ কি? অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়া ভাল নয়—ইহাতে কার্যের ব্যাঘাত হয়, উপকার কিছু হয় না। আপনার উপর নির্ভর করিয়া সাধ্যমত চেষ্টার পর তবে ভগবানে নির্ভর করিলে তাহাই প্রকৃত নির্ভর, নতুবা কোন উদ্যম না করিয়া কেবল মুখে ভগবানের উপর নির্ভর করা আর আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া এক কথা বই কি। যাহারা উদ্যমশীল ও যত্নপরায়ণ কেবল তাহারাই ভগবানের সাহায্য লাভের অধিকারী। অন্যে কখনও তাহা লাভ করে না। জপ করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। মহারাজের নিকট হইতে উহার ক্রম জানিয়া লইবে। মন লাগাইয়া সব কাজ করিতে হয়। সন্দেহ করিতে নাই। একমনে যতটুকু করিতে পার তাহাই ভাল। কলের মতন করিয়া বিশেষ লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে একটা নিষ্ঠাও প্রয়োজন। সময়ের দিকে তত লক্ষ্য রাখার আবশ্যক নাই। উহাতে বিক্ষেপ হয়। আসল কথা ভগবানে মন রাখা। মহারাজকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে। একজনের দ্বারা চালিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আমার শরীর বেশ ভাল নাই, একরূপ চলিতেছে মাত্র। অন্যান্য এখানকার সমস্ত কুশল। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

(২)

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী

১৫।১।২০

প্রিয়—,

আবার তোমার ১৩ই জানুয়ারীর পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। পরীক্ষার জন্য পরিশ্রম করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। যে কাজ করিতে হইবে তাহা যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ মনে করাই উচিত এবং তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবার সম্ভাবনা। Things done by halves are never done right. ইহা অতীব সত্যকথা। তোমার ভগবান লাভের আগ্রহ দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। "ভগবান নাই" এই কথা সাহস করিয়া বলিলেও তিনি নাই হইয়া যান না। তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকেন। তবে বক্তার বুদ্ধি অধিকতর মলিন হইয়া যায়—এইমাত্র। কারণ উপনিষদ বলিতেছেন,

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।

অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি।"

অস্তিত্বই তিনি। অস্তি কখন নাস্তি হইতে পারে না। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইহা অতীব সত্য। ভগবানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে না পারিবার কারণ কিছুই নাই। প্রবল ইচ্ছা, অনুরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় এবং উপযুক্ত উপদেষ্টা থাকিলেই সকল সম্ভব হয়। "যে চায় সে পায়।" Ask and it shall be given. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে বলিয়াছি, তোমার দৃঢ়তা ও কার্য্যশক্তি দেখিবার জন্য। সামান্য বিষয় দেখিয়াই বিশেষভাব উপলব্ধি করা যায়। A straw best shows how the wind blows. এই আর কি! আমার কলিকাতা আসার শীঘ্র কোন সম্ভাবনা নাই। শরৎ মহারাজ শীঘ্রই যাইবেন। তাঁহারা ভাল আছেন। আমার শরীর ভাল নয়। একরূপ চলিয়া যাইতেছে। আমার শুভেচ্ছা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

(৩)

কাশীধাম
২৪-৪-২১

শ্রীমান—

তোমার ২রা বৈশাখের একখানি পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। এতদিন উত্তর দিতে পারি নাই। কি-ই বা উত্তর দিব বুঝিতে পারি না। তোমরা এখন সকল বিষয় বুঝিতেছ—যাহা ভাল বিবেচনা কর করিবে। দুর্ব্বলতা মানুষের স্বভাব। "আমি দুর্ব্বল, আমি দুর্ব্বল" বলিলে উহা চলিয়া যাইবে না, বরং আমি কেন দুর্ব্বল হব আমাকে সবল হইতেই হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলে মানুষ সবল হইতে পারে। বড়মহারাজের কথাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে, শুধু কথায় কিছুই হয় না, কাজে করিলে তবে হয়। ঠাকুর বলিতেন, "সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না, সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়। পরে উহা খাইলে তবে আনন্দ হইয়া থাকে।" প্রার্থনা ঠিক মত হইতেছে না বলিলে চলিবে কেন? যাহাতে ঠিকমত হয় তাহাই করিতে হইবে ইহাই উপদেশ। লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, অম্বল চাখা করিলে কাজ হয় না। ক্ষণিক উৎসাহের কাজ নহে, যাহাতে উহা চিরদিনের জন্য স্থায়ী হয় তাহাই করিতে হয়। তুমি বালক নহ, তোমাকে আর বিশেষ করিয়া এ সম্বন্ধে বলিতে হইবে না। যাহা দুর্ব্বলতার কারণ মনে হইবে, তাহাই ত্যাগ করিবে। যাহাতে বল হয় বুঝিবে তাহাই সাদরে অবলম্বন করিবে, ইহা ছাড়া বলিবার কিছুই নাই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে মঠে বা কলিকাতায় মহারাজদের সঙ্গ করিতে পারিবে। ৺কাশীতে অত্যন্ত গরম সহিতে পারিবে কিনা বলা কঠিন। এখানে রাসবিহারী, বিমল রহিয়াছে, উভয়েই পান বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল। রাসবিহারী অনেক দিন সারিয়াছে, বিমলও ২।১ দিনে আরোগ্য স্নান করিবে। আমার শরীর মূলে ভাল নাই। অত্যন্ত দুর্ব্বল। পায়ের বেদনা এত অধিক যে বেড়াইতে কষ্ট হয়। অন্যান্য অসুখও রহিয়াছে। উভয় আশ্রমের আর সকলে একরূপ ভাল আছে। তুমি আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে যেমন দেখিয়াছি

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ভক্ত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্ বিদ্বান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥

ভাগবত ১১।১৮।২৯

— মহাপণ্ডিত হইয়াও তিনি বালকের ন্যায় ক্রীড়া করেন। সর্ববিষয়ে কুশলী হইয়াও জড়ের মত বসিয়া থাকেন। তাঁহার অসংলগ্ন বাক্য শুনিয়া লোকে তাঁহাকে উন্মত্ত মনে করে। বেদ-নিষ্ঠ হইয়াও তিনি অনিয়ত আচরণ করেন।

ইহা অবশ্য বিবিদিষু— তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে। যাঁহারা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ব হইতেই জ্ঞানলাভ করিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন— শুধু তাঁহাদের পক্ষেই প্রযোজ্য।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর পূত চরিত্রে আমরা উপরোক্ত কয়েকটি লক্ষণ দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি সত্যই মহাপণ্ডিত হইয়াও বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। সর্বকর্মে পারদর্শী হইয়াও অনেক সময় জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার একরূপ অসংলগ্ন বাক্যের অর্থ অনেক সময় আমরা বুঝিতে পারিতাম না। তিনি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন অথচ বাহ্য আচরণ হইতে তাহার কিছুই বুঝা যাইত না।

তাঁহার সেবকগণ বলেন যে, তাঁহার অদ্ভুত পোশাক দেখিয়া অনেক সময় এলাহাবাদের রাস্তায় ছেলেরা তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। উহা দেখিয়া তিনি কৌতুকভরে তাহাদিগকে বলিতেন— "ক্যা দেখ্‌তা হ্যায়্‌— বান্দর? হাঁ— এ তো বান্দরই হ্যায়— রামজীকা বান্দর।"

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার খাটে সব সময়েই বিছানা পাতা থাকিত। উহাতে ধুলাবালি পড়িলেও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাহারও উহা স্পর্শ করিবার উপায় ছিল না। একবার আমাদেরই একটি সাধু কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গলাভের আশায় এলাহাবাদে যান ও তাঁহার বিছানার অবস্থা দেখিয়া, মহারাজের অনুপস্থিতিতে, উহা ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঠিক করেন। মহারাজ বাহির হইতে ফিরিয়া বিছানার ঐরূপ সংস্কৃত অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ সাধুটিকে ডাকিয়া পাঠান ও তাঁহাকে সময়সারিকা (Time-table) দেখাইয়া বলেন— "দেখুন, আপনার ট্রেন আজ অমুক সময়, উহাতেই আপনাকে ফিরিতে হইবে।" সাধুটির অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তাঁহার ঐ আদেশই বহাল রহিল।

তাঁহার ঐ খাটেরই একটু উপরে একটি কুলুঙ্গীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি থাকিত। উহাতেও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কাহারও হাত দিবার উপায় ছিল না।

গ্রীষ্মকালে তাঁহার জন্য তিনটি বিছানা করিতে হইত। একটি উঠানে, একটি বারান্দায় ও একটি তাঁহার ঘরে। তিনি প্রথমে উঠানেরটিতে আসিয়া শুইতেন। ঝড়বৃষ্টি আসিলে বারান্দারটিতে আসিতেন, ঝড়বৃষ্টি আরও বাড়িলে ঘরেরটিতে শুইতেন। তিনটিতেই কিন্তু মশারি আদি খাটান থাকিত এবং বৃষ্টিতে ভিজিতে থাকিলেও তখন তাহা কাহারও উঠাইবার অনুমতি ছিল না।

তিনি সর্বদা একাকী থাকিতেই ভাল-বাসিতেন। বাহিরের কেহ এমন কি আমাদের

সাধুরাও ২।১ দিনের জন্য আশ্রমে আসিলে ২।১ দিন বাদে সময়সারিকা দেখাইয়া আশ্রমত্যাগের নির্দেশ দিতেন।

অসুখ হইলেও তিনি কোনও ঔষধ খাইতে চাহিতেন না ও তাঁহার ঐ অসুখের বিষয় কেহ মঠে জানাইলে মহা বিরক্ত হইতেন ও সেই সেবকের উপরেও তৎক্ষণাৎ আশ্রম পরিত্যাগের আদেশ হইত।

এইরূপই ছিল তাঁহার অনন্যসাধারণ অত্যদ্ভুত আচরণ!

আমরা তাঁহাকে প্রথম দর্শন করি ইং ১৯২১ সালে। তখন তিনি স্বামীজীর মন্দির নির্মাণের জন্য বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। উহার কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর মন্দিরের পূজাদির ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তখন শুধু স্বামীজীর মন্দিরের নীচের অংশটুকু (যেখানে স্বামীজীর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে) ও উহার চারিদিকের আবরণ-শূন্য বারান্দামাত্রই ছিল। নিকটে তখন অন্য কোনও মন্দিরাদি ছিল না। মঠবাড়ীর অংশ ছাড়া তাহার দক্ষিণ দিকে, স্বামীজীর মন্দিরের দিকেও, কোন পোস্তা বাঁধান হয় নাই। জোয়ারে গঙ্গার জল প্রায় স্বামীজীর মন্দিরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িত। নির্জন স্থান বলিয়া অধিকাংশ সময় আমরা ওই স্থানে ধ্যান-জপাদিতে কাটাইতাম। অতি অল্প লোকই তখন সেদিকে আসিতেন। ঐ মন্দিরের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু ইষ্টকাদি পড়িয়াছিল। একদিন একটি বিদেশাগত ভদ্রলোক (সাহেব) আসিয়া আমাদের দেখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন— "তোমরা বিবেকানন্দের মন্দিরটি এরূপ অযত্নে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? আমরা তাঁহাকে কত শ্রদ্ধা করি, জান? ···" ইত্যাদি। আমরা তখন তাঁহার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারি নাই। পরে মহাপুরুষ মহারাজকে উহা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "কেন, ওটি under construction (নির্মাণাধীন) বললে না কেন?" সে-সময়ে আমরা মঠের অফিসেও কিছু কিছু কাজ করিতাম। জনৈক ব্রহ্মচারী তাহা পরিচালনা করিতেন। তাঁহার নিকট উহা বলিলে তিনি বলিলেন, "মহা-পুরুষ মহারাজ ঠিকই বলেছেন, এই মন্দিরের ওপরে শীঘ্রই একটি দোতলা মন্দির হবে। তার নক্সাদিও ঠিক হয়েছে এবং এর জন্য অর্থাদিও এসেছে। কিন্তু তা করবার ভার বিজ্ঞান মহারাজের ওপর। তিনি এলাহাবাদে থাকেন—একটু খামখেয়ালী লোক। তাই কবে এসে যে কাজ আরম্ভ করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি।"

এই প্রসঙ্গে তিনি পূজ্যপাদ মহারাজজীর সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদের বলিতে লাগিলেন:

আগে বিজ্ঞান মহারাজ উত্তর প্রদেশের Executive Engineer ছিলেন এবং স্বামীজী থাকতেই ঐ গৌরবের পদ ছেড়ে দিয়ে আলম-বাজার মঠে যোগ দেন ও স্বামীজীর আদেশ নিয়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে নিজেই বিদ্বৎ-সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তারপর বেলুড় মঠের জমি হলে স্বামীজীর আদেশে তিনি ঐ জমির ওপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর ও সাধুদের থাকবার স্থানটি নির্মাণ করেন। গঙ্গার পোস্তা ও সিঁড়িও তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত হয়। তিনি খুবই পণ্ডিত, 'সূর্যসিদ্ধান্ত' নামে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থটি তিনি অনুবাদ করেছেন, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আরও কিছু বই লিখেছেন।

উক্ত ব্রহ্মচারীটি এই প্রসঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত পোশাক ও আচরণ সম্বন্ধেও কিছু কথা আমাদিগকে শুনাইলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার যে সকল দিব্য দর্শনাদি হইয়াছে তাহাও অল্প-বিস্তর বলিলেন। সেজন্য আমরা বেশ কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার দর্শনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম।

মনে হয়, তখন ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। দেখিলাম একটি ছ্যাকড়া-গাড়ি করিয়া তিনি হঠাৎ মঠের সামনের মাঠে আসিয়া নামিলেন। তাঁহার এই আসার বিষয়ে পূর্বে কাহাকেও খবর দিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু তিনি একাকী গাড়ি হইতে অবতরণ করাতে মনে হইল যে, পূর্বে তাঁহার আসার সংবাদ মঠে আসে নাই। প্রথমেই তাঁহার অদ্ভুত পোশাকের উপর আমাদের দৃষ্টি পড়িল। বাস্তবিকই উহা অদ্ভুত। তাঁহার মাথায় একটি গরম কাপড়ের কানঢাকা টুপি, গায়ে একটি লম্বা গরম কোট—যাহা প্রায় হাঁটু অবধি নামিয়াছে এবং তাহার দুইদিকে বৃহদাকার কতগুলি পকেট— যাহার মধ্যে বহু জিনিস একত্রে রাখা চলে, পরনে একটি ছোট পাঁচ হাত ধুতি, পায়ে দুই জোড়া মোজা এবং চটি-জুতা। এই বেশেই তিনি গাড়ি হইতে নামিলেন। নামিয়াই কিন্তু তিনি সোজা স্বামীজীর মন্দির অভিমুখে গেলেন ও নিকটবর্তী যাঁহাদের দেখিতে পাইলেন (তাঁহাদের মধ্যে বোধ হয়, স্বামী শঙ্করানন্দজীও ছিলেন) তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামীজীর মন্দিরের জন্য কি কি মাল-মসলা যোগাড় করা হইয়াছে। উহা সবিশেষ শুনিয়া তিনি মঠবাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার জন্য পূর্ব হইতেই স্বামীজীর ঘরের পাশের ছোট ঘরটি— যাহা আমরা 'খোকা মহারাজের ঘর' বলিয়া জানিতাম— নির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেখানে উঠিলেন। ব্রহ্মচারী বুদ্ধচৈতন্য (বর্তমানে স্বামী ভাস্বরানন্দ) তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। আহার ও বিশ্রামাদি করিবার পর তিনি আবার স্বামী শঙ্করানন্দজী প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর মন্দির সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন।

অতি শীঘ্রই মাল-মসলা সব যোগাড় হইল এবং তিনিও নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশেরও ঊর্ধ্বে, দেহও খুবই স্থূল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিতে দেখিয়াছি। সকালে চা ও তৎসঙ্গে সামান্য কিছু খাইয়া, কুলি-মজুরেরা কাজে আসিবামাত্রই— বেলা ৮টায় তিনি কার্যস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বেলা ১১টা পর্যন্ত, যতক্ষণ মিস্ত্রি ও কুলিরা কাজ করিত ততক্ষণ, নিকটবর্তী বেদাকুঁ বৃক্ষতলে কখনও বা দাঁড়াইয়া কখনও বা বেঞ্চিতে বসিয়া সকল কার্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। ১১টায় সকলের কাজ শেষ হইলে তিনি আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া (স্নান তিনি অতি অল্পই করিতেন) দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার ১টা হইতে কাজ আরম্ভ হইলেই তিনি বিশ্রাম হইতে উঠিয়া সেখানে যাইতেন। তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আমরা নিজেদের দিকে তাকাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম।

আমাদের বন্ধুবর স্বামী ভাস্বরানন্দের নিকট শুনিয়াছি, ঐ সময় তাঁহার আহার অতি সাধারণই ছিল। সকালে কয়েক কাপ অতি অল্প দুগ্ধ-মিশ্রিত চা ও প্রসাদী দু-একটি সন্দেশ খাইয়াই তিনি তাঁহার কাজে যোগ দিতে যাইতেন। দ্বিপ্রহরে কার্য-নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বা সামান্য স্নান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ প্রসাদাদি পাইতেন। বৈকালেও ঐরূপ চা এবং রাত্রেও অনুরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) ভুবনেশ্বর মঠ হইতে বেলুড় মঠে আসিলেন। আসিয়াই তিনি সর্বপ্রথমে বিজ্ঞান মহারাজের আহারের আরও কিছু সুব্যবস্থা করিলেন ও তিনি যাহা যাহা খাইতে ভালবাসেন তাহা বাজার হইতে আনাইয়া তাঁহাকে খাওয়াই-

বার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার আহারাদি কিরূপ হইল, মাঝে মাঝে তাহারও খবর লইতেন। বিজ্ঞান মহারাজও ছোট শিশুটির ন্যায় তাঁহাকে নিজ আহারাদি বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিতেন। এই সময় তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ ঐ সময় অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া গঙ্গার দিকের উপরের বারান্দাটিতে তাঁহার আরামকেদারায় ভাবস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আমরা সাধু-ব্রহ্মচারিগণ একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ আসনে বসিয়া ধ্যান-জপাদি করিতাম। তাঁহার গুরুভ্রাতাগণও তাঁহাদের ধ্যান-জপাদি সারিয়া "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" বলিয়া প্রায় সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতেন। কেবল মহাপুরুষ মহারাজ, তাঁহার অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়াই হউক বা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, করজোড়ে শুধু "মহারাজ, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত" বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। শ্রীশ্রীমহারাজও স্মিতহাস্যে তাঁহাদের সকলকে "সুপ্রভাত" ও মহাপুরুষ মহারাজকে "তারকদা, সুপ্রভাত" বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞান মহারাজকে দেখিতাম, তিনি শুধু "সুপ্রভাত" বলিয়াই বা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, রোজই সকাল সন্ধ্যায় আমাদের সকলের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া তবেই নিজ কর্মে যোগ দিতে যাইতেন। শ্রীশ্রীমহারাজকে ঐ সময় বলিতে শুনিয়াছি : "পেসন (হরিপ্রসন্ন মহারাজ বা বিজ্ঞান মহারাজ)-এর ভক্তি শশীমহারাজের (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের) ভক্তির পরেই।"

নিত্যই সান্ধ্য আরাত্রিকের পরে আমরা পুনরায় শ্রীশ্রীমহারাজের সম্মুখে মিলিত হইতাম। মঠে উপস্থিত শ্রীশ্রীমহারাজের সকল গুরুভ্রাতাগণ ও মঠের অন্যান্য প্রাচীন সাধুবৃন্দও সেখানে আমাদের সহিত মিলিত হইতেন। কোন কোন দিন শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদের বলিতেন :

"তোরা শুধু চুপ করে বসে আছিস্ কেন? কিছু প্রশ্ন কর। পেসনকেই প্রশ্ন কর। তোরা জানিসনে, পেসন গুপ্তযোগী। ওই তোদের প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে।"

আমরা প্রায় কেহই কোনরূপ প্রশ্ন করিতে পারিতাম না। তখন শ্রীশ্রীমহারাজই আমাদের হইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে এক-একটি প্রশ্ন করিতেন এবং তিনিও একেবারে অনভিজ্ঞ বালকের মত হাতজোড় করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিতেন : "মহারাজ আমি কি জানি? আমি কি জানি? আপনিই ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিন।"

অবশ্য মহারাজ ইহাতেও ছাড়িতেন না। অবশেষে বিজ্ঞান মহারাজকে কিছু উত্তর দিতে হইত। এইরূপে অতি কুশলী হইয়াও তাঁহাকে বালকের ন্যায় আচরণ করিতে দেখিতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজ রোজই তাঁহার কাজের (স্বামীজীর মন্দিরের কাজের) খবর লইতেন এবং মাঝে মাঝে তাহাতে কোনও ত্রুটি হইলে তাহাও দেখাইয়া দিতেন। বিজ্ঞান মহারাজও উহা অতি সম্ভ্রমের সহিত মানিয়া লইতেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের সম্মুখেই শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিতেন : "মহারাজ, আপনি এই সব কি করে জানলেন?" মহারাজও ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিতেন: "পেসন, গুরু-কৃপাসে সব আপ্‌সে আ যাতা হ্যায়!" বিজ্ঞান মহারাজ ভূতপূর্ব উচ্চপদস্থ সরকারী ইঞ্জিনিয়র হইয়াও উহা নতমস্তকে মানিয়া লইতেন।

এই সময় একদিন শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি বিজ্ঞান মহারাজের যে অপূর্ব শ্রদ্ধা ও বালকোচিত ব্যবহার দেখিয়াছিলাম তাহা অবিস্মরণীয়।

স্বামীজীর মন্দিরের কার্যে কতকগুলি মজুর ও মজুরনী নিযুক্ত হইয়াছিল। উহাদেরই একটি মজুরনীকে শ্রীশ্রীমহারাজ স্নেহ করিতেন ও মাঝে মাঝে তাহাকে ডাকাইয়া কিছু প্রসাদাদি খাওয়াইতেন। এইরূপ একদিন দ্বিপ্রহরে আহার-কালে শ্রীশ্রীমহারাজ অকস্মাৎ বলিলেন: "ঐ মজুরনীটিকে ডেকে আন্ তো। আমার পাতে ভাল ভাল মিষ্টি আছে দেখছি—এর কিছু তাকে দিতে হবে।"

একটি সেবক তৎক্ষণাৎ যাইয়া বিজ্ঞান মহারাজকে এই কথা বলিল। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন: "এখন ও যেতে পারবে না। একটি কাজে কেবল মাত্র হাত দিয়েছে।"

শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট ইহা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন: "আমার নাম করে বল যে আমিই ডাকছি। তবে পেসন নিশ্চয়ই ওকে ছেড়ে দেবে।" কিন্তু এইবারও বিজ্ঞান মহারাজ বলিলেন: "না, ওকে এখন ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজ এখনও অনেক বাকী রয়েছে—সেটুকু শেষ হলেই ছেড়ে দেব।"

শ্রীশ্রীমহারাজ এই কথা শোনামাত্রই গম্ভীর হইয়া তৎক্ষণাৎ অর্ধভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়িলেন ও হাতমুখ ধুইয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। বিজ্ঞান মহারাজের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ সকল কাজ বন্ধ করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট ছুটিয়া আসিলেন ও তাঁহার দরজায় "মহারাজ, মহারাজ" বলিয়া ধীরে ধীরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। মহারাজ দরজা খুলিলেন না। তখন বিজ্ঞান মহারাজ সেখান হইতে কিছুদূর গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার দরজায় "মহারাজ, মহারাজ" বলিয়া অনুরূপ মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিলেন। এবারও দরজা খুলিল না। আমরা নিকটেই ছিলাম। তখন তিনি আমাদের নিকট আসিয়া অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন: "ভাই, মহারাজ কি খুবই রেগে গিয়েছেন? আমি কি বোকা! মহারাজের কথা শুনে তখনই ওকে ছেড়ে দিলাম না কেন?" এইরূপ বলেন ও নানারূপ কাতরোক্তি করিতে থাকেন। সেইদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহার আর আহার হইল না। শ্রীশ্রীমহারাজও অর্ধাহার করিয়া সেই যে দরজা বন্ধ করিয়াছিলেন বৈকাল চারিটার পূর্বে উহা আর খুলিলেন না। বেলা চারিটার সময় দরজা খুলিয়া শুনিলেন বিজ্ঞান মহারাজ তখনও আহার না করিয়া যথাসময়ে তাঁহার কার্যস্থলে চলিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াই মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেবককে বলিলেন "শিগগীর কয়েকটা বড় বড় রাজভোগ ও আর যা ভাল ভাল মিষ্টি আছে, তা একটি থালায় সাজিয়ে নিয়ে আয় তো—আর হরিপ্রসন্নকে ডেকে আন। হরিপ্রসন্ন এগুলি খেতে খুবই ভালবাসে!"

বিজ্ঞান মহারাজকে খবর দেওয়া হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিলেন ও সজল নয়নে শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন: "মহারাজ আমি বড়ই বোকা, বড়ই বোকা! আপনার কথা না শুনে কি অন্যায়ই না করে ফেলেছি।"

মহারাজ শুধু স্নেহভরে বলিতে লাগিলেন: "ওসব কথা এখন রেখে দাও। সারাদিন তুমি খাওনি—তোমার খাবার সাজান রয়েছে—তার সাথে এই মিষ্টিগুলিও খেয়ে ফেল—এ খেতে তো তুমি ভালবাস।"

ইহা শুনিয়া বিজ্ঞান মহারাজ শ্রীশ্রীমহারাজের সম্মুখে খাইতে বসিলেন ও ছোট শিশুটির ন্যায় একে একে ঐগুলি শেষ করিলেন। এইরূপই ছিল তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা!

আর একদিনের ঘটনা—সেই দিন মহাজ্ঞানী হইয়াও তাঁহাকে কিরূপ বালকের ন্যায় আচরণ

করিতে দেখিয়াছিলাম তাহাই এখানে বলিতেছি। পূর্ব রাত্রে মঠে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা হইয়া গিয়াছে; এইদিন বৈকালে বিসর্জন হইবে। বিজ্ঞান মহারাজ তাঁহার ঘরটিতে বসিয়া আছেন ও সেখানে স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (ললিত মহারাজ) এবং আরও কয়েকজন সাধু উপস্থিত আছেন। কমলেশ্বরানন্দ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। তিনি কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের গদাধর আশ্রমে বেদ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন ও বিশিষ্ট বেদ-বেদান্তাভিজ্ঞ কয়েকজন পণ্ডিতসহ ঐ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। আমরা বিজ্ঞান মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, তিনি তাঁহার সহিত দেবদেবীর কয়েকটি বীজমন্ত্রের বিষয় আলোচনা করিতেছেন ও উহা কেন বিভিন্ন প্রকারের হইল তাহাও ব্যাখ্যা করিতেছেন। যতদূর মনে পড়ে শুনিয়াছিলাম, তিনি ললিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন: "আচ্ছা, শিবের মন্ত্রের সঙ্গে 'ঐঁ' বীজটা[১] কেন যুক্ত হয়েছে জান? 'ঐঁ' বীজের অর্থ হল অনন্ত, উদার— আকাশবৎ। শিবও তাই — সেজন্য তাঁর মন্ত্রের সাথে ওই 'ঐঁ' বীজটি সংযুক্ত হয়েছে।"[২]

এইরূপ আরও নানাকথা হইবার পর ৺কালী-পূজা সম্বন্ধে কথা উঠিল। হরিপ্রসন্ন মহারাজ বলিলেন: "পূজায় 'আবাহন'-এর অর্থ তো অন্য কিছু নয়— আমাদের মধ্যে যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রয়েছেন তাঁরই জাগরণ ও পরে হৃদয়-ঘটে তাঁরই স্থাপন। এরপর পূজক তাঁর শরীরাদি শুদ্ধ করে নিজে দেব- বা দেবী-স্বরূপ হয়ে তাঁকেই আবার সামনের ঘটে স্থাপন করেন এবং ঘট থেকে পরে তাঁকে প্রতিমায় আনেন। ঐ ঘটটি আমাদের হৃদয়-ঘটের প্রতীকমাত্র। আবার পূজান্তে তাঁকে পুনরায় 'সংহার মুদ্রায়' প্রতিমা থেকে নিয়ে এসে প্রথমে ঘটে স্থাপন করতে হয়; পরে ঐ ঘট থেকে তাঁকে তাঁর স্বস্থান— হৃদয়-ঘটে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়— এরই নাম 'বিসর্জন'। বিসর্জন অন্য কিছু নয়। আমরা সর্বদা আমাদের ভিতরে —হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করতে পারি না বলেই আমাদের ঐ রকম বাহ্য প্রতীক অবলম্বন ক'রে তাঁর পূজা করতে হয়।"

সেই দিন তাঁহার ঐরূপ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তন্ত্র ও বেদান্তের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা শুনিয়া আমরা খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

কিন্তু বৈকালে আবার তাঁহার অন্যরূপ দেখিলাম! বৈকালে বিসর্জনের সময় আসিলে শ্রীশ্রীমহামায়ার প্রতিমাকে পূজা-স্থান হইতে আনিয়া বিসর্জনের জন্য গঙ্গার ঘাটের নিকট রাখা হইল। সাধুগণ মায়ের সম্মুখে ভজনাদি করিয়া মাকে বিদায়-সঙ্গীত শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমহারাজ তখন মঠে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এবং মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন নীচে গঙ্গার দিকের একটি বেঞ্চে বসিয়া ঐ সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিতেছিলেন ও মাকে দর্শন করিতেছিলেন।

---

১ 'ঐঁ' অক্ষরটির একটি অর্থ শিব, বাণলিঙ্গ শিবের পূজায় ঐঁ বীজের প্রয়োগও আছে; তথাপি মনে হয়, মহারাজজী সম্ভবতঃ হৌঁ বলিয়াছিলেন, ঐঁ নহে। হৌঁ শিবের প্রসিদ্ধ বীজ। হ' অক্ষরের অর্থ 'শিব' এবং 'আকাশ'ও।—সঃ

২ দাক্ষিণাত্যের চিদম্বরম্ শহরের শিবলিঙ্গকেও সেখানকার ভক্তগণ আমাদের নিকট ঐরূপ 'আকাশ-স্বরূপ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। হয়ত তাঁহারই নামানুযায়ী শহরটিরও নাম চিদম্বরম্— চিৎ (জ্ঞান) অম্বরম্ (আকাশ)— হইয়াছে। আমাদের উপনিষদেও ব্রহ্মকে ঐরূপ 'কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি 'কং'=সুখ বা আনন্দস্বরূপ ও 'খং'=আকাশস্বরূপ। এই জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকেই হয়ত সর্বনিস্পৃহ পরমকল্যাণময় শিবরূপ দেওয়া হইয়াছে। তাই হয়ত শিবের বীজমন্ত্র 'ঐঁ' যেরূপ বিজ্ঞান মহারাজ বর্ণনা করিয়াছিলেন— তাঁহার মন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

এমন সময় বিজ্ঞান মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন : "পেসন, মা যাচ্ছেন, তাঁর কানে কানে বলে এস, 'মা, তুমি আবার এসো'।"

শুনিয়াই বিজ্ঞান মহারাজ—যাঁহার মুখে সকালে ঐরূপ বেদান্ত ও তন্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম— তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমার নিকট গেলেন ও মায়ের কানের নিকটে মুখ রাখিয়া কিছু বলিয়া চলিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে বলিলেন : "মহারাজ, বলেছি।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন : "কি বলেছ, পেসন ?" তখন বিজ্ঞান মহারাজ ছোট ছেলেটির মত বলিলেন : "বলেছি, 'মা, তুমি আবার এস'।"

তাঁহার চরিত্রে এইরূপই অপূর্ব জ্ঞান ও বালকোচিত সারল্য ও ভক্তির সমন্বয় দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম।

শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্বামীজীকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, একদিন উহা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন: "বাপ্, তাঁর সামনে এগোয় কে? আমরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করতাম। আগুনের কাছে গেলে যেমন আঁচ লাগে,তাঁর কাছে গেলেও ঐরূপ আঁচ অনুভব করতাম ; আর তোমরা যেভাবে মহারাজকে পিছন দিক থেকে এসে প্রণাম কর, আমিও তাঁকে (স্বামীজীকে) ঐরূপ করতাম। তিনি মঠে উপস্থিত থাকলে মঠের ওই গেট (এখন যাহার নিকটে সারদাপীঠের প্রদর্শনী-কক্ষ— Show-Room - হইয়াছে) থেকেই তা বোঝা যেত। সারা মঠ তখন গমগম করত। আবার তিনি উপস্থিত না থাকলে মঠের অন্য রূপ।"

আর একদিন আমরা তাঁহাকে একটি পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিয়া কিছু প্রশ্ন করিলে স্বামীজীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের মাধুর্য সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। মঠের পোস্তা ও সিঁড়ি বাঁধানোর জন্য পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ ব্যয়ের যে খসড়া হিসাব (Estimate) দিয়াছিলেন তাহার অনেক অতিরিক্ত খরচ হওয়ায় স্বামীজী শ্রীশ্রীমহারাজকে খুবই তিরস্কার করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীমহারাজও তখন সজল নয়নে বিজ্ঞান মহারাজকে বলিয়াছিলেন : "পেসন, তোমারই জন্য আজ আমাকে স্বামীজীর কাছে এরকম গালাগাল খেতে হল।" এই শ্রুত ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে আমরা পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন : "হ্যাঁ ভাই, এটি সত্য।" আমরা আশ্চর্য হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম: 'মহারাজ, আপনি এর আগে তো কতই এমন ব্যয়ের খসড়া হিসেব করেছেন, তবে এরূপ ভুল হিসেব করলেন কেন ?" তিনি উহার জন্য মাত্র আটশো টাকা হিসাব দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী যখন মহারাজের নিকট হিসাব চাহিলেন তখন উহার জন্য পনেরশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, তখনও কিন্তু উক্ত প্রকল্পটি অর্ধসমাপ্ত। তদুত্তরে তিনি বলিলেন : "জান কি ভাই, স্বামীজীকে ঐ রকম অল্পব্যয়ের খসড়া হিসাব না দেখালে তিনি কি কখনও ঐ কাজে হাত দিতেন ?" ইত্যাদি।

মনে হয়, ইহারই কিছু পরে পুনরায় স্বামীজীর গালাগালি খাইবার ভয়ে তিনি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকটে কিছুদিন থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া একটি চলতি নৌকা ডাকিলেন এবং উহাতে যেমনই উঠিতে যাইতেছেন, স্বামীজী উপর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন: "পেসন, যেও না, যেও না, তুমি রাজার (মহারাজ) কাছে যেও না—রাজা খুব ভাল লোক নয়।" তারপর তিনি বলিলেন--"আমি কি আর শুনি! তখনই নৌকোয় চড়ে তার ছইয়ের নীচে গিয়ে বসলাম।"

এইরূপই ছিল তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ গভীর প্রেম ও প্রীতিমধুর কলহ।

তিনি বলিতেন: "এখনও স্বামীজী তাঁর ওই ঘরটিতে রয়েছেন। তাই ঐ ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি অতি সন্তর্পণে যাই, পাছে তাঁর ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে। তাঁর শরীর থাকতে একদিন তাঁকে ঐ ঘরে বসে ধ্যান করতে দেখেছিলাম। সে সময় তাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে সমস্ত ঘরটি আলোকিত দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম—তিনি কি সাধারণ মানুষ!"

শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন মন্দির নির্মাণকালে উহার ভিত্তি-প্রস্তরখানি যেখানে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ উহাকে পূর্বে স্থাপিত করিয়াছিলেন সেইখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া বিজ্ঞান মহারাজ যখন বর্তমান মন্দিরের নীচে পুনঃ স্থাপন করেন, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমরা তাঁহার নিকটেই ছিলাম। দেখিলাম, তিনি উপরের দিকে তাকাইয়া গদ্‌গদ-স্বরে বলিতেছেন:—"স্বামীজী, স্বামীজী, তুমি তো বলেছিলে—'যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণ হবে, পেসন, তখন আমি হয়ত আর এ শরীরে থাকব না, কিন্তু ওপর থেকে তা আমি দেখব'—আজ তো এর ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, স্বামীজী, ওপর থেকে তুমি তা দেখ।"

ইহা বলিয়াই প্রতিষ্ঠাকার্য শেষ হইলে তিনি ছলছল চক্ষে নিজ ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহারাজ, আপনি কি সত্যই সেদিন স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, শুধু স্বামীজী কেন, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীমহারাজ প্রভৃতিও সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ করে গিয়েছেন। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই তো কাজ আরম্ভ করেছি।"

তাঁহার দিব্যদর্শনাদি সম্পর্কে তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, আমার ঐরূপ কিছু কিছু হয়েছে; কিন্তু মহারাজের আরও অনেক বেশী।" এই বলিয়া কৌতুকভরে বলিলেন, "তবে ব্যাপার কি জান? আমার মাথাটা কিছু গরম— আর মহারাজের আরও বেশী।"

এই প্রকার কৌতুকচ্ছলে তিনি আমাদের কত গভীর তত্ত্বই না শুনাইয়াছিলেন! যে-সকল অপূর্ব উপাদানে তাঁহার পবিত্র ও উন্নত জীবন গঠিত ছিল, সেইগুলি তাঁহার সান্নিধ্যলাভে ধন্য সকলের জীবনেই অল্প-বিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার প্রধান সেবক বেণীর সম্বন্ধে কিছু বলা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। বেণী দরিদ্রের সন্তান, শৈশবেই পিতৃহীন। দারিদ্র্যের তাড়নায় সে অতি শৈশবে পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজের নিকট চাকুরী করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে চাকর হিসাবে গ্রহণ করেন নাই, প্রথমাবধি নিজ সন্তানের মতই পরম স্নেহে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন। বেণী না হইলে তাঁহার কোনও কর্মই যেন সমাধা হইত না। কখনও তিনি তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতেন, কখনও বা 'বেণীবাবু' বলিয়া সন্তানোচিত আদর করিতেন। তাঁহার শরীরের সেবা বেণী ব্যতীত অপর কাহারও করিবার অধিকার ছিল না। যখন তিনি বেলুড় মঠে বিশেষ অসুস্থ তখনও দেখিয়াছি, তিনি সাধুদের সেবা পছন্দ করিতেছেন না এবং তাঁহারই আদেশক্রমে টেলিগ্রাম করিয়া বেণীকে এলাহাবাদ হইতে আনা হইল। বেণী তাঁহার সকল সেবার ভার লইলে তিনিও নিশ্চিন্ত হইলেন।

যখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার শরীর আর বেশীদিন থাকিবে না তখন একদিন বেণীকে ডাকিয়া বলিলেন: "বেণী, তোর জন্য কি

টাকা আমি রেখে যেতে চাই, নয়ত আমার শরীর গেলে তোর নিজের ভরণ-পোষণের জন্য হয়ত কষ্ট হবে।"

দরিদ্র-সন্তান বেণী কিন্তু তখন হাতজোড় করিয়া বলিল: "মহারাজ, আপনার কৃপায় আমার সবই হয়েছে (বেণীর বয়স তখন প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর, বিবাহ করে নাই)। আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না—শুধু আশীর্বাদ করুন যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর আমার অচলা ভক্তি থাকে।" এলাহাবাদ আশ্রমবাসিগণ বলেন যে, তখন বিজ্ঞান মহারাজ তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন: "বেণী, যদি এই হাত দিয়ে কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের এতটুকুও সেবা করে থাকি, তবে আশীর্বাদ করছি তাঁর চরণে তোর অচলা ভক্তি থাকবে।"

১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজের দেহত্যাগের পর এলাহাবাদ আশ্রমে গিয়া দেখিয়াছি, বেণীর বাড়ি হইতে অনেক আত্মীয়-স্বজন আসিয়াছে এবং তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবার ও বিবাহ করিবার কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছে। হয়ত তাহারা ইহাও ভাবিয়াছিল যে, পূজনীয় মহারাজ যখন তাহার উপর ঐরূপ নির্ভর করিতেন, তখন অবশ্যই তাহাকে বিশেষ কিছু অর্থাদি দিয়া গিয়াছেন এবং তাহার ঐরূপ ঐকান্তিক সেবাদির জন্য সে হয়ত আশ্রম হইতে আরও কিছু পাইতে পারে। বেণী কিন্তু কাহারও কথা শুনিল না। সে শুধু বলিল: "মহারাজ আমাকে এখানে রেখে গিয়েছেন, আমি এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলব।"

ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে বেণীর কঠিন অসুখ হইল। পূজনীয় শঙ্করানন্দ মহারাজ তখন ৺কাশী সেবাশ্রমে। তিনি বেণীকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি এলাহাবাদ আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষকে বেণীকে ৺কাশীতে পাঠাইতে বারংবার লিখিতে লাগিলেন। কারণ কাশী সেবাশ্রমে তাহার সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বেণী কিন্তু নিজ সংকল্পে দৃঢ় রহিল। সে কেবল বিনীতভাবে বলিল: "মহারাজের আশ্রমে অতি শৈশবে এসেছি, তাঁর স্নেহেই মানুষ হয়েছি; আমাকে আপনারা দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমি এ আশ্রম ছেড়ে যাব না।" শঙ্করানন্দ মহারাজ ইহা শ্রবণ করিয়া নিজেই এলাহাবাদে গিয়া তাহাকে আনিবার সঙ্কল্প করিলেন। বেণী যখন শুনিল যে, তিনি উহার জন্য অমুক তারিখে এলাহাবাদে আসিতেছেন, সে সেই দিনই সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিল। মনে হয়, পূজ্যপাদ বিজ্ঞান মহারাজের আশীর্বাদে শেষ মুহূর্তে সে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছিল।

এইরূপে অবহেলিত লৌহও স্পর্শমণির স্পর্শে উজ্জ্বল স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল—সাধুসঙ্গের ইহাই মহিমা!

বিজ্ঞান মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর দুইটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন—যাহা তিনি শেষাবধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। উহার প্রথমটি ছিল এইরূপ: "যখন ধ্যান করবে তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে তা করবে।" সেইজন্য আমরা দেখিতাম, রাত্রে আহারাদির পরই তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িতেন। আমরা ভাবিতাম, উহা তাঁহার অভ্যাস। তখন আমরা তাঁহার ঘরের নিকট স্বামীজীর বারান্দায় শুইতাম। সে সময় কখনও হঠাৎ ঘুম ভাঙিলে দেখিতাম, তিনি সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া আমাদের পাশ দিয়া ছাদের দিকে হাত-মুখ ধুইতে যাইতেছেন। তাঁহার এইরূপ উলঙ্গ অবস্থার কারণ আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশমত সর্ব-বন্ধনমুক্ত হইয়া শায়িত অবস্থাতেও তিনি ঐরূপ

ধ্যান করেন।

তাঁহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্য আদেশটি ছিল,—"সোনার মেয়েমানুষ যদি ভক্তিতে গড়াগড়িও দেয়, তাও তুমি তার দিকে কখনও ফিরেও চেয়ো না।" মঠের প্রেসিডেণ্ট হইবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ইহা বর্ণে বর্ণে পালন করিয়াছিলেন। উহার কিছু পূর্বে যখন তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে শেষ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন তখন বাকরহিত অবস্থাতেও বাঁহাত তুলিয়া তাঁহাকে কৃপা করিতে ও সকলকে আশীর্বাদ করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব মনোভাব একেবারেই বদলাইয়া যায়। তিনি বলিতেন: "মহাপুরুষ মহারাজের ঐ উদার ভাব তখন আমার ভিতরে যেন ঢুকে যায়।" তারপর থেকে তিনি স্ত্রী-পুরুষ- নির্বিশেষে দীক্ষা দিতেন। এ বিষয়ে হয়ত ঠাকুরের আদেশও তখন পাইয়াছিলেন। তৎপূর্বে কোনও স্ত্রীলোক তাঁহার এলাহাবাদ আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিত না। তাঁহার একজন গুরুভ্রাতা ঠাট্টা করিয়া বলিতেন যে, বিজ্ঞান মহারাজের আশ্রমে স্ত্রী মাছিটিরও প্রবেশ করিবার যো নাই।

তিনি যখন স্বামীজীর মন্দির-নির্মাণ কার্য পরিচালনা করিতেছিলেন সেই সময় আমরা জনৈকা ভক্তিমতী মহিলাকে লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করাইতে গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ মহিলাটিকে খুবই স্নেহ করিতেন। মহিলাটি বিজ্ঞান মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। প্রণামান্তে মাথা উঠাইয়া মহিলাটি তাঁহার ঐ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইয়াছিলেন। আমরাও তখন উহার কারণ বুঝিতে পারি নাই। পরে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশেই যে তিনি ঐরূপ ব্যবহার করিতেছেন তাহা জানিতে পারিয়াছিলাম।

এইরূপ জ্ঞান, ভক্তি ও বালকোচিত সারল্যের সহিত তাঁহার আচরণে অপূর্ব সংযম, নিষ্ঠা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

সাধারণের সহিত আচরণে তিনি আমাদের ন্যায় কোনও মৌখিক ভদ্রতার (Formality) ধার ধারিতেন না। হয়ত একঘর লোকের সহিত তিনি ধর্ম বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারাও উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ভাব (Mood) বদলাইয়া গেল ও তাহাদের দিকে তাকাইয়া—"তা হলে আপনারা এখন আসতে পারেন"—এই বলিয়াই তাঁহাদের সম্মুখে দরজা বন্ধ করিয়া করিয়া দিতেন। এইরূপ অদ্ভুত বালকোচিত ব্যবহার আমরা তাঁহার আচরণে প্রায়ই দেখিতে পাইতাম— যাহা আমাদের আচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই ভগবান বলিয়াছেন—"বুধো বালকবৎ…" ইত্যাদি।

তিনি মঠের প্রেসিডেণ্ট হইবার পরও তাঁহার ঐ প্রকার অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়াছি। ভক্তেরা তাঁহার জন্য নানারূপ মিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি সানন্দে উহা আমাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। আবার কখনও বা বহু মিষ্ট দ্রব্যাদি একত্রিত হইলেও তাঁহার সেবকদের বলিতেন: "ও আর আজ কাউকে দেওয়া হবে না। সবটুকুই আমার জন্যে রেখে দাও।" পরদিন হয়ত তার সবটাই নষ্ট হইয়া যাইত এবং তাহা গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইত।

তিনি দীক্ষাদি দেওয়া আরম্ভ করিবার পর ভক্তেরা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ অনেক বস্ত্রাদি তাঁহাকে দিতেন। উহা কখনও কখনও তিনি মঠের উপস্থিত সাধুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। আর কখনও বা বলিতেন: "ওর থেকে একটিও কাউকে দেওয়া হবে না, সবই আমি এলাহাবাদ

নিয়ে যাব।"

সেবকগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিলেন: "সেখানে এত কাপড় নিয়ে গিয়ে কি করবেন?" তিনি বলিতেন: "ও আমার ভাণ্ডারায় লাগ্‌বে।" ঐরূপে একবার দুই বাক্স বোঝাই কাপড় তিনি এলাহাবাদ লইয়া যান। তাহার কিছুদিন পর তাঁহার শরীর যাওয়ায় ঐ কাপড়গুলি বাস্তবিকই তাঁহার ভাণ্ডারায় লাগিয়াছিল ও উহা উপস্থিত সাধুদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

এইরূপ ছিল তাঁহার অদ্ভুত আচরণ, আমাদের চক্ষে যাহা 'বালকবৎ', 'উন্মাদবৎ' প্রতিভাত হইত। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত পরমহংস সন্ন্যাসীদের পূর্বোক্ত বিশেষণগুলির তাৎপর্য তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমরা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছি।

আজ পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ স্থূল শরীরে নাই। কিন্তু তাঁহার পূত অশরীরী আত্মা আমাদের সকলের পিছনে থাকিয়া বলিতেছেন: "আরও অগ্রসর হও, আরও অগ্রসর হও, ওখানেই বসে থেকো না। দেখবে সামনে কতই আনন্দ। যা পেয়ে আমাদের জীবন আনন্দময় হয়েছে, তোমরাও সেই আনন্দের অধিকারী হও।"

কন্যারূপিণী শিবগেহিনী

শ্রীশেফালিকা দেবী

বর্ষার সজল কৃষ্ণ মেঘরাশি অপগত। স্নিগ্ধ নীলাকাশে শুভ্র মেঘপুঞ্জ। স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাত-কিরণ। শিশিরবিন্দু-শোভিত শ্যামশষ্পাবৃতা ধরণী। অলি-গুঞ্জরিত কমল, কুমুদ, কহ্লার শোভিত সরসী। দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র। বৃষ্টিস্নাত বৃক্ষরাজি। বিহগকূজনে মুখরিত দিগঙ্গন। বীচিসঙ্কুলা গৈরিকবসনা তটিনী। নদীকূলে আন্দোলিত শুভ্র কাশগুচ্ছ। বাতাসে শিউলির সৌরভ।

শারদশ্রীর মধুরিমা প্রাণে এক অপূর্ণতা জাগিয়ে তোলে—হৃদয়ের নিভৃত তলে গুঞ্জরিত হয়: 'আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে কি জানি পরাণ কি যে চায়।' সে চাওয়া বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। এককালে এই সময়ে রাজা যেতেন রাজ্যজয়ে। প্রবাসীর মন এই কালে ধাবিত হয় গৃহপানে। গৃহবাসী যায় বিদেশ ভ্রমণে। জননীর মন ব্যাকুল হয় পতিগৃহ-বাসিনী কন্যার জন্য। কন্যার মন চঞ্চল হয় পিতৃগৃহের কথা স্মরণ করে। ভক্ত-হৃদয়ে আকুলতা জাগে ভগবানের লীলারস আস্বাদনের জন্য। তাই শরতের এই স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশে সে চায় না লীলাবিহীন নিত্যকে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অরূপ ব্রহ্মকে বা ষড়ৈশ্বর্যশালী সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। সেই অনাদি অনন্ত ইন্দ্রিয়াতীতকে—সেই বিশ্ববিমোহিনী চৈতন্য-স্বরূপিণী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়াকে সে কল্পনা করে কেবল মাধুর্যমণ্ডিতা, স্নেহপ্রত্যাশিনী কিশোরী কন্যারূপে। ভক্তিহিমে জমাট বাঁধা বিগ্রহধারিণী সেই লীলাময়ীকে ভক্ত-হৃদয় তখন চুম্বক হয়ে আকর্ষণ করে বলে:

'জগৎ ভুলে যার মায়ায়
ভুলেছে সে আমার মায়ায়
একবার কোলে মা আয়, মা আয়
মনোবাঞ্ছা করি পূর্ণ।'

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন রায় রামানন্দকে বলেন "পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়" তখন প্রসঙ্গক্রমে "রায়

কহে বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার।”

বাৎসল্যরসের এই বিকাশ হয় পুত্র বা কন্যাকে কেন্দ্র করে। বৈষ্ণবসাহিত্যে বাৎসল্য-রসের কেন্দ্র ‘পুত্র’ এবং শাক্তসাহিত্যে এই রসের কেন্দ্র ‘কন্যা’। পুত্র সব সময় নিকটেই থাকে। যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ হ'ত শুধু গোচারণ সময়ে। সেইটুকু সময়ের অদর্শনে নন্দরাণীর যে ব্যাকুলতা—তা সত্যই মধুর। কিন্তু পতিগৃহ-বাসিনী, দরিদ্র হরের ঘরণী, কন্যার বৎসরব্যাপী অদর্শনজনিত মেনকার যে আর্তি, তা তুলনা-বিহীন।

বিজয়ার পরদিন হতেই মেনকা তথা ভক্ত-হৃদয়ের দিবস গণনা আরম্ভ হয়। কুহেলিঢাকা হেমন্ত, শুষ্কপত্র মর্মরিত শীত, মধুর বসন্ত, প্রখর নিদাঘ, মেঘমেদুর বর্ষা একে একে গত হয়—আবার ফিরে আসে স্বর্ণোজ্জ্বল শরৎ। ভক্ত হৃদয়ের প্রার্থনা মেনকার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

‘গিরি! প্রাণ গৌরী আন আমার।
উমা-বিধুমুখ না দেখি বারেক
এ ঘর লাগে অন্ধকার।’

ব্যাকুলতা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। মেনকা তখন জিজ্ঞাসা করেন :

‘কবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে॥’

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বিলম্ব যখন অসহনীয়, জাগরণে-স্বপ্নে উমা ব্যতীত অন্য চিন্তা নেই, তখন বলেন :

‘যাও, যাও গিরি, আনিতে গৌরী
উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন
উমা মা মা বলে কেঁদেছে।’

মিলনের পর পরমপ্রেমাস্পদের সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তা ভক্তের অসহনীয়— ভক্তহৃদয় চায় সেই প্রিয়তমকে চিরদিন প্রেমডোরে আবদ্ধ রাখতে। তাই মিলন-প্রতীক্ষারত গিরিজায়ার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

‘এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না।’

অবশেষে একদিন প্রতীক্ষার অবসান হয়। সংবাদ আসে কন্যা অঙ্গনবাহিরে সমাগতা। ব্যাকুলা জননী—

‘অমনি উঠিয়ে পুলকিত হয়ে
ধাইল যেন পাগলিনী।
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল,
অঞ্চল লোটায় ধরণী॥’

কিন্তু শুদ্ধা ভক্তি ঐশ্বর্যের লেশমাত্রও সহ্য করতে পারে না। ঐশ্বর্য-দর্শনে ভাব ভঙ্গ হয়। তাই দশপ্রহরণধাবিনী গৌরীকে দর্শন করে মেনকা বিস্ময়-চমকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন :

‘করী অরিপরে আনিলে হে কারে
কৈ গিরি মম নন্দিনী;
আমার অম্বিকা দ্বিভুজা বালিকা
এ যে দশভুজা ভুবনমোহিনী।’

কিন্তু প্রবল প্রেমের ধর্ম এই যে, সে সমস্ত ঐশ্বর্যকে মুহূর্তে আবৃত করে।

“কেবলার শুদ্ধপ্রেমা ঐশ্বর্য না জানে।
ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥”

তাই বালককৃষ্ণের মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে যশোদা প্রথমে ভীতা হলেও পরমুহূর্তে তা বিস্মৃতা হয়ে গোপালকে পুত্র বলেই আলিঙ্গন করেছিলেন; অসুরদলনীকে দর্শন ক'রে চমকিত হলেও মেনকার মাতৃহৃদয়ে সে ভাব রেখাপাত করতে পারে না—দশপ্রহরণধারিণীর মধ্যেও ‘নন্দিতমেদিনী’ নিজ নন্দিনীকে খুঁজে পেতে তাঁর একটুও দেরী হয় না। স্নেহবিগলিত কণ্ঠে তিনি আহ্বান করেন, অনুযোগ করেন :

‘উমা আয় মা আমার কোলে।
বহুদিন পরে আবার ডাক দেখি মা বলে॥

সেই যে দশমীদিনে, গেলিগো আর এলিনে,
পাষাণ প্রাণে যাস্ কেমনে কাঁদায়ে আমায় ফেলে॥'

কিন্তু ব্যাকুলতা কি কেবল একপক্ষেই? ভক্তের জন্যও কি ভগবান ব্যাকুল হন না? সন্ধ্যা-রাত্রিকের সময় দক্ষিণেশ্বর কুঠিবাড়ীর ছাদে কেন ত্বরে আর্ত আহ্বান উত্থিত হত - "ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস আয়। আমি যে তোদের না দেখে থাকতে পারছিনে।" শুধু ভক্তই ভগবানের প্রেমাকাঙ্ক্ষী নয় ভগবানও প্রেমভিখারী। তাই তিনি দ্বারকার অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করেও দরিদ্র সুদামার জীর্ণ উত্তরীয় প্রান্তে আবদ্ধ উপকরণবিহীন শুষ্ক চিপিটক সানন্দপূর্বক গ্রহণ করেন, শবরীদত্ত বনফল সাগ্রহে মুখে তোলেন; দুর্যোধনের সাড়ম্বর অভ্যর্থনা উপেক্ষা করে বিদুরের গৃহে গমন করেন। মর্ত্য-বাসিনী মেনকার মৃন্ময় কুটিরে আসার জন্য তাই কৈলাসবাসিনীর মনও চঞ্চল হয়। ভক্তের আকুল আহ্বান শোনার জন্য তিনি উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। ভক্ত আহ্বান না করলেও সে উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করে অযাচিতভাবে এগিয়ে আসেন। তাই জননীর অভিযোগে কন্যা—

'অমনি দুবাহু পসারি মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে—
"কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, আমার পিতাও পাষাণ
জেনে এলাম আপনা হতে।
গেলে নাকো নিতে
রব না, যাব দু'দিন গেলে!"'

মাতা তখন কন্যাকে বক্ষে ধারণ করে সমস্ত স্নেহ দিয়ে তার বেদনা মুছিয়ে দেন—কুশল প্রশ্ন করেন:

'কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই
কত লোকে কতই বলে, শুনে প্রাণে মরে যাই॥'

এরপর তিনদিন গিরিরাজভবনে তথা ভক্ত-হৃদয়ে মহোৎসব। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী বাহ্যপূজার আয়োজন হয়। কনক-কিরীটিনী, স্নিগ্ধ কুঞ্চিত আলুলায়িতকেশা, সর্বাভরণভূষিতা, বিদ্যা শ্রী বল ও সিদ্ধি সমন্বিতা দেবী-প্রতিমার সম্মুখে পূজক ধ্যানমন্ত্র পাঠ করেন:

'জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
* * * *
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥'

আর ভক্তের মাতৃহৃদয় তখন প্রেমবিগলিত নেত্রে দর্শন করে বৎসরান্তে পিতৃগৃহে পুনরাগতা, পুত্রকন্যাপরিবৃতা ফুল্লমুখী মাধুর্যমণ্ডিতা কন্যাকে—ঐশ্বর্য-সমন্বিতা বা জটাজূটধারিণী অসুরদলনী, উগ্র অষ্টশক্তি পরিবেষ্টিতা, চতুর্বর্গদায়িনী জগজ্জননীকে নয়। বাৎসল্য-রসধারায় দেবীর সকল ঐশ্বর্য বিলুপ্ত। ভক্তহৃদয়ে তাই আনন্দের গুঞ্জরণ জাগে:

'গিরি গণেশ আমার শুভকারী
পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী
চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি॥
* * *
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী
লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী
সুরেশ কুমার গণেশ আমার
তাদের না দেখিলে ঝরে নয়ন বারি॥'

পূজক ষোড়শোপচার সজ্জিত করে দেবীকে আহ্বান করেন:

'ওঁ আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্বকল্যাণকারিণি॥
* * * *
স্থাপিতাসি ময়া দেবি পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥'

স্নেহপরিপ্লুত ভক্তহৃদয় তখন কন্যার পরিচর্যায় ব্যস্ত। রাত্রি শেষে শোনা যায় স্নেহের আহ্বান :

'গা তোল, গা তোল উমা, রজনী প্রভাত হলো।
মঙ্গল আরতি হবে, উঠ মা সর্বমঙ্গলে ॥
যামিনী হইল গত, উদয় মা দিননাথ
অলসে ঘুমাবে কত, চাঁদবদনে 'মা' 'মা' বল ॥'

অথবা

'উঠ মা সর্বমঙ্গলে প্রভাত হল যামিনী।
পথশ্রান্তে কত নিদ্রা যাও গো বিধুবদনী ॥
কর্পূরবাসিত বারি, মুখ প্রক্ষালন করি
খাও কিছু প্রাণকুমারী করি আয়োজন।'

আনন্দে উল্লাসে তিনটি দিন কোথা দিয়ে চলে যায়। বিদায়ের ক্ষণ এগিয়ে আসে। নবমীর দিন কন্যার নিকট তাই গিরিরাণীর অনুনয় :

'বলিস্ দু'দিন থাকতে হেথা
কালকে ভোলা নিতে এলে।
ক্ষতি কি তায় বল না আমায়
থাকবে ঘরে ঘরের ছেলে ॥'

নবমীর রাত্রে সে বেদনা তীব্রতর হতে থাকে; হৃদয়ের অন্তস্তল হতে উত্থিত হয় কাতর প্রার্থনা :

'(ওগো) নবমী নিশি
তুমি আর যেন পোহায়ো না,
তুমি গেলে আমার উমা যাবে
এ দুঃখীর প্রাণ আর বাঁচবে না।'

তবু নবমীর নিশি পোহায়। অশ্রুসিক্ত বিজয়ার প্রভাত আসে - বাঁশীতে বাজে বিদায়ের করুণ রাগিণী। হৃদয় মথিত করে নির্গত হয় দীর্ঘশ্বাস। ভক্তের বেদনা গিরিজায়ার বাণীতে রূপ পরিগ্রহ করে :

'আজি কি মা যাবি ছেড়ে, হিমালয় শূন্য করে
দিব মা হয়ে বিদায় তোরে কেমন করে ॥'

শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজক পূজা সমাপন করেন। দেবভাষায় বিদায়বাণী উচ্চারিত হয় :

'ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥'

আর গিরিজায়ার কণ্ঠে ভক্তের আর্তি ধ্বনিত হয় :

"এস মা, এস মা, উমা,
বলো না আর 'যাই', 'যাই'।
মায়ের কাছে, হৈমবতি,
ও-কথা মা বোলতে নাই ॥'

দীপ জ্বলে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

দীপের কাজ অন্ধকার দূর করা, কোন কোনও ক্ষেত্রে দগ্ধ করাও— যেমন উজ্জ্বল দীপে ঝাঁপাইয়া পড়িলে পতঙ্গ পুড়িয়া মরে। মন্দালোকে উজ্জ্বল বাতি আনিলে আলো বাড়িয়া উঠে, অতএব স্বল্প প্রকাশকে প্রখর করাও দীপের তৃতীয় কাজ বলা যাইতে পারে। দীপের একটি চতুর্থ কাজও আছে— ভাবুকের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করা। পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া আমরা যত না অন্ধকার-তিরোভাবের কথা ভাবি, ততোধিক বলি, আহা কি সুন্দর! দেওয়ালীর প্রদীপ-সজ্জা আমাদের হৃদয়ে আনন্দ জাগায়। পূজাবেদীতে আমরা দীপ জ্বালাইয়া ভক্তির আনন্দে বিভোর হই।

স্থূল ভৌতিক দীপের উপর্যুক্ত সকল কাজগুলিই আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আলঙ্কারিকভাবে শাস্ত্রে এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও সাধু-সন্তের উপদেশে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। আধ্যাত্মিক স্তরে দীপের উপমা বড় চিত্তস্পর্শী।

* * *

দীপ জ্বলে।

সন্ত তুলসীদাস বলিতেছেন,[১] দীপ হইল রামনাম। দেহকে ঘর বলিয়া ভাবো। দেহের দ্বার হইল তোমার মুখ। জিহ্বা দ্বারের চৌকাঠ। ঐ চৌকাঠে রামনাম দীপটি রাখো— সব সময়ে জ্বালাইয়া রাখো। চৌকাঠে রক্ষিত প্রদীপ যেমন ঘরের ভিতর ও বাহিরের আঙ্গিনা— দুইই আলোকিত করে তেমনি অন্তর বাহির দুইই যদি ভগবজ্জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিতে চাও তো হে তুলসীদাস, অনবরত রামনাম জপ কর। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি হৃদয়কে আঁধার করিয়া রাখে। ভগবানের নাম জপ দ্বারা সেই অন্ধকার দূর হয়। হৃদয়ে ভগবদ্ভাব বাসা বাঁধিলে বাহিরের পরিবেষ্টনীতেও ভগবৎসত্তা ধীরে ধীরে অনুভূত হইতে থাকে। আকাশ বাতাস সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র তরু লতা পাহাড় প্রান্তর নদী পুষ্করিণী সাগর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্য -চরাচর বিশ্বপ্রকৃতি সবই জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। অন্তরে রাম, বাহিরেও রাম।

'বৈরাগ্যশতকম্'-এর প্রণেতা ভর্তৃহরি যোগিগণের হৃদয়ে যে দীপ জ্বলিতেছে তাহার মহিমা বর্ণনা করিতেছেন গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে। "জ্ঞান প্রদীপো হরঃ"— শঙ্কর মহাদেব তত্ত্বজ্ঞান-রূপ প্রদীপ হইয়া "চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে" যোগীদের চিত্তাবাসে শোভা পান। সেই জাজ্বল্যমান দীপশিখায় কাম-পতঙ্গ অনায়াসে দগ্ধ হয়। ঐ জ্ঞানদীপের আলোকে সাধকের আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ স্ফুরিত হয়, জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জিত মোহান্ধকার বিদূরিত হয়।[২] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়াছেন, প্রীতিপূর্বক ভজনশীল ভক্তের প্রতি অনুকম্পায় তিনি জ্ঞানদীপরূপে তাহার হৃদয়ে দেদীপ্যমান হন এবং অজ্ঞান-তমঃ নাশ করেন।[৩] শ্রীভগবানকে জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া ভাবনা করা ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার একটি সার্থক রীতি।

সাধকের ইষ্ট শিব, দুর্গা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, রাম, কৃষ্ণ—যিনিই হউন, সেই ইষ্টমূর্তি যখন জাগিয়া উঠেন তখন চৈতন্যদীপরূপে প্রতিভাত হন। স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক-গানের শেষে ঠাকুরকে "জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর তুমি তমভঞ্জনহার।"— বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন। শ্রীভগবানের সেই বিশ্বমূর্তির বর্ণনা আমরা গীতার একাদশ অধ্যায়ে পাই। দ্বাদশ শ্লোক—

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥

"আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের উদয় হয় তাহা হইলে যে দীপ্তি প্রকাশ পাইবে, সেই অমিত আলোকের সহিত অর্জুনদৃষ্ট বিশ্বপুরুষের অঙ্গজ্যোতিঃ তুলিত হইতে পারে।"

* * *

মুণ্ডক উপনিষদ মানুষের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত

---

১ রামনাম মণিদীপ ধরু জীহ দেহরি দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহিরেহু জো চাহসি উজিয়ার॥

২ চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভারমুচ্চাটয়ন্
চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ॥ (বৈরাগ্যশতকম্—১)

৩ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ গীতা ১০।১১

তাহার প্রকৃত সত্তাকে বলিতেছেন — "আবিঃ"— আলোক—আত্মচৈতন্যের আলোক। "এজৎ"— যাহা কিছু নড়িতেছে, "প্রাণৎ" যাহা কিছু প্রাণবান, "নিমিষচ্চ"— যাহা কিছু চক্ষুষ্মান অথবা চক্ষুহীন, "সদসৎ"— যাহা কিছু স্থূল অথবা সূক্ষ্ম এই আলোকেই "সমর্পিতম্"— দাঁড়াইয়া আছে। যদিও আত্মচৈতন্যজ্যোতি মহত্তম সত্য তথাপি জীবের সাধারণ জ্ঞান দিয়া ইহাকে জানা যায় না।
"পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্ বরিষ্ঠং প্রজানাম্।"
(মু. উ. ২।২।১)

নিয়মিত উপাসনার অভ্যাস দ্বারা মনকে স্বচ্ছ করিতে হয়, মনের বিক্ষেপ, প্রমাদ দূর করিতে হয়। তখন "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥" (মু. উ. ২।২।৭)
"ধীর" সাধকের চিত্তে "বিজ্ঞানে"র— তত্ত্ব-স্পর্শী স্থির চৈতন্যদৃষ্টির উদয় হয়। চৈতন্য-দীপ্তিতে হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়, কেননা যাহা আত্মচৈতন্য তাহা আবার আনন্দও। সেই চিদানন্দ "অমৃতম্"—ক্ষয়-বিনাশহীন। তাহা শুধু হৃদয়কেই ভরিয়া দেয় না, "বিভাতি" সর্ব দিকে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। সাধক নিজে দীপ্তিমান— তাঁহার জগৎও দীপ্তিমান।

দীপ জ্বলে।

কেনোপনিষদের ঋষি দেখিতেছেন সেই দীপের রশ্মিছটা চক্ষুকে দৃষ্টি, কর্ণকে শ্রবণশক্তি, মনকে সঞ্চারক্ষমতা এবং প্রাণকে জীবনধারণের যোগ্যতা দিতেছে। ঐ চৈতন্যরশ্মি দ্বারা আলোকিত না হইলে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ অচল। অতএব সত্যজিজ্ঞাসুর কর্তব্য গভীরভাবে নিজেকে এই প্রশ্ন করা— "কেন"? "কেন"? "কেন"? — যাহা দ্বারা আমার মনের এই দৌড়াদৌড়ি সম্ভবপর হইতেছে, কাহার শক্তিতে আমার প্রাণ-ক্রিয়া, আমার জিহ্বার কথা বলা? "কঃ"? "কঃ"? — কে আমার চোখ দুটিকে দ্রষ্টব্য বিষয়ে সংযুক্ত করিয়া রূপজ্ঞানকে সম্ভব করিতেছে, কান দুটির মধ্যে ধ্বনিকে ঢুকিতে দিয়া শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে?
(কেনোপনিষদ ১।১)

এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য নিজের বুদ্ধি পর্যাপ্ত নয়। যাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন, পাইয়া এই পৃথিবীতেই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সশ্রদ্ধভাবে বসিয়া মীমাংসা শুনিতে হইবে। তাঁহাদের উপলব্ধি যাহাতে লিপিবদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্র, উহা স্থিরবুদ্ধিতে এবং গভীর বিশ্বাস লইয়া অনুশীলন করিতে হইবে। "কেন" ও "কঃ" প্রশ্নের যথার্থ উত্তর শরীরতত্ত্ববিদ্ বা মনস্তাত্ত্বিকরা দিতে পারেন না। তাঁহাদের আবিষ্কার মস্তিষ্ক (Brain) পর্যন্ত। কিন্তু মস্তিষ্কের বহু-জটিল সুসমঞ্জস ক্রিয়া চলে কাহার বুদ্ধিতে? এই জিজ্ঞাসার সমাধান তাঁহাদের নিকট একটি প্রহেলিকা। তাঁহারা অবশ্য এই প্রহেলিকার মধ্যে যাইতে চান না, কেন না মনুষ্যজীবনের অন্তিম রহস্যকে জানা তাঁহাদের দৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন, তাঁহাদের গবেষণা ক্ষেত্র-বাহির্ভূত।

কেনোপনিষদ বলিতেছেন, মানুষের একটি চরম লক্ষ্য আছে। তাহা আত্মাকে জানা—নিজ চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। সংসারের বহু বাসনা কামনা বিক্ষেপ হইতে মন গুটাইয়া অন্তরের অন্তরে সেই আত্মচৈতন্যের ভাবনা অভ্যাস করিলে একদিন সেই চৈতন্য শুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশ হন। তিনি আছেন, সর্বদাই আছেন। তাঁহারই জ্যোতিতে সকল ইন্দ্রিয় ও মন ক্রিয়াশীল। কিন্তু তাহা স্বল্প আলো। আমাদের বহির্মুখীন প্রবৃত্তি চৈতন্যস্বরূপ বৃহৎ আলোকে ঢাকিয়া রাখে। কৃতকৃত্য সাধকের নিকট যখন তিনি আবির্ভূত হন, তখন সাধক দেখেন তিনি "প্রতিবোধবিদিতম্"— প্রত্যেকটি জ্ঞানের সহিত তিনি অভিব্যক্ত। দেখিতেছি, শুনিতেছি,

আস্বাদ করিতেছি, স্পর্শ ও ঘ্রাণ করিতেছি, চিন্তা করিতেছি— এই প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আত্ম-প্রদীপের আলোক-বিস্ফুরণ।

(কেনোপনিষদ, ২।৪

শুধু তাহাই নয়। আত্মপ্রদীপের দীপ্তি আমার শরীর মনের বাহিরেও অনুভূত হইতে থাকে।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।"

আত্মদ্রষ্টা ধীর ব্যক্তিগণ মায়িক সংসারের অন্ধদৃষ্টি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সকল জীবের মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে দর্শন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। (কেনোপনিষদ, ২।৫)

*　　*　　*

দীপ জ্বলে।

"নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে, সকৃদ্বিভাতে হেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮।৪।২)

রাত্রি আর নাই। দিন—কেবলই অবার দিবালোক। রাত্রি আর আসিবে না, আসিতে পারে না। একবার যে দীপ জ্বলিয়াছে উহা অনন্তকালের জন্য জ্বলিয়াছে। সেই দীপ-দীপ্তি সর্বত্র বিচ্ছুরিত। সকলই আলোয় আলোময়। ব্রহ্ম—বৃহত্তম সত্য এই সর্বাবগাহী, সর্বপ্রসারী জ্ঞানালোক। যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহা কিছু অনুমান করিতেছি, যাহা কিছু চিন্তা করিতেছি—সেই জ্ঞানজ্যোতি ছাড়া আর কিছু নয়।

ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ এই ত্রি-অবয়ব কাল মহাকালে মিশিয়া গিয়াছে। মহাকাল শিব জ্ঞান-প্রদীপেরই এক নাম। মহাকাশ চৈতন্যাকাশে লয় পাইয়াছে। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, আশা-নিরাশা, ভয়-অভয়, কর্ম-অকর্ম বন্ধন-মুক্তি তাহাদের দ্বন্দ্ব-ভাব ছাড়িয়া মহাজ্যোতিরূপে প্রকাশমান।

আর কোন প্রশ্ন নাই, সংশয় নাই, সমস্যা নাই। মন মরিয়াছে, বাক্যও ফুরাইয়াছে। পাওয়া নাই, অপাওয়াও নাই। জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। সাধনা নাই, সিদ্ধিও নাই। দুই নাই, একও নাই।

দীপ জ্বলে।

স্বামীজীর গানের খাতা

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

১

স্বামীজীর এই গানের খাতাখানি আমরা মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের দৌহিত্রের স্ত্রীর নিকট হইতে পাইয়াছি। খাতাখানি স্বামীজীর নিকট অন্ততঃ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ছিল, আমাদের মনে হয় তাহারও পূর্ব হইতে, তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার সময় হইতেই ছিল। প্রথমবার আমেরিকা যাইবার পূর্বে স্বামীজী এই খাতাখানি মন্মথবাবুর কন্যাকে দিয়া গিয়াছিলেন। মন্মথবাবুর পরিবারবর্গ পরম পবিত্র স্মৃতি হিসাবে এটিকে এতদিন সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেজন্য, এবং এটিকে আমাদের দিবার জন্য তাঁহাদের নিকট আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ।

মন্মথবাবু স্বামীজীর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে ত্রিবান্দ্রমে সুন্দররাম আয়ারের গৃহে থাকিবার সময় মন্মথবাবুর সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের পর সুন্দররামের অতিথিরূপে থাকিলেও তিনি মন্মথবাবুর গৃহেই

সকালটা কাটাইতেন। মন্মথবাবু তখন মাদ্রাজের সহকারী এ্যাকউন্টান্ট জেনারেল; কাজের জন্য তাঁহাকে নানা স্থানে যাইতে হইত, কর্মব্যপদেশেই তিনি ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছিলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর স্বামীজী যখন এখান হইতে কন্যাকুমারী যাইবার জন্য রওনা হন, মন্মথবাবু তখন তাঁহার সঙ্গে যান। মনে হয়, তিনি কন্যাকুমারী পর্যন্তই গিয়াছিলেন, কারণ কন্যাকুমারীতে তিনি মন্মথবাবুর কন্যাকে কুমারীপূজা করেন বলিয়া শোনা যায়। কন্যাকুমারী হইতে ফিরিবার পর পণ্ডিচেরীতে আবার মন্মথবাবুর সহিত স্বামীজীর দেখা হয় এবং মন্মথবাবুর অনুরোধে তিনি মাদ্রাজে তাঁহার গৃহে আসিয়া তিন সপ্তাহ ছিলেন।[১] পরে এখান হইতে যাত্রা করিয়া ১০ ফেব্রুআরি ১৮৯৩ হায়দ্রাবাদ পৌঁছান। সেখান হইতে ১৭ ফেব্রুআরি যাত্রা করিয়া মাদ্রাজে মন্মথবাবুর গৃহেই পুনরায় ফিরিয়া আসেন এবং খেতড়ি হইয়া আমেরিকা যাত্রার (৩১ মে) পূর্ব পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন।[২]

মাদ্রাজে মন্মথবাবুর গৃহে এই সব অবস্থানকালের কোন সময়ে স্বামীজী মন্মথবাবুর কন্যাকে খাতাখানি দিয়াছিলেন। মন্মথবাবুর দৌহিত্র প্রভৃতিও এই কথাই শুনিয়া আসিতেছেন, বলিলেন। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াও মনে হয়। কারণ বরাহনগর মঠ হইতে বাহির হইবার সময় খাতাখানি যদি স্বামীজীর সঙ্গে না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই এটি তাঁহার গুরুভাইদের কাহারো নিকট পাওয়া যাইত, এটি তিনি সঙ্গে রাখিয়াছিলেন, এবং আমেরিকা যাইবার পূর্বে দিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য ভাবিতে পারা যায় কলিকাতায় থাকাকালেই কোন সময় মন্মথবাবুর কন্যা তাঁহার নিকট হইতে এটি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ মন্মথবাবুর কন্যা তখন খুবই ছোট, ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার বয়স বড় জোর আট-নয় বৎসরের মধ্যে; মন্মথবাবুর বয়স ত্রিশের কাছাকাছি; তাছাড়া আরো একটি বিষয় এই সম্ভাবনার বিপক্ষে যায়—স্বামীজী মন্মথবাবুর কন্যার জন্য নিজের হাতে যে কয়টি গান এই খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রথমটি হইল 'প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো'। এই গানটি স্বামীজী পূর্বে শুনিয়াছিলেন বা গাহিয়াছিলেন কি না, সঠিক জানা নাই; কিন্তু আমরা জানি বরাহনগর মঠ হইতে শেষবার বাহির হইয়া পরিব্রাজক বেশে ভারতভ্রমণ করিবার সময় ১৮৯১-এর অক্টোবর মাসে খেতড়ি রাজার গৃহে (অথবা তাঁহার জয়পুরের বাড়ীতে) গানটি শুনিবার পরই তাহা স্বামীজীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।[৩] কাজেই এই ঘটনার পর স্বামীজী গানটি খাতায় লিখি দিয়াছিলেন, এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, গানের খাতাটিতে এই গানটি স্বামীজী লিখিয়া যাওয়ায়, তিনি খেতড়িতে প্রথমবার যাইবার সময় অথবা আমেরিকাগমনের অব্যবহিত পূর্বে খেতড়ি যাওয়ার সময় গানটি সেখানে শুনিয়াছিলেন—ইহা লইয়া যে সংশয় আছে,[৪] তাহারও মীমাংসা হই

---

১ যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড, ২য় সং)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৩৬৯, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৭, ৩৯৫, এবং স্বামী বিবেকানন্দ (১ম ভাগ, ৩য় সং)—প্রমথনাথ বসু, পৃঃ ২৬৩

২ স্বামী বিবেকানন্দ (১ম ভাগ, ৩য় সং)—প্রমথনাথ বসু, পৃঃ ২৮৬, ২৯০

৩ স্বামী বিবেকানন্দ (১ম ভাগ, ৩য় সং)—প্রমথনাথ বসু পৃঃ ১৯৮, ১৯৯

৪ যুগনায়ক বিবেকানন্দ (১ম খণ্ড, ২য় সং)—স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৪০৮

যায়। কারণ শেষবার খেতড়ি যাওয়ার পর স্বামীজী আর মাদ্রাজে ফেরেন নাই, সেখান হইতেই বোম্বে গিয়া জাহাজে উঠিয়াছিলেন; মন্মথবাবুদের সঙ্গে আর দেখা হয় নাই।

যাঁহাদের নিকট খাতাটি পাইয়াছি, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম স্বামীজী মন্মথবাবুর এই বালিকা কন্যাকে কয়েকটি গান এবং একটু তবলা পাখোয়াজ আদি বাজানোও শিখাইয়াছিলেন, ইহার সমর্থনও খাতাটির ভিতর পাওয়া যায়।

২

বলা নিষ্প্রয়োজন, খাতাটি অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পাতাগুলি সব অক্ষত নাই। খাতাটি ডিমাই ১/১৬ (৪.৫″×৬.৮″) সাইজের। পিচবোর্ডের মলাট। মলাটের গোড়ার দিকটি নীল রং-এর কাপড় মোড়া উপরিভাগ লাল খয়েরী ও নীল রং-এ মেশানো ডিজাইনের মার্বেল কাগজে মোড়া। খাতার অধিকাংশ পৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। বাঁধন কাটিয়া মাঝখানে কয়েকটি পৃষ্ঠা আলগা হইয়া গিয়াছে—এই পাতা কয়টি পূর্বের ক্রমানুসারে সাজানো না-ও থাকিতে পারে। আমরা যে অবস্থায় খাতাটি পাইয়াছি সেই অবস্থাতেই টানা পত্রাঙ্ক দিয়া দিলাম। বিশেষ কারণে উভয় দিক হইতেই এই পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে।

খাতাটির যে অংশগুলি আমরা স্বামীজীর হস্তাক্ষর বলিয়া স্থির করিয়াছি, প্রকাশ করিবার পূর্বে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইবার জন্য তাহা জনৈক নির্ভরযোগ্য হস্তাক্ষর-বিশারদকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়াও লইয়াছি। তিনি তাঁহার নিশ্চিত অভিমত জানাইয়াছেন যে, সে অংশগুলি স্বামীজীর হাতের লেখা। ইহা ছাড়া, প্রথম দিকের কালিতে লেখা আরো সাত পৃষ্ঠার হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে হয় তাহাও স্বামীজী লিখিয়াছেন—ধরিয়া ধরিয়া স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। এরূপ হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। তবু, একেবারে নিঃসংশয় নই বলিয়া এখানে এখন আমরা সেগুলিকে অপর কাহারো হস্তাক্ষর বলিয়াই ধরিয়া লইতেছি; ধরিয়া লইতেছি, স্পষ্টাক্ষরে লিখিবার জন্য স্বামীজী অপর কাহাকেও দিয়া এই কয় পৃষ্ঠা কপি করাইয়া লইয়াছেন। ইহা ছাড়া কালিতে লেখা আরো চার পৃষ্ঠা তিনি অপর কাহাকেও দিয়া লিখাইয়া লইয়াছেন। হইতেও পারে, তাঁহার কোন সঙ্গীত-শিক্ষকই তাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কালিতে লেখা বাকি তিন পৃষ্ঠায় স্বামীজীর হস্তাক্ষর।

সমগ্র খাতাটির প্রথম দিকে (একটু সংশয়জনক সাত পৃষ্ঠা স্বামীজীর হাতের লেখা নয় বলিয়া হিসাবে বাদ দিলে) তিন পৃষ্ঠা স্বামীজী কালিতে লিখিয়াছেন বাকী সবই, ৪৯ পৃষ্ঠা, লিখিয়াছেন পেন্সিলে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আগমনের পর সেখানে স্বামীজীর অবস্থানের সময় হইতে তিনি খাতাটিতে পেন্সিলে লেখা শুরু করেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ, খাতাটির একদিকে প্রথম পৃষ্ঠায় '২২ জানুআরি ৮৬' তারিখ সহ স্বামীজীর স্বাক্ষর রহিয়াছে, এবং তাহা পেন্সিলে লেখা, আর, খাতার অন্যদিকে তাঁহার পেন্সিলে লেখা প্রথম গানটি হইল 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি'—যাহা স্বামীজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেই, নির্বিকল্প সমাধিলাভের পর রচনা করিয়াছিলেন।[৫] তাঁহার রচিত গানগুলির মধ্যে তিনটি গান এই খাতায় পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি নিঃসন্দেহে ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭-র মধ্যেই রচিত। কারণ

৫ 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ' গানটিও স্বামীজী এই সময়ই রচনা করেন ('আমার জীবনকথা'—স্বামী অভেদানন্দ, ২য় সং, চিত্র-পরিশিষ্ট)।

এই তিনটি গানের মধ্যে যেটি এই খাতায় শেষে লেখা হইয়াছে, সেই 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গানটি মাষ্টার মহাশয় ২১শে ফেব্রুআরি ১৮৮৭ শিবরাত্রির দিন সকাল বেলা স্বামী শিবানন্দের কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, 'এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন'।[৬]

খাতাটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৮। লেখা প্রথম দিক হইতে ৬১ পৃষ্ঠা, শেষের দিক হইতে ১৭ পৃষ্ঠা (ইহার মধ্যেও অবশ্য ফাঁকা পৃষ্ঠা আছে), মোট ৭৮ পৃষ্ঠা। মাঝখানে ২০ পৃষ্ঠা ফাঁকা। লেখা পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে ৫২টি পৃষ্ঠা স্বামীজীর হস্তাক্ষর-ভূষিত—৫১টি সম্পূর্ণ, ১টি আংশিক।

৩

খাতাটি একদিক হইতে, শেষের দিক হইতে খুলিলে দেখা যায় ১ম পৃষ্ঠাতেই কাল কালিতে পাকা হাতের লেখা (স্বামীজীর নয়):

'নটের প্রথম গীত
রাগিণী কেদারা তাল চৌতাল

বন্দে পরম পুরুষায়, অনাদি অনন্ত অব্যক্তরূপায়।
বিশ্ব সুদৃশ্য অতি চমৎকার, হয় রচনা যাঁহার,
পাইবে ত্রাণ, করবে গান, কৃপানিধান দেবদেবতায়।
অনন্ত অভ্রান্ত অশোক অভয় সদাসর্বজনাশ্রয়।
অতি মহান জগতঃ ত্রাণ, স্বসমান শিবস্বরূপায়ঃ।'

ডানদিকের কয়েকটি অক্ষর মলাটের কাগজে ঢাকিয়া থাকায় দুটি শব্দ আন্দাজে লিখিতে হইল। তৃতীয় লাইনের একটি শব্দের শুধু 'ন' এবং শেষ লাইনের একটি শব্দের 'ণ' দেখা যায়, এগুলিকে যথাক্রমে 'গান' ও 'ত্রাণ' লিখিয়া দিলাম। 'ত্রাণ' এর বদলে 'প্রাণ'ও হইতে পারে।

প্রথম লাইনের 'অনন্ত' শব্দটি কাটিয়া পেন্সিলে 'অচিন্ত্য' লেখা আছে। চতুর্থ লাইনে আগে 'অচিন্ত্য' লিখিয়া পরে কালিতেই কাটিয়া 'অনন্ত' লেখা হইয়াছে।

এই গীতটির নীচেই পেন্সিলে লেখা তারিখ সহ স্বাক্ষর:

'Narendranath Dutt
22nd Jan 86'

তারিখের ডানদিকে পেন্সিলে 'Friday' লেখা। দুঃখের বিষয়, স্বাক্ষরটির উপর কেহ, বোধ হয় মন্মথবাবুর বালিকা কন্যাই, কালি বুলাইয়াছে (ওভার-রাইটিং) এবং পেন্সিল দিয়া পৃষ্ঠাটির নীচের ও উপরের ফাঁকা অংশ যাহা ছিল সবই অপটু হাতের লেখা ও হিজিবিজি দাগে ভরাইয়া দিয়াছে।

---

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ (৭ম সং, ৭ম মুদ্রণ), পৃঃ ২৯৫। স্বামী অভেদানন্দজীর স্মৃতি অনুযায়ী গানটি ১৮৮৬-এর শিবরাত্রির দিন রচিত ('আমার জীবনকথা', ২য় সং, পৃঃ ১০৭); এখানে কথামৃত অনুসৃত হইল। এই খাতায় গানটি লেখাও রহিয়াছে প্রথম দুটি গানের অনেক পরে।

২য় পৃষ্ঠা ফাঁকা।

৩য় পৃষ্ঠায় পেন্সিলে কাঁচা হাতে লেখা এক লাইন গান ও বাজনার তিনটি বোল ; ৪র্থ ও ৫ম পৃষ্ঠাতেও তাই ; ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত কয়েকটি গান (এই পৃষ্ঠাগুলির কোনটিই স্বামীজীর হাতের লেখা নয়)।

১০ম, ১১শ ও ১২শ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর হস্তাক্ষর। পেন্সিলে লেখা। ১০ম পৃষ্ঠায় দুটি গান : 'প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো' এবং 'জয় অরু বিজয়'। ১১শ পৃষ্ঠায় আর একটি গান। ১২শ পৃষ্ঠায় স্বামীজী সুরফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তেতাল ও চৌতালের পাখোয়াজের বোল লিখিয়া দিয়াছেন এবং কিভাবে বাজাইতে হয় তাহার কিছু নির্দেশও পৃষ্ঠার নীচের দিকে দিয়াছেন :

'ধা = দুহাতে জোরে ঘা		তা = ডান হাতে জোরে ঘা
ধিন্ = ঐ আস্তে ঘা		তিন্ = ঐ আস্তে—
কৎ = বাম হাতে ময়দাতে চেপে থাবড়া।		ক = ঐ আস্তে।'

—ইত্যাদি।

১৩শ ও ১৪শ পৃষ্ঠা ফাঁকা। ১৫শ পৃষ্ঠায় ভূপালী-ত্রিতাল-এর ব্যবহারবিধি ও এক লাইন গান (স্বামীজীর হাতের লেখা নয়)। ১৬শ ও ১৭শ পৃষ্ঠায় ভূপালীর স্বরলিপি (স্বামীজীর হাতের লেখা নয়)। এরপর এদিকে আর কিছু লেখা নাই, কেবল ২১শ পৃষ্ঠার মাথায় একটি ইংরেজীতে সই এবং ২৭শ পৃষ্ঠার মাথায় কাঁচা হাতের দু'তিনটি অক্ষর—দুই-ই পেন্সিলে লেখা।

এদিককার ৩য় হইতে ২৯শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পৃষ্ঠার মাথায় কাল কালিতে ইংরেজীতে 19 হইতে 45 পর্যন্ত পত্রাঙ্ক লেখা আছে। ক্রমিক পত্রাঙ্কের এই হিসাব প্রথমদিকের কাল কালিতে লেখা ১৬ পৃষ্ঠার পর ছাড়িয়া দিয়া এই দিকের (শেষের দিকের) প্রথম পৃষ্ঠাকে ১৭শ পৃষ্ঠা ধরিয়া করা হইয়াছে।

পত্রাঙ্ক কেন এভাবে দেওয়া হইল, এবং প্রথম দিকে ১৬ পৃষ্ঠা লিখিবার পর ছাড়িয়া দিয়া কেন খাতার অপর দিকের ১ম পৃষ্ঠায় 'নটের প্রথম গীত' লেখা হইল, এ প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। ইহার একটি আনুমানিক উত্তর আমরা পাইয়াছি। এই খাতাটির সন্ধান যাঁহার নিকট আমরা প্রথম পাই, তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম যে এই গানের খাতাটি ছাড়া স্বামীজীর আরো একটি খাতা আছে যাহাতে তিনি ছাত্রাবস্থায় একটি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ সে খাতাটিও এই গানের খাতার সঙ্গেই পাওয়া যাইবে। যেখানে এই গানের খাতাটি পাইয়াছি, সে বাড়ীর কেহই অবশ্য দ্বিতীয় খাতাটির কথা কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হয়, স্বামীজী এই গানের খাতাটির অপর দিক হইতে নাটকটি কাহাকেও দিয়া কপি করাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে যে কোন কারণেই হউক, সম্ভবতঃ সে সময় কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাদিতে বিশেষভাবে জড়িত থাকার জন্য, তাহা আর লেখানো হইয়া উঠে নাই।

৪

খাতাটির অপর দিক হইতে, প্রথম দিক হইতে, খুলিলে দেখা যায় ষোড়শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কালিতে, তারপর সবই পেন্সিলে লেখা স্বরলিপি ও গান।

দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম এবং দশম হইতে দ্বাদশ পৃষ্ঠা একই হাতের লেখা (পূর্বেই বলিয়াছি

এই কয় পৃষ্ঠা স্বামীজীর হাতের লেখা হইবার সম্ভাবনা সমধিক, কিন্তু আমরা এখনো এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সংশয়রহিত নই)। ষষ্ঠ হইতে নবম পৃষ্ঠা পযন্ত অন্য হাতের লেখা (স্বামীজীর নয়)। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও ষোড়শ পৃষ্ঠা স্বামীজীর হাতের লেখা। পঞ্চদশ পৃষ্ঠা ফাঁকা ছিল, অথবা লেখা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল, পরে উহাতে কাঁচা হাতে পেন্সিলে হিজিবিজি লেখা হইয়াছে।

কালিতে লেখা এই ষোল পৃষ্ঠার (আসলে লেখা ১৪ পৃষ্ঠার) পর হইতে, সপ্তদশ পৃষ্ঠা হইতে একষষ্টিতম পৃষ্ঠা পর্যন্ত সবই স্বামীজীর হাতের লেখা, পেন্সিলে।

এই দিককার পৃষ্ঠাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১ম পৃষ্ঠা ফাঁকা।

২য় হইতে ১২শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কেবল স্বরলিপি—প্রতি পৃষ্ঠায় একটি করিয়া, কেবল ১০ম পৃষ্ঠায় দুইটি। তাল সহ রাগ-রাগিণীগুলির নাম যথাক্রমে : ছায়ানট, কাওয়ালী ; দ্বিতীয় ছায়ানট, কাওয়ালী ; ঝংলা সারঙ্গ ঢিমা তেতালা ; মল্লার, একতালা , মেঘ-মল্লার, কাওয়ালী ; কলঙ্গরা, খেমটা ; মচ্ বেহাগ, একতালা ; 'Italian' ঝিঝিট, কাওয়ালী ; বিভাষ, কাওয়ালী ; সারঙ্গ, কাওয়ালী ; বেহাগ, কাওয়ালী এবং দেশ মল্লার, কাওয়ালী।

[*এখান হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কালিতে লেখা স্বামীজীর হস্তাক্ষর :*]

১৩শ পৃষ্ঠায় 'যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী' গানটি স্বরলিপিসহ (খাম্বাজ, কাওয়ালী)।

১৪শ পৃষ্ঠায় দুটি স্বরলিপি। উপরে বসন্তবাহার, কাওয়ালী। নীচে একপাশে স্বরলিপি—খাম্বাজ, লক্ষ্ণৌ ঠুংরী ; অপর পাশে স্বামীজী একটি গানের চার লাইন লিখিয়া রাখিয়াছেন—

'জল কো পাণি বদাস্থর জুলুম লিয়া (?)
মেরে মহাল মুলুক সব লুট লিয়া
মহালো মহালো মে বেগম রোএ
ঝটপটিমে গাগরিয়া'

১৫শ পৃষ্ঠা ফাঁকা ছিল, অথবা উহার উপর লেখা উঠিয়া অতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর কেহ, সম্ভবতঃ মন্মথবাবুর কন্যাই, বড় বড় অক্ষরে পেন্সিলে 'মা মা পা গা', 'F F G E' ইত্যাদি লিখিয়া রাখিয়াছে।

১৬শ পৃষ্ঠায় দুটি স্বরলিপি, রাগিণীর নাম দেখা গেল না, তাল কাওয়ালী এবং আড়া খেমটা।

[*এখান হইতে শেষ পর্যন্ত সবই স্বামীজী পেন্সিলে লিখিয়াছেন*]

১৭শ পৃষ্ঠায় এই খাতাতেই তাঁহার প্রথম রচিত গান 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি'। প্রথম রচিত গান কেন, স্বামীজীর প্রথম ছন্দোবদ্ধ রচনাই বলা যায়, অবশ্য যদি 'নটের প্রথম গীত'টি তাঁহার রচিত না হয়।

প্রথম রচিত বলার কারণ, খাতায় তাঁহার রচিত গানগুলির মধ্যে এইটিই প্রথমে রহিয়াছে। গানটি স্বরলিপি সহ লেখা নয়, তবে মাত্রা দিয়া লেখা। রচনাকালে লিখিতে

লিখিতেই যে তিনি সুর ও কথার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন, যাহা রচনাকালে স্বাভাবিক, তাহা লেখাটি দেখিয়াই বোঝা যায়। এই খাতাতেই রচিত না হইলে সংশোধনগুলি একটানা লেখার ভিতর থাকিত না, আগেরটি কাটিয়া উপরে বা পাশে লেখা থাকিত, যেমন এই খাতার ভিতরই স্থানে স্থানে সে নিদর্শনও রহিয়াছে—'ভাসেএ' স্থলে 'ভা আ আ সে' করিবার ক্ষেত্রে এবং 'ভাসেএ ডোওওবেএ' স্থলে 'ওঠেএ ভাসে এ ডোওওবে এ' করিবার ক্ষেত্রে।

পুরা গানটি নিম্নে প্রদত্ত হইল (ফটোও দেওয়া হইল) :

নাহি সূউ উ উ র্য্য　নাহি　জ্যোওওওতি　নাহি　শশাঙ্ক　সুউউউন্দর
ভাসে এ　ব্যোমে　ছায়া আ আ-সম　ছবি　বি ই শ্ব　চরা আ আ আ চর।
অস্ফুট অ অ মন　আ আ আকাশে　জগত　সং ং ংসার ভা আ আ সে—
ওঠে-এ　ভাসে এ ডোওও বে-এ　অহং　স্রো ও তে　নিরন্তর অ— ॥
ধীরে ২　ছায়া দল　মহালয়ে এ　প্রবে এ এ শিল—
বহে　মাত্র অ　আমি ই ই ই　আমি ই ই　এই ধারা অণ্ উ ক্ষণ
সে　ধারা-ও　বন্ধ হলো ও　শূন্যে শূন্য　অ অ অ　মিশাইল—
অবা আ ঙ্ মনস　গো ও চর　বোঝ অ　প্রাণ　বোঝে এএএএ--যার

স্বামীজী পরে গানটির সামান্য পরিবর্তন করিয়াছেন, যাহা রচনাবলীতে দেখি : 'ওঠে ভাসে ডোবে' স্থলে 'ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ', 'মিশাইল' স্থলে 'মিলাইল', 'অবাঙ্মনস গোচর' স্থলে 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' এবং 'বোঝ প্রাণ' স্থলে 'বোঝে প্রাণ' করিয়াছেন।

১৮শ পৃষ্ঠায় একটি গানের, ভাষা দেখিয়া মনে হয় কোন ব্রাহ্মসঙ্গীতের প্রথমাংশ। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় এটি স্বামীজীর রচিত একটি অসমাপ্ত গান :

'রে বি হ অ ঙ্গ মম মন—চিদানন্দাকাশে ব্রহ্ম অ সহবাসে—সুখে কর অ বিচরণ যোগ পক্ষপুটে করি আরোহণ'

১৯শ পৃষ্ঠায় 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন' গানটি, স্বরলিপিসহ।

২০শ পৃষ্ঠায় স্বামীজী 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ' গানটি স্বরলিপিসহ রচনা করিয়াছেন (ফটো দেওয়া হইল) :

বড় সারঙ্গ

রে পা মা—রে　রে পাপা মা　রে　সসা সা সা　রে ম ম　মপপ　মা　রে সাসা—
এ ক রূ প　অ রূ প না—ম　ব র ণ　অ তী ত আগামি কা—ল হীন—

রে—মর্পা প—　ম প নি　সা-সা　সা নি রেঁ সাঁ-নি　পপা　ম রে—সা সা
দে শ হীন　স র ব　হী-ন　নে এ তি নে　তি বিরাম　য　থায়্

সাঁ সাঁ　নি নি　সাঁ সাঁ　মাসা সা　সাঁ-সাঁ—নিসাঁরে　র্ম-রেসাঁ নিসাঁসাঁ　পা—ম
ত থা　হতে এ　ব হে　কা র ণ　ধা-রা—ধরিয়ে　বা-স না বেশ উ　জা—রা

রে রে´রে রে রে´ রে সা সাং সাং নি—পাপা মম মম ম র্প— মমরে´রে পপ
গ র জি গ র জি উ ঠে তা র— বারি অহং অহং ইতি— সরব ক্ষ অ ণ।

(রূপ অরূপ)

সে অপার ইচ্ছা সাগর মাঝে অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে
কতই রূপ কতই শ—ক্তি কত গতি স্থিতি কে করে গণন।
কো—টী চন্দ্র কো—টী তপন লভিয়ে সেই সাগরে জনম
মহা ঘোর রোলে ছাইছে গগন করি দশ দিক জ্যোতি মগন।
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী—সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ
সেই সূ- র্য্য তার কিরণ যেই সূর্য্য সেই কিরণ।

পরে স্বামীজী এ গানটিরও সামান্য পরিবর্তন করিয়াছেন, যাহা রচনাবলীতে দেখা যায় : তথা হতে বহে' স্থলে 'সেথা হতে বহে', 'বেশ উজারা' স্থলে 'বেশ উজালা', 'কতই শক্তি' স্থলে 'কতই শকতি' এবং 'ছাইছে গগন' স্থলে 'ছাইল গগন' করিয়াছেন। এই খাতাতেই প্রথমে লেখা 'সেই সূর্য্য সেই কিরণ' কাটিয়া 'যেই সূর্য্য সেই কিরণ' করিয়াছেন 'স' এর উপর 'য' লিখিয়া।

এরপর :

২১ পৃষ্ঠায় 'হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনি' গানটি, স্বরলিপিসহ।
২২ „ 'চমকে চপলা চমকে প্রাণ' „ „
২৩ „ 'শিব শঙ্কর বং বং ভোলা' „ „
২৪ „ 'হর শঙ্কর শশিশেখর' „ „
২৫ „ 'সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায়ী' „ „
২৬ „ 'পটু তরে কোন্ নায়ে হু' (?) „ „
২৭ „ 'এক পযাণ ছন কবহুঁ না বেসর' (?) „ „
২৮ পৃষ্ঠা ফাঁকা।
২৯ পৃষ্ঠায় কেবল স্বরলিপি
৩০ „ 'নিবিড় আঁধারে মা তোর' গানটি, স্বরলিপিসহ
৩১ „ 'পরবত পাথার ব্যোমে জাগো' „ „
৩২ „ 'দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল' „ „
৩৩ „ 'জাগ্ মা কুলকুণ্ডলিনী' —কেবল গান
৩৪ „ 'ময় গোলাম ময় গোলাম, ময় গোলাম তের' গানটি, স্বরলিপিসহ
৩৫ „ 'ওহে দিন যে গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে' „ „
৩৬ „ 'কে এল কিভাবে রথে করে' „ „
৩৭ „ 'বরজ কিশোরি হরি খেলত রংগে' „ „
৩৮ „ 'কোথা ওহে তরুণ তপন' „ „
৩৯ „ 'জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা' „ „
৪০ „ 'মন করোনা কাজে হেলা' „ „

স্বামী বিবেকানন্দের গানের খাতার একটি পৃষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দের গানের খাতার একটি পৃষ্ঠা

৪১তম পৃষ্ঠায় স্বামীজী 'তাথীয় তাথীয় নাচে ভোলা' গানটি স্বরলিপিসহ রচনা করিয়াছেন :

গা স সসা গা গা গ্মা ধ সা রে গা—গগ পা পপ পপ ধা— প গ সা সা
তা থী য় তা থী য় নাচে ভোলা—বব বং বব বাজে গা—আল্

(সা রে সা)
পপ পপ পপ ধধধ পা-প গগরে সাসারে
ডিমি ডিমি ডিমি ডমুর বা-জে দুলিছে কপাল মা—ল্

গগপ ধনিসা পসা সা স্মা নি সা পসা
গরজে গ— ঙ্গা জ টা মা — ঝ

ধ নি সা—রে রে রে সা নি ধ প প্ম
উ গ রে—অ ন ল ত্রি শূ ল রা জ

পপ পপ পপ পধা ধধ পা প্ম গগরে সারে সারেগা
ধক্ ধক্ ধক্ মৌ লী ব দ্ধ জ্বলে শ শাঙ্ক ভাল্—

স্বামীজী পরে এই গানটিরও কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন ; রচনাবলীতে দেখা যায় : 'তাথীয় তাথীয়' স্থলে 'তাথেইয়া তাথেইয়া', 'বব বং বব' স্থলে 'বব বব', 'ডমুর' স্থলে 'ডমরু', 'জটা মাঝ' স্থলে 'জটা মাঝে', 'ত্রিশূল রাজ' স্থলে 'ত্রিশূল রাজে' এবং 'মৌলীবদ্ধ' স্থলে 'মৌলিবদ্ধ' করিয়াছেন। গানটির এই সামান্য পরিবর্তন স্বামীজী লেখার অল্প পরেই করিয়াছেন। কারণ কথামৃতে প্রায় এই পরিবর্তিত রূপই পাই—কেবল 'তাথেইয়া' স্থলে 'তাথৈয়া', এবং 'বব বব' স্থলে 'ববম্'।

এরপর :

৪২ পৃষ্ঠায়	'তোমার সব কলে কলে'	—কেবল গান।	
৪৩ „	'হরি বোল্ বোল্ রে মাধাই' এবং	গানটি, স্বরলিপিসহ	
	'রাধে গোবিন্দ জয়। (জয়) শ্যাম সুন্দর'	„	„
৪৪ „	'কোথা গো প্রেমময়ী রাধে রাধে'	„	„
৪৫, ৪৬ „	'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী'	„	„
৪৭ „	'চন্দন চর্চ্চিত নীল কলেবর'	„	„
৪৮ „	'চলত কান মন আটকী'	„	„
৪৯ „	'সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল'	—কেবল গান।	
৫০ „	'দুর্ঘাত কিল কোকিল কুল উজ্জ্বল কলনাদং জৈমিনিমিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং'	„	„

[প্রথম লাইনটি যে ঠিক মত পড়িতে পারিয়াছি, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নই।]

৫১ পৃষ্ঠায়	'চিন্‌বো কেমনে হে তোমায় ওহে বন্ধুয়া'	—কেবল গান।
৫২ "	'রাধার প্রেম কি পায় সকলে'	" "
৫৩, ৫৪ "	'যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো'	" "
৫৫, ৫৬ "	'কোন ধনি জল আনি দেও লো বদনে'	" "
৫৭, ৫৮ "	'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন'	" "
৫৯, ৬০ "	'বিশ্ব ভুবন রঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি'	গানটি, স্বরলিপিসহ
৬১ "	'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী'	—কেবল গান।

এরপর ফাঁকা পৃষ্ঠা।

স্বামীজীর গানের খাতার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। স্বামীজীর হাতের লেখাগুলি অধিকাংশ পেন্সিলের এবং বহুদিন আগেকার বলিয়া কোথাও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা কোন কোন অক্ষরের কিছুটা উঠিয়াই গিয়াছে। সেজন্য আমাদের পড়িবার ও বুঝিবার ভুল কোথাও কোথাও থাকিতেও পারে। পরে সেরূপ যদি কিছু দেখা যায় তাহা সংশোধন করিবার, এবং খাতাটির আরো কিছু অংশ সবিস্তারে ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

হেঁয়ালি

শ্রীদিলীপকুমার রায়*

আকাশ তোমায় কেমন ক'রে রাখবে শ্যামল, ঢেকে—
নীল হ'ল যে তোমার ছোঁওয়ায় তোমারি রঙ মেখে!
"শূন্য তোমায় মানে না হায়"—কে সে অবোধ বলে?
চাউনি তোমার বৃন্দ তারার নয়নে ঝল্‌মলে!
ঢাকবে তোমায় কেমন ক'রে মৃন্ময়ী মেদিনী—
পঙ্কে যখন উঠল ফুটে চিন্ময়ী নলিনী!
রাখতে পারে রত্নকে কি লুকিয়ে রত্নাকরে?
মণির আশায় ডোবে প্রেমের ডুবারি সাগরে।
বীজকে ছোট ব'লে মাটি করে হাসাহাসি,
মাটির রসেই মহীরুহ হয় যে সে উচ্ছ্বাসি'।
"বহ্নিকণা নিভাই আমি"—দৃপ্ত পবন বলে,
সেই কণারি মালা গেঁথে লাখ দেয়ালি জ্বলে।
বজ্রবাদল শাসায়ঃ "আমি দেখাই আঁধার-ভয়,"
পরক্ষণেই গায় ঝল্‌কেঃ "সোনার আলোর জয়!"
তোমার লীলার না পেয়ে পার অচিন, যতই ভাবি—
ততই সবই হয় হেঁয়ালি, পাই না খুঁজে চাবি।

---

* প্রসিদ্ধ গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার। পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ*

উনিশ শতকে যুগসন্ধিতে তুমি
যেই এলে প্রভু, তোমার জন্মভূমি
ভাস্বর হলো দুস্তর অনালোকে,
আগুন লাগলো ভেদবুদ্ধির
অজ্ঞতা নির্মোকে ॥

তোমার শুদ্ধা ভক্তি তর্কাতীত
সমন্বয়ের মহিমায় মণ্ডিত
হে সমদর্শী মূর্ত বিশ্বত্রাতা !
ঊর্ধ্ববাহুতে অভয়মুদ্রা
মাভৈঃ মন্ত্রদাতা ॥

অমিত শক্তি দিলে নরেন্দ্রপ্রাণে
সংশয়-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসানে
অনলবীর্য জিজ্ঞাসু চেতনায়,
দীক্ষিত হ'লো বিবেকানন্দে
নবযুগ রচনায় ॥

হে দেব, তোমার অমল অভ্যুদয়ে
ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধনে ভুবন জয়ে
দলে দলে এল সন্ন্যাসী সন্তান,
নবভারতের নির্মাতা যাঁরা
প্রজ্ঞায় বলবান ॥

তুমি যদি প্রভু না আসতে মরলোকে
মায়াবন্ধনে অপার দুঃখে শোকে
স্বার্থপঙ্কে আবিল এ সংসারে,
পাপীয়স দিবারাত্রি কাটতো
অবিরাম হাহাকারে ॥

যুগে যুগে তাই এসেছ হে অবতার
জীবের দুঃখ ঘোচাতে দুর্নিবার
লোকশিক্ষার লোকায়ত দেবালয়ে,
অধর্মনাশে ধর্মস্থাপনে
পুঞ্জ পাপক্ষয়ে ॥

ভবতারিণীর তৃতীয় নেত্রজ্যোতি
নির্বিকল্প সমাধিসিদ্ধ যতী
মাতা সারদার সাধনার বিগ্রহ,
কলির ক্লৈব্যনাশনে তোমার
জন্ম পরিগ্রহ ॥

---

* সুপ্রসিদ্ধ কবি। অর্ধ শতাব্দী যাবৎ কবিতা ও কাব্যসমালোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সেবক। মোট ১৭টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। ইংরেজী ফরাসী জার্মান রুশ ও চীন ভাষায় ইঁহার বহু কবিতা অনূদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ : 'উদাত্ত ভারত' ও 'রক্ত গোলাপ'।

কবে আমি হব সে-পূজারী

শ্রীশান্তশীল দাশ*

শুধুই মন্দির গড়ি, আর নানা আড়ম্বর দিয়ে
পূজো-পূজো খেলা করি—সেই খেলা আত্মপ্রবঞ্চনা।
কত সাজ সজ্জা নিয়ে, শঙ্খ ঘণ্টা মন্ত্র উচ্চারণে
অন্তরের রিক্ততা কি ঢাকা পড়ে সেই কলরবে ?

একান্ত আপন জন তুমি যে আমার এ কথাটি
কোনদিন মনে জাগে ? বেদনা কি তোমার বিরহে ?
কই, কোথা সে-বেদনা ? এতটুকু নেই কোনখানে ;
তোমার আরতি করি—সে-আরতি অভিমানে ভরা।

আমার অন্তর মাঝে নিঃশব্দে তোমার পূজারতি
কবে হবে ? সে-নির্জনে তুমি আমি আর কেহ নয় ;
আমার সমস্ত দুঃখ, আমার সমস্ত সুখ নিয়ে
সাজা'ব তোমার ডালা, ঢেলে দেব ও দু'টি চরণে।

সেই পূজা কবে হবে ? কবে আমি হব সে-পূজারী ?
এই পূজো-পূজো খেলা—কী বেদনা জাগায় যে মনে !

---

* প্রসিদ্ধ কবি

ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়*

করুণা, করুণা প্রভু ! আশ্চর্য কৃপার
মৃতসঞ্জীবনী স্পর্শে নিঃস্পন্দ আত্মার
দিব্য জীবনের মাঝে মহা উদ্বোধন !
পাষাণ অহল্যা—তার নবজাগরণ
শ্যামশস্যে হিল্লোলিত প্রাণ-সমুদ্দুরে !
সমুদ্ধত অহং-এর দুর্দান্ত অসুরে
করেছিনু কর্ণধার জীবন-তরীর !

সহসা উঠেছে ঝড় ! সুপ্ত বারিধির
বক্ষ জুড়ে তরঙ্গেরা উদ্বেল, উন্মাদ !
মুহূর্তে বিধ্বস্ত আত্মসংযমের বাঁধ !
যত অনুশাসনের কঠিন শৃঙ্খল
নিমেষে বিচূর্ণ ! চূর্ণ দৃপ্ত মনোবল !
এখন করুণকণ্ঠে কাঁদি, "নারায়ণ !
সমুদ্র শাসন করো ! শান্ত করো মন !"

---

* চারণকবির অপ্রকাশিত কবিতা।

উজ্জীবন

বকলম

যেখানে ভাঙন ধরে
সেখানে সব-কিছু ভাঙ্‌চুর হোক।
তুমি অভয়, অশোক।
জোড়াতালি দেবার চেষ্টা আর নয়।
ওটা মাটির ভাঁড় অন্নময় :
ওটাকে ছাড়তে হয়।

যেখানে রঙ ধরে,
আঁধার যবনিকার পার,
সেখানে সব একাকার,
তা ধরা-ছোঁয়ার নয়,
অব্যক্ত অব্যয়,
মুক্ত মনোময়,
সে ই প্রশান্তি নিলয়।

সেখান থেকে উত্তরণ শীর্ষ স্তরে :
যেখানে রস ধরে,
- রসো বৈ সঃ—
সবই সেখানে ঐশ।
স্রষ্টা-সৃষ্টি, কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া সব অদ্বয়,
একসত্তা আনন্দময়,
তারই নাম ব্রহ্মে লয়।

চলছি আমি চলছি

সেথ সদরউদ্দীন*

চলছি আমি চলছি পথ
চলছি শুধুই চলছি
চলাব পথে কতই বাধা
দুইটি পদে দলছি।
চলছি শুধুই চলছি ॥

থামব নাক থামব না,
জীবন ধরে রাখব না,
পথের ডাক শুনছি,
যাত্রা শুরু অকাতরে—
এক পা এক পা দু'পা করে
লক্ষ চরণ গুণছি।
সারা দেহে ক্লান্তি নামে
পথের মাঝে টলছি।
চলছি তবু চলছি ॥

ডাক দিয়েছে অসীম আমায়
সাধ্য কার আমায় থামায়
পথের ধূলি মাখছি,
অনেক দীর্ঘ পথের শেষে
প্রভুর সাথে মিলব হেসে
সেই বাসনা রাখছি।
শ্রান্তি আমার ফেলব ধুলায়
শপথ করে বলছি।
চলছি আমি চলছি ॥

---

* এম. এ., বি. এড্., প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পাণিহাটি।

'রূপং দেহি, জয়ং দেহি'

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

কোন কুণ্ঠা জাগে না তো যবে অকাতরে
তোমার চরণে যাচি 'দেহি দেহি' ক'রে।
এমন অবোধ পুত্র কে আছে এ ভবে
কাম্যধন আছে জেনে চুপ করে র'বে
না চাহিয়া স্নেহময়ী জননীর কাছে?
রূপ জয় যশ তাই অসংকোচে যাচে।

আমি যে-রূপের প্রার্থী—সে তো আত্মরূপ!
কার সাধ্য দিতে পারে এই অপরূপ
রূপরাশি তুমি ছাড়া! আমি চাই জয়—
জিনি যাহে মৃত্যুপতি—হই মৃত্যুঞ্জয়।
অঞ্জলি ভরিয়া চাহি করিবারে পান
জ্ঞানের সে যশ-সুধা যা আছে অম্লান
তোমার অক্ষয় ভাণ্ডে! দাও মাগো, দাও
দিয়ে দিয়ে চিত্ত মোর অমৃতে ভরাও।

দেবী-প্রার্থনা

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

এদেশ মোদের হয়েছে মলিন অন্যায় অবিচারে,
আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠেছে দানবের হুঙ্কারে।
এসো মা জননী শক্তিরূপিণী লয়ে দশ প্রহরণ
অসুর নাশিতে এসো মা ভবানী—এসেছে বোধন-ক্ষণ।
ফুলে ফলে আর তটিনীর জলে বহে আনন্দ-বাণী—
শরৎ-শোভায় সূর্য-কিরণে এসো মা হরের রাণী।
শক্তিবিহীন পরাণে মোদের দাও মা নবীন শক্তি,
আগমনী গানে জাগিয়া উঠুক হৃদয়ে পরমভক্তি।

মিস্টিসিজ্‌ম্‌ ও মানবতা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী*

মিস্টিসিজ্‌ম্‌ শব্দটি বিদেশী, কিন্তু মিস্টিক ভাবের প্রসার সর্বদেশে ও সর্বকালে। দেশভেদে এই একই ভাব বিভিন্ন নামে 'বিশিষ্ট' মানুষের ভিতর প্রকাশ পায়। আদ্যকাল থেকেই তা প্রকাশ পেয়ে আসছে। মিস্টিকতত্ত্ব-বিশারদ R. M. Jones বলেন, 'Mystical experience is as old as humanity.'

আবার কেউ হয়তো বলবেন, ভাবালু অনগ্রসর মানুষই এই ভাববিলাসে আবিষ্ট হয়। শিশুসুলভ সরল বিশ্বাসের দর্পণেই মিস্টিক ভাবের প্রতিফলন ঘটে। সভ্যতা ও জ্ঞান যত প্রসারিত হয়, ততই এ-ভাব বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে অন্ধকারের মতই আত্মগোপন করে।

শেষোক্ত মতটি ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। অসভ্য আদিম স্তরেই মিস্টিক অনুভব সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঊনবিংশ শতাব্দের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, এমন কি বিংশ শতকের আকাশচারী আবিষ্কার এ-ভাবকে বিলুপ্ত করতে পারেনি। সত্য-সন্ধানের আগ্রহ ও পরমসত্যের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা যতদিন মানুষের ভিতর থাকবে, মিস্টিকভাবও ততদিন থাকবে।

কবি দার্শনিক জ্ঞানী মরমী সাধক— সকলেই কোন-না-কোন দিক থেকে মিস্টিক। এমন কি বৈজ্ঞানিকও পরম তন্ময়তার স্তরে মিস্টিক। তবে সৌন্দর্য ও ধর্মসাধনার ক্ষেত্রই মিস্টিক ভাব উপলব্ধি ও প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র। কবি বিহারীলাল বলেন,

> কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
> যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের ধেয়ানে।

মিস্টিসিজ্‌ম্‌ বা মিস্টিক ভাব বলতে কি বোঝায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বার বার সাবধান করে বলেছেন,—Mist (কুহেলিকা), Mystery (প্রহেলিকা), Maze (গোলকধাঁধা), Magic (ইন্দ্রজাল) ও Miracle (অদ্ভুত ঘটনা) প্রভৃতির সঙ্গে মিস্টিসিজ্‌মের কোন যোগ নেই। Walter. T. Stace বলেন, 'There is nothing misty or foggy about mysticism. Mysticism is not also sensational mysteries or occultism; neither it is parapsychological phenomena such as telepathy, clairvoyance, nor has it anything to do with ghosts etc.' (The teachings of the Mystics).

যাঁরা অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড করেন, নখদর্পণ করেন, কুমারী-প্রশ্নে ভবিষ্যৎ ফলাফল নিরূপণ করেন— তাঁরা মিস্টিক না-ও হতে পারেন। অবশ্য ভারতীয় শাস্ত্র বলে, মিস্টিকদের ভিতর 'অষ্ট সিদ্ধি'র প্রকাশ ঘটতে পারে। সেগুলি পরম মিস্টিকভাবের আনুষঙ্গিক নিম্নস্তরের ফল। সামুদ্রিক বিদ্যা ভূতবিদ্যা বিষবিদ্যা মণিলক্ষণ

---

* এম. এ., অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ, কলিকাতা; অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির নাম: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার (দুই খণ্ডে), শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, চর্যাগীতির ভূমিকা, সাহিত্য-দীপিকা, হিরন্ময় পাত্র, ভারত-সাবিত্রী, কুমারীকন্যা-কাহিনী, নিরঞ্জনা নদীর ঢেউ, বাংলা সাহিত্যে মা।

অত্যুজ্জ্বলন সৌভাগ্যকরণ প্রভৃতি মিস্টিকতন্ত্রের বাইরের ব্যাপার। মিস্টিসিজ্ম্ গূঢ়, কিন্তু রহস্যময় নয়—গভীর, কিন্তু ধাঁধা নয়—দিব্য, কিন্তু যাদু নয়। তা তর্কাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত হলেও সত্য ধ্রুব ও অপরোক্ষ প্রত্যয়।

মিস্টিসিজ্ম্ হল বিরাট অখণ্ড সত্যের সম্যক্ দর্শন। যে সত্য ধ্রুব ও চিরন্তন, যে সত্য এক হয়েও সর্বব্যাপী, যে সত্য রূপ-বিবর্জিত হয়েও রূপের ভিতর প্রসৃত, নিঃসঙ্গ হয়েও সংসর্গ, অবিভক্ত হয়েও বিভক্তরূপে প্রতিভাসিত; যা সূক্ষ্ম বলে সাধারণের অবোধ্য, অথচ জ্ঞানী ও ভক্তের নিকট সহজবোধ্য— যা দূর থেকেও দূরে, অথচ কাছের থেকেও কাছে – যা অণুতম, অথচ মহত্তম – যা নিখিল ভূতের অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত; জ্যোতির জ্যোতি, অন্ধকারের পরপারে আলো, মৃত্যুর অতীত অমৃত, অনন্দজয়ী আনন্দ— নিজের অন্তরে ও নিখিল জগতের মধ্যে তার একান্ত নিশ্চিত উপলব্ধিই মিস্টিসিজ্ম্। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'The essential characteristic of mysticism is immediate, intuitive relation with the Absolute' (La Vallee Poussin).

এই নির্বিশেষ তত্ত্বকে (Absolute) কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন ভগবান্, কেউ বলেন পরমাত্মা :

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥
(ভাগবত)

ব্যক্তিভেদে বা মত ও পথভেদে তত্ত্বের নাম পৃথক, কিন্তু অনুভব সর্বত্র একপ্রকার।

এই অনুভবের আর একটি দিক—মানুষের অন্তরতম বিশুদ্ধ সত্তার সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয়। অর্থাৎ মিস্টিসিজ্ম্ এক অর্থে আত্মদর্শনরূপ আত্মপ্রত্যয়। Rudolph Otto বলেন, 'To know and to find one's self; to know one's own soul in its true nature and glory, and through this knowledge to liberate and realize divine glory; to find the abyssus, the depths within the self and discover the self as divine in its inmost depth.'

আমি যে মানুষটি আছি, সে মানুষটি অসার ও অনিত্য। আমার দেহ ভঙ্গুর, রূপ ভঙ্গুর। বাইরের দিক থেকে আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ যেমন নশ্বর, তেমনই নশ্বর আমার অন্তরিন্দ্রিয় মন এবং সেই মনের সংজ্ঞা, সংস্কার, বেদনা, বিজ্ঞানাদি অনুভব। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় —কিছুই শাশ্বত নয়।

কিন্তু এই নাম ও রূপের অন্তরালে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির অতীত এমন একটি বিশুদ্ধ ও পূর্ণ কিছু আছে, যা অনশ্বর, সত্য ও ধ্রুব। আগুন তাকে দগ্ধ করতে পারে না, জল তাকে প্লাবিত করতে পারে না, অস্ত্র তাকে ভেদ করতে পারে না। তার কোন রূপ নেই, বর্ণ নেই— কোন লক্ষণও নেই। তা অরূপ, অবর্ণ, অলক্ষণ ও অলক্ষ্য। একে আবিষ্কার করা বা জানা অত্যন্ত কঠিন। দুরূহ হলেও তা অবোধ্য নয়। তাকে বোঝা যায় বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়ায়। এবং বোঝা গেলে, মুহূর্তে আমার এই নামরূপাত্মক আমি রূপান্তরিত হয়ে যায়। খণ্ড আমি তখন অখণ্ড, সঙ্কীর্ণ আমি তখন উদার, স্বরাট আমি তখন বিরাট, অনিত্য আমি নিত্য। এইটেই ব্যক্তির সঠিক স্বরূপ। পরিবর্তনশীল নাম ও রূপের অন্তরালে, এই নিত্য শুদ্ধ স্বরূপকে আবিষ্কার করা, তাঁকে প্রত্যয়বলে উপলব্ধি করাই মিস্টিসিজ্‌মের শেষ কথা।

এই নিজ স্বরূপকে শুধু অদ্বয় অখণ্ড বিরাটরূপে নিজের অন্তরে অনুভব করা নয়, তাকে আবার নিখিল বিশ্বে প্রতিফলিত করে উপলব্ধি করাও মিস্টিসিজ্‌মের অঙ্গ। তখন নিখিল বিশ্ব আর ব্যক্তি

আমি ভিন্ন থাকে না। আমিই নিখিলব্যাপ্ত। নিখিল বিশ্বেও তখন আর দুই বা নানা থাকে না। আমারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে বহুধা বিভক্ত এই জগৎ এক হয়ে যায়, আবার আমিও বহির্বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে যাই। মিস্টিক উপলব্ধিতে দুটি ব্যাপারই ঘটে—একটি সান্তের ভিতর অনন্তের অনুভব, অপরটি অনন্ত-অসীমে সান্তের ব্যাপ্তি। একটিতে বিম্বে—জলবুদ্বুদে প্রতিবিম্বিত আকাশ, আর একটিতে আকাশে ব্যাপ্ত বিম্ব: একটিতে অণুতে বিরাটের প্রকাশ, আর একটিতে বিরাটে অণুর ব্যাপ্তি। সর্বত্রই একের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেন, অন্তরে যিনি 'একা একাকী' 'অন্তরবাসিনী' —জগতে তিনিই 'বিচিত্র', 'বিচিত্ররূপিণী'। এই চিরন্তন এক ও অদ্বৈতের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে লাভ করার জন্য ব্যক্তিহৃদয়ের যাত্রা এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভব—এইগুলিই মিস্টিসিজ্‌মের প্রাণের কথা।

বস্তুতঃ মিস্টিসিজ্‌ম্‌ একপ্রকার বিশেষ অনুভব বা প্রত্যয় বা জ্ঞান। মানুষের প্রত্যয় বা জ্ঞান নানাপ্রকারের হতে পারে: (১) ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, (২) মনঃকল্পিত জ্ঞান এবং (৩) অপর প্রত্যয় বা প্রজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক থেকে অমলের কথায় এই তিন রকমের জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যায়ঃ—

(১) অমল। ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ওই দেখো না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে কাঠবিড়ালি কুটুস্‌ কুটুস্‌ করে খাচ্ছে।

—এখানে জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ। অমল চোখ দিয়ে যা দেখছে, তারই বর্ণনা করছে। পিসিমা, জাঁতা, ভাঙা ডাল, কাঠবিড়ালির খুদ খাবার চিত্র প্রভৃতি স্থূল দৃষ্টিগ্রাহ্য। এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই সাধারণ লোকের জ্ঞান।

(২) আবার এই অমলই, যে গ্রামে সে কখনো যায়নি, পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী-নদীর ধারে, দইওয়ালাদের গ্রামের বর্ণনা দিয়েছে:—

অমল। অনেক পুরানো কালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম—একটি লালরঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওয়ালা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দই। কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বই কি, খুব চরে।

অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী নিয়ে যায়—তাদের লাল শাড়ী পরা।

দই। বা! বা! ঠিক কথা, নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে।

—এখানে বর্ণনা সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত বা অনুমান। অনুমানের পশ্চাতে খানিকটা বইপড়া বা লোকমুখে শোনার অভিজ্ঞতা থাকলেও, মনের কল্পনার স্থানই প্রধান। এই কল্পনা কবির সামগ্রী। এ শক্তির ভিতর একটি যাদুশক্তি আছে। এর সাহায্যে কবি অদেখা দৃশ্য দেখেন, অগম্য স্থানে গমন করেন, যে শব্দ সহসা শোনা যায় না, এমন শব্দ শোনেন। অথচ এ কল্পনা মিথ্যাও নয়। কবি-কল্পনার জালে ধরা দেয় বাস্তব সত্যের এক রসরূপ। এই মানস জ্ঞান বাস্তব সত্যের উপর মায়ার ইন্দ্রজাল রচনা করে। বাস্তব সত্য থেকে তা কোনক্রমেই অসত্য নয়। Tennyson বলেন, Literary truth is truer than facts: যার ফলে বালক অমলের বর্ণনা দইওয়ালার কাছে খুব সত্য বলে মনে হয়।

(৩) তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান প্রজ্ঞালব্ধ।

তা স্থূল ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান নয়, অতীন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান। এই জ্ঞানই মিস্টিক অনুভবের মূল কারণ। সে জ্ঞানও এক হিসাবে প্রত্যক্ষ; কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞান থেকে পৃথক করে বোঝাবার জন্য বলা হয় 'অপরোক্ষ'। অপরোক্ষের এক মানে—অপর অক্ষ (অন্য চোখ)—যা দিয়ে বস্তুজগতের অতীত জগতের রূপ ও দৃশ্য দেখা যায়। অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, তা এই চোখ দিয়ে। কৃষ্ণ বলেছিলেন, বিশ্বরূপ তো সকল চোখ দিয়ে দেখা যায় না, 'দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।' (গীতা)। অমলও এই চোখ দিয়ে অদৃশ্য রাজার ডাকহরকরার আসার দৃশ্য দেখেছে। অপর দিকে এ চোখ অ-পর—পরের নয়, নিজেরই চোখ, কিন্তু অন্য ধরনের :—

> অমল। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—মনে হয়, আমি যেন অনেকবার দেখেছি।...আমি দেখতে পাচ্ছি। রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে—বাঁ হাতে তার লণ্ঠন কাঁধে চিঠির থলি।

শুধু দেখা নয়, অমল শুনতেও পায়—

> ফকির, এই যে ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না!

এ দৃশ্য সকলে দেখতে পায় না, এ বাজনা সকলে শুনতে পায় না। পিসেমশাই দেখতে পাননি, মোড়লও এ ধরনের অনুভব ধারণা করতে পারেনি। তারা অমলের কথায় অবাক হয়েছে, উপহাস করেছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের বাইরে কোন জ্ঞান থাকতে পারে, এ তাদের বোধের অগম্য। কিন্তু মানুষের ভিতর কিছু মানুষের এই দিব্য দৃষ্টি ও দিব্য কর্ণ থাকে। সে চোখ ও সে কান অমলের ছিল, ঠাকুর্দার ছিল — যা দিয়ে তাঁরা 'uncreated light' কে দেখতে পেয়েছেন, 'heavenly music'কে শুনতে পেয়েছেন। এ জ্ঞান মিথ্যা নয়, এই জ্ঞান দিয়ে যা প্রত্যক্ষ হয়, তাও 'অপরোক্ষ' সত্য। সত্যের এই অপরোক্ষ জ্ঞান বা স্ব-জ্ঞানই (Intuitive Knowledge) মিস্টিসিজ্‌ম্।

মিস্টিসিজ্‌মের ভারতীয় প্রতিশব্দও আছে। কেউ কেউ Mysticism-এর বাংলা করেছেন 'অতীন্দ্রিয়বাদ', কেউ 'মরমিয়াবাদ' (আচার্য ক্ষিতিমোহন)। মোহিতলাল একে বলেছেন, 'তত্ত্বরস-রসিকতা'। 'তত্ত্বরস-রসিকতা'র ভিতর সৌন্দর্য ও রস-সম্ভোগের প্রতিবেদনটিই প্রবল। কাব্য-শিল্পের জগতে এ নাম চলতে পারে।

ধর্মসাহিত্যে মিস্টিসিজ্‌মের ভারতীয় প্রতিশব্দ 'অপরোক্ষানুভূতি'। অপরোক্ষ মানে সাক্ষাৎ অধিগত। তা পরোক্ষ নয়, অর্থাৎ পরের দ্বারা শ্রুত বা অনুমিত নয়। পরের শ্রুত বা অনুমিত অনুভব তর্কাপেক্ষ ও বিকল্পাশ্রয়ী। কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি নির্বিকল্প ও তর্কাতীত। কারণ তা নিজের সাক্ষাৎকৃত; তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অনুভব বলতে এই অপরোক্ষানুভূতিকেই বোঝায়। সোজাসুজি একে 'প্রত্যক্ষ' অনুভূতি না বলার কারণ, এ অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয়জ্ঞ অনুভূতি থেকে পৃথক। অথচ এও এক রকমের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার। তবে সে সাক্ষাৎকার Sensory plane-এর নয়, ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের।

বৌদ্ধতন্ত্রে মিস্টিসিজ্‌মের আর একটি প্রতিশব্দ আছে— 'স্ব-সংবেদন'। আমাদের বাঙালী সিদ্ধাচার্যেরা একে বলেছেন 'সঅ সংবেঅণ'। ডঃ সুকুমার সেন এই স্ব-সংবেদনকে বলেছেন— 'স্বয়ম্ভুয়মান নির্বিকল্প মহাসুখ'। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে স্বসংবেদন সুখের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভব হতে পারে। তবু, স্বসংবেদন যে শুধু সুখেরই অনুভব হবে, তার তো কোন স্থিরতা নেই; অনুভব সুখেরও হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে, ঘৃণারও হতে পারে, ভয়েরও হতে পারে। মিস্টিসিজ্‌মের

ব্যাপারটি ঘটে স্বানুভব নিয়ে, বিষয় এর বিচার্য নয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিন্তু স্বসংবেদন বোঝাতে বিষয়ের দিকে যাননি, অনুভবের ওপরেই জোর দিয়েছেন। হেবজ্রতন্ত্রের ইংরেজী অনুবাদক Dr. Snellgrove স্বসংবেদনের অর্থ করেছেন 'Self experiencing'। Mysticism-এর পাশ্চাত্য প্রবক্তারাও বলেন, 'Mysticism is the science of Self-evident Reality.' (E Underhill).

বৌদ্ধতন্ত্রেও বলা হয়েছে, বাকপথের অতীত যে জ্ঞান, তা স্বসংবেদ্য— 'স্বসংবেদ্যমিদং জ্ঞানং বাক্‌পথাতীতগোচরম্‌।' (হেবজ্রতন্ত্র)। উপনিষদে বলা হয়েছে— এ জ্ঞান মেধা দিয়েও লাভ করা যায় না, শ্রুতি দিয়েও লাভ করা যায় না। এ জ্ঞান স্বয়ংবেদ্য।

স্বসংবেদনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হেবজ্রতন্ত্রের 'যোগরত্নমালা' টীকার রচয়িতা কাহ্নপাদ বলেছেন, স্বসংবেদন হচ্ছে অ-পর প্রত্যয় বা আত্ম-প্রত্যয়, কিন্তু সে প্রত্যয় প্রত্যাত্মবেদ্য— 'স্বসংবেদ্যমপর-প্রত্যয়ং প্রত্যাত্মবেদ্যং স্বভাব ইতি।' এখানে 'প্রত্যাত্মবেদ্য' শব্দটি লক্ষণীয়। মিস্টিক সংবেদন যে-কোন বিষয় অবলম্বনে হতে পারে, প্রকৃতি প্রেম সৌন্দর্য আনন্দ দুঃখমৃত্যু—যে-কোন বিষয়কে নিয়ে স্বরূপানুভব বা স্ব-সংবেদন হতে পারে। যার ফলে, কেউ বা Nature-mystic, কেউ বা Love-mystic, কেউ বা Mystic of the Soul। কিন্তু মিস্টিক সকলে হতে পারে না। মিস্টিক তিনিই, যিনি প্রত্যগাত্ম বা পরাবৃত্ত (Retroverted) —যিনি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়কে উল্‌টো পথে ঘোরাতে পেরেছেন। তাঁর কাছে সমুখ বিমুখ, এ জগতের আলো তাঁর কাছে অন্ধকার, এ জগতের অন্ধকার তাঁর কাছে আলো; এখানকার দুঃখ তাঁর কাছে সুখ, এখানকার সুখ দুঃখ। এ জগতের ভয়াল মরণ তাঁর দৃষ্টিতে 'শ্যাম-সুন্দর'—'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম-সমান।' Rudolph Otto বলেন, 'His consciousness is transfigured in a particular way...He undergoes conversion.'

মিস্টিক প্রত্যগাত্ম, তাঁর জগৎ অন্য এক জগৎ। সে জগতেও আনন্দ আছে, বেদনা আছে, আছে বিপ্রলম্ভের ক্রন্দন ও সম্ভোগের উল্লাস। কিন্তু সে ভাব ও ক্রিয়ার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মিস্টিক সাধক তাই বলেন,

> যত সুখ রঙ্গ দেখি না বান্ধিব মন।
> পলটিয়া নিজ দেশে স্মরণ গমন॥
> পিরীতি উলটা রীত না বুঝে চতুরে।
> যে না চিনে উলটা সে না জীয়ে সংসারে॥
> সমুখ বিমুখ সব বিমুখ সমুখ।
> পলটা নিয়মে সব জগতে সংযোগ॥
> সমুখের সব পন্থ বিমুখ করিয়া।
> পলটি বিমুখ পন্থে জাইব চলিয়া॥
>
> (আলী রাজা)

এই 'উলটা' 'পলটা' 'বিমুখ' পথটিই প্রত্যগাত্মার পথ: বিপরীত অনুভবই তাঁর সত্যকারের অনুভব। জাগতিক অনুভব দিয়ে মিস্টিক অনুভব বিচার করলে, তাকে কুৎসিৎ, অদ্ভুত ও অসুন্দর বলে মনে হবে। 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা একদিন জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে তাঁর স্বামী রাজাকে দেখেছিলেন—"ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্য চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল, ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না—ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।"

কিন্তু এই সুদর্শনাই যেদিন প্রত্যগাত্ম হয়ে

পরাবৃত্ত চোখ মেলে অন্ধকার ঘরে রাজাকে দেখলেন, সেদিন তাঁর দেখা ও অনুভব কত পৃথক! তিনি বললেন,

"আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও। তুমি অনুপম।"

এই স্বতন্ত্র অনুভবই মিস্টিকের অনুভব। কাহ্নপাদের কথাতেই বলা যায়, মিস্টিসিজ্‌ম্ হচ্ছে—'স্বসংবেদ্যম্ অপরপ্রাপ্যং প্রত্যাত্মবেদ্যং স্বভাব ইতি।' অর্থাৎ মিস্টিসিজ্‌ম্ হচ্ছে প্রত্যগাত্মার স্বানুভব বা স্বসংবেদন।

আমাদের একটি খুব ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, অপরোক্ষানুভব-সম্পন্ন ব্যক্তি জগতে 'অব্যবহার্য'। তিনি জগৎ ও জীবনের প্রতি উদাসীন। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, যেখানে আত্মার স্বরূপ পরিচয় ঘটে, সেখানে সে তো অব্যবহার্য হয়ে যায় না। বরং মিস্টিক মানুষ মানবতার স্ফুরণে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে পূর্ণ শতদলের মত সুন্দর ও সুরভিত হয়ে ওঠে। মিস্টিক অনুভবে ব্যক্তি তন্ময় হন, কিন্তু যতদিন তিনি বেঁচে আছেন, ততদিন ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় না। আচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন, The maintenance of individuality is not inconsistent with a state of enlightenment. The spirit is other-worldly, but their life is not colourless. They transform their energies into a living whole which expresses itself through love and power.'

বিষয়টি আরো একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। মিস্টিক অনুভবের ফলগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, স্ব-সংবেদনে একটি সর্বাত্মভাব অনুভূত হয়। একের অদ্বৈত অনুভবের সঙ্গে, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাব জাগে। তাতে নানাত্বের ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে যায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা বলেন, 'স্বপর বিভাগ' আর তখন থাকে না। আমি-তুমি বোধটাই যত অনিষ্টের গোড়া। জগতের যত পাপ, যত অন্যায়, পরপীড়ন, পর-শোষণ, প্রবঞ্চনা—সব অভ্রভেদী পর্বতস্তূপের মত পুঞ্জীভূত হয়—যতক্ষণ থাকে স্বার্থবুদ্ধি ও ভেদবোধ। কিন্তু অপরোক্ষানুভবে এই আত্ম-পর ভেদজ্ঞান নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। একটি আত্যন্তিক সাম্যবোধে ব্যক্তি-হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। দর্শনকারেরা এই বোধকে বলেন 'সমরস'। তন্ত্র বলে সমরস হচ্ছে 'একো ভাবরসাস্বাদঃ'—এক বা সমভাবের আস্বাদন। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সমরসকে বলেছেন 'The sameness or oneness of emotion.' এই সমরসের দৃষ্টিতে জগতকে দেখা গেলে, 'কে মোর আত্মপর?' তখন একটি সার্বিক করুণাবোধেও হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়। তখন সাদা-কালো, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র ভেদজ্ঞান থাকে না। তখন ব্যক্তি স্বভাবতই হয় 'জগদর্থকরুণাভারস্তিমিতহৃদয়।' বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা বলেন, তত্ত্বাববোধে যে গগনব্যাপী অদ্বয় সহজতরু জন্মলাভ করে, সে তরুর ফুল ও ফল মহাকরুণা।

দ্বিতীয়তঃ মিস্টিক অনুভবে সুপ্তসত্তার জাগরণ ঘটে—ভূমি হয় ভূমা, স্বরাট হয় বিরাট। ঋষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, শ্বেতকেতু, তুমিই সেই—'তত্ত্বমসি'। যখন মানুষ স্ব-স্বরূপকে জানে, তখন মুহূর্তে ক্ষুদ্রতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ক্ষুদ্র অহং বিশ্বব্যাপ্ত অহংকে প্রত্যক্ষ করে। তখন, আমি ছোট, আমি সঙ্কীর্ণ—এই বুদ্ধির বিনাশ ঘটে। আমারই ভিতর প্রকাণ্ড শক্তি, বিপুল জ্ঞান, অসীম আনন্দ অনুভব করি। উপনিষদ বলেন,

তাঁকে জানাই একমাত্র পথ। বিরাট বস্তু (ব্রহ্ম) অমর, অক্ষয়, অক্ষর, অব্যয়। আমিও অমর, অক্ষয়, অক্ষর। মৃত্যুভীত জীবনে, মৃত্যুকে জয় করবার মত বর্ম এই বোধের চেয়ে আর কিছু আছে কি? উপনিষদ তাই বললেন, 'তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যু-মেতি। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।' পাশ্চাত্য মিস্টিকতত্ত্ব-বিশারদেরা একেই বলেছেন, 'expansion of soul'.

ব্যক্তিসত্তার এই মহাজাগরণ মিস্টিক অনুভবের অমৃতফল। ঋগ্বেদে দেখা যায়, অম্ভৃণ ঋষিকন্যা বাক্ এই সত্যকে অনুভব করে বিশ্বপ্রসূতির গৌরব ঘোষণা করে বলেছিলেন, আমিই 'রাষ্ট্রী' (রাষ্ট্র-শক্তি), আমিই 'সংগমনী বসূনাং' (ধনের জনয়িত্রী), আমিই 'চিকিতুষী' (সর্বদ্রষ্ট্রী)। এই যে আত্মশক্তির অববোধ, এ সর্বভয়ের উপশান্তা। উপনিষদ তাই বজ্ররবে ঘোষণা করলেন,

'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।'

তৃতীয়তঃ মিস্টিক উপলব্ধিতে সৌন্দর্যবোধেরও উদ্বোধন ঘটে। স্ব-সংবেদনে যে অক্ষর সত্যের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় হয়, তিনি পরম আনন্দ, পরম সুন্দর। শঙ্করাচার্যের শ্রীবিদ্যার মত তিনি 'সৌন্দর্যলহরী', কবি বিহারীলালের সারদার মত তিনি,

'সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী।'

তিনি কান্তির কান্তি, দীপ্তির দীপ্তি, রূপের রূপ। উপনিষদ তাঁকে পুরুষরূপে কল্পনা করে বলেন, সেই রূপই বিশ্বে শত-সহস্র রূপে প্রকাশিত— 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।'—এই বিশ্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ব্যক্তিসত্তার সমগ্র সৌন্দর্য-চেতনাকে আন্দোলিত করে। সে সৌন্দর্য, সে আনন্দ অনির্বচনীয় 'বাক্‌পথাতীত' হলেও রূপদ্রষ্টা তাঁকে প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না। অরূপকে প্রকাশ করার তাগিদে রূপদ্রষ্টা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে ওঠেন রূপদক্ষ শিল্পী ও কবি। বৈদিক দ্রষ্টা ঋষিদের বলা হয় 'কবির্মনীষী'। তারও কারণ এই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিস্টিকদের কবি-সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁরা বলেন, মিস্টিক সংবেদন অনির্বাচ্য হলেও, মিস্টিকেরা স্বসংবেদনকে কথাবেদ্য করে তুলতে চেষ্টা করেন। যে ভাব শুধু অনুভবের সামগ্রী, তাকে প্রকাশ করতে গেলে রূপক-প্রতীকের প্রয়োজন হয়। রূপক-প্রতীক-সঙ্কেতের ভাষাই মিস্টিকদের একমাত্র ভাষা—স্বসংবেদনের ভাষা চিরকাল রূপকাশ্রয়ী ও প্রতীকধর্মী। E. Underhill বলেন, 'All kinds of symbolic language come naturally to the articulate mystic, who is often a literary artist as well.'

এইখানেই মিস্টিক একাধারে কবি ও শিল্পী। কবিরও প্রধান অবলম্বন ব্যঞ্জনাময় অলঙ্কৃত ভাষা, আনন্দ ও রূপদ্রষ্টা মিস্টিকেরও প্রধান অবলম্বন বক্রভাষণ বা রূপময় বাণীশিল্প। এই বাণীশিল্প মিস্টিককে জোর করে আয়ত্ত করতে হয় না, সৌন্দর্যের ধ্যানে তাঁর প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৌন্দর্যের স্পর্শ লাগে। উপলব্ধির প্রকাশে তাঁর অলঙ্করণ 'অপৃথগ্‌যত্নে' নির্বর্তিত হয়।

মোটের উপর মিস্টিকের অতীন্দ্রিয় সংবেদন মিস্টিককে জীবন ও জগতের প্রতি উদাসীন করে তোলে না। আত্মশক্তির উন্মেষে তিনি অকুতোভয় হন, আত্মবিশ্বাসে হন অটল। উদার সার্বিক প্রেমে তিনি বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করেন। সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর দৃষ্টিও হয় শিব-সুন্দর। মিস্টিক মানুষ পূর্ণ মানবতার প্রতীক।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ঃ 'অবধূতের গল্প'

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অপরূপ গল্পকথাগুলির মধ্যে অন্যতম অবধূতের গল্প। বেদ উপনিষদ পুরাণ লোককথা— এমনি নানা উপাদানে তাঁর গল্পসাহিত্য গড়ে উঠেছে। ভাগবতের অবধূতের গল্পের উপাদান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পসাহিত্যে কীভাবে দেখা দিয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের সেই দিকটি আলোচ্য।

মহাভারতের আধ্যাত্মিকদর্শনরূপে আমরা 'গীতা'কে গ্রহণ করতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে রয়েছে 'উদ্ধবগীতা'। সাধক ও দার্শনিকদের কাছে 'উদ্ধবগীতা' অতি উচ্চস্তরের অধ্যাত্মগ্রন্থ। উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব উপদেশাবলীই 'উদ্ধবগীতা'। 'উদ্ধব-গীতা'য় অবধূতের কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে রয়েছে।

ভাগবতে অবধূতের গল্পটি শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বলেছেন—

অত্র মাং মৃগয়ন্ত্যদ্ধা যুক্তা হেতুভিরীশ্বরম্।
গৃহ্যমাণৈর্গুণৈর্লিঙ্গৈরগ্রাহ্যমনুমানতঃ ॥
তত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অবধূতস্য সংবাদং যদোরমিততেজসঃ ॥

(১১।৭।২৩-২৪)

— "এই মানবদেহেই অপ্রমত্ত পুরুষেরা সাধারণ দৃষ্টির অতীত আমাকে বুদ্ধ্যাদি হেতুর দ্বারা— অর্থাৎ জড়বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশ স্বপ্রকাশ চৈতন্য ছাড়া হতে পারে না— এই যুক্তি ও অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর আছেন বলে নির্ণয় করেন।" (এক্ষেত্রে কৃষ্ণই ঈশ্বর।)

(ঈশ্বর আছেন বলেই জগৎ আছে— একে বলে অন্বয়। ঈশ্বর না থাকলে জগৎ থাকতো না — এ হলো ব্যতিরেক। অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা প্রমাণ হলো যে, ঈশ্বর আছেন।)

"অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা ঈশ্বরের অসম্ভাবনার যুক্তি খণ্ডন করে আত্মার দ্বারা আত্মার সম্যক উদ্ধার প্রসঙ্গে অবধূত ও পরম বিবেকী যদুর সংবাদ — এই পুরানো ইতিহাসের উদাহরণ বিদ্বানেরা দিয়ে থাকেন।"[১]

যদু ও অবধূতের গল্পটি এইরকম— একদিন পরম ধার্মিক যদুর সঙ্গে অবধূতের দেখা। বয়সে তরুণ, সদসদ্ বিচার সম্পন্ন, নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণকারী, দেহের প্রতি নিদারুণ উপেক্ষা— এই 'কিঞ্চিৎ জড়োন্মত্তপিশাচবৎ' অবধূতকে দেখে যদু জিজ্ঞাসা করলেন, আয়ু, যশ আর ঐশ্বর্যের কামনায় সাধারণ মানুষ ধর্ম-অর্থ-কাম-চর্চায় নিযুক্ত থাকে। আপনি সর্ববিষয়ে সমর্থ হয়েও এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন? বিষয় সুখের উর্ধ্বে বিশুদ্ধচিত্ত আপনার আনন্দের কারণ কি?

উত্তরে অবধূত বললেন—

সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ॥
মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎ সর্প উর্ণনাভিঃ সুপেশকৃৎ॥

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাবিভাগের অধ্যাপক। 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা-গ্রন্থের জন্য উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত। 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য'—ইঁহার অপর দুইটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

১ 'আর্য্যশাস্ত্র' সংস্করণের অনুবাদ অবলম্বনে।

এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষমিহাত্মনঃ॥
(১১।৭।৩২-৩৫)

— 'রাজন্, আমারই বুদ্ধির দ্বারা স্বীকৃত— (উপদেশ নিবন্ধন নয়) অনেক গুরু আছেন, যাঁদের কাছ থেকে বুদ্ধি লাভ করে আমি মুক্ত হয়ে ভ্রমণ করছি। আমার সেই গুরুরা হচ্ছেন: পৃথিবী বায়ু আকাশ জল অগ্নি চন্দ্র সূর্য কপোত অজগর সাগর পতঙ্গ মৌমাছি হাতি মৌচোর হরিণ মাছ পিঙ্গলা কুরর (পাখি) বালক কুমারী ব্যাধ সাপ মাকড়সা আর কাঁচপোকা।

ভাগবতের এই অবধূত 'দত্তাত্রেয়' নামে ভগবানের অন্যতম অবতাররূপে স্বীকৃত। তবে উপদেশদাতা হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য আর সবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করায়। এ বৈশিষ্ট্য রামকৃষ্ণদেবের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বিভিন্ন ধর্মসাধনার গুরুদের কাছে যেমন তিনি সাধনপন্থা গ্রহণ করেছেন, তেমনি আবার সর্বধর্মমতের মূল সত্যকে এক জেনে বলেছেন, 'যত মত তত পথ', 'অনন্ত মত, অনন্ত পথ'।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবধূত 'কুরর'-গুরু প্রসঙ্গে বলছেন—

পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তমং নৃণাম্।
অনন্তং সুখমাপ্নোতি তদ্‌বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ॥
সামিষং কুররং জঘ্নুর্বলিনোঽন্যে নিরামিষাঃ।
তদামিষং পরিত্যজ্য স সুখং সমবিন্দত॥
(১১।৯।১, ২)

'প্রিয় বস্তু গ্রহণের ফলেই দুঃখের সৃষ্টি, এ কথা জেনে যিনি পরিগ্রহ থেকে বিরত হন, সেই বিদ্বান অনন্ত সুখের অধিকারী হন।'

'মুখে করে আমিষের টুকরা নিয়ে যাচ্ছে, এমন একটি কুররকে (বাজপাখীকে) অন্যান্য পাখীরা হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন আমিষের টুকরাটি ফেলে দিয়ে কুরর পাখীটি স্বস্তি লাভ করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে অবধূতের গল্পটি যে-ভাবে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিয়েছে, তাতে বর্ণনা-শক্তি ও অধ্যাত্ম অনুভবের গভীরতা এ দুয়ের সহজ মিলন লক্ষণীয়। কথামৃতের প্রথমভাগে (২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩) গল্পটি এসেছে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রসঙ্গে। শিবনাথের ঈশ্বরানুরাগের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ। কিন্তু তিনি জানেন, নানা সাংসারিক কর্মে ব্যস্ত শিবনাথ সবটা সময় ঈশ্বর-স্মরণে দিতে পারেন না। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

'বিষয়কর্ম করলেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা জোটে।

'শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটি গুরু মনে করেছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধরেছিল একটি চিল এসে একটা মাছ ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া করে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কা কা করে বড় গোলমাল করতে লাগলো। মাছ নিয়ে চিল যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলোও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্বদিকে ও পশ্চিমদিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হয়ে একটা গাছের উপর বসলো। বসে ভাবতে লাগলো ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম!

'অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন যে, যতক্ষণ মাছ সঙ্গে সঙ্গে থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে ততক্ষণ কর্ম থাকে আর কর্মের দরুন ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্মক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।'

চিলের উড়ে যাওয়ার বর্ণনাভঙ্গীর সঙ্গে সহজেই জাহাজের মাস্তুলে বসা পাখীটির উড়ে উড়ে সমুদ্র পার হওয়ার প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। মাস্তুলে বসা পাখীটির গল্পে আদিগন্ত সমুদ্রের পটভূমি এমন এক বিস্তার ও গভীরতার সঞ্চার করেছে, যার সঙ্গে চিলের গল্পটির ঠিক তুলনা হয় না। কিন্তু মূল বক্তব্য দুটি গল্পেই প্রায় এক। সাংখ্যদর্শনে এবং জাতকের গল্পে* শ্যেন, ভাগবতে কুরর, কথামৃতে চিল—গল্পের দিক থেকে এই পরিবর্তনটুকু দ্রষ্টব্য।

ঐ একই দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবধূতের আর এক গুরু মৌমাছির কথা বলেছেন। মৌমাছি এবং মৌচোর দুজনের কথাই ভাগবতের গল্পে রয়েছে। একজন মধুকর, অন্যজন মধুহা। মৌচোরের গল্পটিও মূলতঃ মৌমাছিরই গল্প। ভাগবতের ভাষায় গল্পটি এই—

ন দেয়ং নোপভোগ্যঞ্চ লুব্ধৈর্যদ্দুঃখসঞ্চিতম্।
ভুঙ্‌ক্তে তদপি তচ্চান্যো মধুহেবার্থবিন্মধু॥
সুদুঃখোপার্জিতৈর্বিত্তৈরাশাসানাং গৃহাশিষঃ।
মধুহেবাগ্রতো ভুঙ্‌ক্তে যতির্বৈ গৃহমেধিনাম্॥
(১১। ৮। ১৫, ১৬)

—'মৌমাছিকে অনুসরণ করে মৌচোর যেমন তরুকোটরে মৌচাক থেকে সঞ্চিত মধু হরণ করে, তেমনি যারা কোনরকম দান-ধ্যান না করে অর্থলোভে কেবল সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাদের সেই সঞ্চিত ধন, অন্যেরাই ভোগ করে। নিপুণ বিষয়ী লোকদের অতিদুঃখে উপার্জিত ধন থেকে যেসব অন্ন প্রভৃতি হয়, আগে তা সাধুসন্ন্যাসীরাই ভোগ করেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, "অবধূতের আর একটি গুরু ছিল মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধরে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সেই মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় করতে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবেই। তাদের সঞ্চয় করতে নাই।"

ভাগবতের গল্পটির সঙ্গে সামান্য একটু পার্থক্য এখানে মৌমাছির উপরে জোর দেওয়ায়। ভাগবতে মধুহা বা মৌচোরই গুরু। তবে অবধূতের গুরুর তালিকায় মধুকরও আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পের কেন্দ্র মৌমাছিকে আমরা ভাগবতের এই বর্ণনায় পাবো—

স্তোকং স্তোকং গ্রসেদ্ গ্রাসং দেহো বর্তেত যাবতা।
গৃহানহিংসন্নাতিষ্ঠেদ্ বৃত্তিং মাধুকরীং মুনিঃ॥
অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামাত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥
সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষুকঃ।
মক্ষিকা ইব সংগৃহ্নন্ সহ তেন বিনশ্যতি॥
(১১।৮।৯-১২)

—'যেটুকু আহারের দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, সেইটুকুই গ্রহণীয়। সন্ন্যাসী গৃহস্থকে পীড়ন না করে অল্প অল্প সংগ্রহ করে মাধুকরীর দ্বারা জীবন ধারণ করবেন।

'মৌমাছি যেমন ফুল থেকে মধুই গ্রহণ করে, তেমনি বিবেকবান মানুষ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শাস্ত্ররাশি থেকে সর্বতোভাবে সারটুকুই গ্রহণ করবেন।

'সন্ধ্যার সময় অথবা আগামীকাল এটুকু থাকে' —একথা মনে রেখে কখনো ভিক্ষা করবেন না। করপাত্র (যতটুকু হাতে ধরে) অথবা উদরপাত্র (যেটুকুতে পেট ভরে) হবেন— মৌমাছির মতো কখনো সঞ্চয়ী হবেন না। সন্ন্যাসী কখনো এইভাবে সঞ্চয় করবেন না। যদি করেন তাহলে

* সীলবীমংসন জাতক।

মৌমাছির মতো মৌচাকের (সঞ্চিত বস্তুর) সঙ্গে বিনষ্ট হবেন।'

ভাগবতের মধুকর এবং মধুহা—এই দু'য়ে মিলে রামকৃষ্ণদেবের মৌমাছির গল্প গড়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীর সর্বস্বত্যাগের এ উদাহরণের শ্রেষ্ঠ প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অর্থসঞ্চয় তো দূরের কথা, প্রয়োজনে একটুকু মুখশুদ্ধির মসলাও তিনি সঞ্চয় করতে পারতেন না। চৈতন্যদেবের অর্ধেক হরিতকীর গল্পটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অবধূতের আর এক গুরু ইষুকার বা শর-নির্মাতা অর্থাৎ ব্যাধ। এই ব্যাধের গল্পটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্পে ভাগবত থেকে একটু পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটি গল্পও দেখা দিয়েছে—যা ব্যাধের তন্ময়তার অনুরূপ এবং বাংলার পল্লী অঞ্চলের এক স্বাভাবিক চিত্র।

সাংখ্যদর্শনের আখ্যায়িকাপ্রকরণে ইষুকার বা শরনির্মাতার কাহিনী সম্বলিত সূত্র-(৪.১৪) ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার একটি গল্প বলেছেন। একাগ্র-চিত্ত শরনির্মাতা যেমন পাশ দিয়ে রাজা চলে গেলেও দেখতে পায় না, সেইরকম একাগ্রতার ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়।

ভাগবতের অবধূতের অন্যতম গুরু ইষুকার সম্বন্ধে রয়েছে—

তদৈবাত্মন্যবরুদ্ধচিত্তো
　　ন বেদ কিঞ্চিৎ বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্ত-
　　মিষৌ গতাত্মা ন দদর্শ পার্শ্বে॥
　　　　　　(১১। ৯। ১৩)

—'ব্যাধ যেমন একাগ্রচিত্তে লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ায় নানা বাজনা বাজিয়ে রাজার চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পায়নি, তেমনি যাঁর চিত্ত আত্মাতে অভিনিবিষ্ট তিনি বাইরের বা ভিতরের আর কিছুই জানতে পারেন না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপন সাধকজীবনের তন্ময়তা প্রসঙ্গে এই গল্পটি একটু অন্যভাবে শুনিয়েছিলেন —"গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা, গাড়ী, ঘোড়া··· কতক্ষণ ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হুঁশ নাই। সে জানতে পারলে না যে, কাছ দিয়ে বর চলে গেল।"

ভাগবতের গল্পের নৃপতির জায়গায় এখানে বর দেখা দিয়েছে। লোকমুখে এই জাতীয় গল্পের কিছু কিছু অদল বদল স্বাভাবিক। এক হিসাবে বরের যাত্রা আর একটু ঘনিষ্ঠ কল্পনার পরিচায়ক। *তবে এই গল্পটির সূত্রে রামকৃষ্ণদেব আর একটি গল্প* উপস্থাপিত করেছেন। গ্রাম-বাংলার পটভূমিতে সে গল্পটি আরো মনোহারী।

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগলো, মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে করে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, মহাশয়, অমুক বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হুঁশ নাই। তার হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। তখন পথিক বিরক্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে, চিৎকার করে পথিককে ডাকছে— ওহে শোন শোন! পথিক ফিরতে চায় না, অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বলছে, 'কেন মশায়! আবার ডাকছ কেন?' তখন সে বললে, তুমি আমায় কি বলছিলে?

পথিক বললে, তখন কতবার করে জিজ্ঞাসা করলুম —আর এখন বলছো কি বললে? পথিক বললে, তখন যে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই নাই।"

(কথামৃত : ৩য় : ২ই এপ্রিল, ১৮৮৩)

গল্পটি বলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি অপূর্ব উপমায় এই ধ্যানতন্ময়তাকে ফুটিয়েছেন—"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না— যেন বার বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—বাইরে পড়ে থাকবে।"

ভাগবতের এই অবধূত উপাখ্যানের পটভূমিকায় স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানা গুরুর কাছ থেকে সাধনপন্থা শিক্ষা করার কাহিনী। যোগেশ্বরী, তোতাপুরী, গোবিন্দ রায়— এমনি নানা গুরুর কাছ থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আবার এইসব গুরুরাও শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে এসে আপন আপন সাধনপথের সঙ্গে আর সব সাধনপন্থার গভীরতম ঐক্য অনুভব করে পূর্ণতার পথে এগিয়ে গেছেন। সারাজীবনই তিনি সৎ ও মহৎ দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করেছেন। 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি'—ভাগবতের গল্পে এর প্রাচীন উদাহরণ, আধুনিকতম উদাহরণ তিনি স্বয়ং।

অমনীভাব

স্বামী ধীরেশানন্দ

মনের বিচিত্র খেলা, তাহার অগণিত চাতুর্য, অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ কর্মের দুর্বার প্রেরণা—এ সকলের সহিত সকলেই সুপরিচিত। মনে কত ইচ্ছাই না জাগিতেছে! কখনও ইচ্ছাপূরণে সে আনন্দে অধীর, কখনও বা ইচ্ছা প্রতিহত হইলে ব্যর্থতা-বিড়ম্বিত হইয়া ও নিরাশায় ব্যাকুল হইয়া সে নিতান্তই দুঃখী। একই বস্তুকে সুখকর বোধে তৎপশ্চাতে সে ধাবিত হইতেছে, আবার কখনও বা সেই বস্তুকেই দুঃখদায়ক মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর হইতেছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন—এই উভয় অবস্থাতেই মনের এই লীলা সমভাবে চলিয়াছে। মনের আর শান্তি নাই। কিন্তু সুষুপ্তিকালে যখন মন থাকে না, তখন কিন্তু ঐ সব দ্বন্দ্ব, ভাল-মন্দ, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ কিছুই নাই। তখন আমরা বেশ আনন্দেই থাকি। সুষুপ্তিভঙ্গে জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সেই পূর্বের বৈষয়িক সুখদুঃখের খেলাই পুনরায় সমভাবে চলিতে থাকে। এইভাবেই এই জগতে সকল জীবের জীবনেই যেন এক অনির্দিষ্ট যাত্রা অনাদি কাল হইতে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই যাত্রার শেষ কোথায়, তাহাই বিচার্য।

দেখা যায় সুষুপ্তিতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, দুঃখ নাই,—কারণ সেখানে মনই নাই এবং দৃশ্যমান জগৎও নাই। সেখানে আছে একটা বিশেষ নির্বিষয় আনন্দ, যে আনন্দের সহিত জগতের কোন আনন্দেরই তুলনা হইতে পারে না. সুষুপ্তিতে মন নাই, তাই দ্বৈত নাই; কোন বৈষয়িক সুখ-দুঃখও নাই। অপর দুই অবস্থায় (জাগ্রৎ ও স্বপ্নে) মন উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা হইতে যেন এই বিচিত্র জগদ্রূপ দ্বৈত আসিয়া চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে এবং আবার সুখ-দুঃখাদি জীবকে ব্যাকুল ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।

তাহা হইলে বোঝা যায়, এই দ্বৈত মনেই রহিয়াছে। মনেই ইহার উদয় এবং মনেতেই ইহার বিলয়।

আচার্য শ্রীগৌড়পাদও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন :

'মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥'
(মাঃ কাঃ ৩।৩১)

—সচরাচর এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সব মনেরই কল্পনা। মনই এই দ্বৈতরূপে প্রতিভাত হইতেছে। মন যখন 'অমন' হইয়া যায় তখন আর দ্বৈতের কোন উপলব্ধিই হয় না।

সুষুপ্তিকালে মন থাকে না, মন যেন অমন হইয়া যায় বটে কিন্তু তৎকালে মনের নাশ হয় না, উহা স্বকারণে সূক্ষ্মভাবে বিলীন হইয়া থাকে মাত্র। মনের পুনরুদ্ভব হইতেই তাহা বোঝা যায়। কিন্তু সর্বদা সুষুপ্তিতে থাকা ও তৎকালীন দুঃখ-রহিত নির্বিষয় আনন্দানুভব করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কারণ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের সুখদুঃখাদি ভোগপ্রদ কর্মের অবসান হইলে স্বাভাবিক নিয়মে আপনা হইতেই সুষুপ্তি অবস্থা জীবের আসিয়া থাকে। সুষুপ্তি অজ্ঞানব্যবহিত স্বরূপস্থিতি। উহা কোন কর্মফল নহে। পুনরায় ভোগপ্রদকর্ম ফলপ্রদানে উদ্বুদ্ধ হইলে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। স্বকৃত কর্মের অধীন জীবের এই বিষয়ে কোন স্বতন্ত্রতা নাই।

যদি জাগ্রতে স্বকারণ সহ মনের নাশ কোন উপায়ে সম্পাদন করা যায় তবে আর দ্বৈতই থাকিবে না, সুতরাং বৈষয়িক সুখ-দুঃখও থাকিবে না। সর্বজীবেরই একমাত্র কাম্য সর্বদুঃখনিবৃত্তি। সকলেই ইহাই চায়। তাই পরম কৃপাপরবশ হইয়া আচার্য পরবর্তী শ্লোকে বলিতেছেন :—

'আত্মসত্যানুবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্ ॥'
(মাঃ কাঃ ৩।৩২)

—'আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সর্ব পদার্থই অবস্তু, মিথ্যা', এই তত্ত্ব শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশ লাভের পর যখন নিশ্চিতরূপে অনুভূত হয়, তখন আর কল্পনার যোগ্য কোন বস্তুই থাকে না। বাস্তব বস্তুর অভাববশতঃ মন আর কোন কল্পনা করিতে না পারিয়া 'অমন' হইয়া যায়। গ্রহণযোগ্য বস্তুর অভাবে মন তখন গ্রহণভাববিবর্জিত হইয়া নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় শান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এখানে মনকে 'অমন' করিবার জন্য একটি উপায় আচার্য বলিলেন—'আত্মসত্যানুবোধ।' অর্থাৎ দৃঢ় আত্মবিচারসহায়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি।

অবস্থাত্রয়ের (জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির) মধ্যে নিত্য ভ্রাম্যমাণ জীব এই তিন অবস্থার বিচার দ্বারাই তত্ত্বোপলব্ধি করিতে পারে ও বৈষয়িক সুখ-দুঃখপ্রদ দ্বৈতের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আনন্দে থাকিতে পারে। অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী, কিন্তু এই তিন অবস্থার মধ্যে সমভাবে এক 'আমি' বিদ্যমান। এই 'আমি'র কখনও বিলোপ ঘটে না। দেহ মন বুদ্ধি ও অহংকার হইতে ভিন্ন এই 'আমি'ই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা। আমারই সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ অবস্থাত্রয়ে সতত অনুভবগোচর হইতেছে। কিন্তু আমার এই রূপটি সর্ববস্তুসহ জড়িত হইয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমি নিজ স্বরূপটি ভুলিয়া গিয়া নিজেকে দেহ মন বুদ্ধি আদি বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে ভাবিতেছি ও যাবতীয় বাহ্য পদার্থে 'মমত্ব' অভিমান করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া নিজেকে নিজেই যেন বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। এখন এই আত্মসম্মোহন ভঙ্গ করিতে হইলে আমাকেই তাহা করিতে হইবে ও তত্ত্বের দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান সহায়ে এই মোহজাল ছিন্ন-

করতঃ কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে হইবে। অপর কেহ ঔষধ সেবন করিলে ব্যাধিগ্রস্তের রোগনিবৃত্তি হইবে না।

শংকা হইতে পারে যে, বিচারের দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে সেই সাধকের মনোনিরোধ হইয়া সমাধি হইবে কিনা অর্থাৎ তিনি বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া যাইবেন কিনা। উত্তরে বলা যায় যে, বিচারবান্ সাধক ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির দ্বারা বাহ্য-জ্ঞানরহিত হইবার চেষ্টা করেন না। তিনি কেবল জীব জগৎ ও জগদধিষ্ঠান ব্রহ্ম বিচারেই ব্যাপৃত থাকেন। সর্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মই নিত্য, নাম-রূপাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, একটা সত্তাবিহীন প্রতীতিমাত্র, আমিই সেই ব্রহ্ম—এইরূপ বিচারেই তিনি কেবল ব্যাপৃত থাকেন। ইঁনি উত্তম অধিকারী। চিত্ত শুদ্ধ, বিষয়বিরত ও একাগ্র না হইলে এরূপ নিয়ত বিচার কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে সম্যক্ অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম, যোগাভ্যাস বা উপাসনারই ফল এরূপ চিত্তশুদ্ধি। বিষয়-ভোগবিরত চিত্তে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসাই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। আচার্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন :

'প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ।
কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃডন্তে ঘনা ইব॥'
(নৈঃ সিঃ ১।৪৯)

—বর্ষাবিগমে (শরৎ আগত হইলে) আকাশে যেমন মেঘকুল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, বুদ্ধির শুদ্ধির দ্বারা প্রত্যগাত্মপরায়ণতা উৎপন্ন করিয়া নিষ্কাম কর্মও তদ্রূপ কৃতার্থ হইয়া বিদায় গ্রহণ করে।

বিচারবান্ সাধকের বিচারই প্রধান সাধন। তবে বিচারপ্রসূত জ্ঞানসমকালে চিত্তের একটা অতি সূক্ষ্ম অবস্থাবিশেষ হয়, চিত্ত সেখানে স্বভাবতই নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ও ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়। সমাধির দৃষ্টিতে তাহাকেই নিরোধসমাধি বলা যাইতে পারে। বিচারের গভীর অবস্থাতে এই সমাধি আসিয়া যায়। অতএব বিচারবান্ সাধকের বিচারদ্বারাই মনোনিগ্রহরূপ সমাধিলাভ হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত মাঃ কাঃ ৩।৩২ শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তম অধিকারীর পক্ষে মনোনিগ্রহরূপ সমাধি দৃঢ় জ্ঞানেরই ফল। জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়-রূপ ত্রিপুটি ভেদভান সহ ঐরূপ ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তের অবস্থার নামই সবিকল্প সমাধি। পুনঃ ঐ ত্রিপুটি ভেদভান রহিত হইয়া কেবল জ্ঞেয় ব্রহ্মাকারা কিন্তু অজ্ঞায়মান চিত্তবৃত্তিতে স্থিতিই নির্বিকল্প সমাধি নামে খ্যাত। ইহাকেই অখণ্ডাকারা চরম বৃত্তি বলা হয়, যাহা দ্বারা মূল অজ্ঞান ও তৎকার্য বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং তদন্তর্গত নিজ দেহেন্দ্রিয়াদিও চিরতরে বাধিত অর্থাৎ মিথ্যারূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। এই অবস্থা 'অদ্বৈত-ভাবনারূপ নির্বিকল্প সমাধি' নামে খ্যাত। অজ্ঞান নাশের (নাশ অর্থ বাধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিশ্চয়) পর ঐ বৃত্তি নিজেও বিলীন হইয়া যায় ও তখন 'অদ্বৈতাবস্থানরূপ নির্বিকল্প সমাধি' অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি, স্বরূপস্থিতি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এতদনন্তর জ্ঞানী স্বরূপভূত জ্ঞানে সদা অবহিত, সুপ্রতিষ্ঠ হন, যাহা হইতে তাঁহার আর কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। ব্যবহারকালেও তিনি সেই জ্ঞানে সদা সচেতন। ইহাকেই বলে 'জ্ঞানসমাধি' বা 'চৈতন্যসমাধি' বা 'সহজসমাধি'। এই সমাধি আর কখনও ভাঙ্গে না। তাই জ্ঞানী সদা সমাধিস্থ। জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তি সদাই চিদাকৃতি। 'সমাহিতা ব্যুত্থিতা বা বৃত্তিঃ সর্বা চিদাকৃতিঃ'—(বৃঃ বার্তিক-সার ২।৪।৪০)

বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

'তত্ত্বাববোধ এবৈকঃ সর্বাশাতৃণপাবকঃ।
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তূষ্ণীমবস্থিতিঃ॥'

—একমাত্র ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধই সর্ববিষয়ভোগ-

বাসনারূপ তৃণের দাহকারী অগ্নিসদৃশ, তাহাই সমাধি শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে, কেবল নীরব অবস্থানমাত্রই সমাধি নহে।

দৃঢ় আত্মবোধই নির্বিকল্প সমাধি। মহাবাক্যের অর্থ—আমিই অখণ্ডাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপই নিজের স্বরূপ ইহা নিশ্চিত হইলে জ্ঞানীর ব্রহ্ম-সমাধিই হইয়া থাকে। অর্থাৎ বেদান্তে ব্রহ্ম-সমাধি কেবল জ্ঞানসহায়ে জানিবার যোগ্য, উহা যোগাভ্যাসাদি প্রচেষ্টাসাধ্য নহে। সুতরাং ব্রহ্মরূপে অবস্থিতিই নির্বিকল্প সমাধি। আর ব্রহ্মরূপে ভান হওয়াই সবিকল্প সমাধি।

কোন কোন আচার্য বলেন যে, মহাবাক্য-বিচার দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেও নির্বিকল্প সমাধি বিনা অদ্বৈতবস্তুর বিশেষরূপে অভিব্যক্তি হইবে না। এই জন্য ক্ষণমাত্র নির্বিকল্প সমাধি হইলেও বোধের বিষয়-বস্তুরূপ অদ্বৈতের অভিব্যক্তি পূর্ণতয়া নিশ্চিত হইয়া যায়। জ্ঞানই সমাধি শব্দের মুখ্য অর্থ— এই বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের বহু বচন প্রমাণরূপে বিদ্যমান।

এখানে একটি বিষয় বোদ্ধব্য। ব্যবহারদশাতে অনেকেই কোন আকস্মিক ঘটনায় (যেমন হঠাৎ প্রিয়জন বিয়োগ বা অর্থনাশ ইত্যাদি) যেন স্তব্ধ হইয়া যান তখন, অথবা দুই বৃত্তির মধ্যস্থলে (যাহাকে সন্ধিস্থল বলা হয়) মন সর্ববিকল্পরহিত হইয়া যায়, উহা সাময়িক স্বরূপস্থিতি হইলেও নির্বিকল্প সমাধি নহে। কারণ উহা আত্মবিমর্শ-বিহীন। উহা চিত্তের একটা নির্বিকল্প অবস্থামাত্র। নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মাকার অজ্ঞায়মান বৃত্তি থাকিবে।

ব্রহ্মবিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্বসাক্ষাৎকার, কেবল বাহ্যজ্ঞানরহিত হওয়া বা নিরোধ-সমাধি নহে। বিচার করিতে করিতে সর্ব অনাত্ম পদার্থ মিথ্যা-বোধে পরিত্যক্ত হইলে এক স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই তখন অবশেষ থকেন এবং তত্ত্বপক্ষপাতিনী বুদ্ধিও তখন পূর্ণরূপে আত্মাভিমুখিনী হইয়া ব্রহ্মাকারাই হইয়া যায় অর্থাৎ সমাধিস্থ হইয়া পড়ে। উত্তমাধি-কারীর কথা বলা হইল।

পুনঃ যাহাদের বেদান্তসিদ্ধান্তে নিষ্ঠা আছে, বেদান্তোক্ত সাধনে রুচি ও আগ্রহ আছে কিন্তু মল, বিক্ষেপ ও বুদ্ধিমান্দ্য আদি প্রতিবন্ধবশতঃ মহাবাক্যার্থ বিচারে অসমর্থ এরূপ নিম্নাধিকারীদের উপায় হইতেছে যোগাভ্যাসাদি সহকৃত বেদান্ত বিচার। যোগাভ্যাস সহায়ে চিত্ত একাগ্রকরতঃ তাঁহারা চিত্তবৃত্তিকে ধ্যানে সাক্ষীচৈতন্যনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে পূর্বোক্ত সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় আরূঢ় হইয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারে কৃতকৃত্য হন। বিচার এখানে অপ্রধান। এই কথাই মাঃ কাঃ ৩।৪০ শ্লোকে বলা হইয়াছে :—

'মনসো নিগ্রহায়ত্তমভয়ং সর্বযোগিনাম্।
দুঃখক্ষয়ঃ প্রবোধশ্চাপ্যক্ষয়া শান্তিরেব চ॥'

—নিম্নাধিকারী যোগিগণের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, অভয়, তত্ত্বজ্ঞান, অক্ষয় শান্তি বা মুক্তি— এই সবই মনোনিগ্রহরূপ সমাধির দ্বারা লভ্য।

ভগবান্ ভাষ্যকারও বলিয়াছেন :—

'এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎ পক্বকষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ॥
পরিপক্বং মনো যেষাং কেবলোঽয়ং চ সিদ্ধিদঃ॥'

—(অপরোক্ষানুভূতি ১৪৩।১৪৪)

—(স্বাভিমত বিচারাত্মক সাঙ্গ রাজযোগের বিষয় বলিয়া ভাষ্যকার উপসংহারে বলিতেছেন যে,) যাহাদের রাগাদি দোষ কিঞ্চিন্মাত্র দূরীভূত হইয়াছে তাহাদের এই বিচার হঠযোগ[১] অর্থাৎ পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ সহ অভ্যাস করা কর্তব্য। আর যাহারা শুদ্ধচিত্ত তাহাদের পক্ষে

১ শ্রীবিদ্যারণ্যরচিত টীকা দ্রষ্টব্য।

কেবল আত্মবিচারই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া বিষয়োপরত হইলে চিত্তশুদ্ধ হয়। অশুদ্ধ চিত্তে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই জ্ঞানোদয় হইতে পারে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তিজ্ঞানই অজ্ঞান ও তৎকার্য নিরসনের একমাত্র সাধন। সুতরাং চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক চিত্তের বিষয়োপরতি, ইহা যেন অভাবাত্মক সাধন, আর স্বরূপপ্রাপ্তি-ফলদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তি-জ্ঞানাভ্যাস যেন ভাবাত্মক সাধন। এই উভয় মিলিত হইয়াই নিম্নাধিকারীদের অজ্ঞাননিবৃত্তি, স্বরূপজ্ঞান ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভে কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে।

চিত্তমলনাশে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা যোগ ও বেদান্ত উভয় দর্শনই স্বীকার করেন। যোগমতে চিত্ত-মলনাশ (চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপ সমাধি) স্বরূপ-স্ফূর্তির সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু বেদান্তমতে ঐ নিরোধসমাধি জ্ঞানের কারণ নহে। মলরহিত শুদ্ধচিত্তে বিচারপ্রসূত 'অহং ব্রহ্মাস্মি', এই বৃত্তিই আত্মাকে বিষয়ীভূত করিয়া আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশ করে। অজ্ঞাননাশেই বৃত্তির সার্থকতা। তখন স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা স্বয়ং প্রতিভাত হন। বেদান্তে নাশ অর্থ বাধ অর্থাৎ মিথ্যাত্বনিশ্চয়, কার্যের কারণে বিলয়রূপ নাশ নহে। জ্ঞানে বাধিত প্রকৃতি বা অজ্ঞান ও তৎকার্য জগৎপ্রপঞ্চ ত্রৈকালিক অসৎ-রূপে পর্যবসিত হইয়া যায়। সাংখ্য ও যোগমতে প্রকৃতি অসৎ নহে, প্রকৃতি সৎ ও নিত্য এবং পুরুষও বহু, এক অদ্বিতীয় নহে। সুতরাং উভয় মতে (বেদান্ত ও সাংখ্যযোগ) সিদ্ধান্ত ও সাধনগত পার্থক্য রহিয়াছে। বেদান্তের ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানমূলক বাধসমাধি ও যোগিদের লয়সমাধি বা সর্ববৃত্তিনিরোধমূলক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এক কথা নহে বা এক স্থিতিও নহে।

অপর সকল মতবাদিগণই ঈশ্বর-প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি দ্বারা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের ফলে স্ব স্ব মতানুযায়ী সালোক্য সামীপ্যাদি মুক্তি স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদিগণও ভক্তিমূলক উপাসনা নিম্নাধিকারীর জন্য স্বীকার করেন। কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাত্মক একাগ্র সমাধি সহায়ে ঈশ্বর-কৃপায় ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বর-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ-বলে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্যক্ অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত নির্বিকল্প সমাধিজাত ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ দ্বারা স্বরূপস্থিতি ও কৃতকৃত্যতা তাঁহারা অঙ্গীকার করেন।

প্রধানতঃ সমাধিকে যোগদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধাত্মক লয়মুখ সমাধি ও অদ্বৈতবেদান্তোক্ত বাধমুখ সমাধি— এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই উভয় প্রকার সমাধির পার্থক্য বিচার করিতে হইলে 'বাধ' ও 'লয়' এই পারিভাষিক সংজ্ঞাদ্বয়ের অর্থ বিচার্য। কার্য কারণে লয় হয়। কারণে কার্য সূক্ষ্মভাবে সুপ্ত থাকে ও কালবশে সেই কার্যের পুনরুদ্ভব হয়। সুতরাং কার্যের পূর্ণতয়া নিবৃত্তি হয় না। যোগ-সম্মত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লয়-সমাধি। ব্যুত্থান-দশায় প্রকৃতি ও তাহার কার্য পুনরায় সত্যরূপে আসিয়া হাজির হয়। সাংখ্যমতেও প্রকৃতিপুরুষ-বিবেকখ্যাতির ফলে চিত্ত তৎকারণ প্রকৃতিতে লীন হয়, চিত্তের ধ্বংস হয় না। প্রকৃতিরও ধ্বংস হয় না। পুরুষ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিবিক্ত বা পৃথক হইয়া যান, এই মাত্র।

বাধমুখ সমাধিতে চিত্ত ও তৎকারণ অজ্ঞান চরমবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ অখণ্ডব্রহ্মাকারা বৃত্তিদ্বারা বাধিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে চিৎ-প্রতিবিম্ব জীবও বাধিত হইয়া যায়। বাধিত বস্তু অধিষ্ঠানরূপ। ভ্রান্তিকল্পিত সর্প যখন অধিষ্ঠান-রজ্জুজ্ঞানদ্বারা বাধিত হয়, তখন ঐ সর্প রজ্জু-রূপই হইয়া যায়। তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চিত্ত, জীব, অজ্ঞানাদি সব কিছুই বাধিত হইয়া অধিষ্ঠান-ব্রহ্মরূপই হইয়া যায়। অর্থাৎ এক ব্রহ্মই অবশেষ

থাকেন। জীব-জগতের কেবল একটা মিথ্যা, সত্তাবিহীন প্রতীতি মাত্র ভাসে। সুতরাং সাংখ্য ও যোগদর্শনোক্ত চিত্তের তৎকারণ প্রকৃতিতে লয় ও ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে বেদান্তোক্ত বাধ অর্থাৎ জীব জগৎ সব কিছুর ত্রৈকালিক অসত্তা ও মিথ্যাত্বনিশ্চয় এক কথা নহে।

প্রকৃতি জড়া। সুতরাং প্রকৃতিলয়াত্মক সমাধি অজ্ঞানসমাধি বা মূঢ়সমাধি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই জন্যই বৈদান্তিকগণ উহার আদর করেন না। বিচারকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

কিন্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধাত্মক যোগাভ্যাস উপেক্ষণীয় নহে। উহা পরম্পরাক্রমে মুক্তির সাধন হইয়া থাকে। বিষয় হইতে চিত্ত নিরুদ্ধ না হইলে অর্থাৎ চিত্তের বহির্মুখীনতা দূর না হইলে, চিত্ত অন্তর্মুখ না হইলে আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত। তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তি। চিত্তনিরোধ যোগ বা বিচার উভয় প্রকারেই হইতে পারে। কিছুটা অন্তর্মুখ সাধকের পক্ষে বিচারমার্গই উত্তম। বিচার দ্বারাই বহির্মুখীনতা পূর্ণরূপে দূর হইয়া প্রত্যগাত্ম-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে। যাহাদের চিত্ত বহির্মুখ হইলেও মধ্যে মধ্যে অন্তর্মুখ হয় তাহাদের ভক্তিযোগ-সাধন সহায়ে ঐ বহির্মুখীনতা দূর করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। অতিশয় বহির্মুখচিত্ত পুরুষের পক্ষে অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাস কল্যাণপ্রদ। কিন্তু জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎকারণ, চিত্তশুদ্ধির হেতুরূপে যোগ ঐ জ্ঞানের ও মুক্তির পরম্পরা কারণ মাত্র। চিত্ত শুদ্ধ হইলে প্রত্যেক সাধককেই বেদান্তোক্ত শ্রবণ মননাদি সাধন সহায়ে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিতে হইবে; অদ্বৈতবেদান্তমতে ইহাই একমাত্র পথ।

চিত্ত কেবল বিষয়বিরত হইয়া একাগ্র হইলেই স্বরূপের স্ফূর্তি বা অভিব্যক্তি হয় না। বৃত্তি দ্বারা স্বরূপকে চিত্ত যে পর্যন্ত বিষয়ীভূত না করিতেছে ততক্ষণ অজ্ঞান নাশ হইবে না। স্বরূপকে বিষয়ীভূত করা অর্থ পূর্ণ স্বরূপাভিমুখী হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মাকারাকারিত হওয়া। তখন চিত্তও স্বরূপে বিলীন হইয়া যাইবে।

অধিকারীবিশেষে চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কোন উপায়ে লয়মুখসমাধি কর্তব্য হইলেও অন্ততো গত্বা প্রপঞ্চমিথ্যাত্ববোধরূপ বাধমুখসমাধি ভিন্ন কৈবল্যমুক্তি সুদূরপরাহত। বাধমুখসমাধি হইলে তখন মন থাকিয়াও নাই। তখনই ঠিক ঠিক অমনীভাব লাভ হয়। তখন পুরুষ জীবদ্দশাতেই মুক্ত। সব কিছু করিয়াও তিনি কিছুই করেন না, দেখিয়াও দেখেন না। ইহা এক অপূর্ব স্থিতি। মিথ্যা, প্রতীতিমাত্রশরীর এই জগতের খেলাতে তিনি আর কোন উদ্বেগ অশান্তি বোধ করেন না। পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাঁহার নিকট বাস্তব দ্বৈত বলিয়া কোন বস্তুই তখন নাই। তখনই অনাদিকালপ্রবৃত্ত জীবের এই মিথ্যা সংসার-যাত্রার চিরনিবৃত্তি। শ্রীবশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

'দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।
সম্পন্নং চেৎ তদুৎপন্না পরা নির্বাণনির্বৃতিঃ॥'
(যোগবাশিষ্ঠ ১।৩।৬, যোগঃ বাঃ সার ৩।২২)

— দৃশ্যপ্রপঞ্চ বস্তুতঃ নাই (উহা একটা মিথ্যা প্রতীতি বা প্রতিভাস মাত্র), এই বোধে যখন মন হইতে দৃশ্যের সত্তাবোধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, তখনই মোক্ষসুখের আবির্ভাব হয়। ইহাই অমনীভাব।*

* শ্রীমৎ তীর্থস্বামী বিরচিত 'সমাধি' নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন

বন্যাসেবাকার্য

আবেদন

বিহারের অভাবনীয় বন্যায় যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে এবং যাহার জন্য বহু ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছেন, জনসাধারণ সে বিষয় অবগত আছেন। পাটনা শহরও বন্যায় প্লাবিত এবং এখনও শহরের অনেকাংশ জলের নীচে। কিন্তু ইতিমধ্যেই নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন গত ২৭শে অগস্ট হইতে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। বর্তমানে শহরে ও শহরের উপকণ্ঠে সাতটি অঞ্চলে দৈনিক পাঁচ হাজার জনকে চিড়া, গুড়, আটা, ছাতু, আলু, দেয়াশলাই, ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐসব অঞ্চলে রোগীদেরও চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে আরও বৃহত্তর অঞ্চলে সেবাকার্য শুরু করা প্রয়োজন।

সামর্থ্যের অপ্রাচুর্যসত্ত্বেও মিশন এই সেবাকার্যে অগ্রসর হইয়াছে এই ভরসায় যে পূর্বের ন্যায় এইবারও জনসাধারণ তাঁহাদের অকুণ্ঠ সাহায্য দান করিয়া আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

এই বন্যাত্রাণ কার্যের জন্য সকল প্রকার দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। চেক 'Ramakrishna Mission' এই নামে লিখিতে হইবে।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২০২, হাওড়া

২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা-৭০০-০১৪

৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩

৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯

৫। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০-০২৬

৬। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পাটনা ৮০০-০০৪

৭। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২

৮। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০-০৫৫

৯। রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৬০০-০০৪

বেলুড় মঠ
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

ঈশ্বরতত্ত্ব

[প্রথম পর্যায়]

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

অপূর্ব সৌন্দর্য ও মহিমায় মণ্ডিত নিখিল বিশ্বের অসাধারণ সুশৃঙ্খল সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া অনাদিকাল হইতেই চিন্তাশীল মানুষের মনে বিবিধ প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। এই জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার অদম্য কৌতূহল মানবের হৃদয়ে যে-চিন্তা জাগ্রত করিয়াছে, তাহার মূলে প্রধান জিজ্ঞাসা এই—জগতের নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং সৃষ্টিকারী কেহ আছেন কিনা? যদি থাকেন, তবে তিনি কে? তাঁহার স্বরূপই বা কি প্রকার? এই চিরন্তন প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই যুগে যুগে বিবিধ দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং অধিকাংশ ধর্মমতের মূলেও এই প্রশ্নের প্রভাব বিদ্যমান। বলা বাহুল্য যে, উক্ত প্রশ্নের সমাধান ঈশ্বর স্বীকার করিয়াই নির্ধারিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সর্বপ্রাচীন বৈদিক যুগেও ঈশ্বর-চিন্তার সন্ধান পাওয়া যায়। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" – অর্থাৎ আমরা কোন অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিব?— কাহার তৃপ্তির জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হইবে?— এই প্রশ্ন বৈদিক ঋষির কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে। পরবর্তী কালে সংহিতা দর্শন ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতিতেও নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে, বহু লৌকিক ও অলৌকিক কাহিনীর বিন্যাসের মধ্য দিয়া সৃষ্টিরহস্যের উৎস অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের মন ও বুদ্ধির অগোচর, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নামক একটি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশেও সুপ্রাচীন কাল হইতে এক অলৌকিক মহাশক্তিধর পুরুষকে স্বীকার করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ভয়-ভক্তিমিশ্রিত স্তব গান প্রভৃতি রচিত হইয়াছে; নিজ নিজ অভিলাষ সিদ্ধির জন্য, কখনও বা জগতের কল্যাণের জন্য হৃদয় উৎসারিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা বিধি প্রবর্তিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর জাগতিক প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম বিদ্যমান। অতি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম যে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট নিয়ম তাহাদের মধ্যে এমনভাবে বিদ্যমান যে, নিয়মের ব্যতিক্রম সম্ভব নহে। আমাদের স্থূল অনুভূতির বিষয়গুলির প্রত্যেকটিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, সমস্ত বস্তুই নিজস্ব একটি অসাধারণ সাংগঠনিক পদ্ধতিতে এবং স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ। স্থূল শরীরের সাংগঠনিক কৌশল এতই বিচিত্র এবং বিজ্ঞানোচিত যে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে যে কোন মানুষের মন বিস্ময়ে পূর্ণ হয়। দেহের আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহ যেমন কৌশলে বিন্যস্ত, তেমনই তাহাদের উপযোগিতা অনন্য-সাধারণ। পায়ের নখ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তিষ্ক পর্যন্ত দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি, শিরা-উপশিরা প্রভৃতি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই বিন্যস্ত রহিয়াছে। ঐ বিন্যাসের অতি সামান্য পরিবর্তন হইলেই শরীর অসুস্থ হয় এবং অনেক

---

* ন্যায়-তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক। 'ক্ষণভঙ্গবাদ' ও 'মাধ্যমক-কারিকা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

ক্ষেত্রে জীবন বিনষ্ট হয়। শরীরের বাহিরের অংশেও চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় সাংগঠনিক কৌশলে এমনভাবে নির্মিত এবং যথাস্থানে সুবিন্যস্ত যে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নাই। শরীরের উৎপত্তি সম্বন্ধেও যে-নিয়ম যুক্তি ও পরীক্ষাসিদ্ধ, তাহাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। অতি ক্ষুদ্র বিন্দু-রূপে যাহার উদ্ভব, ক্রমশঃ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাই একটি পূর্ণাঙ্গ শরীররূপে পরিণত হয় এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্রমশঃ ঐ শরীর শৈশব বাল্য কৈশোর যৌবন প্রভৃতি অবস্থা অনুসারে নানা-ভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। অন্যান্য জড়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও সর্বত্রই নিয়মের রাজত্ব দেখা যায়। পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের তারল্য, তেজের উষ্ণতা, বায়ুর প্রবহমানতা প্রভৃতি এমনই অলঙ্ঘনীয়-স্বভাব যে, উহার ব্যতিক্রম কখনই হইতে পারে না। স্থূল জড়বস্তুর মৌলিক বিশ্লেষণ করিলেও এই নিয়মের রাজত্ব স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়।

স্থূল সাবয়ব বস্তুর মূল উপাদান অনুসন্ধান করিলে শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থাকে পাওয়া যায়, যে-অবস্থার কোন আকৃতি নাই, অথচ কার্যকারিতাশক্তি রহিয়াছে। বস্তুর এই চরম অবস্থার নাম কাহারও মতে পরমাণু, কেহ বা উহাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত স্থূল বস্তুর চরম মূল অবস্থাকে অবিভাজ্য বস্তুসত্তারূপেই স্বীকার করিতেন এবং ঐ চরম অবিভাজ্য পরমাণু হইতেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ স্থূল বস্তুর আকার আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ, অতি সূক্ষ্ম পরমাণু-সমূহই পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া আমাদের ব্যবহার-যোগ্য স্থূল বস্তুর আকার পরিগ্রহ করে, এইরূপ বলিতেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে পরমাণুকে প্রথম ভাঙ্গা হয় এবং পরমাণুও যে একটি জটিল একক —এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়। ফলতঃ পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি কণাগুলি মৌলিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই মৌলিক কণাগুলিও প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কিনা তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ আধুনিকতম গবেষণায় নিরত আছেন।

অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য বস্তুর সূক্ষ্মতম স্বরূপকে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে পরিপূর্ণ বলিয়াই ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করেন। অর্থাৎ যে পরমাণু হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইবে সেই পরমাণু হইতে জল সৃষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে জলীয় পরমাণু কোন প্রকারেই পৃথিবীর জনক হইবে না, উহা কেবল জলেরই জনক হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটান সাধ্যাতীত। সুতরাং দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক অন্যান্য জড়বস্তু পর্যন্ত— সকলের মধ্যেই একটি অলঙ্ঘনীয় নিয়ম বিরাজমান।

এখন প্রশ্ন হইল, এই নিয়ম কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল? ইহা কি চিরন্তন? অর্থাৎ এই নিয়মের প্রবর্তনকারী কেহই নাই, কিন্তু বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতিই এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে? অথবা এইরূপ সুশৃঙ্খল নিয়মের প্রবর্তনকারী কেহ রহিয়াছেন? যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে স্বভাব বা প্রকৃতিই এই নিয়মের প্রবর্তক। অর্থাৎ, প্রতি বস্তুর এমন একটি নিজস্ব শক্তি বিদ্যমান, যে-শক্তি অপর কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই অনুকূল পরিবেশে এই নিয়মের রাজত্ব সিদ্ধ করিতেছে। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে চার্বাক বৌদ্ধ জৈন এবং কপিলের সাংখ্যদর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে নিরীশ্বরবাদী নামে অভিহিত করা হয়।

আধুনিক জড়বিজ্ঞানীদের মতেও সর্বত্র একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত নিয়ম বস্তুসত্তার স্বভাবশক্তির ফলেই ঘটে, উহা বাহিরের কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত নহে। সুতরাং তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বরবাদী বলিয়াই

প্রসিদ্ধ।

কিন্তু ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এবং পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম এবং নিয়ম অনুযায়ী বস্তুর যথাযথ বিন্যাস চিন্তাশক্তিশূন্য জড়শক্তির দ্বারা প্রবর্তিত হইতে পারে না। বরং অতি নিপুণ চিন্তাশীল সচেতন কাহারও পক্ষেই এইরূপ নিয়মের প্রবর্তন এবং তদনুযায়ী বস্তুবিন্যাস সম্ভব হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যে সমস্ত বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাদের সাহায্যেই আমরা যাবতীয় বস্তুর বিচার করিতে পারি। কারণ, ইন্দ্রিয়াতীত বা অদৃশ্য কোন বস্তুর সাহায্যে নির্ভুল কোন তথ্য নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে অলৌকিক বা অদৃশ্য তত্ত্ব যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রেও ঐরূপ তথ্য নির্ধারণের মূল প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর ভিতরেই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া যে-তত্ত্ব আমরা অতি পরিস্ফুটভাবে উপলব্ধি করি, সেই যুক্তি এবং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াই অদৃশ্য বস্তুর ক্ষেত্রেও তত্ত্ব নির্ধারণ করিতে পারি। স্থূল বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়াই ইন্দ্রিয়াতীত অবিভাজ্য চরম বস্তুসত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, বস্তুর ঐরূপ আবশ্যিক সত্তা ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে অনুভবযোগ্য নহে। সুতরাং, পদার্থ-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দৃষ্ট বস্তুর সাহায্যেই অদৃশ্য তত্ত্ব নির্ধারিত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। বিভিন্ন যুক্তিতর্কের প্রয়োগ করিয়া যদি বুঝা যায় যে, প্রত্যেকটি বস্তুর সাংগঠনিক কৌশল এবং যথাস্থানে বিন্যাস কোন অভিজ্ঞ চেতনভিন্ন সম্ভব নহে, তাহা হইলেই জাগতিক বস্তুর অপূর্ব নির্মাণকৌশল এবং যথাস্থানে বিন্যাস এমন একজন অভিজ্ঞ চেতনের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিবে, যে-চেতনকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি দেখা যায় যে কোন অভিজ্ঞ চেতন ব্যতীতও প্রত্যেকটি বস্তুর বিভিন্ন নির্মাণকৌশল এবং যথাস্থানে বিন্যাস সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশ্যই ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সহিত আমাদের এই বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে।

এই বিষয়ে প্রধান যুক্তিটি উল্লিখিত হইতেছে। গৃহ শয্যা বস্ত্র প্রভৃতি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার্য জিনিস। ইহাদের প্রত্যেকটিকে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন দ্রব্যের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশলেই ইহারা প্রস্তুত হয়। গৃহের উপাদান যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে না পারিলে গৃহ নির্মাণ করা যায় না। সুতরাং গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে প্রথমতঃ গৃহের উপাদান কি কি তাহা জানা প্রয়োজন। কিন্তু কেবলমাত্র উপাদান বস্তু জানিলে গৃহ নির্মিত হইবে না, উহা সংগ্রহ করাও দরকার। আবার যাবতীয় বস্তু সংগৃহীত হইলেই গৃহ প্রস্তুত হইবে না। ঐ বস্তুর সাহায্যে কিভাবে গৃহ নির্মাণ করিতে হইবে সেই কৌশল জানিতে হইবে। সুতরাং গৃহের উপাদান এবং গৃহনির্মাণের কৌশল যিনি জানেন, তাঁহার পক্ষেই গৃহ নির্মাণ সম্ভব। এই দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনায়াসেই বলা যায় যে, বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে যাহা গঠিত হয় তাহার ঐ সাংগঠনিক পদ্ধতির জ্ঞাতা একজন চেতন থাকিবেই। কারণ, যাহা জড়বস্তু তাহা বিভিন্ন স্থান হইতে নিজেরাই একত্র সম্মিলিত হইতে পারে না এবং নির্দিষ্ট উপায়ে জড়বস্তুসমূহের দ্বারা কোন বস্তুও সুগঠিত হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, জড়বস্তুর মধ্যেও একটি ক্রিয়াশক্তি থাকে। বাতাস জড় হইলেও তাহার প্রবহণশক্তি অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং জড়বস্তুসমূহ স্বীয় ক্রিয়াশীলতার

ফলেই সম্মিলিত হইয়া সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত নির্দিষ্ট বস্তুরূপে পরিণত হয়। সুতরাং বিভিন্ন জড় উপাদানের সাহায্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে বস্তু সংগঠনের জন্য চেতন কোন কিছুই স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এইরূপ যুক্তি সংগত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, বিভিন্ন জড়বস্তু ক্রিয়াশীল বলিয়া স্বীকার করিলেও, একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতেই তাহারা মিলিত হইয়া বিশেষ বিশেষ বস্তুরূপে পরিণত হইবে, কখনও সেই নির্দিষ্ট প্রণালীর কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটিবে না, ইহার কারণ কি? অবিভাজ্য সূক্ষ্ম বস্তুসত্তা একটি নির্দিষ্ট প্রণালীতেই বিভিন্ন বস্তুর প্রাথমিক মৌলবস্তুরূপে পরিণত হয় এবং ঐ সমস্ত মৌল বস্তুও একটি নির্দিষ্ট প্রকারেই ব্যবহারযোগ্য বস্তুরূপ ধারণ করে, ইহা অনস্বীকার্য। বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি যদি নিজ শক্তিবলেই সর্বদা মিলিত হইত, তাহা হইলে সেই মিলন-প্রক্রিয়ার তারতম্য কেন ঘটিবে না, তাহা চিন্তনীয়। যদি নির্দিষ্ট গতিপথে অগ্রসর হওয়া এবং যথাযথভাবে বিন্যস্ত হইয়া বস্তুরূপ ধারণ করা স্বাভাবিক শক্তির ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ স্বাভাবিক শক্তি জড় অথবা চেতন—ইহা নির্ধারণ করা আবশ্যক। সুনির্দিষ্ট পথে যথাযথভাবে নির্মিত হওয়ার মত শক্তি যাহার রহিয়াছে, তাহাকে জড় বলিব কেমন করিয়া? যে কোন কার্যের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাংগঠনিক রূপ প্রদান করিতে হইলে তাহার পিছনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ঐরূপ চিন্তাশক্তি জড়ের ধর্ম হইতে পারে না। সুতরাং যে-শক্তি প্রত্যেকটি বস্তুকে সর্বদা সুনিয়ন্ত্রিতরূপে পরিচালনা করিয়া প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে সংগঠিত করে, সেই শক্তিকে চেতন বলিতেই হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বস্তুর যে-শক্তি তাহার নিজের সত্তার অন্তর্গত, সেই শক্তি এবং পূর্ব-কথিত পরিচালক চেতনশক্তি এক নহে। বৈদ্যুতিক পাখা যে-শক্তিতে ঘূর্ণায়মান, সেই শক্তি পাখার সাংগঠনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাখার সাংগঠনিক পদার্থের একটি নিজস্ব মৌলিক শক্তি আছে, তাহা ঐ বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে ভিন্ন। বৈদ্যুতিক শক্তির চাপ এবং বেগ গ্রহণ করিবার মত একটি শক্তি পাখার মৌলিক বস্তুসমূহের রহিয়াছে। কোন একটি হালকা কাগজ বা তুলাকে পাখার রূপ প্রদান করিলে উহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে ঘূর্ণায়মান হইবে না। কারণ, বৈদ্যুতিক শক্তির চাপ সহ্য করিবার মত শক্তি তাহার থাকিবে না। সুতরাং বস্তুর মৌলশক্তি এবং পরিচালক শক্তি এক নহে। এই যুক্তিবলে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, প্রতিটি বস্তুর স্বীয় শক্তি থাকিলেও কোন একটি পরিচালক শক্তি ব্যতীত মৌলশক্তি-সম্পন্ন বস্তু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাংগঠনিক আকৃতি গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব যে-শক্তি সমস্ত বস্তুর মৌলশক্তিকে বিকশিত করিয়া সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে উহাদের কার্যকরী করিয়া তোলে সেই শক্তিকেই চেতন বলিয়া অভিহিত করা হয়। জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বস্তুগত মৌলশক্তি এবং বহিঃস্থিত চেতনশক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ চেতনশক্তিকেই ঈশ্বর বলা যায়।

ঈশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করিলেও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, নিয়ন্ত্রণকারী বা সর্বতঃ প্রভুত্বসম্পন্ন একটি চেতনসত্তাই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর সম্বন্ধে পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন:

"শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়াদারভ্য গূঢ়া সর্বেষু বস্তুষু ॥"

(পঞ্চদশী, ৩।৩৮)

ইহার তাৎপর্য এই যে, আনন্দময়কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময়কোষ পর্যন্ত, পরম

সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া অতি স্থূল বস্তু পর্যন্ত— প্রত্যেক পদার্থের মধ্যেই একটি নিগূঢ় শক্তি বিরাজিত। সর্ববস্তুনিয়ন্ত্রণকারিণী ঐ শক্তিই ঐশ্বরী শক্তি, অর্থাৎ ঐ শক্তিই চেতন ঈশ্বর-সত্তার প্রমাণ।

অনাদিকাল হইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক বিশালাকার ধারণ করিয়াছে। ঈশ্বরের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির অভাব নাই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ঈশ্বর সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদমূলক আলোচনার অবকাশ নাই। সুতরাং ঈশ্বর স্বীকার করিবার পক্ষে একটি সাধারণ প্রাথমিক যুক্তি আলোচিত হইল মাত্র। সুযোগ এবং অবকাশ হইলে ভবিষ্যতে প্রবন্ধান্তরে এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিরুদ্ধধর্মস্বরূপিণী

ডক্টর রমা চৌধুরী*

আজ পুনরায় ভারতবর্ষ তথা সমগ্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজা "শ্রীশ্রীদুর্গা"পূজা সমাগত। এই অনুপম পূজার প্রাক্কালে, বিশ্বজননী শ্রীশ্রীদুর্গার অশেষ অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় মহিমা গরিমা মধুরিমা সামান্যমাত্রও উপলব্ধির জন্য তাঁর নিগূঢ় স্বরূপ সম্বন্ধেও যথাসাধ্য অনুধাবন করা আমাদের সকলেরই অবশ্যকর্তব্য। এই দিক থেকে, পরমা জননী বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "শ্রীশ্রীচণ্ডী"ই আমাদের গরিষ্ঠ সহায়।

কিন্তু এস্থলে, প্রারম্ভেই আমরা যেন হতচকিত বিস্ময়বিমূঢ় সন্দেহাকুলিত হয়ে পড়ি, যখন দেখি যে, পরমা দেবীকে নানারূপ বিপরীত ধর্মে বিভূষিতা করা হয়েছে কয়েকস্থলে। এরূপ বিপরীত ধর্ম সাধারণতঃ একই আধারে সহাবস্থান করতে পারে না বলেই আমরা জানি— কারণ আলোক এলেই, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার বিদূরিত হয়; শীতকাল এলেই, গ্রীষ্মঋতুর অবশ্যম্ভাবী অবসান ঘটে, সত্য-শিব-সুন্দরের আবির্ভাব হলেই, অসত্য-অশিব-অসুন্দরের অনিবার্য বিলুপ্তি সাধিত হয় মুহূর্তমধ্যেই। সেজন্য পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য-সমন্বয়ান্বিত মহাদেবীস্বরূপে কিরূপে এরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের স্থান হতে পারে? অথচ, শ্রীশ্রীমাতৃলীলা-কীর্তনধন্য "শ্রীশ্রীচণ্ডী"তেও শ্রীশ্রীদুর্গার স্বরূপকেও এইভাবে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্মাধার বলে বর্ণনা করা হয়েছে সানন্দে সাগ্রহে সশ্রদ্ধায়। যথা—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহের্তুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥ ১।৫৮
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা ভগবতী মহাদেবী মহাসুরী॥
(১।৭৭)

কেনোপমা ভবতু তেহস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শক্রভয়কার্যতিহারী কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয়্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি॥ (৪।২২)

---

* উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি—(১) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত, (২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্যা এবং (৩) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সদস্যা।

ইনি কুড়িটিরও অধিক আধুনিক সংস্কৃত নাটিকা রচনা করিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঐগুলির অভিনয় পরিচালনা করিয়া ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন। দর্শন-বিষয়ক ইঁহার মূল্যবান প্রকাশনগুলিও উল্লেখযোগ্য।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥
(৫।১৩)

মুক্তিহেতুভূতা তিনি পরমা বিদ্যা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুভূতা অবিদ্যা সর্বেশ্বরেশ্বরীরূপিণী॥
(১।৫৮)

এস্থলে পরমা জননী একাধারে মুক্তির কারণ, পরমা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং সংসার-বন্ধের কারণ, অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

মহাবিদ্যা মহা-অবিদ্যা, মহামেধা
মহাবিস্মৃতি যথা।
মহামোহ মহাসৌভাগ্যবতী, মহাদেবী
মহাসুরীও তথা॥ (১।৭৭)

এস্থলে, পরমা জননীর বিরুদ্ধগুণসমূহের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। যথা— তিনি একাধারে মহাবিদ্যা অথবা ব্রহ্মবিদ্যা এবং মহা-অবিদ্যা, 'মহামায়া' অথবা সংসারবিদ্যা ; একাধারে মহামেধা অথবা মহাজ্ঞান এবং মহাবিস্মৃতি অথবা মহা-অজ্ঞান ; একাধারে মহামোহ এবং ভগবতী ; একাধারে মহাদেবী এবং মহাসুরী।

পরাক্রম তব অতুলনীয়,
রূপ শত্রুভয়কারী, অতি মনোহর।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা হয় দৃষ্ট,
ত্রিভুবনে তুমিই বরদা নিরন্তর॥ (৪।২২)

এস্থলেও পরমা দেবীর কয়েকটি বিরুদ্ধ ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা— তিনি একাধারে অতুলবীর্যমণ্ডিতা এবং সতত বরদায়িনী ; তাঁর রূপ একাধারে শত্রুভয়কারী এবং অতি মনোহর, তাঁর চিত্তে কৃপা ও সমর-নিষ্ঠুরতা একাধারে বিরাজ করছে।

অতিসৌম্যা অতিভীষণা তাঁকে
বারংবার প্রণাম।
জগদাশ্রয়রূপিণী, ক্রিয়ারূপিণীকে
বারংবার প্রণাম॥ (৫।১৩)

এস্থলেও পরমা দেবীর একাধারে অতি শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল-মধুর এবং উগ্র-তীব্র-ভীষণ-কঠোর রূপের কথা বলা হয়েছে শ্রদ্ধাভরে।

বস্তুতঃ, এরূপ বিরুদ্ধগুণসমাবেশ সাধারণ দিক থেকে অসম্ভব বোধ হলেও, ভারতীয় দর্শনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপেই যুক্তিসঙ্গত এবং অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ, ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি, মুখ্যপ্রাণ, মধুরতম রস নিহিত হয়ে রয়েছে অপরূপ, অনুপম, অত্যাশ্চর্য মন্ত্রযুগলে - সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম। (ছা. উ. ৩।১৪।১) ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্। ব্রহ্মই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
(মু. উ. ২।২।১১)

এই মতানুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই ব্রহ্মে বিরাজমান ; ব্রহ্মও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতে বিরাজমান। সেজন্য সাধারণ সাংসারিক দৃষ্টিতে যা পরস্পরবিরুদ্ধরূপে সহাবস্থান করতে পারে না, তা সবই পারমার্থিক দিক থেকে ব্রহ্মে একত্রে স্থিতি করছে ; স্থিতি করতে বাধ্য। না হলে, তারা থাকবেই বা কোথায় ? সর্বব্যাপী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছা. উ. ৬।২।১) ব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য আধারই বা তাদের কোথায় ? সেজন্য, সেই একই ব্রহ্মে আলোক এবং অন্ধকার, শীত এবং গ্রীষ্ম, জ্ঞান এবং অজ্ঞান, পুণ্য এবং পাপ, প্রমুখ সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধস্বভাব বস্তুও সগৌরবে অবস্থান করছে আদ্যন্তকাল। এই দিক থেকে বিশ্বেশ্বর সত্যই বিশ্বরূপ— বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উচ্চনীচ, ভালমন্দ,—প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁরই রূপ, তাঁরই প্রকাশ, তাঁরই পরিণাম অহরহ। এই ভাবে, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অংশে অংশে, প্রতিটি কণায় কণায়, প্রতিটি অণুতে অণুতে, প্রতিটি পরমাণুতে পরমাণুতে— এই ধরণীরই ধূলায় ধূলায়, এই মর্তেরই মাটিতে মাটিতে, এই সংসারেরই সরণিতে সরণিতে, এই ভুবনেরই ভবনে ভবনে, এই জগতেরই জনে জনে— সচ্চিদানন্দস্বরূপ স্বয়ং পরব্রহ্ম বিরাজিত তাঁর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-মাধুর্য-

ঐশ্বর্য-গাম্ভীর্য-শৌর্য-বীর্য সহকারে। সেইদিক থেকে পরমব্রহ্মে তথাকথিত বিরুদ্ধগুণাবলীও সাম্য-সামঞ্জস্য-সমন্বয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে শাশ্বতকাল একত্রে অবস্থান করতে পারে নিশ্চয়ই অনায়াসে।

অবশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি এরূপ বিরুদ্ধ গুণাবলীর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই উপরের যুক্তি অনুসারে, স্বীকার করতেই হয় যে, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনো আশ্রয়, আধার, অথবা ক্ষেত্র নেই বলে, তাদের সবগুলিকেই— যতই পরস্পরবিরোধী হোক না কেন— একই ব্রহ্মে পাশাপাশি থাকতে হবেই হবে যে কোনো উপায়েই হোক্ না কেন; এবং উপরন্তু থাকতে হবেই হবে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ বর্জন করে সমন্বিত-সমঞ্জসভাবে— যেহেতু "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" (মা উ. ৭) ব্রহ্মে কোনোরূপ অন্তর্বিরোধ থাকতেই পারে না। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট দ্রব্য-গুণ-কর্মাবলীই বা ব্রহ্মসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে উদ্ভূত হতে পারে কিরূপে? অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে অসত্য, অচিৎ অথবা জড়ত্ব, এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারে কি করে? কারণ সর্ববাদিসম্মতক্রমে, কারণ ও কার্য সমস্বভাব, যেহেতু স্বয়ং কারণই ক্রমান্বয়ে কার্যে পরিণত হয় যেমন— কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে কার্য মৃন্ময় ঘটের উৎপত্তি হয়। এস্থলে কারণ মৃৎপিণ্ডও মৃত্তিকাস্বরূপ, কার্য মৃন্ময় ঘটও ঠিক তাই; এবং মৃত্তিকাস্বরূপ কারণ থেকে মৃত্তিকাস্বরূপ ঘটের উদ্ভব হয়। সেক্ষেত্রে সত্য-শিব-সুন্দর, সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্য, আলোক-আনন্দ-অমৃত স্বরূপ কারণ ব্রহ্ম থেকে দীন-হীন, ক্ষুদ্র-ক্ষীণ, তুচ্ছ-শূন্য, পাপী-তাপী, ক্লিষ্ট-পিষ্ট, তপ্ত-শপ্ত, ভ্রষ্ট-নষ্ট, নির্বোধ-নিষ্ঠুর, অনাচারী-কদাচারী, সঙ্কীর্ণ-স্বার্থসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্ভবপর কিরূপে?— এস্থলে যে কারণ ও কার্য হঠাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে গেল!

এর উত্তর হল এই যে, পারমার্থিক দিক থেকে, অতি অবশ্য ব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুই ব্রহ্ম— অজ্ঞান নেই, অবিদ্যা নেই; মায়া নেই, মোহ নেই, পাপ নেই, তাপ নেই, দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, জরা নেই, মরণ নেই, সাংসারিক কোনো দীনতা-হীনতা, সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতা, অনিত্যতা-অসারতা নেই। কিন্তু এরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি, ভূমা-দৃষ্টি, মুক্তদৃষ্টি মুষ্টিমেয় সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী জীবন্মুক্ত "ঋষি" ব্যতীত আর কারই বা আছে? সেজন্য, ব্যাবহারিক বা সাংসারিক দিক থেকে, সৃষ্টিবৈচিত্র্য না থেকেও উপায় নেই— কারণ, এই দিক থেকে, সৃষ্টি জীবের কর্মানুসারী— এবং বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন কর্মানুসারে ভালোমন্দ পাপপুণ্য সুখদুঃখ প্রভৃতির উদ্ভবও ত হতে বাধ্য। অতএব, এই দিক থেকে বিরুদ্ধ গুণাবলীর অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। পরব্রহ্মে এই সকল আপাতদৃষ্ট বিরুদ্ধ গুণাবলী কিরূপে সহাবস্থান করবে — এই ভেবে আমরা স্বভাবতই প্রথমে ব্যাকুল হই। পরে অবশ্য মনে হয় যে— অনন্ত-অচিন্ত্য-অনির্বচনীয়-গুণশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মে সবই সম্ভবপর, এবং তাঁর মধ্যে সবই ব্রহ্ম। সুতরাং, সকল দ্বিধা-ভয়, সন্দেহ-সংশয়, ত্যাগ করে আজ এই শুভ পূজা-কালে, সর্বস্বরূপিণী, সর্বপালিনী সর্বধারিণী মহাদেবীকে নিঃসংশয়ে প্রণতি নিবেদন করে বলি—

"আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৪)

—হে অনতিক্রমণীয় শক্তিশালিনি!
পৃথিবীরূপে তুমি সদা বিরাজিতা।
সর্বব্যাপিনী একাকিনী তুমি
সমগ্র জগতের আশ্রয়ভূতা।
জলস্বরূপিণী তুমি একাকিনী
সমগ্র জগতের পুষ্টিসাধিনী।
সর্বপ্রাণস্বরূপা জননী
তুমিই নিখিলবিশ্বরূপিণী॥ ওঁ শান্তিঃ

ক্যানসার

ডক্টর জলধি কুমার সরকার*

ক্যানসার (cancer) বা কর্কটরোগ—এই কথাটি বললেই লোকে বোঝে যে, একটি সাংঘাতিক ধরনের ঘা বা টিউমার (tumour), যার কোন চিকিৎসা নেই এবং যা হ'তে মৃত্যু অবধারিত। সাধারণের এই যে ধারণা, এটা সত্য ব্যাপার হ'তে খুব দূরে নয়। এ সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

আমরা দেখি যে, সদ্যোভূমিষ্ঠ শিশু আস্তে আস্তে বড় হ'তে থাকে। সেটা সম্ভব হয়, কারণ তার শরীরের বিভিন্ন অংশ যে সমস্ত জীবকোষ (cell) দিয়ে তৈরী তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। আমরা যদি আরও আগেকার অবস্থা ধরি তাহলে দেখতে পাব যে, সেই শিশুটি এক-কালে মাতৃগর্ভে জরায়ুর মধ্যে মাত্র একটি জীবকোষ আকারে ছিল, যেটি তার পিতার শুক্রকীট (spermatozoa) এবং মাতার ভ্রূণকোষের (ovum) সংমিশ্রণের ফলে তৈরী হয়েছিল। সেই আদি জীব-কোষ বা 'জাইগোট' (zygote)-টির মধ্যে এমন সব শক্তি বা সম্ভাবনা নিহিত ছিল যার ফলে এক হ'তে দুই, দুই হ'তে চার— এইরূপ সংখ্যায় জীবকোষ বেড়ে আস্তে আস্তে শিশুর হাত পা মুখ চোখ ইত্যাদি তৈরি করতে পেরেছিল। অর্থাৎ জাইগোট হ'তে জীবকোষগুলি শুধু যে সংখ্যায় বেড়েছিল তা নয়, তাদের থেকে কতক-গুলি আলাদা রকমের হয়ে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ, যেমন অস্থি, যকৃৎ (liver), মস্তিষ্ক প্রভৃতি তৈরি করেছিল। আমরা যদি শরীরের বিভিন্ন অংশের জীবকোষগুলি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখি, তা হলে দেখতে পাব যে, তাদের আকার ও প্রকৃতি আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। এমন আলাদা হয়ে গেছে যে, মস্তিষ্কের জীবকোষগুলি যতই বংশবৃদ্ধি করুক না কেন তারা মস্তিষ্কই তৈরি করবে, অস্থি করবে না। জীবকোষগুলি বিভক্ত হয়ে অর্থাৎ এক হ'তে দুই হবার পরে— ক্রমে ক্রমে পরিণত অবস্থা (maturity) লাভ করে। বিভজ্যমান অবস্থায় তাদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যে, তাদের চেনা যায়। কিন্তু তাদের এই শৈশব বা এমব্রায়োনিক (embryonic) অবস্থা বেশীক্ষণ থাকে না। আমাদের শরীরের যে কোন অংশ কেটে নিয়ে যদি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখি, তাহলে বিভজ্যমান কোষ হয়ত দেখতেই পাব না, কারণ তাদের সংখ্যা খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ জীবকোষগুলি যদিও ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করে চলেছে (কারণ পুরাতন কোষগুলির ক্রমাগত ক্ষয় হচ্ছে), কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাদের বংশবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত হয়, ঠিক প্রয়োজনের বেশী হয় না।

এই গেল জীবকোষগুলির সাধারণ অবস্থা। শরীরের কোন অংশে আঘাত, পুড়ে যাওয়া বা জীবাণুর আক্রমণের ফলে (যেমন ফোড়া হওয়ার পর) যদি জীবকোষগুলি বিনষ্ট হয়, ওই সব উদ্দীপনের তাগিদে আশেপাশের জীবকোষগুলি তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি ক'রে শীঘ্রই সেই অংশের ক্ষতিপূরণ করে। আমরা প্রতিদিনই দেখছি, কেটে যাওয়ার পরে মেরামতির কাজ কেমন

---

* এম. বি. বি. এস. (কলিঃ), ডি. ব্যাক্ট. (লণ্ডন), পিএইচ. ডি. (কলিঃ), এফ. এ. এম এস., এফ. এন. এ., কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভাইরলজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

নিপুণভাবে হয়। কিন্তু মেরামতির জন্য কোষের বংশবৃদ্ধি হ'লেও, প্রয়োজন শেষ হ'লেই বংশবৃদ্ধির কাজও শেষ হয়। ক্বচিৎ কখনও অবশ্য এই মেরামতির কাজে একটু মাত্রাধিক্য হয়ে পড়ে, যেমন পুড়ে বা কেটে যাওয়ার পর কারও কারও ওই জায়গা একটু উঁচু হয়ে থাকে, যেটাকে কিলয়ড (keloid) বলে।

অতএব দেখা গেল যে, জীবকোষগুলির বংশবৃদ্ধি করা সহজাত গুণ হ'লেও, তা কতকগুলি নিয়মের বশে চলে। যদি কোন কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় অর্থাৎ শরীরের কোন অংশের জীবকোষ অকারণে ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বংশবৃদ্ধি করে, তা হ'লে ওই অংশ স্ফীত হয়ে ওঠে ও আব (অর্বুদ) বা টিউমার (tumour)-এর সৃষ্টি করে। এটা একটা রোগ, সন্দেহ নেই এবং জীবজন্তু, এমন কি গাছেরও এই রোগ হয়। ক্যানসারও এই শ্রেণীতে পড়ে, কিন্তু তার কিছু বিশেষত্ব আছে।

টিউমার মানেই ক্যানসার নয়। টিউমারের মধ্যে কতকগুলি বিনাইন (benign) বা অ-মারাত্মক, আর কতকগুলি ম্যালিগন্যাণ্ট (malignant) বা মারাত্মক। অ-মারাত্মক টিউমারের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে— (১) এরা ছোট বা বড় আকারের যাই হোক না কেন, এদের চারিধারে একটা আবরণী গড়ে ওঠার জন্য এদের বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ থাকে, যার ফলে অস্ত্রোপচারের দ্বারা এদের সামগ্রিকভাবে তুলে ফেলা যায়। (২) শরীরের যে অংশে হয়, সেখানেই এরা সীমাবদ্ধ থাকে, একস্থান হ'তে অন্যস্থানে ছড়িয়ে পড়ে না। (৩) এরা আস্তে আস্তে বড় হয়। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে বিভজ্যমান জীবকোষ (dividing cell) খুবই কম। (৪) সাধারণতঃ এরা [illegible] না। তবে যদি এই টিউমার কোন অত্যাবশ্যক শরীরাংশের (যেমন হৃৎপিণ্ড) উপর চাপ দিয়ে তার কার্যে বাধা দেয়, তা হ'লে অবশ্য এরা মৃত্যু ঘটাতে পারে। স্থান-বিশেষে অ-মারাত্মক টিউমার নিয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করাও অসম্ভব নয়। আমাদের দেহে যে আঁচিল দেখা যায়, তাও এই রকমের টিউমার।

অন্যদিকে মারাত্মক টিউমারের রকম সকম আলাদা। (১) এরা তাড়াতাড়ি বাড়ে। (২) এরা আকারে বাড়তে বাড়তে আশেপাশের শরীরাংশ (organ)-গুলিকে আক্রমণ করে। রক্তনালী (artery বা vein)-কে ফুটো করে দিয়ে রক্তপাত করতে পারে। এরা কোন আবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। চারিধারে এরা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বলেই এই রকম টিউমারকে কর্কটরোগ বলা হয়। (৩) এই টিউমারের কোষগুলি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং বিভজ্যমান কোষ প্রচুর দেখা যায়। (৪) এদের জীবকোষ, রক্তনালী বা "লিম্ফ"নালীর (lymph vessel—শরীরে রক্তপ্রবাহ ছাড়া আর এক রকম তরল পদার্থ 'লিম্ফ' প্রবাহিত হয়) মধ্যে প্রবেশ ক'রে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই জীবকোষগুলি অপরিণত অবস্থায় থাকে ব'লে এদের আক্রমণ-ক্ষমতা এত বেশী যে, এরা যেখানে সুবিধা পায়, সেইখানেই টিউমারের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ—ফুসফুসের ক্যানসারের কোষ লিভারে যেয়ে সেখানে ফুসফুসের ক্যানসার তৈরি করে। এরূপ ছড়িয়ে পড়াকে মেটাস্টেসিস্ (metastasis) বলে।

সব রকম মারাত্মক টিউমারকেই চলতি কথায় ক্যানসার বলে। প্রধানতঃ এরা দু'ভাগে বিভক্ত — কার্সিনোমা (carcinoma) ও সারকোমা (sarcoma)। রক্তে শ্বেতকণিকার (leucocytes) অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির ফলে যে প্রাণঘাতী লিউকিমিয়া (leukaemia) রোগ

হয়, তার শ্বেতকণাগুলির ক্যানসার কোষের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ একে ব্লাড ক্যানসার (blood cancer) বলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার জন্য লিউকিমিয়াকেও আমরা ক্যানসার বলে অভিহিত করব।

কোন কোন অ-মারাত্মক টিউমার অনেকদিন থাকার পরে অকস্মাৎ মারাত্মক টিউমারে রূপান্তরিত হয়। সেইজন্য বিনাইন বা অ-মারাত্মক টিউমারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। শরীরের কোন কোন অংশে মারাত্মক টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী আবার কোন কোন অংশের টিউমার বেশীর ভাগ অ-মারাত্মক হয়। মারাত্মক টিউমারের আবার কোন কোনটি আস্তে আস্তে ছড়ায়, যেমন স্তনদেশের কয়েক রকম ক্যানসার। আবার কোন কোনটি তাড়াতাড়ি ছড়ায় যেমন মূত্রাশয়ের বা ফুসফুসের ক্যানসার। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যখন রোগনির্ণয় হয়, তখন এত জায়গাতে টিউমার ছড়িয়ে পড়েছে যে রোগনির্ণয়ের অর্থ - আসন্ন মৃত্যুকে ঘোষণা করা। সেইজন্য মারাত্মক টিউমারের ভীষণতার শ্রেণীভেদ আছে।

রোগনির্ণয়ঃ প্রথমতঃ টিউমার হয়েছে কি না, দ্বিতীয়তঃ সেটা কি জাতীয়, তা ঠিক করতে হবে। বহিঃশরীরে টিউমার হ'লে ধরা সোজা, কিন্তু শরীরের ভিতরে হ'লে রোগীর লক্ষণ দেখে টিউমার সন্দেহ করতে হয়। অনেক সময় বহিঃশরীরের টিউমার আসলে আভ্যন্তরীণ কোন মারাত্মক টিউমারের ছড়িয়ে পড়ার (metastasis) অংশ। এই সব বিবরণ হ'তে বুঝতে পারা যায় যে, ক্যানসার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ার আগে ধরা পড়লে তাকে দমন করা সহজ হয়। সেইজন্য বর্তমানে সকলেই শুরুতেই রোগনির্ণয় করার জন্য ব্যগ্র। বিশেষজ্ঞরা এবিষয়ে জনসাধারণকে কয়েকটি লক্ষণ সম্বন্ধে সজাগ হ'তে বলেছেন, যাতে তাঁরা তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যেয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন। কয়েকটি লক্ষণ হোল— প্রদাহ (inflammation) না হয়েও শরীরের কোন স্থান উঁচু হ'য়ে উঠা, অকারণে তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে যাওয়া, অনেকদিন ধরে কোন ঘা ভাল না হওয়া, বয়স্ক লোকের মল-ত্যাগের অভ্যাসের পরিবর্তন, আঁচিল হঠাৎ বড় হ'য়ে যাওয়া, স্ত্রীলোকের স্তনদেশের কোন অংশ শক্ত হয়ে ওঠা অথবা ঋতু বন্ধ হয়ে যাবার পরে আবার শুরু হওয়া ইত্যাদি। উন্নত দেশগুলিতে বেশী বয়সের লোকদের ক্যানসার কেন্দ্রে যেয়ে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করাবার সুযোগ আছে। অনেক সময় শুধু চোখে দেখে চিকিৎসকরা ঠিক করতে পারেন না যে, টিউমারটি মারাত্মক ধরনের কি না। সেক্ষেত্রে টিউমারের একটি ছোট অংশ কেটে নিয়ে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করান হয়, যাকে বায়োপসি পরীক্ষা (biopsy examination) বলে। চিকিৎসার পদ্ধতি নিরূপণ করার জন্য এরূপ পরীক্ষার খুব প্রয়োজন। অনেক সময় অস্ত্রোপচার কালে, অস্ত্রোপচার অসমাপ্ত রেখে, তৎক্ষণাৎ বায়োপসি পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে অস্ত্রোপচার সমাপ্ত করতে হয়, কারণ টিউমারের প্রকৃতি অনুযায়ী অস্ত্রোপচারের প্রকারভেদ করতে হয়।

আজকাল ক্যানসার রোগীর রক্ত পরীক্ষা ক'রে রোগনির্ণয় করার চেষ্টা চলছে। মুখ ও জরায়ুর মধ্যে ক্যানসার হ'লে ওই সব জায়গার জীবকোষ চেঁচে নিয়ে তা পরীক্ষা ক'রে রোগ ধরা যেতে পারে। এক্স-রে ফটো ক্যানসার রোগ-নির্ণয়ে অনেক সাহায্য করে।

ক্যানসার কেন হয় ?

ক্যানসারের সঠিক কারণ জানা নেই। এ সম্বন্ধে নানারকমের মত আছে :

(১) বংশগত বা জাতিগত রোগ— কয়েক রকমের ক্যানসার কোন কোন বংশে একটু বেশী

দেখা দিলেও ক্যানসারকে বংশগত রোগের মধ্যে ধরা হয় না। জাপানীদের পাকস্থলীতে ক্যানসার বেশী হয়, কিন্তু তাদের স্তনদেশের ক্যানসার অন্য জাতির চেয়ে কম। অবশ্য এরকম জাতিগত প্রাধান্যের উদাহরণ খুবই কম।

(২) কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য এর কারণ—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে স্যার পার্শিভাল পট লক্ষ্য করেন, যেসব ছেলে আলকাতরা লাগান চিমনি পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত, তাদের অনেকেরই ত্বকে ক্যানসার হয়। পরে আলকাতরা হ'তে ক্যানসারকারক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত রঙ, অনেক প্রসাধন দ্রব্য কিংবা কলকারখানা হ'তে যে সব দূষিত গ্যাস বার হয়, তাদের অনেকেরই ক্যানসার করার ক্ষমতা আছে। বহু বৎসর ধরে সিগারেট খাওয়ানের ফলে যে ক্যানসার হয়—একথা অনেক বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন, কিন্তু এটা এখনও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি।

(৩) ভাইরাস (virus)-জনিত — ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি জন্তুর ক্যানসারের কারণ যে ভাইরাস বা জীবপরমাণু, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে মানুষের ক্যানসারের কারণ ভাইরাস কিনা, সে-সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হ'লেও তা ঠিক প্রমাণিত হয়নি। কেবলমাত্র মানুষের আঁচিল (wart)-এর কারণ যে একরকম ভাইরাস, তা জানা গেছে। মানুষের গলা হ'তে পাওয়া এ্যাডিনোভাইরাস (adenovirus) ইঞ্জেকসন দিয়ে জন্তুর ক্যানসার করা যায়, কিন্তু মানুষের ক্যানসার করতে পারা যায়নি। ক্যানসারের ভাইরাস নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে, কারণ এর ভাইরাস আবিষ্কৃত হ'লে ক্যানসার প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা যেতে পারবে।

(৪) কোন কারণে জীবকোষকে উত্তেজিত করা—(ক) কাশ্মীরের শীতাধিক্যের জন্য অনেকে পেটের কাছে কাপড়ের নীচে কাঙরি (kangri) নামে মাটির ভাঁড়ে আগুন রাখে। তাদের কারও কারও পেটে ক্যানসার দেখা দেয়। (খ) এক্স রে বা ঐ জাতীয় আলো (radiation)—বিগত মহাযুদ্ধের সময় জাপানে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পরে যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই ক্যানসার বা লিউকিমিয়া দেখা গিয়েছিল। দেখা গেছে যে, এক্স-রে বিভাগের কর্মীদের ঘন ঘন ওই আলোর সংস্পর্শে আসার জন্য তাদের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে। এমন কি অনেকে অন্যান্য রোগ-নির্ণয়ের জন্য ঘন ঘন এক্স-রে ছবি তোলার বিরোধী।

উপরি-উক্ত যে সব কারণগুলি বলা হোল, তাদের প্রত্যেকেই হয়ত জীবকোষের মধ্যে একই রকমের পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্যানসার রোগের সৃষ্টি করে।

ক্যানসারের কি চিকিৎসা আছে?

(১) আগেই বলা হয়েছে যে, অ-মারাত্মক টিউমারের রোগীকে অস্ত্রোপচার দ্বারা আরোগ্য করা সহজ। ক্যানসার রোগীর প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ টিউমার ছড়িয়ে পড়বার আগে অস্ত্রোপচার করলে নীরোগ হওয়া আশা করতে পারা যায়।

(২) এক্স-রে ও রেডিয়ম আলো দেওয়া—কোন কোন ক্যানসারে এই চিকিৎসায় ভাল কাজ হয়, আবার এমন কতকগুলি ক্যানসার আছে যাতে ক্যানসার কোষগুলি এই আলোয় মরে না। ক্যানসার রোগীর অস্ত্রোপচারের আগে কখনও কখনও এই আলো দেওয়া হয়, যাতে ক্যানসারের আয়তন ছোট হয় এবং অস্ত্রোপচার সহজসাধ্য হয়; আবার অস্ত্রোপচারের পরেও আলো দেওয়া হয়, যাতে করে ছড়িয়ে পড়া ক্যানসার-কোষগুলি বিনষ্ট হ'তে পারে। মুস্কিল হচ্ছে যে, এই আলোয় অনেক সুস্থ জীবকোষও বিনষ্ট হয় এবং রক্ত-

কণিকাকারক জীবকোষের বিনষ্ট হবার ফলে রক্তাল্পতা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, অত্যধিক পরিমাণে এই আলোর ব্যবহারের ফলে ক্যানসার সৃষ্টি হ'তে পারে।

(৩) রাসায়নিক ওষুধ— অনেক রকম রাসায়নিক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের ক্যানসার কোষকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। এদের কয়েকটি হচ্ছে: মায়লেরান (myleran), এনডক্সান (endoxan), মেথোট্রেক্সেট (methotrexet) প্রভৃতি। এই সব ওষুধের সাহায্যে ক্যানসার রোগীকে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে।

(৪) স্ত্রী ও পুং গ্রন্থিরস (sex-hormone) – এই জাতীয় ওষুধ যেমন ইস্ট্রোজেন (oestrogen) প্রজেস্টিরোন (progesterone) প্রভৃতি দিয়ে কয়েক রকমের ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়। দেখা গেছে, যে বয়স পর্যন্ত নারী রজস্বলা হয় (সাধারণতঃ ১৩ থেকে ৪৫ বৎসর) সেই বয়সের মধ্যে ক্যানসার হ'লে অনেক ক্ষেত্রে ডিম্বাশয় (ovary) বাদ দিলে চিকিৎসার সাহায্য হয়।

ক্যানসার প্রতিরোধ করা কি সম্ভব?

যে অসুখের কি কারণ ও কেমন করে হয়, সঠিক জানা নেই, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে এই রোগের কারণ হিসেবে যেগুলিকে সন্দেহ করা হয়েছে, তা যতদূর সম্ভব এড়ানই ভাল। সিগারেট ধূমপান না করা, রঙ করা খাদ্যদ্রব্য বর্জন করা, আঁচিল কাটতে চেষ্টা না করা, শরীরের কোন অংশে কিছু দ্বারা (যেমন জুতার পেরেক) দিনের পর দিন ঘর্ষণ না হ'তে দেওয়া— এইরূপ কয়েকটি ব্যবস্থার কথা সাধারণভাবে বলা যেতে পারে। অনেকের মতে সিগারেট ধূমপান না করে হুঁকা বা গড়গড়ায় ধূমপান করলে, ধোঁয়ার ক্যানসারকারক দ্রব্যগুলি জলে মিশে যাওয়ার ফলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা কমে যায়। আগেই বলেছি, যদি কোনদিন ক্যানসারের ভাইরাস ধরা পড়ে— তা হ'লে সেই জীবপরমাণু দিয়ে টিকা তৈরি করা সম্ভব হবে, যেমন বসন্ত রোগের টিকা দিয়ে ওই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। তবে যতদিন না ক্যানসারকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন আমাদের সাবধান থাকতে হবে, যাতে রোগটি শুরুতেই ধরা পড়ে।

ক্যানসার কি আপনা আপনি ভাল হতে পারে?

প্রমাণিত ক্যানসার আপনা আপনি ভাল হয়ে যাবে, এ সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কচিৎ যদি রোগীর শরীরে নিজ হ'তে ক্যানসার প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মে, তা'হলে অবশ্য এটা সম্ভব। কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্যানসার রোগীর মধ্যে হয়তো একজনার এরূপ হ'তে পারে।

ক্যানসার কি কেবল অধিক বয়স্কদের হয়?

সাধারণতঃ তাই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটদেরও হ'তে পারে। লিউকিমিয়া ত ছোটদের খুবই হয়। মূত্রাশয়ের ক্যানসার ছোটদেরও হ'তে পারে।

ক্যানসার কি এখন বেড়েছে?

সংখ্যায় যে এ-রোগ বেড়েছে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। তার একটা কারণ এই যে, লোকের আয়ুষ্কাল বেড়েছে, তাই বেশী লোক 'ক্যানসার বয়সে' (cancer age) পৌঁছচ্ছে। বর্তমান সভ্যতার যুগে ক্যানসারকারক বহু রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারও একটা কারণ। তা ছাড়া রোগনির্ণয়ের সুবিধা অনেক বাড়ার জন্য রোগ ধরা পড়ছেও বেশী।

ক্যানসার চিকিৎসার ভবিষ্যৎ কি?

সমস্ত সভ্যদেশেই জীবনধারণের মান উন্নয়নের ফলে অথবা নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ফলে জীবাণু-ঘটিত অসুখ বা মড়ক প্রায় আয়ত্তে

মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু ক্যানসার তার অজ্ঞেয় প্রলয়মূর্তি নিয়ে মানুষের কাছে এক বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ক্যানসারের কারণ, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে। খবরের কাগজে ক্যানসারের নিত্য নূতন ভাইরাস বা ওষুধের আবিষ্কারের খবর বার হওয়াতেই এটা বোঝা যায়। অবশ্য কোন দাবীই আজ পর্যন্ত টেকেনি। তবে এ-বিষয়ে অগ্রসরের গতিবেগ খুবই প্রবল। কিন্তু মনে হয় যে, সব ক্যানসারের একই কারণ নাও হ'তে পারে, আবার সব রকম ক্যানসারের চিকিৎসার নির্দেশ একই পথে নাও আসতে পারে।

'অনন্ত রাধার মায়া'

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

তত্ত্বকথা কাহিনীর সাহায্যে রসসুন্দর ও জীবনস্পর্শে সঞ্জীবিত ক'রে মানুষ তার অনুভবকে প্রকাশ করে। দার্শনিক তত্ত্বকথা সাধারণের বোধগম্য করতেই কল্প-কাহিনীর বিস্তার করেছে সকল দেশের পুরাণেই। কারণ, ভাবের চাই একটা শরীর, যাকে আশ্রয় করে হবে তার প্রকাশ। অনুরূপভাবে, শরীরেরও চাই একটি ভাব—নতুবা সে কিসের প্রকাশ? তাইতো তত্ত্বে কাহিনীতে এমন সুনিবিড় সম্বন্ধ।

পণ্ডিত ও সাধকেরা বলে থাকেন, এই বিরাট বিশ্বও ভাবেরই একটা স্থূল অভিব্যক্তি মাত্র। ভাবের যিনি প্রকাশক তিনি স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপ। ভাবে চৈতন্যে মিলিয়ে জীব-জগৎ। কিন্তু স্বপ্রকাশ চৈতন্য ভাবাতীত—এক, 'যে একের দুই নাই'। এই যে ভাবনা তা ইট কাঠের মত জড় নয়, আবার স্বপ্রকাশ চৈতন্যের মত স্বয়ং-প্রকাশও নয়। মানুষের চিন্তাশক্তি অচেতন, এ-কথা সাধারণ অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি বলে না। তা বোলে সে-চিন্তাই মানুষ, তার বেশি কিছু নয়—এ-কথাও কেউ বলে না। মানুষকে বাদ দিয়ে আলাদা করে তার চিন্তাশক্তিকে ভাবা যায় না। মানুষের পরিচয় তার এই চিন্তাতেই—নয়তো সে অস্তিমাত্রম্। তাই চৈতন্য থেকেই চিন্তা—চিন্তা অবলম্বনেই চৈতন্যের জগদভিসারী অভিব্যক্তি। এই চৈতন্যময়ী চিন্তাকেই চিচ্ছক্তি বলা হয়েছে তন্ত্রে। বন্ধনদশায় চৈতন্য ও চিন্তাশক্তি আলাদা দুই বলে বোধ হয়—জ্ঞান হলে দেখে এক। কারণ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত সত্তা শক্তির নেই। এই চিন্তা বা ভাব যখন চৈতন্যকে বিষয় করে চৈতন্যময় হয়, তখন তা ব্রহ্মবিদ্যা, আর যখন বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে চৈতন্য থেকে, বিষয় করে অহং বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় দেহ ভোগ্য বিষয়কে, ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল স্থূলতর-তমে স্পন্দিত হতে থাকে, তখন তা অবিদ্যা, বন্ধনকর্ত্রী মহামায়া মোহরাত্রি। ইনিই সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মের ঈক্ষণরূপা চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী। ব্রহ্মার যে সৃষ্টিমূলা রাজসী শক্তি, বিষ্ণুর যে পালনকারিণী সাত্ত্বিকী শক্তি ও রুদ্রের ধ্বংসকারিণী তামসী শক্তি - সবই এই ত্রিগুণাত্মিকা মহামায়ার এক একটি শক্তি মাত্র। ব্রহ্মাদি দেবগণের অন্তরে মহাদেবী অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিতা থেকে সৃষ্ট্যাদি কার্য পারিচালিত করে থাকেন। তাঁরা ঐ সকল গুণে দেবী-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েই অহংকার করে সৃষ্ট্যাদি কার্য সকল করে চলেছেন। শক্তি বিহীন হলে কেউ কোন কার্যই করতে পারেন না।

এই শক্তি ও ব্রহ্ম স্বরূপত অভিন্ন। চিৎ-

স্বরূপিণী মা অধিকারী অনুসারে সগুণা ও নির্গুণা হয়ে উপাসনার ভেদ নির্দেশ করেছেন।

নিজ ইচ্ছায় ব্রহ্মাদি দেবগণ অহং-ত্যাগ করতে পারেন না। এই অহংকে অবলম্বন করেই ভগবান বিষ্ণু বারে বারে লোকানুগ্রহার্থ দেহধারণ করেন। অবতার তাই শক্তিরই। শক্তি ভিন্ন অবতারলীলা অসম্ভব। যেমন ব্রহ্ম সর্বব্যাপক তেমনি শক্তি সর্বব্যাপিনী—কারণ, শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন।

অহংকার শক্তিরই। শক্তির কৃপা না হলে অহং-এর লেশ কোথা দিয়ে প্রকাশিত হয়ে যে কিরূপ নেবে, সাধকের সাধ্য নেই তা ধরার, এমন কি ভূতভাবন শ্রীবিষ্ণুও এই অহংকার অবলম্বনেই অবতরণ করছেন বারে বারে—এই তত্ত্বটি দেবীভাগবতের একটি কাহিনীতে সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশিত হয়েছে।

পরীক্ষিৎ-তনয় জনমেজয়ের সর্পসত্র ব্যর্থ হল। পিতা পরীক্ষিতের সদ্গতি হয়নি ভেবে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। বৈশম্পায়ন অখিল ভারত-কথা শুনিয়েও তাঁর শোক শান্ত করতে পারলেন না দেখে মহামুনি ব্যাস এগিয়ে এলেন, বললেন: রাজন্, কাম্যকর্ম বড় কঠিন। সদুপায়ে অর্জিত অর্থ দিয়ে এবং নিরহংকার হয়ে করতে না পারলে বিষময় ফল হয়। দেখলে তো, তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি সাক্ষাৎ ধর্মপুত্রাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রাজসূয় যজ্ঞ করে তিনমাসের মধ্যেই নিগৃহীত হলেন; স্বর্গলক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা দ্রৌপদী সভায় অপমানিতা হলেন—পাণ্ডবগণ সর্বস্ব হারিয়ে বার বছর বনে বনে কাটালেন; একবছর হীন কর্ম করে ছদ্মবেশে থেকে পরে বহুরক্তক্ষয় করে রাজত্ব ফিরে পেলেন!

যুধিষ্ঠির অর্থসংগ্রহ করেছিলেন নিপীড়নের মাধ্যমে আর যজ্ঞ করেছিলেন সাহংকারে—তাই এই বিষময় ফল। অধিক কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি নারায়ণের অংশ-সম্ভূত, তিনিও পূর্বকালীন অহংকারের বশে এই হীন গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। যদিও তিনি লোকপালক তথাপি এই সকলই পরমাশক্তি মহামায়ার ইচ্ছাবশেই হয়েছে বলে জানবে।

জনমেজয় বিস্মিত হয়ে বললেন: এঁরও অহংকার! ইনি তো সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের নারায়ণ ঋষি ছিলেন এবং বহু তপস্যা করেছিলেন বদরিকা আশ্রমে।—

ব্যাসদেব বললেন: শোন সেই পরমাদ্ভুত কথা। প্রজাপতি ব্রহ্মার হৃদয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি হল। ধর্ম দক্ষের দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করেন। তাঁদের হরি কৃষ্ণ নর ও নারায়ণ নামে চারটি পুত্র হয়েছিল। এই নর ও নারায়ণ বদরিকা আশ্রমে কঠোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাঁদের তপস্যার সুমহৎ তেজে চরাচর জগৎ পরিতপ্ত হয়ে উঠল।

দেবরাজ ইন্দ্র সন্তপ্ত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, যদি তাঁরা তাঁর ইন্দ্রত্ব ছিনিয়ে নেন! তপোভঙ্গের জন্য তিনি নিজে তাঁদের কাছে এসে বললেন- ঋষিদ্বয়, কি আপনাদের কামনা বলুন। আপনাদের তপস্যার সন্তুষ্ট হয়ে আমি উত্তম বর দিতে এসেছি।

নর-নারায়ণ ঋষি গ্রাহ্যই করলেন না ইন্দ্রের কথা। ইন্দ্র দেখলেন, দুজনে দৃঢ় ধ্যানাসনে তন্ময় হয়ে আছেন। ইন্দ্র মায়া বিস্তার করে ঝড় বৃষ্টি দাবানল, বাঘ সিংহ প্রভৃতি দিয়ে নানাপ্রকার ভয় দেখিয়েও দুজনকে আসনচ্যুত করতে পারলেন না। ইন্দ্র বিমনা হয়ে ফিরে গেলেন। ভাবলেন, এঁরা পরমাপ্রকৃতি ভুবনেশ্বরীর ধ্যান করছেন, এঁদের কোন মায়া দিয়ে কিছু করা যাবে না। কারণ, যে পরমাপ্রকৃতি সকল মায়ার মূল, তাঁকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁর কোন অনিষ্ট কেউ করতে

পারে না।

রাজন্‌, মায়ার কি প্রভাব দেখ, এ-সব জেনেও ইন্দ্র মন্মথ ও বসন্তকে আহ্বান করে তাদের নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে বিমোহিত করতে পাঠালেন আর পাঠালেন আটহাজার পঞ্চাশজন দিব্যাঙ্গনাকে।

অকালে বসন্তের বিস্তার দেখে নারায়ণ ঋষি বুঝতে পারলেন—এ ইন্দ্রের কার্য। অদূরে মন্মথ ও রতিকে এবং অপ্সরাদের দেখে নারায়ণ ঋষি অভিমানে পূর্ণ হয়ে ভাবলেন, এঁদের চাইতে সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী যোগবলে সৃজন করে এঁদের উচিত শিক্ষা দেব। নারায়ণ আপন উরুতে করাঘাত ক'রে এক অপূর্ব কন্যার সৃজন করলেন। উরু থেকে উদ্ভূত বলে তার নাম হল উর্বশী। ইন্দ্রপ্রেরিত অপ্সরাগণ অত্যন্ত বিস্মিতা হলেন।

পরে নারায়ণ ইন্দ্রপ্রেরিত অপ্সরাদের পরিচর্যার জন্য তাঁদের অপেক্ষা সুন্দরী সমসংখ্যক অপ্সরা সৃজন করলেন। তাঁদের দেখে ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরাগণ নারায়ণের স্তব করতে লাগলেন। বললেন: হে দেবযুগল, আপনাদের তপস্যার মহত্ত্ব ও ধৈর্য দেখে আমরা স্তব করতেও সমর্থ হচ্ছি না। পৃথিবীতলে এমন কেউ নেই, যে আমাদের দেখে ধৈর্যহারা না হয়—কিন্তু আপনাদের কোনও মনোবিকার নেই। ইন্দ্র-কার্যে নিযুক্তা আমরা দুর্জন হলেও, জানিনা কোন পুণ্য-বলে আপনাদের দর্শনলাভ করেছি। প্রচণ্ড কোপানলে দগ্ধ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দুষ্কার্য-কারিণী আমাদের যে আপনারা ক্ষমা করেছেন—এতে আপনাদের মহত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে।

জিতকাম জিতলোভ মুনিদ্বয় তাঁদের বিনয়-বচনে সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গে ফিরে যেতে বললেন ও বর প্রার্থনা করতে বললেন। তাঁরা প্রণতা হয়ে বললেন, হে নারায়ণ, ভক্তিযোগে আপনার চরণ দর্শন করে আর স্বর্গে যেতে চাই না। হে মধুসূদন, আমাদের অভিলাষ আপনি আমাদের পতি হোন। আপনার সৃষ্ট অপ্সরাগণ দেবলোকে যাক। হে মাধব! আপনি দেবগনের প্রভু, আমাদের বাঞ্ছিত বর দান করে সত্য রক্ষা করুন। আপনি জগৎ-স্বামী, আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত আমাদের আপনি পরিত্যাগ করতে পারেন না।

নারায়ণ বললেন: হে অপ্সরাগণ, আমি সহস্র বৎসর জিতেন্দ্রিয় হয়ে তপস্যারত, এখন আমি বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হতে পারি না। পরমানন্দ ও ধর্মনাশক বিষয়-সম্ভোগে আমার বাসনা হয় না। কোন্ বুদ্ধিমান—'পশূনামপি সাধর্ম্যে রমেত'—পশুর সমান বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হয়?

ব্যাস বললেন: রাজন্‌, অপ্সরাগণ তাঁদের অভিলাষ পরিবর্তন করলেন না। নারায়ণ চিন্তা করতে লাগলেন: আমি এখন বিষয় সঙ্গে লিপ্ত হলে উপহাসাস্পদ হব। আমার অহংকারের জন্যই এমন ধর্মনাশকর বিষম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আমি যদি পূর্বের ন্যায় মৌন থাকতাম, যদি অভিমান বশে এদের সম্ভাষণ ও যোগশক্তির প্রভাব প্রদর্শন না করতাম, তবে এরূপ দুঃখময় পরিস্থিতিতে মাকড়সার জালের ন্যায় বন্ধনে পতিত হতাম না। অহো! অহংকারই সংসারের মূল—অনর্থের নিদান। এক্ষণে কি করি? আমি ক্রোধ উৎপন্ন করে এদের তাড়াব।

কনিষ্ঠভ্রাতা নর নারায়ণকে চিন্তাকুল দেখে বললেন: হে নারায়ণ! আপনি ক্রোধভাব ত্যাগ করে শান্তভাব অবলম্বন করুন ও সকল অনর্থের মূল দুর্ধর্ষ অহংকারের বিনাশ করুন। আপনার কি মনে নাই, পূর্বেও অহংকারের বশেই আমরা প্রহ্লাদের সঙ্গে সহস্র বৎসর সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম। হে মুনীন্দ্র! শান্তভাব অবলম্বন করুন।

জনমেজয় বললেন: কি আশ্চর্য, এঁদের মত ব্যক্তি যদি অহংমুক্ত না হতে পারেন, তবে

ত্রিভুবনে অহংশূন্য আর কে হতে পারে? আমি নিশ্চিত বুঝছি, সকল প্রাণীই এই অহংকারে আবৃত হয়েই বিষ্ঠামূত্রদূষিত সংসারে ভ্রমণ করছে।

ব্যাসদেব বললেন: রাজন্, অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহংকার থেকে উদ্ভূত। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও অহংকারে মোহিত হয়েই স্ব স্ব কার্য করছেন। আর এই অহং থেকেই কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু সকলের উৎপত্তি ঘটছে।

সে যা হোক, শক্রপ্রেরিত ও নারায়ণের উৎপন্ন অপ্সরাদের প্রার্থনা শুনে নারায়ণ ঋষি তো মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেলেন। শাপ দিতে পারেন না—ক্রোধ করতে পারেন না। একক্ষেত্রে বর প্রদানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গরূপ অসত্যাচরণ অপর পক্ষে ক্রোধে তপোক্ষয়! এদিকে বিষয় ভোগে স্পৃহাও নেই আর তপস্যাভঙ্গ করেনই বা কি করে?

গভীর চিন্তা করে নারায়ণ স্মিতহাস্যে বললেন: হে সুন্দরিবৃন্দ! আমি তপশ্চরণে কৃতসংকল্প, অতএব দারপরিগ্রহ করে ব্রতভঙ্গ করতে পারব না। তোমরা কৃপা করে আমার ব্রত রক্ষা কর—আমি জন্মান্তরে তোমাদের পতি হতে পারি। হে বিশলাক্ষি-সকল! আমি অষ্টাবিংশ মন্বন্তরে দ্বাপরযুগে দেবকার্যের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হব, তোমরা পৃথিবীতলে রাজকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে আমার পত্নীভাব পাবে।

ব্যাস বললেন: রাজন্! ভৃগুমুনির শাপে নারায়ণকে বারে বারে পৃথিবীতে আসতে হচ্ছে ধর্মরক্ষার্থে এবং কৃষ্ণাবতারে ষোড়শ সহস্র একশ জন রাজকন্যাকে বিবাহ করতে হয়েছে।

তত্ত্বের কথা কাহিনীতে কেমন রূপ নিয়েছে সামান্যত দেখা গেল। এই অহংকার যে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই নরনারায়ণের মতন পরাক্রান্ত পুরুষগণ রেখে দেন লোকরক্ষার্থে—এ তত্ত্ব কথামৃতের আলোকে দেখলে মন্দ হয় না।

জীবের সর্বশেষ বন্ধন অহংকার। অহংকার সহজে যায় না। "'আমি' থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না"; "'আমি কর্তা' এই বোধ থেকেই যত অশান্তি দুঃখ"—বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার বলেছেন কেশব সেনকে, "আমি' ত্যাগ করো—আমি কর্তা— আমি লোককে শিক্ষা দিচ্ছি। কেশব বললে, 'মহাশয়, তা'হলে দল টল থাকে না'।"

"আমি যাবার নয়। 'আমি ঘট' যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ জীব জগৎও রয়েছে।"

এ যেমন জীবের পক্ষে তেমনি—'অবতারেরও দেহবুদ্ধি আছে। শরীর ধারণে মায়া।' কিন্তু, তাঁরা মায়াধীশ ব'লে মায়া তাঁদের বন্ধনের কারণ কখনো হয় না। 'তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে।' তাঁরা স্বেচ্ছায় এ-বন্ধন স্বীকার করেন আদ্যাশক্তির যন্ত্র হয়ে বা নিজেকে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করে এই সৃষ্টিলীলার পুষ্টিসাধন করেন, লোককল্যাণ করেন। কারণ, 'অবতারের হাতে জীবের মুক্তির চাবি থাকে।'

আবার 'যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। শক্তিলীলাতেই অবতার।'

সুতরাং যতক্ষণ আমি বোধ ততক্ষণ সকলেই মহামায়ার 'অণ্ডরে'। 'অবতার-লীলা—এ সব চিৎশক্তির ঐশ্বর্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনি আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।'

'সবই সেই আদ্যাশক্তির, সেই চিৎশক্তির ঐশ্বর্য- সৃষ্টি, পালন, সংহার; জীব জগৎ; আবার ধ্যান, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম, সব তাঁর ঐশ্বর্য।'

মহামায়ার মায়ায় সকলেই মুগ্ধ হন। ঠাকুর বলেছেন, 'এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মুগ্ধ। ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন— তিনিও মুগ্ধ। রাম সীতার জন্য কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিলেন। পঞ্চ-ভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'

সুতরাং 'শক্তিরই অবতার।' এই মহাশক্তির উপাসনা সকলেই করেছেন। রাম কৃষ্ণ শঙ্কর চৈতন্যদেব সকলেই আদ্যাশক্তির আরাধনা করেছেন। 'নেতি'মুখে বিচার করতে গিয়ে অনেকে শক্তিকে জড়া বলে থাকেন। শক্তি জড়া নন। কারণ, "যতক্ষণ 'আমি' আছে—ভেদ-বুদ্ধি আছে— ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মান্‌তে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি ব'লে গেছে।"

তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালক সারদাকে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বলেছিলেন :

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি রাম কোটি কৃষ্ণ হয় যায় রয়॥ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

ডক্টর শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত*

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১১) উনিশ শতকের লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল পরিমণ্ডলে একজন সার্থকনামা ও প্রতিভাবান কৃষ্ণযাত্রাকার, এবং তিনি সুদক্ষ সঙ্গীত-রচয়িতা ও সুকণ্ঠ গায়ক বলে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দুর্গাপুর স্টেশনের দশ এগারো মাইল উত্তরে অবস্থিত ধবনী গ্রাম তাঁর পিতৃভূমি। তাঁর বিস্তৃত জীবনী আলোচনার এখানে অবকাশ নেই, কিন্তু তিনি সমগ্র বাঙলা এবং বাঙলার বাইরে যে-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সে শুধু কেবল সম্ভব হয়েছিল তাঁর জন্মগত রচনাশক্তি ও গীতি-প্রতিভার দ্বারা। দুঃসহ দারিদ্র্য ও বহুবিধ বিঘ্ন-কণ্টকিত ছিল তাঁর জীবনের প্রথম অধ্যায়, এইজন্যই তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা খুব বেশি কিছু গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য যে একজন পণ্ডিত রেখে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনো করেছিলেন, তা তাঁর লিখিত সাতটি পালাই সপ্রমাণ করে। রসজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণক্ষমতার এক দুর্লভ সম্মেলন ঘটেছিল তাঁতে। তা-ই তাঁকে পণ্ডিত না করলেও যথার্থ জ্ঞানী করে তুলেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ যুগপুরুষ। তাঁর মধ্যে এক লোকোত্তর ধ্যানীসত্তা ও রসিকসত্তার অপরূপ সাযুজ্য ঘটেছিল। পরম রসস্বরূপের যিনি ধ্যানী, গানের রসেও তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই পরম পুরুষের অলৌকিক রসাস্বাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সুকণ্ঠ গায়কের সুরের আনন্দ আস্বাদেও নিমগ্ন হতেন। অনন্তের ধ্যানমাধুর্যের সঙ্গে সুরের রসালাপ তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে অন্যলোকে টেনে নিয়ে যেত। এইভাবেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের সঙ্গে কৃষ্ণযাত্রামূলক লোকসংস্কৃতির শেষ প্রতিনিধি উনিশ শতকের বিখ্যাত পালা-

---

* বর্ধমান শ্যামসুন্দর কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত। উক্ত গ্রন্থটি পরিবর্ধিত আকারে আসন্ন-প্রকাশ। 'বাঙলা সাহিত্যের রূপচিত্র', 'বঙ্কিমসাহিত্য পরিক্রমা' ও 'মধুমঞ্জরী' ইঁহার অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ।

রচয়িতা ও গায়ক নীলকণ্ঠের ভক্তজীবনের মিলন-সংঘটনের একটি পুণ্য পরিবেশ গড়ে উঠেছিল সাধনার পীঠভূমি দক্ষিণেশ্বরে। সেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধক কবি নীলকণ্ঠের দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে মিলনের পবিত্র চিত্রটি পরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আলোচনার অবতারণা। পুণ্যদৃশ্যকে যতই ধ্যানে ও মননে প্রত্যক্ষ করা যায় ততই আমাদের লাভ। উনিশ শতকের মধ্যলগ্নে ভক্তি ও প্রতিভায় যে-কয়জন মনীষী-ব্যক্তি বাঙালীর কাছে বরেণ্য স্থান গ্রহণ করেছিলেন, কোনো না কোনো ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের সঙ্গে তাঁদের পুণ্য নাম গ্রথিত হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণযাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভক্তি-আশ্রয়ী সঙ্গীত-প্রতিভায় সেই যুগে যে-মহৎ ঐতিহ্যের ভাবাকাশ সৃষ্টি করেছিলেন, তারই আনন্দজ্যোতি যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিকেই শুধু আকর্ষণ করেনি, সমাধির আনন্দ-গহনেও তিনি ডুবে যেতেন নীলকণ্ঠের গান শুনে। শ্রীরামকৃষ্ণের রসবোধ এতই সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের ছিল যে, গানের পদমাধুর্য ভাবসম্পদ সুর-তাল-লয় ইত্যাদি বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হলে তিনি তৃপ্তি পেতেন না—সমাধিস্থ হওয়া তো দূরের কথা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নীলকণ্ঠের প্রতিভার মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নীলকণ্ঠের গান সর্বপ্রথম শুনেছিলেন কলকাতার হাটখোলায় বারোয়ারী তলায়। একজন ভক্ত এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন নীলকণ্ঠ প্রেমিক সাধক ও পরম ভক্ত। তিনি আরও বলেছিলেন যে, নীলকণ্ঠ যখন বৃন্দাদূতী সেজে গান করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ কেঁদে আর কূল পায় না। এ-কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রা শোনবার জন্য। তাঁকে গান শোনাবার ব্যবস্থা করলেন সর্বপ্রথম স্বামী অভেদানন্দ।

পরমহংসদেবের অন্যতম সেবক লাটু মহারাজ এবং স্বামী অভেদানন্দ একটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে নির্দিষ্ট দিনে দক্ষিণেশ্বর থেকে হাটখোলার বারোয়ারী ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। নীলকণ্ঠের যাত্রা তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দর্শকশ্রোতৃবৃন্দের ভিড় এত নিবিড় যে, তাদের মধ্য দিয়ে আসরে প্রবেশ করা একরূপ অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। কোনো প্রকারে অভেদানন্দ স্বামীজী এবং লাটু মহারাজ আসরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে নীলকণ্ঠকে সংবাদ দিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর যাত্রাগান শুনতে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। কণ্ঠ মহাশয় পরমহংসদেবের কথা শোনামাত্রই দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্যে পথ করে তাঁর হাত ধরে আসরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। সানন্দ আবেগে কণ্ঠ মহাশয় বৈষ্ণব পদের একটি গান ধরলেন। সুগভীর ব্যাকুলতা যখন গানের কথা কয়টির মধ্যে ঝরে পড়ছিল, তখন দেখা গেল পরমহংসদেবের ওষ্ঠাধর কাঁপছে। ভক্ত-গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত প্রেম-সাধনার গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভাবের অতলে ডুব দিয়েছেন। স্বামী অভেদানন্দ সেই দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে – 'সুমিষ্ট কণ্ঠে ভাবের সহিত যখন নীলকণ্ঠ আবার গাহিতে লাগিলেন, তখন পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অপূর্ব সেই মূর্তি। নীলকণ্ঠও ভাবে গদ্গদ হইয়া দুই হস্তে পরমহংসদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বার বার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে পরমহংসদেব বসিয়া আবার গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি তখন যেন আবার সাধারণ মানুষ। শ্রোতৃবর্গ অবাক হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "ইনি কে? এই মহাপুরুষ কোথায় থাকেন? এ-রকম অপূর্ব রূপ তো কথনও দেখি নাই।" নীলকণ্ঠের গানের সঙ্গে পরমহংসদেব

মধ্যে মধ্যে আখর দিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ তাহা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইল। প্রায় বেলা দশটার সময় যাত্রা ভঙ্গ হইল।' লোকশিক্ষায় পরম উৎসাহদাতা পুণ্যপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নীলকণ্ঠের প্রথম পরিচয় ঘটল ভক্তিসঙ্গীতের এই সুধানিষ্যন্দী পরিমণ্ডলে। এই ঘটনা খুব সম্ভব ১৮৮২ কিংবা ৮৩ খ্রীষ্টাব্দের।

এরপর নীলকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে এসে পরমহংসদেবকে গান শুনিয়েছিলেন। কণ্ঠ মহাশয় অনেকবারই কলকাতায় গান করেছিলেন। সেবারও কলকাতায় গান গেয়ে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর (১২৯১ সাল) দক্ষিণেশ্বরে নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে সকালে গান গাইলেন।[১] এই গান শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও গিয়েছিলেন। সেদিন বিকেলেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের মেঝেতে একটি মাদুরে বসে আছেন। বেলা প্রায় তিনটে হবে। নীলকণ্ঠ তাঁর সম্প্রদায়ের পাঁচ সাতজন লোক নিয়ে পরমহংসদেবের ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। নীলকণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন এ-কথা পূর্বাহ্নেই তাঁকে বলে দিয়েছিলেন। পূর্বদ্বার দিয়ে নীলকণ্ঠ প্রবেশ করে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দক্ষিণেশ্বরে এই প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটি শ্রীম এইভাবে দিয়েছেন—

'কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের কিঞ্চিৎ ভাব উপশম হইতেছে। ঠাকুর মেঝেতে মাদুরে বসিয়াছেন—সম্মুখে নীলকণ্ঠ ও চতুর্দিকে ভক্তগণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আবিষ্ট হইয়া)— আমি ভাল আছি।

নীলকণ্ঠ (কৃতাঞ্জলি হইয়া)— আমায়ও ভাল করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— তুমি তো ভাল আছ। 'ক'য়ে আকার 'কা', আবার আকার দিয়ে কি হবে? 'কা'এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা'-ই থাকে। (সকলের হাস্য)

নীলকণ্ঠ— আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— তোমায় সংসারে রেখেছেন পাঁচজনের জন্য। অষ্টপাশ। তা সব যায় না। দু-একটা পাশ তিনি রেখে দেন—লোকশিক্ষার জন্য। তুমি এই যাত্রাটি করেছ. তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্ছে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন? তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।'[২]

এই কথাগুলির পরে নীলকণ্ঠ ভক্তিবিনম্রকণ্ঠে পরমহংসদেবের আশীর্বাদ যাজ্ঞা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, 'তোমার যখন তাঁর নাম করতেই চোখ দুটি জলে ভেসে যায়, তখন আর তোমার ভাবনা কি?— তাঁর উপর তোমার ভালোবাসা এসেছে।' ঠিক তারপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ নীলকণ্ঠের 'শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস' গানটির প্রশংসা করলেন। তারপরে ভক্তিবিষয়ক কয়েকটি কথা বলে কৌতুকের সঙ্গে বললেন, 'তুমি সকালে অত গাইলে, আবার এখানে এসেছ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী।' কৌতুক আর ভক্তির মিলিত প্রবাহ শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই বয়ে যেত। নীলকণ্ঠ তার উত্তরে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন,— 'তা কেন? অমূল্য রতন নিয়ে যাব!' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, 'সে অমূল্য রতন আপনার কাছে। আবার 'ক'য়ে আকার দিলে কি হবে? না হলে

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ, (৭ম সং), পৃঃ ২০৮
২ ঐ পৃঃ ২০৮

তোমার গান অত ভালো লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ তাই তার গান ভাল লাগে।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্য হয়েছে, সেই মানহুঁস। তুমি সেই মানহুঁস।' সেইদিন দেখা যায়, চৈতন্যময় পরম পুরুষ উনিশ শতকের একজন সিদ্ধ গায়ককে যথার্থ মানুষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং ভক্তিময় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার প্রসার যাতে অবারিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে উৎসাহবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এরপর নীলকণ্ঠকে এও জানালেন যে, তিনি তাঁর গান হবে শুনে নিজেই যাচ্ছিলেন, এবং নিয়োগীও বলতে এসেছিলেন। একটু পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর নিজের আসনে গিয়ে বসে নীলকণ্ঠের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,— 'একটু মায়ের নাম শুনব।' নীলকণ্ঠ তাঁর দলের যে-দুই চারজন লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নিয়েই দুটি গান গাইলেন। প্রথমটি 'শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস,' দ্বিতীয়টি 'মহিষমর্দিনী'।[৩]

শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৪র্থ ভাগে উপরিলিখিত গান দুইটির মধ্যে প্রথম গানটির কেবল সূচনাটুকু উল্লেখ করেছেন, আর দ্বিতীয় গানটির কেবল 'মহিষমর্দিনী' নামটুকুই আমাদের গোচরে এনেছেন। দুটি গানই একরূপ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নীলকণ্ঠের পালাগুলিও অবলুপ্ত-প্রায়। বহু কষ্ট করে এবং বর্ধমান জেলার বহু দূরবর্তী গ্রামে ঘুরে ঘুরে পালাগুলির সব কয়টিই আমরা একরূপ উদ্ধার করেছি। কোনোটির রূপ পূর্ণাঙ্গ, কোনোটি বা খণ্ডিত। 'মহিষমর্দিনী' গানটি আমরা পেয়েছি নীলকণ্ঠের 'প্রভাসযজ্ঞ' পালায়। কিন্তু শ্রীম 'শ্যামাসঙ্গীতটির' প্রথম ছত্র দিয়েছেন এইভাবে— 'শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।' কিন্তু এই শ্যামাসঙ্গীতটির অংশবিশেষে কিছু ভুল আছে মনে হয়। কারণ আমরা শ্যামাসঙ্গীতটির যে-পূর্ণরূপ সংগ্রহ করেছি তার সূচনা একটু পৃথক। গানটি কোথাও পাওয়ার আর সম্ভাবনা নেই বলে গানটির পূর্ণাঙ্গরূপ এখানে উদ্ধৃত করলাম—

শ্যামাপদে আশ নদীর ধারে চাষ
ভাবনা বারোমাস ঘোচে না;
কৃপাশস্য কবে হবে কি না হবে
তাহার নিশ্চয় কেউ জানে না।
ছয় রিপু-নদীর অজয় অকূল,
পাপ-পানি বন্যা বাড়িছে বিপুল,
রাখতে তারে নারে ভক্তির বেড়াপুল,
পুলক বিনা যে পুল টেকে না॥
ভাঙিলে সে-বান অমনি ভাসান
কার সাধ্য তথায় বাস করে;
অপরাধ-বালি ফেলিয়ে দেয় কালি,
চাসে বাসে তার মন বসে না।
সেই বালি তুলি ফেলায়ে অন্তরে
কার সাধ্য তথা পুনঃ ক্ষেত্র করে,
কণ্ঠ কয় সেই মরুভূমি 'পরে
বপন করিলে বীজ অঙ্কুরে না॥

নিজের ভিতরকার অপরাধ-ভাবনার নৈরন্তর্য যে বিশ্বমাতার কৃপালাভের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে, তাঁর এই বিষাদ-গভীর উপলব্ধিই স্বচ্ছ সরল কবিভাষার সাহায্যে কয়েকটি চিত্রকল্পের সৃষ্টি করে এই শ্যামাসঙ্গীতটিকে এক অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তুলেছে। এই সঙ্গীতের কথাগুলি যেন তাঁর ভক্তিসাধনার পথে বহু আশঙ্কাপূর্ণ ও যন্ত্রণাবিদ্ধ বুকের স্পন্দনটুকু গীতিরসে ঢেলে দিতে পেরেছে। নদীর ধারে চাষের অনিশ্চয়তা ও অসহায়তার চিত্রকল্প নীলকণ্ঠের মাথুর পালার আর একটি গানে পাওয়া যায়—

এই পরের দেওয়া বাস পরেছি
পরের বাসে বাস করেছি,
এমনি পরের আশ করেছি,
চাষ করেছি নদীর কূলে।

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ, (৭ম সং), পৃঃ ২০৯

এই গানটিতে ব্যবহৃত নীলকণ্ঠের চিত্রকল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয়, 'শ্যামাপদে আশ নদীর ধারে চাস' পাঠটিই যথার্থ। এই শ্যামাসঙ্গীতটি নীলকণ্ঠের কোনো পালায় দেখা যায় না। খুব সম্ভব শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনাবার জন্য এই রসমধুর শ্যামাসঙ্গীতটি নীলকণ্ঠ তখনই রচনা করেছিলেন। নীলকণ্ঠের রচিত শ্যামাসঙ্গীত আমরাই সত্তরটির উপরে সংগ্রহ করেছি। তাঁর পালাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায়, তিনি যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই পালার কাহিনীর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে শ্যামাসঙ্গীত পালায় গ্রথিত করেছেন। কৃষ্ণযাত্রার গায়ক হয়ে, পালায় বৈষ্ণবভাব ভাবাবেশ সৃষ্টি করে এবং বৈষ্ণব-সাধনার প্রবক্তা হয়েও শক্তিসাধনা যে নীলকণ্ঠের অন্তরের বস্তু ছিল, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। শক্তিসাধনার তাই একটি মহাসঙ্গীত রচনা করে 'জগদম্বার বালক' শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই সঙ্গীত তাঁর সুকণ্ঠে পরিবেশন করে, তিনি শুধু যে সেই শুভলগ্নেই ধন্য হয়েছিলেন তা নয়, ঊনিশ শতকের শেষপাদে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল, সেই গৌরবের ও আনন্দের ইতিহাসেও চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় স্থান লাভ করেছেন।

নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে এর পরের গানটি শুনিয়েছিলেন শ্রীম-র ভাষায় 'মহিষমর্দিনী'। গানটির কোনো পদ শ্রীম উল্লেখ করেননি। আমাদের মনে হয় গানটির পূর্ণরূপ এই—

তারা ধন্য মা তোর লীলাখেলা নীরদ-বরণী,
মা লীলার ছলে কত রূপ ধর জননী।
সুরাসুর নিধনকালে, দুর্গামূর্তি ধরেছিলে,
মহিষাসুরে নিধন করলে মহিষমর্দিনী।
মা শিব অংশে জন্ম যে তাঁর পুরাণে শুনি॥
কালকেতুকে ছলবার তরে
গোসাপ হয়ে ছিলি মা প'ড়ে,
কালিদহের শ্রীমন্তের তরে কমলে কামিনী।
সিংহলেতে সেজেছিলি নিজে ব্রাহ্মণী॥
শিবকে ছলিবার তরে
গিয়েছিলি কুচবিহারে,
জাল ফেলে মাছ ধরেছিলি সেজে বাগ্‌দিনী।
দিলি মাছের হাঁড়ি শিবের মাথায় শিবগৃহিণী॥

আমরা পূর্বেই বলেছি, গানটি নীলকণ্ঠ তাঁর 'প্রভাস-যজ্ঞ' পালায় গ্রথিত করেছিলেন। পুরাণ এবং লোকসংস্কৃতির বেশ কয়েকটি উপাদান গ্রহণ করে এই শ্যামাসঙ্গীতটিতে নীলকণ্ঠ একটি অপূর্ব রস সঞ্চার করেছেন— ভক্তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রূপে শক্তিমাতাকে প্রত্যক্ষ করে অন্তরলোকে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে ধন্য হতে চেয়েছেন। মহিষমর্দিনী-রূপের বর্ণনা নীলকণ্ঠের আর কোনো শ্যামাসঙ্গীতে নেই। এইজন্যই এই সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি যে, নীলকণ্ঠ এই শ্যামাসঙ্গীতটিই শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন।

গান দুটি শুনতে শুনতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। সমাধির অতলান্ততা থেকে জাগতিক চেতনার স্তরে পৌঁছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করেছিলেন। নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁর চারিদিকে গান ও নৃত্য করতে লাগলেন। নূতন একটি গান ধরা হল 'শিব শিব'। এই গানটি গাওয়ার সময়ও ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে আবেগ-বিহ্বল হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছিলেন। ভক্তির প্রগাঢ়তার সঙ্গে শিশুর সারল্য একত্রে মিশে থাকলেই এই ধরনের নৃত্যবিহ্বল রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

নীলকণ্ঠের রচিত শিব-সম্পর্কিত কয়েকটি গানই আমরা সংগ্রহ করেছি। সেগুলির মধ্যে একটি গানের আরম্ভ এইরূপ—

জয় জয় শিব ত্রিগুণধারী, সৃজন পালন নিধনকারী,
ত্রিপুরান্তক ত্রিপুরহারী, ত্রিপুরপতি তিমিরনাশন।

গানটির মাঝখানে আছে—

জয় জয় শিব ভাবী ভাবক,
করুণাযুত নয়নে পাবক।

জীব শিবদানে ত্বরিত ধারক,

যাবক জিত যুগল চরণ॥

আমাদের মনে হয়, নীলকণ্ঠ এই গানটিই শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়ে তাঁকে ভাববিহ্বল করে তুলেছিলেন।

গানটি শেষ হলে ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বললেন— 'আমি আপনার সেই গানটি শুনব, কলকাতায় যা শুনেছিলাম।' মাষ্টার স্মরণ করিয়ে দিলেন গানটির কথা— 'শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নব নটবর, তপত কাঞ্চন কায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ গানটির প্রথম ছত্রটি শুনে উল্লসিতভাবে সম্মতি জানালেন। স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে গিয়ে কলকাতার হাটখোলায় হয়ত ঠাকুর নীলকণ্ঠের এই গানটিও শুনেছিলেন। এই গানটিই পূর্বে আর একবার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সকাল বেলা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নীলকণ্ঠের দেশের একজন বৈষ্ণব এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। গানটি নীলকণ্ঠের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই গানটির সঙ্গেও 'প্রেমের বন্ধে ভেসে যায়' ধুয়া ধরে নীলকণ্ঠ ও অন্যান্যের সঙ্গে ঠাকুর নেচেছিলেন। সেই গানের সঙ্গে নৃত্যশীল অবস্থায় সুন্দর আখরও যোগ করেছিলেন। অল্প দূরে উত্তরের বারান্দায় কয়েকজন ভক্তিমতী নারী এই অনুপম দৃশ্য ভাবোদ্বেল হৃদয়ে দেখছিলেন। প্রান্তবাহিনী ভাগীরথী-বুকের নৌকাযাত্রিগণও এই অপরূপ ভক্তিসঙ্গীতের মাধুর্যধারায় অভিসিঞ্চিত হচ্ছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীম মন্তব্য করেছেন, 'ঘরটি যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে।'[৪] নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে মোট চারটি গান শুনিয়েছিলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠমহিমায় সেদিন পরমহংসদেবের পুণ্যগৃহে সুরঝংকৃত এক দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

গান এবং নৃত্যের পর নীলকণ্ঠ ঠাকুরের সঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় এসে বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। কোজাগরী পূর্ণিমার পরদিনের এই সন্ধ্যা; অনাবিল জ্যোৎস্নার রজত-নির্ঝরে পরিপ্লাবিত চতুর্দিক। জ্যোৎস্নামাখা দিনাবসানের এই প্রসন্ন পরিবেশে একটি ভক্ত-হৃদয়ের কবি-মানুষ অন্য একজন লোকোত্তর মহাপুরুষের পুণ্য সান্নিধ্যে এসে এক অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। নীলকণ্ঠ কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করলেন। ঠাকুর তাঁকে সহাস্যে বললেন. 'তুমি কত লোককে পার করছ — তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্ছে।' উত্তরে নীলকণ্ঠ মৃদুস্মিত মুখে বললেন, 'পার করছি বলছেন। কিন্তু আশীর্বাদ করুন, যেন নিজে না ডুবি।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে মধুর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি ডোবো তো ঐ সুধাহ্রদে!' পরমহংসদেব এই স্বল্প কথা-কয়টিতে চির আনন্দময় অমৃতহ্রদের ইঙ্গিত যেন দিলেন সেই সাধক যাত্রাকারকে। ঠাকুরের প্রতিটি কথাই উপমা-প্রয়োগের কুশলতায়, অধ্যাত্ম-উপলব্ধির গভীরতায়, কখনো বা কৌতুকরসের হৃদ্য স্পর্শে সৃষ্টিধর্মী। নিজে কিছু না লিখেও এই দিক দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের রাজ্যে রসস্রষ্টার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। একদিকে তিনি অধ্যাত্মরাজ্যের দিশারী, অন্যদিক দিয়ে ঐ আত্মিক-নির্দেশ দিতে গিয়েই তিনি চিরস্মরণীয় কথাকোবিদ। নীলকণ্ঠের সঙ্গে সংলাপেও তাঁকে ঐ রসস্রষ্টার আনন্দভূমিতেই প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি নীলকণ্ঠকে কাছে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছিলেন সেদিন।

কীর্তনান্তে ঠাকুর যখন ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসে নীলকণ্ঠের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন নীলকণ্ঠ হঠাৎ বলে উঠলেন— 'আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ।' ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ

---

৪ গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গানটির পূর্ণরূপ শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৪র্থ ভাগ (৭ম সং), ৪১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে বলে এখানে আমরা গানটি আর উদ্ধৃত করিনি।

এর উত্তরে যা বলেছিলেন তাও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। ঠাকুর বলেছিলেন —'গঙ্গারই ঢেউ। ঢেউয়ের কথনো গঙ্গা হয়?' এখানেও এক অনুপম উপমা। নীলকণ্ঠ তারপরেও বলেছিলেন,—'আপনি যাই বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখছি।' ঠাকুর এর উত্তরে একেবারে মূলের তত্ত্বকে টান দিয়ে ভাবঘন কণ্ঠে বলেছিলেন,— 'বাপু, আমার "আমি" খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না।' মর্মের গভীরে যার মূলের উপলব্ধি, তিনি নিজের 'আমি'কে খুঁজে পাবেন কি করে? তিনি তো খুঁজতে আসেননি; নিজের খোঁজার সমাপ্তি ঘটিয়ে খোঁজাতে এসেছেন। নীলকণ্ঠ সেদিন এসেছেন সেই খোঁজার আধিকারিকের পদপ্রান্তে।

ঠাকুরও সাধককবি নীলকণ্ঠকে সেদিন গান শুনিয়েছিলেন। গান আরম্ভ করার ঠিক পূর্বমূহূর্তে তিনি কণ্ঠ মহাশয়কে বললেন,— 'তোমার এখানে আসা!—যাকে অনেক সাধ্যসাধনা করে তবে পাওয়া যায়!'[৫] জহুরী জহর চিনতে পেরেই প্রাণ খুলে এই কথাগুলি উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। গান ধরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—

গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।—
পূজে গণপতি, পেলাম হৈমবতী
যাও হে গিরিরাজ, আন গিয়ে গৌরী॥

গানটি গেয়েই যাত্রাওয়ালাদের তিনি গান শুনাচ্ছেন বলে হেসে উঠলেন। হাসলেও তিনি এ-কথা জানতেন যে, তিনিই আসল রসের ভাণ্ডারী। এইজন্যই তিনি যেমন গান শোনেন, তেমনি গায়ককেও গান শোনান। আনন্দরূপের প্রতি-মুহূর্তের ধ্যানে তাঁর চিত্তলোক যে গানে ও সুরে ভরা!

ভক্তিরসের রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো কখনো গানের রসের মধ্য দিয়েই হৃদয়ের গহন গভীর ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করেছেন। তিনি জানতেন, রসস্বরূপকে রসের বোধ ও বোধির মধ্য দিয়েই প্রকাশ করলে হৃদয়কে একেবারে উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়। এইজন্যই উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক-গায়ককে একান্ত সান্নিধ্যে পেয়ে তিনিও বালকের মত গানে মেতে উঠেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যেও এই একই হৃদয়ধর্মকে লক্ষ্য করা যায়। তিনিও গানের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের ভক্তির আবেগকে প্রকাশ করতেন; এবং মহা-প্রেমের আবেগ-বিহ্বলতায় যখন বাহ্যতঃ জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে থাকতেন, তখনও স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর ভক্তিসঙ্গীত শুনে পুনর্বার ফিরে আসতেন মানুষী-চেতনার মধ্যে। নীলকণ্ঠ এইজন্যই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ বলেই মনে করেছিলেন। সত্যের যাঁরা যথার্থ বার্তাবাহক তাঁদের এমনি লৌকিক এবং অলৌকিকতার রহস্যময় পথ ধরেই পদচারণা চলে।

নীলকণ্ঠ চলে আসার সময় ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, 'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই, তার পুরস্কার আজ হলো।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'কোনো জিনিস বেচলে এক খামচা ফাউ দেয়—তোমরা ওখানে গাইলে, এখানে ফাউ দিলে।' সকলে কলস্বরে হেসে উঠলেন এই কথা শুনে। নীলকণ্ঠের ভক্তিরসাশ্রয়ী গান শুনে এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের সময় নির্মল কৌতুক ও হাসি মিশিয়ে দিয়ে পরমহংসদেব তাঁর পবিত্র ঘরখানিতে সেদিন কয়েকটি অপরূপ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিলেন। আর বিদায়ের সময়ও নির্মল হাস্যরসের ঝর্ণাধারায় অভিসিঞ্চনের সঙ্গে সঙ্গে আশীর্বাদ দানে সাধক-কবি নীলকণ্ঠকে ধন্য করেছিলেন। নীলকণ্ঠের বয়স

---

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ, (৭ম সং), পৃঃ ২১১

তখন ৪৩ বৎসর ৩ মাস ; এবং ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের ১ বৎসর ১০ মাস পূর্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির অল্পকাল পূর্বে তাঁর সঙ্গে রাঢ় দেশের বহুখ্যাত একজন ভক্তগায়কের এই মধুর মিলনের চিত্রটিকে অন্যান্য বহু পুণ্য-মিলনের মতই মহাকাল যে বাঙালীর ইতিহাসে চিরদিনকার অম্লান রঙে অঙ্কিত করে রাখবেন, এ-বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যে মা : শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং ৩১।১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড. কলিকাতা ৯। (১৯৭৩), পৃঃ ৯০, মূল্য চার টাকা।

সাহিত্যের সৃজন ও সমালোচন—এ দুইই যখন একই প্রতিভার নিপুণ পারদর্শিতার সাক্ষ্য দেয়, তখন সারস্বত আসরে তা বিশেষ সম্মানের দাবী রাখে। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের সেই বিরল প্রতিভাবানদের একজন, যাঁর অন্তর্লোকে বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব জগৎটি আপন লাবণ্যে সৌরভে ও সহ-মর্মিতায় পরিপূর্ণভাবে ধরা দিয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যে মা' গ্রন্থটি বাঙালী হৃদয়ের গভীরতম মন্ত্র-বাণী— 'মা'-ডাকের কাব্যময় গদ্যসৃষ্টি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে চয়ন করে বাংলার ব্রতপার্বণে, ছড়ায়, রূপকথায়, গীতিকায়, পদাবলীতে, শাক্তসঙ্গীতে, চৈতন্য-চরিত-সাহিত্যে, মঙ্গলকাব্যে যে মায়ের হৃদয়ের নিয়ত প্রকাশ ঘটেছে, তাকে ভাবাশিল্পের সূক্ষ্ম সুচারু মৃদুতায় লেখক অবিস্মরণীয় রূপ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এতে তাঁর গবেষণাপ্রবণ তথ্যানুসন্ধানী দৃষ্টি সহায়ক হলেও এখানে যা পরিবেশিত হয়েছে তা রূপে রসে পূর্ণাঙ্গ দশটি অধ্যায়ের দশটি কবিতা, তবে সংস্কৃতে 'কাব্য' শব্দটির ব্যাপক ব্যঞ্জনায় কবিতা।

মানবজন্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃস্নেহে— যে স্নেহ ঈশ্বরস্নেহেরই পার্থিব রূপ। তাই শুধু বাংলার মায়েদের হৃদয়কথাই যে স্মরণীয় তা নয়, পৃথিবীর সব মায়েরাই মূলতঃ এক। কিন্তু বাঙালীর সমাজ-জীবনে ও পারিবারিক চেতনায় মায়ের যে অনন্য-ভূমিকা, তা-ই তার ঈশ্বরচেতনাকেও মাতৃময় করে তুলেছে। কোনো সন্দেহ নেই, অপার স্নেহ ও স্নেহজনিত শঙ্কাতেই এ মাতৃত্বের প্রধান পরিচয়। তবু এ স্নেহই যে আমাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে প্রবুদ্ধ করেছে— সেকথাও সমান সত্য ; এর আতিশয্য আমাদের যতটা দুর্বল করেছে, এর সর্ব-ব্যাপিতা তার চেয়ে আমাদের অনেক বেশী শক্তি-মান করেছে। মায়ের স্নেহ আমাদের শুধু যে 'বাঙালী' করেছে, একথা অর্ধসত্য। আমাদের বাঙালীজাতের যা কিছু মনুষ্যত্ব, তার মূলেও আমাদের মায়েরা— এইটি সত্যের সম্পূর্ণতা। (বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দের মায়ের কথা মনে করুন।) এ প্রসঙ্গে 'কথামুখে' (পৃঃ ৫-৬) লেখকের মন্তব্য সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য।

বইটির সূচনায় বাংলা ছড়ার একটি উদ্ধৃতি— "দুনিয়ার সার। ভালবাসা মার।"। সমগ্র বইটির মূল বক্তব্য ঐখানেই। তবু লেখকের অনবদ্য বিশ্লেষণের মণি-মুক্তা থেকে কিছু কিছু সম্পদ পাঠকদের উদ্দেশে তুলে দিই, যাতে তাঁর নিজস্ব ভূমিকাটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ জাগে।

"এ দেশের মায়ের কথা মনে হলেই চোখের

সামনে ভেসে ওঠে এ দেশের প্রকৃতির ছবি। বাংলার মা বঙ্গ-প্রকৃতির প্রতিকৃতি।…মায়ের মুখ যেন উদার আকাশ, চোখ দুটি জোড় কমল, বুকে গঙ্গা-মধুমতীর ধারা। বাংলার মাটির মিষ্টি গন্ধ দিয়ে গড়া বাঙালী মায়ের চিন্ময়ী রূপ।"

(কথামুখ— পৃঃ ১)

"এ দেশের সন্ধ্যার আকাশে পাতলা মেঘের উপর অস্তসূর্যের সাতরঙা আলো ঠিকরে পড়ে। ফলে অসংখ্য বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। তেমনই বাংলার মায়েদের স্নেহপূর্ণ হৃদয়টিতে নানা ভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে শত শত অভিনব ভাবের মূর্তি গড়ে ওঠে। বাংলার কাব্য-সাহিত্যে এই মাতৃভাবের বিচিত্র রূপ ছড়ানো রয়েছে।"

(কথামুখ—পৃঃ ৭)

"এ দেশের সাহিত্যে মাতৃ-মূর্তির ক্রমবিকাশের একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। উষা ও প্রভাত যেমন একই প্রাতঃসন্ধ্যার দুই রূপ, তেমনই একই মায়ের দুটি রূপ ফুটে উঠেছে বাংলার ব্রতে ও ছেলেভুলানো ছড়ায়। ব্রতে সন্তানকামনায় উন্মুখ মায়ের ব্রতচারিণী মূর্তি। এ যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে শুভ্রজ্যোতি পূর্বাশার তপস্যা। এই তপস্যার ফলে ক্রমে অরুণ আভা জাগে, বাল সূর্য উদিত হয়। তখন আলোয় উদ্ভাসিত কলকাকলিতে মুখরিত প্রভাত। এইটেই ছড়ার জননী মূর্তি।"

(ছেলেভুলানো ছড়ায় মা—পৃঃ ;৯)

"গ্রামগীতিকার মাতৃমূর্তি গ্রাম্যকবির স্বভাবকবিত্ব ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে আঁকা। গ্রামবাংলার মাটির গন্ধে, নদী-নালার রসে সে মূর্তিগুলি প্রত্যক্ষ, মধুর ও রসস্নিগ্ধ। মঙ্গলকাব্যের মা বিদগ্ধ কবিকল্পনার সৃষ্টি। বাস্তব হলেও কল্পনার হেমদ্যুতিতে তা লোকোত্তর। একটি বনফুল, অপরটি উদ্যানলতা। উপরন্তু মঙ্গলকাব্যের মা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে উত্তীর্ণ এক একটি নাটকীয় চরিত্র। এখানে বাৎসল্য সূর্যরশ্মিপাতে মৃত্তিকাদীর্ণ ভুঁই-চাঁপার মত বিকশিত।"

(মঙ্গলকাব্যে জননীমূর্তি— পৃ; ৭১)

এমন উদাহরণ এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কবির দৃষ্টি ও সমালোচকের রসগ্রাহিতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপে এ গ্রন্থকে মহনীয় করে তুলেছে। বাঙালীর জীবনচেতনায় এই মাতৃমূর্তির সুচির-প্রতিষ্ঠা-উপলব্ধির পরম সহায়করূপে এ গ্রন্থ আমাদের সকলেরই বার বার পঠনীয়। প্রচ্ছদসহ সমগ্র গ্রন্থটির প্রকাশনাও প্রশংসনীয়।

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য :

বাংলাদেশে বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাদ্য ও বস্ত্রাদি বিতরিত হয়।

ভারতে সেবাকার্য :

(১) **খরাত্রাণ :**

রায়পুর কেন্দ্র গত জুলাই মাসে (১৯৭৫) ১৪৭ কেজি শস্যবীজ বিতরণ করে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে'র শ্রমিকদিগকে ২,৫২০'৩৭ টাকা ও ২,৯৯২ কেজি খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়।

নওয়াপাড়া (ওড়িশা) কেন্দ্র ২০ অগস্ট পর্যন্ত চালু ছিল এবং ৩৩,২০০ কেজি গম ও ৮৫৫টি বস্ত্রাদি বিতরণ করে।

রাজকোট আশ্রম পরিচালিত Dhaneti লঙ্গরখানা ১২ই অগস্ট বন্ধ হয়। উক্ত কেন্দ্রের ১লা জানুআরি ১৯৭৫ হইতে বন্ধকাল পর্যন্ত কার্যবিবরণ : ২, ৫৬, ৫৮৮ জনকে খাওয়ান, ১০টি কূপ সংস্কার ; একটি কৃষককে বলদ কিনিতে ৬২৫ টাকা দান ; শস্যবীজ ৪৫ বস্তা, ২০ দিন ধরিয়া প্রত্যহ ৫০০ শিশুর মধ্যে শর্করা-মিশ্রিত দুধ ১০০ লিটার, পশমের কম্বল ১৪৫, রাজকোট শহরের ৩,১৮৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৩,০০০ কেজি গম ও শিশুদের পোশাক ৩০০— এইগুলির বিতরণ।

(২) **বন্যাত্রাণ :**

করিমগঞ্জ কেন্দ্র গত ৩০শে জুলাই বন্যাত্রাণ কার্য আরম্ভ করে। ১৩ই অগস্ট পর্যন্ত বিতরিত হয় : আটা ১,৩৫০ কেজি এবং বস্ত্রাদি ৫৮।

কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের কৃতিত্ব

পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ১৯৭৫ সালের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের জনৈক ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

কার্যবিবরণী

সেলম (তামিলনাড়ু) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৯ সালে এই আশ্রমের ভিত্তি স্থাপিত হয়, ১৯২৮ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও ১৯৪০ সালে মিশনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে ইহার স্বীকৃতি-লাভ। ইহার কর্মধারা দ্বিমুখী : ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার এবং জনসেবা।

ধর্ম ও সংস্কৃতি : মন্দিরে নিত্যপূজা আরতি ভজন প্রার্থনা এবং প্রতি রবিবারে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ও বাণীর আলোচনা ও গীতাদি অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ হয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনাদির ব্যবস্থাও করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি বিশেষ পূজা, কথা-কালক্ষেপম্, ভজন ও সাধারণ সভার মাধ্যমে পালিত হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের ও শ্রীরাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধাদি অবতার ও ধর্মসংস্কারকদের আবির্ভাব-তিথি আলোচনাদির মাধ্যমে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান যথা, প্রতি একাদশীতে রামনাম, শিবরাত্রি, নবরাত্রি প্রভৃতি যথাবিধি পালিত হয়। শনিবারে সারদা বাল মন্দিরের বালক-বালিকারা এবং বুধবারে ভক্ত মহিলাগণ ভজন গান করেন।

আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৯. ৮. ৭২ তারিখে আশ্রমে শুভাগমন করেন।

২২শে সান্ধ্য আরাত্রিক ও প্রার্থনার পর তিনি উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং ২৪শে বিবেকানন্দ বীণা নিলয়মের ও সারদা কলেজের ছাত্রী ইউনিয়নের উদ্বোধন করেন।

আশ্রম গ্রন্থাগারে ইংরাজী, তামিল, তেলেগু, মালয়লাম, কানাড়া এবং হিন্দী ভাষায় পুস্তক আছে। ১৯৭২ এর মার্চে মোট পুস্তক-সংখ্যা ছিল ১,৪০০।

জনসেবা: (ক) দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে ৭১,১৯২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়, তন্মধ্যে নূতন রোগী ছিল ৩৫,৩৭০ জন। অন্তর্বিভাগে ৮টি শয্যা আছে। চিকিৎসালয়ে শল্যবিভাগ ও চক্ষুচিকিৎসা বিভাগের সহিত দাঁতের চিকিৎসার জন্যও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইয়াছে। কিছু কিছু দুঃস্থ রোগী ও অপুষ্ট শিশুকে প্রত্যহ বিনামূল্যে দুধ দেওয়া হইয়াছে।

(খ) গত ১৯৭২ ডিসেম্বরের বন্যাত্রাণ কার্যে আশ্রম ২,১৩১ টাকা, প্রায় ৫০০০ নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরণ করে এবং স্থানীয় শ্রীসারদা কলেজ কর্তৃক পরিচালিত বন্যাত্রাণ কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা করে।

আশ্রম কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের উন্নতির জন্য এবং আশ্রম কর্মিভবনের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট ৩,৭৫,০০০ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন।

নূতন দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭২-৭৩-এর কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনা-বক্তৃতাদির মাধ্যমে জন-মানসে অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির প্রচার ও সেবাই এই আশ্রমের কার্যধারা। আলোচ্য বর্ষের কার্যবিবরণী সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল:

ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার: আশ্রমে নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা; সপ্তাহে তিন দিন হিন্দী, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় যথাক্রমে রামচরিত-মানস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও উপনিষদাদির পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতাদি নিয়মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দিল্লীর বিভিন্ন স্থানের ভক্ত সমাবেশে ও বহির্দিল্লীতে যথা, আগ্রা চণ্ডীগড মীরাট প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতাদি এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত সমিতিতে প্রতি রবিবার বক্তৃতা ও আলোচনাদি হয়। বিভিন্ন ধর্মের অবতার-পুরুষদের পুণ্য জন্মদিন পালিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর শুভ জন্মতিথি আশ্রমে ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে মহাসমারোহে পালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরাজীতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। মোট ১,৭৪৭ জন ছাত্রছাত্রী ইহাতে যোগদান করে এবং ১৭২টি পুরস্কার বিতরিত হয়।

দাতব্য চিকিৎসা: আশ্রম পরিচালিত যক্ষ্মা চিকিৎসাকেন্দ্রের অন্তর্বিভাগে দুধ, জলখাবার ও দামী ঔষধপত্রও উভয়বিভাগের রোগীদের ১,৬৬১ জনকে বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ২,৫৪৯, তন্মধ্যে ১,৬৭৯ জন নূতন। আঞ্চলিক যক্ষ্মা-সমিতির একটি গৃহ-চিকিৎসা ইউনিট আশ্রমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কাজ করে। এতদ্ব্যতীত ২১৫ জন আন্তর্বিভাগের রোগীকে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে রাখিয়া চিকিৎসা করা হয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিভাগে ৭৮,০১১ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে ৬,২১৭ জন নূতন।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার: আশ্রমের নিঃশুল্ক পুস্তকালয় ও পাঠাগারের ব্যবহার প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। দৈনিক উপস্থিতি গড়ে ৩৮৯ জন। আলোচ্য বৎসরে ১,০৬০ নূতন পুস্তক সহ মোট পুস্তকের সংখ্যা ছিল ২৬,০১৪।

২১,৪৫৮টি বই পড়িবার জন্য দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিচালিত গ্রন্থাগারে ৩০৭ জন ছাত্র ও ২৪৫ জন ছাত্রী সদস্য হয়। বর্ষশেষে এই বিভাগের পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৩,৬৩৯। ছাত্রছাত্রীদের গড়পড়তা দৈনিক উপস্থিতি ছিল ১৩৬।

সারদা মহিলা সমিতি ও সারদা মন্দির: সারদা মন্দির ৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিবার সাপ্তাহিক বিদ্যালয়। প্রতি রবিবার সকাল ৯টা হইতে ১০টা পর্যন্ত গড়ে উপস্থিত ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রার্থনা ধ্যান ভজন ও নীতিগর্ভ গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সারদা মহিলা সমিতির সভ্যাগণের সহায়তাতেই এই বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। উক্ত সমিতির সভ্যাগণ প্রতি মাসে একটি ভজন-সঙ্গতি ও ২টি পাঠচক্র পরিচালনা করেন। লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সারদা-সমিতির রোগি-কল্যাণমূলক সেবাকার্য পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় অব্যাহত ছিল।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী দিব্যাত্মানন্দ** গত ১৯শে অগস্ট (১৯৭৫) সকাল ৯.২০ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মধুমেহ সহ বৃক্ক-বৈকল্যের ফলে দেহত্যাগ করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগ দেন এবং ১৯২৯ সালে স্বীয় গুরুর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি জামতাড়া পোনমপেট দেওঘর বাগেরহাট কনখল কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং পুরুলিয়া কেন্দ্রের কর্মিরূপে সংঘ-সেবা করেন। কিছুকালের জন্য তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন। তিনি কয়েকখানি বাংলা বইও লিখিয়াছেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

পূর্ণিয়া (বিহার) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৫ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মঙ্গলারতি উষাকীর্তন পূজা হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় স্বামী অকামানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন।

পরদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় পূর্বোক্ত বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী অকামানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, প্রধান অতিথি শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ ও সভাপতি শ্রীবি. কে. সিংহ। প্রধান অতিথি আশ্রমের ছেলেদের মুষ্টিভিক্ষার পারিতোষিক বিতরণ করেন।

১০ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত ৺শ্রীশ্রীবাসন্তী-দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নবমী পূজার দিন অপরাহ্ণে পাঁচ হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

২৩শে জুলাই শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি হয়। সন্ধ্যায় স্বামী অনুপমানন্দ ভাষণ দেন।

মুদ্রণ-প্রমাদ

এই সংখ্যার ৪৫৮ পৃষ্ঠায় কবি-পরিচিতিতে এবং ৪৬০ পৃষ্ঠায় প্রথম কবির পরিচিতিতে 'সু' এই প্রথম অক্ষরটি ছাপিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে। উভয়ত্র 'প্রসিদ্ধ' স্থলে 'সুপ্রসিদ্ধ' পড়িতে হইবে।

দিব্য বাণী

সশৈলবনধাত্রীণাং যথাধারোঽহিনায়কঃ।
সর্বেষাং যোগতন্ত্রাণাং তথাধারা হি কুণ্ডলী ॥
সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ ॥
প্রাণস্য শূন্যপদবী তদা রাজপথায়তে।
তদা চিত্তং নিরালম্বং তদা কালস্য বঞ্চনম্‌ ॥
সুষুম্না শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ।
শ্মশানং শাম্ভবী মধ্যমার্গশ্চেত্যেকবাচকাঃ ॥

—হঠযোগপ্রদীপিকা, ৩।১-৪

শৈলবনরাজি-সমন্বিতা ধরা—বাসুকি আধার তার ;
সর্পী কুণ্ডলিনী তেমতি সকল যোগের আধার সার।
শ্রীগুরু-প্রসাদে সুপ্তা কুণ্ডলিনী জাগরিতা যবে হন ,
পদ্ম উর্ধ্বমুখ—গ্রন্থিনিচয়ের হয় তবে বিমোচন।
প্রাণের কুটিল 'শূন্যপদবী' যে রাজপথ সম হয়
সাধকের চিত আলম্বনহীন—দূরে যায় যমভয়।
'শূন্যপদবী' বা 'শ্মশান' 'শাম্ভবী' 'সুষুম্না' নামে যে নাড়ী—
'ব্রহ্মরন্ধ্র' নাম, 'মধ্যমার্গ' নাম, 'মহাপথ' নাম তারি।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা ৵বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতেছি।

সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই।

সুষুম্না ও কুণ্ডলিনী

(১)

ভারতের তথা বিশ্বের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে ভাষ্যসহ শুক্লযজুর্বেদের একটি মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। মন্ত্রটির আদ্য পদ-- 'সুষুম্নঃ'। ভাষ্যকার মহীধরের ব্যাখ্যা মনঃপূত না হওয়ায় স্বামীজী বলিলেন, ভাষ্যকার সুষুম্নার যে-ব্যাখ্যাই করুন না কেন, পরবর্তী কালে তন্ত্রাদিতে দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্না-নাড়ী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহারই বীজ ঐ বৈদিক মন্ত্রে নিহিত রহিয়াছে।

স্বামীজীর উপরি-উক্ত কথা হইতে এবং সুষুম্না ও কুণ্ডলিনী বিষয়ক সাহিত্য হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, বৈদিক ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর-তন্ময়তার ফলে মেরু-দণ্ডের অভ্যন্তরস্থ একটি বিশেষ নাড়ী সক্রিয় হইয়া উঠে এবং প্রাণের প্রবাহ এই নাড়ীপথে যতই উর্ধ্বগামী হয়, ততই অতীন্দ্রিয় দিব্যানুভূতি-সমূহ উপস্থিত হইতে থাকে এবং এই নাড়ীটিকে সেই সুদূর অতীতেই তাঁহারা সুষুম্না নামেই অভিহিত করিয়াছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণ-সূক্তেও সুষুম্না নাড়ীর কথা পাওয়া যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে, মন উক্ত নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইলে সর্বজগদাধার ব্রহ্ম অনুভূত হন।

ছান্দোগ্য এবং কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে, হৃদয় হইতে নিঃসৃত একশত একটি নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে একটি নাড়ী মস্তক অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। এই নাড়ীর দ্বারা উর্ধ্বে গমন করিয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে। বিভিন্ন দিকে প্রসারিত অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণ সংসারপ্রাপ্তির কারণ হয়। আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে অমৃতত্বপ্রাপিকা এই বিশেষ নাড়ীটিকে সুষুম্না নামেই অভিহিত করিয়াছেন। যদিও মেরুদণ্ডের শেষে অবস্থিত মূলাধারই সুষুম্না নাড়ীর উৎস, তথাপি নাভিচক্র ভেদ না হইলে দেবভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ হয় না এবং হৃদয় হইতেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি শুরু হইয়া থাকে। মনে হয় এই কারণেই উপনিষদের ঋষি— সুষুম্না হৃদয়েরই নাড়ী— এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে উল্লেখিত হৃদয়পদ্মরূপ প্রাসাদ ও হৃদয়ের নাড়ীসমূহের বিবরণও অনুধাবনীয়।

গীতার অষ্টম অধ্যায়েও এই সুষুম্না নাড়ীর কথা আছে। বলা হইয়াছে প্রাণকে ভ্রূমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেহত্যাগ করিলে যোগী সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। এখানেও শ্রীধরস্বামী আনন্দগিরি কেশব কাশ্মীরী মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি টীকাকারগণের অভিমত এই যে, ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকটিতে সুষুম্না নাড়ীরই উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য শংকরও 'ভূমিজয়ক্রমে'ই যে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে প্রবিষ্ট করিতে হয়, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে যে চক্রগুলি রহিয়াছে প্রাণ-প্রবাহের দ্বারা সেইগুলিকে ভেদ করাই হইল ভূমিজয়। মধুসূদন সরস্বতী ভ্রূমধ্যকে সরাসরি 'আজ্ঞাচক্র' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাণকে যে ঐ চক্রে গুরু-উপদিষ্ট প্রণালীতেই স্থাপিত করিতে হয়, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন।

তন্ত্রে, শাণ্ডিল্যাদি কয়েকটি অপ্রধান উপনিষদে এবং শিবসংহিতা ঘেরণ্ডসংহিতা হঠযোগপ্রদীপিকা প্রভৃতি যোগগ্রন্থে সুষুম্না নাড়ী ও কুণ্ডলিনীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এই সকল গ্রন্থ সর্বাংশে সহজবোধ্য নয়। উপরন্তু অনেকক্ষেত্রেই অত্যন্ত অসাবধান অনুবাদ সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে বিভ্রান্তিজনক।

শাক্তসঙ্গীতেও আমরা কুণ্ডলিনী ও ষট্‌চক্রের কথা পাই। সেগুলি উপরি-উক্ত তন্ত্র- ও যোগ-গ্রন্থে বিবৃত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি মাত্র, সুতরাং রূপকের ভাষায় লিখিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই অনেকস্থলে দুর্বোধ্য। প্রাচীনতম বাংলাভাষায় লিখিত বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণের চর্যাগীতিতে 'সন্ধ্যা'-ভাষায় গঠিত 'বঙ্গড়ী' 'ডোম্বী' 'পুলিন্দা' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সুষুম্না নাড়ীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যেও সুষুম্না ও কুণ্ডলিনী বিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। ইহা বর্তমান যুগের সাহিত্য এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদাদেবী ও তাঁহাদের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসঞ্জাত কথায় সমৃদ্ধ। সুতরাং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরোক্ষভাবে যতদূর জ্ঞান সঞ্চয় করা যাইতে পারে, তাহা আমরা অতি সহজেই এই সাহিত্য হইতেই পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব বলিতেন: জ্ঞান হইবার দুইটি লক্ষণের একটি হইতেছে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ; কুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না—বসিয়া বসিয়া বই পড়িয়া যাইতেছি, বিচার করিতেছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, ইহা জ্ঞানের লক্ষণ নহে। শুধু পুঁথি পড়িলে চৈতন্য হয় না—ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়। ব্যাকুল হইলে তবে কুণ্ডলিনী জাগেন। কুণ্ডলিনী না জাগিলে চৈতন্য হয় না। শুনিয়া বা বই পড়িয়া জ্ঞানের কথা বলা অতি অকিঞ্চিৎকর। তিনি আরও বলিয়াছেন: কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হইলেই ভাব ভক্তি প্রেম এই সকল হয়—ইহারই নাম ভক্তিযোগ। মূলাধারে কুণ্ডলিনী। চৈতন্য হইলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ইত্যাদি চক্র ভেদ করিয়া শেষে শিরোমধ্যে গিয়া পড়েন। ইহারই নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়। সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়াই সাধনার শেষ কথা। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজিতা।

কথামৃতে এবং বিশেষতঃ লীলাপ্রসঙ্গের গুরু-ভাব পূর্বার্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুণ্ডলিনী সম্পর্কে বহু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। উপরে আমরা উহারই কেবলমাত্র দুই-একটি কথার উল্লেখ করিলাম। লীলাপ্রসঙ্গে ষট্‌চক্রভেদ বিষয়ক যে-সকল কথা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন অনেক কথাই আমরা পাই, যাহা অনুধাবন করিলে গ্রন্থকারেরই স্বকীয় অনুভূতি যে উহাতে প্রতিফলিত, ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। অনুভূতি ব্যতিরেকে ঐ ধরনের নূতন আলোকসম্পাত কখনও সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকার নিজেও এক-সময়ে বলিয়াছিলেন যে, উক্ত গ্রন্থে তিনি এমন কিছু তত্ত্ব পরিবেশন করেন নাই, যাহা তাঁহার উপলব্ধির অগম্য।

স্বামী বিবেকানন্দের 'Six Lessons on Raja

Yoga'-এ ('সরল রাজযোগ'), 'রাজযোগ'-গ্রন্থে ও অন্যান্য বক্তৃতায় এবং 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' আদি কথপোকথনে কুণ্ডলিনী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দৃষ্ট হয়। স্বামীজী শুধু তাত্ত্বিক দিক হইতেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেন নাই, প্রয়োগাত্মক দিক হইতেও, অর্থাৎ কিভাবে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে তাহারও পদ্ধতিবদ্ধ নির্দেশ দিয়াছেন।

(২)

গীতায় যাহাকে 'প্রাণ' বলা হইয়াছে, আচার্য শংকর তাহাকেই 'পবন' বলিয়াছেন ('পবনেন সাকং বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে'— আমার মন পবনের সহিত বিষ্ণুপদে বিলীন হয়।), হঠযোগ-প্রদীপিকা ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাকেই 'মারুত' বলা হইয়াছে, বাউল সাধকগণ তাহাকেই 'হাওয়া' বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাহাকেই 'মহাবায়ু' বলিয়াছেন। এইগুলি একই পরিভাষা।

অন্যদিকে কুণ্ডলিনীশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'আদ্যাশক্তি' বলিয়াছেন; স্বামীজী 'বিদ্যারূপিণী মহামায়া' বলিয়াছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছেন: 'কুণ্ডলিনী হইতেছেন আত্মার জ্ঞানশক্তি। চৈতন্যময়ী, ব্রহ্মময়ী ইত্যাদি নামে তিনি প্রতি জীবের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন।' তন্ত্রাদি গ্রন্থেও এই সকল অভিধা দেখিতে পাওয়া যায়। হঠযোগপ্রদীপিকায় কুণ্ডলিনীর পর্যায়বাচক সাতটি শব্দের মধ্যে 'ঈশ্বরী' ও 'শক্তি' এই দুইটি নামও পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত দুই প্রকার অভিধা দেখিয়া স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে: তাহা হইলে কুণ্ডলিনী কি ভৌতিক বায়ু— স্নায়ুপ্রবাহ মাত্র? অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী ও মহাবায়ু কি এক? ইহা বিতর্কমূলক প্রশ্ন। তবে মনে হয় এইরূপ বলা অসমীচীন হইবে না যে, তাত্ত্বিক দিক দিয়া মহাবায়ু বা স্নায়ুপ্রবাহ এবং কুণ্ডলিনী এক কি না তাহাতে তর্কের অবকাশ থাকিলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহারা পর্যায়বাচী শব্দ এবং উহাদের সমীকরণ আমাদের ধর্মসাহিত্যে, সঙ্গীতে ও ধর্মীয় আলোচনায় ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মনে হয় একদিকে যোগের পরিভাষা — প্রাণ, পবন, মারুত, মহাবায়ু ইত্যাদি এবং অন্যদিকে তন্ত্রের পরিভাষা আদ্যাশক্তি, মহামায়া, ব্রহ্মময়ী, চৈতন্যময়ী, ইত্যাদি একই কুণ্ডলিনী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হওয়ায় আমাদের উক্ত সংশয় উপস্থিত হয়। তবে তন্ত্রের দিক দিয়াও বলা যায়, আদ্যাশক্তিই যখন সব হইয়াছেন, তখন মহাবায়ুরূপেও তিনিই বর্তমান। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীকে দয়া শ্রদ্ধা ভ্রান্তি স্মৃতি তুষ্টি লজ্জা শান্তি তৃষ্ণা ক্ষান্তি ইত্যাদি মনোবৃত্তিরূপিণী বলিয়া স্তব করা হইয়াছে। সুতরাং সেই আদ্যাশক্তিই যে জীবদেহে প্রাণরূপে এবং প্রাণের বিভিন্ন ক্রিয়া-রূপেও বর্তমান, ইহা অনায়াসেই বলা যায়। প্রাণ ও মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও সকলেরই সুবিদিত।

(৩)

মিস্টিসিজ্‌ম্ বা মরমিয়াবাদের কথা প্রায়ই শোনা যায়। মিস্টিসিজ্‌মের মূলে এই কুণ্ডলিনী-জাগরণ। স্বামী তুরীয়ানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছেন: 'তিনি (কুণ্ডলিনী) যখন জাগেন, তখন জ্যোতি-দর্শন, দেবমূর্তি-দর্শন প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অনুভূতি সব হইয়া থাকে।'

কিন্তু কোনও মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি স্থায়ী হয় না, যদি না সাধক জিতেন্দ্রিয় হন। সাধনাবস্থায় এক-আধবার দিব্যদর্শনাদির মূল্য আর কতটুকু! 'অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্' – যাঁহাদের বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয় নাই সেই কুযোগীদের ঈশ্বরদর্শন হয় না। তাই সাধককে অবশ্যই রিপুজয় করিতে হয়। কিন্তু এমন কোনও সাধক নাই, যিনি জীবনে অল্পবিস্তর

রিপুসমূহের তাড়নায় বিব্রত হন নাই। রিপু-জয়েরও মোক্ষম অস্ত্র হইতেছে, নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর জাগরণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন: 'কুণ্ডলিনী চৈতন্য হলে রিপুটিপু কোথায় পড়ে থাকে। তখন মনেও হয় না যে, সে সব আছে।'

যাঁহারা কথামৃত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা —'কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তিটি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। যাঁহারা স্বামীজীর Raja Yoga-গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ে অবশ্যই —'The rousing of the Kundalini is the one and only way to attaining Divine Wisdom...' – এই কথাটি গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই স্বামীজী অন্যভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বামীজীর উক্তির মর্মার্থ আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই: জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ ইত্যাদি যে-পথই সাধক অবলম্বন করুন না কেন, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ না হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব—কুণ্ডলিনী-জাগরণ সকল সাধনমার্গেরই 'সামান্য'-ধর্ম; 'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।' এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় –'কুণ্ডলিনীর উত্থানকালে কেবল যোগীদিগেরই কি চক্রস্থিত পদ্মসকল প্রস্ফুটিত হয়, ভক্তদিগের হয় না?'—জনৈক জিজ্ঞাসুর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছিলেন 'ভক্তদিগেরও হয়'।

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যগণের এই সকল উক্তির সহিত পরিচিত হইলে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, কুণ্ডলিনী শক্তিকে কিভাবে জাগ্রত করা যায়।

কুণ্ডলিনীকে জাগাইবার উপায় সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'রাজযোগ'-গ্রন্থে বলিয়াছেন: 'কুণ্ডলিনী-জাগরণের অনেক উপায় আছে—কাহারও ভগবৎপ্রেমবলে, কাহারও বা সিদ্ধ মহাপুরুষগণের কৃপায়, কাহারও বা সূক্ষ্ম জ্ঞানবিচারের দ্বারা।' যোগের দ্বারা অর্থাৎ নাড়ীশুদ্ধি, প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহায্যে কিভাবে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিতে হয়, তাহা স্বামীজী উক্ত গ্রন্থের 'অধ্যাত্ম প্রাণের সংযম'-শীর্ষক অধ্যায়ে এবং 'সরল রাজযোগে' বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশীয় শিক্ষার্থিগণকে স্বামীজী যোগের যে-প্রক্রিয়া শিখাইতেন, 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ'-গ্রন্থেও সেই প্রণালীই লিপিবদ্ধ দেখা যায়। তবে কিছু বিশেষ আছে—"বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, তাই সব জানতে পাচ্ছিস না। ঐ কুলকুণ্ডলিনীই হচ্ছেন তিনি। ধ্যান করবার পূর্বে যখন নাড়ীশুদ্ধি করবি, তখন মনে মনে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, 'জাগো মা, জাগো মা'।" শেষোক্ত কথাগুলিই বঙ্গসন্তান শরচ্চন্দ্রেরই জন্য; অবশ্য পৃথিবীর যে-কোন শাক্তের পক্ষেই উহা সাদরে গ্রহণীয়। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় 'শ্রীম'র প্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ: "গান ক'রে ক'রে একাগ্রতার সহিত গাইবে—নির্জনে গোপনে—

'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনি! তুমি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী,
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী'।"

স্বামীজীর উপদিষ্ট কুণ্ডলিনী-জাগরণ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহাতে তন্ত্র ও যোগের সমন্বয় ঘটিয়াছে। হুঁ মন্ত্র জপ, মাতৃ-সম্বোধনে কুণ্ডলিনীকে জাগিবার জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি তন্ত্র ও শাক্তভাবের কথা। আর নাড়ীশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সজোরে কুণ্ডলিনীর মস্তকে বায়ুর দ্বারা আঘাতের কল্পনা ইত্যাদি হঠযোগের অন্তর্গত। এই হঠযোগের পর স্বামীজী প্রত্যাহার ধারণা

ধ্যান ও সমাধির শিক্ষা দিতেন—এই চারিটিই রাজযোগের অন্তর্গত। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কুণ্ডলিনী-জাগরণের কোনও পদ্ধতিই গ্রন্থ দেখিয়া অভ্যাস করা উচিত নহে—স্বামীজীও রাজযোগের ভূমিকায় পাঠকবর্গকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট প্রণালী অনুযায়ীই সাধনা করিতে হয়, নতুবা বিপদের আশঙ্কা আছে।

নিরুপদ্রব ও সকলেরই পক্ষে নিরাপদ পদ্ধতি হইতেছে শ্রীভগবানের ধ্যান, নাম-জপ ও স্মরণমনন। এই বিষয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উক্তি অনুধাবনযোগ্য :

> কুণ্ডলিনী শক্তি ধ্যান জপ ইত্যাদির দ্বারাই জাগে। আর কেউ কেউ বলেন, ওর বিশেষ সাধনা আছে, তদ্দ্বারা জাগে। আমার বিশ্বাস জপধ্যানের দ্বারাই জাগে। কলিতে জপ-ধ্যানই প্রশস্ত। জপের মত সহজ সাধন আর নেই। * * * বাজে গল্পটল্প না করে সারাদিন তাঁর স্মরণমনন করবি। খেতে, শুতে, বসতে —সর্বক্ষণ। এইরূপ করলে দেখবি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগবে। মায়ার পরদা একটার পর একটা খুলে যাবে। নিজের ভিতরে যে কি অদ্ভুত জিনিস আছে দেখতে পাবি।

(৫)

অনেকের ধারণা কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলেই 'কেল্লা ফতে' হইয়া গেল—কুণ্ডলিনী আপনা আপনিই এক এক চক্র ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বগামিনী হইবেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না এবং যেরূপ সাধনা, সেইরূপই সিদ্ধি। ইহা অবশ্য সত্য যে, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে সাধকের মন সুষুম্নামার্গের সহিত পরিচিত হয়। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় পাওয়া যায়, কুণ্ডলিনী জাগিবার পূর্বে অনাহতধ্বনি শ্রুত হয়। সুতরাং কুণ্ডলিনীর জাগরণ হইলে সাধক নিঃসংশয়ে উহা অনুভব করিতে পারেন। সাধকের নিকট ইহার যথেষ্ট মূল্য থাকা সত্ত্বেও, ইহা সাধনপথে প্রথম সোপানমাত্র। গুরু-উপদিষ্ট প্রণালীতে নিত্য নিয়মিত সাধন ব্যতীত কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি হয় না। ফলে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর আদি চক্রও ভেদ না হওয়ায় দেবভাবের বিকাশ ঘটে না।

সাধন-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আবার প্রারব্ধজনিত প্রতিবন্ধকের ফলে সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে এবং কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়। প্রতিবন্ধকগুলি কি তাহা মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথম পাদে বিবৃত করিয়াছেন : রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, উদ্যমরাহিত্য, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতা লাভ না করা এবং ঐ অবস্থা লাভ হইলেও তাহা হইতে পতিত হওয়া। এই নয়টিই সাধনপথে অন্তরায় এবং ঈশ্বরের নামজপের দ্বারাই যে এই যোগবিঘ্নগুলি অপসারিত হয়, তাহা সুদূর অতীতেও যেরূপ মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়া গিয়াছেন, আজও আচার্যগণ সেইরূপই উপদেশ দিয়া থাকেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কি অন্তরায়াবস্থায়, কি স্বাভাবিক সাধনা-বস্থায়—কোন পরিস্থিতিতেই ঊর্ধ্বচক্রগুলিকে ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত প্রাণায়ামাদির বা ভাবাবেগের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নহে। নাড়ী-শুদ্ধির দ্বারা কুণ্ডলিনীর জাগরণে কিছুটা সহায়তা হয়, ইহা নিশ্চিত সত্য এবং কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগমনে প্রাণায়ামেরও সার্থকতা অবশ্যই আছে। তথাপি কুণ্ডলিনীর জাগরণের পর স্বাধিষ্ঠানাদি ঊর্ধ্বচক্র-গুলি ভেদ করিবার জন্য অতিরিক্ত প্রাণায়াম করিবার স্বাভাবিক প্রবণতাকে দমন করা বিধেয় এবং গুরূপদিষ্ট প্রাণায়ামের মাত্রা লঙ্ঘন করা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

ভাবাবেগ সম্বন্ধে স্বামীজী বহুবার সাবধান-

বাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। ভাবের আতিশয্যে কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগমন হইয়া থাকে এবং উন্নত অবস্থা লাভ করা যায় ইহা সত্য, কিন্তু আধার উপযুক্ত না থাকায় ঐ অবস্থা স্থায়ী তো হয়ই না, উপরন্তু প্রতিক্রিয়ার ফলে কুণ্ডলিনী নিম্নচক্রে পতিত হইয়া আর সহজে ঊর্ধ্বাভিমুখী হন না। যাঁহারা অতিশয় ভাবপ্রবণ, তাঁহাদের কুণ্ডলিনী-শক্তি সহসা উপরে উঠিয়া যান, কিন্তু উঠিতেও যতক্ষণ নামিতেও ততক্ষণ। যখন নামেন, তখন সাধককে একেবারে অধঃপাতে লইয়া গিয়া ছাড়েন—স্বামীজীর এই সাবধান-বাণী প্রত্যেক সাধকেরই বিশেষভাবে স্মরণীয়।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : ন চ তাঃ প্রত্যক্ষাদিভি র্বাধিতুং শক্যন্তে। বহুবিধ-লিঙ্গোপেততয়া তৎপরত্বেন প্রবলত্বাৎ। কিন্তু তা এব প্রত্যক্ষাদি-তাত্ত্বিকাংশানুপজীবকত্বাৎ। শুক্তিজ্ঞানবৎ পশ্চাদ্‌ভাবিত্বাৎ স্বপ্রমেয়বোধনে প্রত্যক্ষাদি অনুপজীব্য স্বপ্রকাশচৈতন্যবিষয়ত্বাৎ, অনুমানাপেক্ষয়া প্রত্যক্ষবৎ। অব্যবহিত-বস্তু-বিষয়ত্বাৎ চ প্রত্যক্ষাদিকং বাধিত্বা তাত্ত্বিকাংশাৎ প্রচাব্য ব্যাবহারিকাংশে ব্যবস্থাপয়ন্তি। ততশ্চ তাদৃশে আত্মনি কর্তৃত্বাদি-প্রপঞ্চস্য পরমার্থতোঽসম্ভবেন সোঽধ্যস্ত এব।

ন চ স্বপ্রকাশস্য অজ্ঞানবিষয়ত্বাভাবেনাধিষ্ঠানত্বাযোগাৎ অধ্যস্তত্বানুপপত্তিঃ। লোকে ঘটমহং ন জানামি ইতি অজ্ঞানবিশেষণতয়া ভাসমানস্য এব তদ্বিষয়ত্ব-দর্শনাৎ। স্বরূপচৈতন্যস্য মাম্ অহং ন জানামি ইতি অজ্ঞানসাধকতয়া সিদ্ধস্য তদবিরোধিত্বাৎ বৃত্ত্যারূঢ়স্য এব তস্য তদ্‌বিরোধিত্বাৎ। আত্মনি আরোপিতাংশ-ভেদ-সত্ত্বাৎ সাদৃশ্যাদেশ্চ আত্মনি ব্রাহ্মণ্যাদ্যধ্যারোপে সংবিদনিত্যত্বাধ্যারোপে চ অদর্শনাৎ। স্বপ্রকাশস্য চ স্বয়মেব স্বস্মিন্ প্রমাণত্বেন তন্নিষ্ঠাবিদ্যায়াঃ প্রমাণদোষস্য সত্ত্বাৎ চ। ততশ্চ কর্তুঃ অধ্যস্তত্বেন অনাত্মত্বাৎ আত্মনশ্চ কর্তৃত্বাদিসাক্ষিণো ব্রহ্মত্বে বাধাভাবাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিষয়ঃ সম্ভবতি। এবং কর্তৃত্বাদেঃ অনর্থস্য আত্মনি আরোপিতস্য সমূলস্য নিবৃত্তিঃ প্রয়োজনম্ অপি সম্ভবতি ইতি আহ— **যস্মিন্ দৃষ্টে** ইতি।

যস্মিন্ সদানন্দ-চিৎপ্রকাশে পরিপূর্ণে বিষ্ণৌ দৃষ্টে শান্ত্যাদি-সহিত-নিরন্তরানুষ্ঠিত-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈঃ সম্যক্ সাক্ষাৎকৃতে তৎসংসৃতিচক্রং সমূলং নশ্যতি লীয়তে। তং **হরিম্ ঈড়ে** ইতি সম্বন্ধঃ।

অত্র উভয়ত্র শ্রুতিঃ। 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি। যত্র ত্বস্য সর্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ' (বৃ. ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) ইত্যাদি।

নন্বহংকারাদি-প্রপঞ্চ-মূলাজ্ঞানস্য নিবৃত্তি র্ন সম্ভবতি তস্য অনধ্যস্তত্বাৎ। স্বেন এব স্বস্য অধ্যাসে আত্মাশ্রয়াৎ। অজ্ঞানান্তরাঙ্গীকারে চ অনবস্থাদ্যাপত্তেঃ। লোকে অনধ্যস্তস্য ঘটাদেঃ জ্ঞানাৎ নিবৃত্ত্যসম্ভবঃ।

কিঞ্চ ভাবরূপাজ্ঞানস্য অনাদিনো* নিবৃত্তি র্ন সম্ভবতি, অনাদিভাবস্য আত্মবৎ নিত্যত্ব-নিয়মাৎ।

অনুবাদ: ঐ শ্রুতিসমূহ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। (কারণ) বহুবিধ (বাক্যতাৎপর্যবোধক) লিঙ্গের দ্বারা সমর্থিত হওয়াতে ঐ শ্রুতিবাক্যসকল ব্রহ্মবোধক বলিয়া (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে) প্রবল। বরং উক্ত শ্রুতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের তাত্ত্বিকাংশের অনুপজীবক (অসাধক বা অবোধক। অর্থাৎ ঐ শ্রুতিবাক্যসমূহের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবিষয়ক সত্যত্ববুদ্ধি খণ্ডিত হয় মাত্র)।[১] (শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মাববোধ) শুক্তিকাজ্ঞানের ন্যায় পশ্চাদ্‌ভাবী (যেরূপ রজতজ্ঞানের পশ্চাৎ শুক্তিকাজ্ঞান হয়, তদ্রূপ ভেদজ্ঞানের পরই পূর্ণ ব্রহ্ম-জ্ঞান হইয়া থাকে।) আর প্রত্যক্ষ যেরূপ (স্ববিষয় বোধনে) অনুমানের উপর নির্ভর করে না, স্ববিষয় বোধনে ঐ শ্রুতিবাক্যসমূহও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া স্বপ্রকাশ-চৈতন্যকেই বিষয় করিয়া থাকে। শ্রুতিসমূহ ব্যাবধানরহিত ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক বলিয়াও (প্রত্যক্ষাদির দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। বরং) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে বাধিত করে[২] অর্থাৎ তাহাদিগকে তাত্ত্বিকত্ব (পারমার্থিক সত্যত্ব) হইতে বিচ্যুত করিয়া ব্যবহারিকত্ব অংশে স্থাপিত করে। (অর্থাৎ তাহাদের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কেবল ব্যাবহারিক সত্তা মাত্র আছে, ইহাই সিদ্ধ করে।) অতএব (শ্রুতিপ্রসিদ্ধ) সেইরূপ (অর্থাৎ নির্বিশেষ) ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে কর্তৃত্বাদি (সংসার-) প্রপঞ্চের পারমার্থিকত্ব অসম্ভব বলিয়া তাহা আত্মাতে অবশ্যই অধ্যস্ত অর্থাৎ কল্পিত।

আর ইহাও বলিতে পার না যে, স্বপ্রকাশচৈতন্য (ব্রহ্ম) অজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, সুতরাং তাহার অধিষ্ঠানত্ব অসিদ্ধ হওয়াতে (কর্তৃত্বাদি প্রপঞ্চের) অধ্যস্তত্বই অযৌক্তিক।[৩]

---

* ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'অনাদিনঃ' না হইয়া 'অনাদেঃ' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১ লৌকিক প্রত্যক্ষের সহিত শ্রুতি-প্রমাণের বিরোধ ঘটিলে, লৌকিক প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শ্রুতি-প্রমাণের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। তাহার কারণ, লৌকিক প্রত্যক্ষ পুরুষবুদ্ধি-প্রসূত বলিয়া পুরুষবুদ্ধির সম্ভাবিত দোষ লৌকিক প্রত্যক্ষেও সংঘটিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা স্বাভাবিক। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রমাতার দোষত্রুটি নাই, ইহা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বভাবতই দোষত্রুটিশূন্য হওয়ায় স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ লৌকিক প্রত্যক্ষ ব্যাবহারিক প্রমাণ, কিন্তু শ্রুতি তাত্ত্বিক প্রমাণ। অতএব লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় এবং শ্রুতির বিষয় পৃথক্ হওয়ায় প্রকৃত বিরোধ নাই।

২ লৌকিক প্রত্যক্ষও ব্যবধানরহিত বস্তুকেই বিষয় করে। কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয় অপরোক্ষ স্বপ্রকাশ-চৈতন্য অপেক্ষা ব্যবহিত। কারণ, অদ্বৈতমতে একমাত্র ব্রহ্মই অব্যবহিত, অন্যান্য যাবতীয় নামরূপাত্মক বস্তু ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া স্বপ্রকাশচৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা অপেক্ষা ব্যবহিত। সুতরাং লৌকিক প্রত্যক্ষ কল্পিত বা ব্যাবহারিক বস্তুর প্রামাণ্যের জ্ঞাপক, কিন্তু স্বপ্রকাশচৈতন্যের জ্ঞাপক নহে।

৩ শুক্তি-রজতাদি ভ্রমের স্থলে ইহাই নিয়ম যে, অজ্ঞান অধিষ্ঠানরূপ শুক্তির স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে এবং তাহার বিক্ষেপশক্তির ফলে রজতের অধ্যাস ঘটে। সুতরাং অজ্ঞানের আবরণশক্তির দ্বারা অধিষ্ঠানের স্বরূপ আবৃত না হইলে ভ্রম হয় না। কিন্তু স্বপ্রকাশচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না; অতএব অন্ধকার যেমন সূর্যকে আবৃত করিতে পারে না, তেমনই জড় অজ্ঞানও স্বপ্রকাশচৈতন্যকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং অধিষ্ঠান আবৃত না হইলে ভ্রম অসম্ভব। ইহাই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য।

(পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি সমীচীন নহে) কারণ, জগতে দেখা যায় যে, 'আমি ঘট জানি না' এইরূপ জ্ঞানে অজ্ঞানের বিশেষণরূপে ভাসমান চৈতন্যই অজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। (আরও দেখ)— 'আমাকে আমি জানি না'—এইরূপে স্বরূপচৈতন্য অজ্ঞানের সাধক হইয়া থাকে (সাধকরূপে সিদ্ধ হয়) বলিয়া তাহা (স্বরূপচৈতন্য) অজ্ঞানের বিরোধী নহে, ('আমি ব্রহ্ম'—এইরূপ) বৃত্তিতে আরূঢ় (প্রতিফলিত) চৈতন্যই অজ্ঞানের বিরোধী [৪] (নিরংশ হইলেও) আত্মাতে আরোপিত অংশভেদ আছে (সুতরাং এক অংশে জ্ঞাত ও অন্য অংশে অজ্ঞাত—সামান্যাংশে জ্ঞাত ও বিশেষাংশে অজ্ঞাত বলিয়া আত্মা অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন, ইহা সিদ্ধ হয়), (সাদৃশ্যাদি দোষ অধ্যাসের কারণ হয়, ইহা বলা হইয়াছিল—তাহার ব্যভিচার দেখান হইতেছে—) আত্মাতে ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির ও (ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানরূপ) অনিত্য জ্ঞানের অধ্যারোপে সাদৃশ্যাদি (কোন দোষ) দেখা যায় না ; অথচ অধ্যারোপ হইয়া থাকে। সুতরাং সাদৃশ্যাদি দোষ বিনাও অধ্যাস হইতে পারে, ইহাই ভাবার্থ)। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজেই নিজের প্রমাণ (উহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না), অতএব ঐ চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যাই (আত্মাতে কর্তৃত্বাদি অধ্যাসক্ষেত্রে) প্রমাণগত দোষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।[৫] অতএব কর্তা অহংকারাদি আত্মাতে অধ্যস্ত বলিয়া অনাত্মা হওয়াতে ঐ কর্তৃত্বাদির সাক্ষী প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মত্ব বিষয়ে কোন বাধা না থাকায় ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ (গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপ) **বিষয়** সম্ভব হইতে পারে (—ইহাই সিদ্ধ হইল।)। এইরূপে আত্মাতে আরোপিত ঐ কর্তৃত্বাদি অনর্থসমূহের সমূল নিবৃত্তিই (এই গ্রন্থ রচনার) **প্রয়োজন**, ইহাও সম্ভব হয়, ইহাই গ্রন্থকার বলিতেছেন—**যস্মিন্ দৃষ্টে**—ইত্যাদি শব্দের দ্বারা।]

যস্মিন্—যে সদানন্দ চিৎপ্রকাশস্বরূপ পরিপূর্ণ বিষ্ণুতত্ত্ব, **দৃষ্টে**—শমদমাদিসহিত নিরন্তর অনুষ্ঠিত শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা সাক্ষাৎকার হইলে, **তৎসংসৃতিচক্রং**—সেই সংসারচক্র

---

৪ অদ্বৈতবেদান্তমতে স্বরূপচৈতন্য এবং বৃত্তিজ্ঞান এক নহে। অন্তঃকরণের বিষয়াকারা বৃত্তি হইলে বিষয়ের আবরক অজ্ঞান অপসারিত হয় ; ঐ অবস্থায় বৃত্তিতে চৈতন্যের যে স্ফুরণ হয়, তাহাকেই বৃত্তিজ্ঞান বলে। সুতরাং বৃত্তিজ্ঞান হইলে অজ্ঞান থাকিতেই পারে না। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা নাই। 'আমি অজ্ঞ'—এই বুদ্ধি স্বাভাবিক। ঐরূপ প্রতীতিস্থলে 'আমি'-নামক পদার্থটি বিশেষ্য এবং অজ্ঞান বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়। বৃত্তি হইলে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, সুতরাং এইস্থলে বৃত্তিব্যতীতই অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। অজ্ঞান জড় পদার্থ, অতএব প্রকাশাত্মক চৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয় না হইলে, অজ্ঞান কখনও প্রতীয়মান হইত না। ফলতঃ স্বপ্রকাশচৈতন্য অজ্ঞানের আশ্রয়—ইহাই সিদ্ধ হয়।

৫ অধ্যাস সর্বত্রই আগন্তুক কোন একটি দোষের ফল। শুক্তি-রজত, রজ্জু-সর্প প্রভৃতি অধ্যাসস্থলে কাচ-কামলা প্রভৃতি চক্ষুরোগ, দূরত্ব, অন্ধকার, মনের অনবধানতা প্রভৃতি আগন্তুক দোষরূপে গণ্য। সুতরাং বস্তুর যথার্থ জ্ঞানের যাহা করণ অর্থাৎ প্রমাণ তাহার মধ্যে দোষ থাকিলেই অধ্যাস ঘটে। কিন্তু স্বপ্রকাশচৈতন্য নিজের অতিরিক্ত কোন প্রমাণের প্রমেয় হয় না এবং চৈতন্যের কোন দোষও নাই, সুতরাং আগন্তুক দোষ না থাকায় স্বপ্রকাশচৈতন্যে অধ্যাস সম্ভব নহে, এই আশঙ্কার সমাধানের জন্যই গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, যাহা প্রমাণের দ্বারা জানা যায়, সেইরূপ বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রমাণগত আগন্তুক দোষ অধ্যাসের কারণ হইবে। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া কোন প্রমাণের জ্ঞেয় নহেন, কিন্তু ব্রহ্মাশ্রিত অবিদ্যারূপ দোষকেই এখানে অধ্যাসের কারণ বলিতে হইবে।

(অহংকারাদিপ্রপঞ্চ) সমূলে (অজ্ঞানসহ) **নশ্যতি**—বিলীন হইয়া যায় (বাধিত হয়), **তং হরিমীড়ে**—সেই শ্রীহরিকে আমি বন্দনা করি, এইরূপ বাক্যযোজনা অর্থাৎ সম্বন্ধ (এখানে বুঝিতে হইবে)।

[এই সংসৃতিচক্র (প্রতীতিতঃ) আছে, অথচ (বস্তুতঃ) নাই – এই উভয় বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ দেওয়া হইতেছে : 'যেখানে (যে অবিদ্যাবস্থায়) দ্বৈত যেন আছে, সেখানেই একে অপরকে দর্শন করে। যেখানে (মোক্ষাবস্থায়) ইঁহার (অদ্বৈতদর্শীর) সব কিছুই আত্মারূপেই পর্যবসিত হয়, সেখানে কিসের দ্বারা কে কাহাকে দর্শন করে ? ইত্যাদি (শ্রুতিবাক্য সংসারচক্রের সত্তাসত্তা-বিষয়ে প্রমাণ)।

(শঙ্কা) : অহংকারাদিপ্রপঞ্চের মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ তাহা অধ্যস্ত নহে। (অধ্যস্তবস্তুরই নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞান কেন অধ্যস্ত নহে, তাহা বলা হইতেছে। অজ্ঞান নিজেই নিজের দ্বারা অধ্যস্ত হয় বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ হইবে। (অন্য অজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান অধ্যস্ত হয়, এইরূপে) অজ্ঞানান্তর অঙ্গীকার করিলে অনবস্থা প্রভৃতি দোষ[৬] প্রাপ্তি (অপরিহার্য) হইয়া পড়িবে। (অতএব অজ্ঞান অধ্যস্ত নহে)। অনধ্যস্ত ঘটাদির জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তি লোকসমাজে প্রসিদ্ধ নহে।

আরও কথা এই যে, ভাবরূপ, অনাদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতেই পারে না, (কারণ) অনাদি ভাব-বস্তু, আত্মার ন্যায় নিত্যই হইবে—ইহাই নিয়ম (যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত)।[৭] [ক্রমশঃ]

---

৬ এইরূপ দোষ সাধারণতঃ ৫টি : (১) আত্মাশ্রয় (২) ইতরেতরাশ্রয় (৩) চক্রকাশ্রয় (৪) অনবস্থা ও (৫) অনিষ্টপ্রসঙ্গ। উদয়নাচার্য ও বরদরাজ এই ৫টিরই উল্লেখ করিয়াছেন। (এই বিষয়ে অন্যান্য মতও বিদ্যমান।) কোন পদার্থ নিজের উৎপত্তি অথবা স্থিতি অথবা জ্ঞানে অব্যবধানে নিজেকে অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে 'আত্মাশ্রয়'। আর সেই পদার্থ অপর একটি পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে বলে 'ইতরেতরাশ্রয়' বা 'অন্যোন্যাশ্রয়'। এইরূপ অপর দুইটি পদার্থ বা ততোধিক পদার্থকে অপেক্ষা করিয়া আবার নিজেকেই অপেক্ষা করিলে তৎপ্রযুক্ত যে অনিষ্টাপত্তি হয় তাহাকে বলে 'চক্রকাশ্রয়'। আর যেরূপ আপত্তির কোথাও বিশ্রাম বা শেষ নাই, এমন যে ধারাবাহিক আপত্তি, তাহাকে বলে 'অনবস্থা'। উক্তরূপ অনন্ত আপত্তিমূলক যে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাও 'অনবস্থা' নামে কথিত। কিন্তু কোন স্থলে ঐরূপ আপত্তি সর্বমতে প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহা 'অনবস্থা'রূপ তর্ক হইবে না। কারণ সেইরূপ স্থলে উহা সকল মতেই ইষ্টাপত্তি। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ তর্ক ভিন্ন সমস্ত তর্কই 'অনিষ্টপ্রসঙ্গ' নামে পঞ্চম প্রকার তর্ক।

৭ ইহা পূর্বপক্ষীর কথা।

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীহরিঃ শরণম্

৺কাশী

৮।৮।২০

শ্রীমান্ অনাদি চৈতন্য*,

তোমার ৬ই তারিখের পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। মঠ হইতে যে পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলে তাহাও পাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তহৃদয় ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তথায় চিরবিরাজমান থাকিয়া তাহাদিগকে সমান স্নেহাশীর্ব্বাদ বিতরণ করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার উৎসবে এখানে অদ্বৈত আশ্রমে বিশেষ পূজা পাঠ ভজন ভোগরাগ হোমাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। দুই শতের অধিক ভক্তমণ্ডলী পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অল্পস্বল্প দরিদ্রনারায়ণ সেবাও হইয়াছিল। সকলই সুচারুরূপে প্রশান্তভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছিল। উভয় আশ্রমের প্রায় সকলেই ভাল আছে। কাহারও কাহারও জ্বরাদি হইতেছে। বৃষ্টি খুব হইযাছে ও হইতেছে। উহার জন্যই বোধ হয় জ্বরজ্বারি। তোমাদের আশ্রম হইতে চাষবাস ও শিল্পশিক্ষার চেষ্টা হইতেছে জানিয়া অতিশয় প্রীত হইযাছি। এই ত চাই। এখন এইরূপই করিতে হইবে। সকল বিষয় নিজেরা শিখিয়া সাধারণ্যে শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার অভাবেই তো আমাদের এত অবনতি। আন্তরিক যত্ন চেষ্টা থাকিলে কোন বিষয়ের জন্য অসংকুলান হইবে না। মা সব ঠিক করিয়া দিবেন। এইরূপ চলিয়া চল। ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়াই তোমাদেরও চিত্তে এইরূপ প্রেরণা হইতেছে জানিবে। আমার শরীর স্বচ্ছন্দ নহে। চলিয়া যাইতেছে মাত্র। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীতুরীয়ানন্দ

---

* পরবর্তী কালে স্বামী নির্বেদানন্দ।—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সন্ন্যাসী গৃহী সকলের উপরই মায়ের সমান স্নেহ-ভালবাসা। গৃহস্থের পুত্রকন্যাগণও যখন মায়ের কাছে আসিতেন, কখনও তাঁহাদের মনে হয় নাই যে, তাঁহাদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ বা স্নেহ-মমতায় কমতি আছে। মায়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা, তাঁহাদের সুখদুঃখের সংসারযাত্রায় অন্তরের দুঃখ-বেদনা লাঘব ও হর্ষ-উৎসাহ বৃদ্ধি করিত। মা অনেকেরই বাড়ীঘরের, পরিবার পরিজন চাকরী রোজগার— সাংসারিক অবস্থার খোঁজখবর লইতেন। তাঁহারা

কোন সমস্যার কথা নিবেদন করিলে মনোযোগ দিয়া শুনিয়া ঠিক কর্তব্য নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেন। দূরদেশে অবস্থানকারী বহু সন্তান মাকে চিঠিপত্র লিখিয়া সদাসর্বদা নিজেদের অবস্থা জানাইতেন এবং দুঃখ-বিপদে প্রার্থনা করিতেন তাঁহার উপদেশ ও আশীর্বাদ। সন্ন্যাসী গৃহী উভয়বিধ বহু সন্তানের নিকট হইতেই বহু চিঠিপত্র আসিত মায়ের কাছে। মা সেই সকল পত্র মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া কি লিখিতে হইবে স্বয়ং বলিয়া লিখাইতেন। তাঁহার প্রাচীন সন্তান শ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গগণের, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতেও বিশেষ কর্মারম্ভে অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভের জন্য পত্রাদি আসিত। এ দীন সন্তানের এরূপ অনেক পত্রাদি দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বুদ্ধি-বিবেচনা কিঞ্চিন্মাত্র থাকিলেও সে অমূল্য রত্ন নিশ্চয়ই সংগৃহীত ও সযত্নে রক্ষিত হইত। কিন্তু তরলমতি নির্বোধ তখন তাহা হাতে পাইয়াও রাখে নাই, স্বহস্তে বিনষ্ট করিয়াছে—এখন অন্তরে আপসোস হয় খুব। স্মৃতিসহায়ে কয়েকখানি পত্রের মর্মার্থ-রক্ষার চেষ্টা করিব :

১। পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের ভুবনেশ্বরে মঠস্থাপন করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-পূর্ণ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদনান্তর অতিশয় বিনম্রভাবে অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া লিখিত পত্র। উত্তরে মায়ের সন্তোষ-প্রকাশ ও ঠাকুরের কৃপায় শুভকার্য সুসম্পন্ন হওয়ার শুভাশীর্বাদ।

২। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের অসুস্থ শরীরে স্বাস্থ্যলাভার্থ দেওঘরে গিয়া মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন ও স্নেহাশীর্বাদ প্রার্থনায় লিখিত হৃদয়ের আবেগ আকুলতা পূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র। উত্তরে মায়ের দুঃখ প্রকাশ, উদ্বেগ ঠাকুরের নিকট মঙ্গল কামনা।

৩। পূজনীয় শরৎ মহারাজের পত্র—কোনও প্রয়োজনে মায়ের পত্রানুযায়ী কিছু টাকা জয়রামবাটীতে পাঠাইবার কথা ছিল—মহারাজ গণেন মহারাজকে টাকা পাঠাইতে বলিয়াছিলেন এবং পরে খোঁজ করিলে গণেন মহারাজ টাকা পাঠান হইয়াছে বলায় নিশ্চিন্ত থাকেন। জয়রাম-বাটীতে টাকার প্রয়োজন না হওয়ায় মা-ও আর কোন খোঁজ খবর করেন নাই। কয়েকদিন পরে গণেন মহারাজ বলিলেন টাকা পাঠান নাই, ভ্রমবশতঃ পাঠান হইয়াছে বলিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়া শরৎ মহারাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া পত্রে অত্যন্ত আর্তিপ্রকাশ ও অপরাধ ক্ষমাপনের জন্য কাতর প্রার্থনা করেন। উত্তরে, মায়ের টাকার প্রয়োজন হয় নাই একথা জ্ঞাপন ও ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকা না পাঠান ভাল হইয়াছে বলিয়া অভয়-প্রদান, আশীর্বাদ-জ্ঞাপন।

৪। পূজনীয় বলরামবাবুর পুত্র রামবাবুর সুবিস্তৃত পত্রাবলী, তাঁহার জননীর শেষ অসুখ, দেহত্যাগ, শ্রাদ্ধাদি কর্মের সুবিস্তৃত বিবরণসমূহ ও স্নেহাশীর্বাদ-প্রার্থনা। উত্তরে মায়ের দুঃখ প্রকাশ ও শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন হওয়ার জন্য আশীর্বাদ এবং পরে শ্রাদ্ধ ভালভাবে হইয়াছে জানিয়া সন্তোষ-প্রকাশ।

৫। পূজনীয় প্রজ্ঞানন্দ স্বামীর মায়াবতী হইতে লিখিত পত্রসকল। উদ্বোধনে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ও তাঁহার সহোদরা সুধীরা দেবী মায়ের বিশেষ স্নেহ কৃপালাভে ধন্য ও আকৃষ্ট হন। তিনি মায়ের নিকট মায়াবতী হইতে বিস্তৃত পত্র লিখিয়া তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন ও স্নেহাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তাঁহার পত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মায়াবতীর সুন্দর বর্ণনা ছিল। এক পত্রে লেখা ছিল—রাতে আশ্রমে বাঘ আসে, বাঘের ডাক শুনা যায়। শুনিয়া মার ভীষণ ভয়-ভাবনা হইয়াছিল। মায়াবতী হইতে তিনি মায়ের নূতন বাড়ীর বাগানে লাগাইবার জন্য ডালিয়ার মূল

পাঠাইয়াছিলেন। আরও মনে পড়ে ভুটিয়া ভক্তিমতী মহিলা রমাদেবী ও সুরমাদেবী ভগিনীদ্বয়ের বিবরণ ও অতুলনীয় ভক্তিভাবের নিদর্শন, তৎকর্তৃক প্রেরিত, তাঁহাদের প্রদত্ত, স্বহস্তে প্রস্তুত সুন্দর কার্পেটের আসন।

৬। অরবিন্দ ঘোষের (শ্রীঅরবিন্দের) স্ত্রীর সুলিখিত পত্র, যাহাতে তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখিত ছিল। শ্রীশ্রীমায়ের পদাশ্রিতা ভক্তিমতী মহিলা মায়ের সেবার জন্য টাকাও পাঠাইয়াছিলেন, মনে পড়ে।

সেই সময়ে দেশের অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক। সন্ত্রাসবাদীদের দমনের জন্য বদ্ধপরিকর ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচার লোকের অন্তরে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে, চারিদিকে পুলিশের কড়া নজর। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুগণও সন্দেহভাজন বলিয়া বিবেচিত; কোয়ালপাড়া, জয়রামবাটীতে পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই অঞ্চল ম্যালেরিয়া-কবলিত, দুরধিগম্য, অশিক্ষিত গরীব লোকের বাসভূমি, সেজন্য সুস্থ, সবল যুবক দেশপ্রেমিকগণকে তথায় অন্তরীণ রাখিয়া সায়েস্তা করার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক থানাতেই ঐরূপ অন্তরীণ যুবক দেখা যাইত। তাঁহাদের মধ্যে মায়ের স্নেহাশীর্বাদের পাত্রগণও ছিলেন। মায়ের মন তাঁহাদের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিত। কেহ কেহ সুবিধামত পত্র লিখিতেন, সেইসকল পত্রে পুলিশের ছাপ মারা থাকায় দেখিয়া দেখিয়া মা চিনিয়াছিলেন। এইরূপ পত্র পাইলেই মা হাতে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন সেই পুলিশ ছাপের দিকে। কখনো কখনো দু'একটি বাক্যে তাঁহার রুদ্ধ হৃদয়বেদনা ফুটিয়াও বাহির হইয়া পড়িত।

ভক্তগণের পত্রে সময় সময় কঠিন সমস্যার উল্লেখ থাকিত, মায়ের নিকট হইতে সমাধান আশা করিয়া। মা ঠিক ঠিক উত্তর দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করির। একজন ভক্ত স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর আর সংসার ভাল লাগিতেছে না, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সহ স্ত্রীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিতে চান। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু হইতে অভিলাষী। পত্র শুনিয়াই মা দুঃখে অধীর হইলেন। বলিলেন, 'দেখ-দিকিন, কি অন্যায়! সে বেচারী অল্পবয়সের মেয়ে—এই কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কোথায় যায়, কি করে?' তারপর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'লিখে দাও তাকে এখন সংসার ছাড়তে নিষেধ করে। আগে ছেলেপিলেদের মানুষ করুক। টাকা পয়সা রোজগার করে তাদের থাওয়া থাকার সুব্যবস্থা করুক। তারপরে তখন দেখা যাবে।'

আর একজন লিখিয়াছেন—তিনি যে চাকরী করেন তাহাতে মিথ্যা বলিতে হয় সময় সময়, সেজন্য তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তবে সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য পারিতেছেন না, ভরণ-পোষণের আর কোন উপায় নাই। এমতাবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মায়ের উপদেশ প্রার্থনা করিতেছেন। মা শুনিয়া ভক্তটির জন্য চিন্তিত হইয়া একটু ভাবিলেন, তৎপরে লেখককে বলিলেন, 'তাকে লিখে দাও চাকরী না ছাড়তে।' অল্পবয়স্ক লেখক ভাবিতেছে, মা এরূপ আদেশ কেন করিতেছেন, সে তো ভাল পথেই চলিতে চায়। সে লিখিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। মা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'আজ একটু সামান্য মিথ্যা কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু চাকরী ছেড়ে অভাবে পড়লে তখন চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না।' শেষোক্ত অংশ—'চুরি ডাকাতি পর্যন্ত করতে ভয় পাবে না—অভাবে পড়লে'—খেদ করিয়া দুই তিন বার বলিলেন। লেখক মায়ের দূরদৃষ্টি ও সন্তানকে রক্ষার আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইল।

অপর একজন লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের চিত্রপট আসনে ছিল, নিত্য পূজা ভোগ আরাত্রিক হয় ছেলেমেয়েরা করে। একদিন সন্ধ্যায় ছোটমেয়ে আরাত্রিক করিয়া অসাবধানে কাঠের সিংহাসনের নীচে ধুনুচী রাখিয়াছিল, তাহাতে কাপড়ে আগুন লাগিয়া আসন, মায় শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের ছবিও ভস্মীভূত হইয়াছে। তাঁহারা এই ঘটনায় অতিশয় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া মায়ের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। ঘটনা জানিয়া মায়ের দুঃখ ও চিন্তা হইল, বলিলেন, 'এসব পূজা আরতি বড় কঠিন ব্যাপার, খুব সাবধানে করতে হয়। এসকল ব্যাপার মঠে আশ্রমেই সাজে, না হ'লে আমি কি আর পারি না সন্ধ্যে বেলা একটু ধূপধুনা ঘুরিয়ে দিতে॥' বারংবার আপসোস করিয়া মা তাঁহাদের অভয়দান ও আশীর্বাদ জানাইয়া ভবিষ্যতে সাবধান থাকিবার জন্য লিখিয়া দিতে বলিলেন। [ক্রমশঃ

কঠোপনিষৎ-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

আত্মার সম্বন্ধে নচিকেতা প্রশ্ন করেছেন এবং যমরাজ উত্তর দিচ্ছেন। প্রথমেই বলছেন ওঁকার সম্বন্ধে :

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥
১।২।১৫

— সেই পদকে, সেই তত্ত্বকে আমি সংক্ষেপে বলছি, তা হচ্ছে ওম্।

সেই তত্ত্ব বলতে কোন তত্ত্ব ?—না, যার কথা সমস্ত বেদ বলেন— 'সর্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি'—যে তত্ত্বকে, যে স্বরূপকে সমস্ত বেদ প্রকাশ করেন, উপদেশ করেন। 'তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি'—সমস্ত তপস্যা, সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধন যে তত্ত্বকে প্রকাশ করে অর্থাৎ প্রকাশ করতে সহায়ক হয়। 'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি' —যা ইচ্ছা ক'রে—যে বস্তুকে লাভ করবার জন্য— ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান করা হয়। ব্রহ্মচর্য বলতে বিধিপূর্বক গুরুগৃহে বাস ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি— দুই-ই লক্ষ্য করা হয়।

আত্মতত্ত্বের উপদেশ করতে যেয়ে যমরাজ ওঁকারের উপদেশ করলেন, কেন ? এর কারণ এই যে, আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্গম দুরধিগম্য বস্তু। সুতরাং সেই দুরধিগম্য তত্ত্বকে হঠাৎ তার স্বরূপে বর্ণনা করবার চেষ্টা না করে, কি উপায়ে মন সেই তত্ত্ব ধারণা করবার উপযোগী হতে পারে এই কথা বলে ওঁকারের উপাসনার কথা প্রথমে বললেন। ওঁকারের উপাসনা সেই আত্মতত্ত্ব ধারণার পক্ষে সহায়ক হয়। সাক্ষাৎভাবে শুদ্ধবুদ্ধিতে যে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করা যায়—অপরোক্ষ অনুভূতি করা যায়, তাকে অশুদ্ধ মন দিয়ে গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে, মনের শুদ্ধির জন্য বা সেই তত্ত্বকে সহজবোধ্য করবার জন্য যমরাজ প্রথমে ওঁকারের উপাসনার কথা বললেন।

'সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি'– সমস্ত বেদ যে আত্মতত্ত্বকে প্রকাশ করেন। সমস্ত বেদ মানে কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ; কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান—সমস্ত। কোন অংশকে তার থেকে বাদ দেওয়া হয় না। আত্মজ্ঞানই হচ্ছে মানুষের চরম লক্ষ্য। বেদ আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেন।

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

তবে বেদ সাক্ষাৎভাবে আত্মতত্ত্বের কথা সব জায়গায় বলেন না, পরম্পরাক্রমে বলেন—নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলেন, কর্ম এবং উপাসনার ভেতর দিয়ে সাধককে নিয়ে যেয়ে ক্রমশঃ আত্ম-তত্ত্বের অধিকারী করেন।

সমস্ত বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মজ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যে। অদ্বৈতবেদান্তীরা এই জন্য যে চারটি মহাবাক্যের কথা বলেন, তাদেরও তাৎপর্য এই জীব আর ব্রহ্মের ঐক্যে। যাকে আমরা জীব বলে বলি, সে যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ তার যে অব্রহ্মভাব সেটা তার স্বরূপ নয়—ঔপাধিক, উপাধি-বশতঃ তার উপরে আরোপিত ধর্ম—এটি সমস্ত বেদ বোঝাচ্ছেন। 'সমস্ত' বেদ ('সর্বে বেদাঃ') বলার ভেতরে খুব জোর দেওয়া রয়েছে, emphasis রয়েছে। এমন কোন বেদের অংশ নেই যার অন্য কিছুতে তাৎপর্য থাকতে পারে। বলা বাহুল্য. এই যে জোর দেওয়া, এটার কারণ হচ্ছে. মীমাংসকদের যে-সিদ্ধান্ত তাকে যেন খণ্ডন করে বেদ বলছেন যে সমস্ত বেদ যে কেবল যাগ-যজ্ঞ করতে বলেন তা নয়, আত্মার স্বরূপকেও প্রকাশ করেন এটি হল বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাৎপর্য এইখানে। অপরগুলি গৌণ, এই তত্ত্বকে বোঝবার সহায়ক। বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদিরও তাৎপর্য পরম্পরাক্রমে আত্মজ্ঞানে।

মীমাংসকরা বলেন, বেদের তাৎপর্য কর্মে। 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্'—বেদের 'অর্থ' অর্থাৎ প্রয়োজন হল কর্মে। বেদ মানুষকে কর্মেতে নিযুক্ত করে। এছাড়া আর কিছুতে বেদের তাৎপর্য নেই। যা কিছু কর্মকে প্রতিপাদন করে না, সেগুলি হল অনর্থক। কিন্তু বেদের কোন অংশকেই অনর্থক বলা চলে না। এই জন্য কার্য প্রতিপাদন করে না এমন অংশগুলিকে বলা হয়েছে কর্মের সহকারী হিসেবে কর্মের অঙ্গরূপে। মীমাংসকদের এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত। তাঁরা জীব আর ব্রহ্মের অভিন্নত্বই যে বেদের তাৎপর্য, যা অদ্বৈতবাদীরা বলে থাকেন, তা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য—এটি অসম্ভব। কেন অসম্ভব? তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁরা বলছেন যে, জীব আর ব্রহ্মের ঐক্যে কি লাভ হল?—কি ফল হল? আমি জানলুম জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন তাহলে দাঁড়াল কি কথাটা? —না, জীব কর্তা ভোক্তা নয়। জীব যদি কর্তা ভোক্তা না হয়, তা হলে 'সোমেন যজেত'—সোমযাগ করবে, একথা কাকে বলা হল? যে কর্তা নয়, তাকে যজ্ঞ করতে বলা—এতো অসম্ভব ব্যাপার! কর্তা না থাকলে যজ্ঞের অধিকারী নেই, সুতরাং সোম-যাগ করতে বলা অর্থহীন। আবার বেদ বলছেন, 'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গ কামনা করে যাগ করবে, অর্থাৎ স্বর্গসুখ ভোগ করবার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করবে। কিন্তু ভোক্তাই যদি না থাকে, কামনা-বিশিষ্ট কোন জীবই যদি না থাকে, কার জন্য বেদ এসব বিধান করেছেন? যদি বিধান কারুর জন্য করা না হয়, তাহলে সে বিধিবাক্যগুলি নিরর্থক হবে। আর বিধিবাক্যগুলি যদি নিরর্থক হয়, তা হলে বেদ অপ্রমাণ হবে। বেদের এই অপ্রমাণতা যে সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে সে সিদ্ধান্ত, স্পষ্ট বোঝা যায়, অপসিদ্ধান্ত—বেদ-বিরোধী সিদ্ধান্ত। যারা এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা পোষণ করে তারা নাস্তিক। এটি একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত মীমাংসকদের মতে। সুতরাং, মীমাংসকরা বলেন, 'কর্মেতেই বেদের তাৎপর্য' তাঁদের এই সিদ্ধান্তটিকে গ্রহণ করতেই হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে বেদেতে যে জ্ঞান-কাণ্ড রয়েছে তার কি ব্যাখ্যা হবে. বেদে যে সব উপাসনার কথা আছে, যেগুলি সাক্ষাৎভাবে কর্ম

নয় তাদের কি গতি হবে? এর উত্তরে মীমাংসকরা বলছেন, উপাসনাগুলিকেও আমরা কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত করে নেব। কর্মকে আর একটু ব্যাপক অর্থে যদি গ্রহণ করি, তো একদিকে যেমন শারীরিক কর্ম যাগ-যজ্ঞাদি, আহুতি দেওয়া প্রভৃতি বোঝায়, অন্যদিকে তেমনি মানসিক কর্মও তাতে অন্তর্নিহিত আছে; কর্মের সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে অনেক চিন্তা করবার কথা বলা হয়েছে। যেমন বলেছেন, তাঁকে ধ্যান করবে 'বষট্ করিষ্যন্'। সুতরাং কর্ম মানসক্রিয়া, তাও বেদেতে বিধান করা হয়েছে, কেবল শারীরিক কর্ম নয়। সুতরাং, সমস্ত উপাসনার সেখানে অবকাশ রয়েছে। আর জ্ঞানকাণ্ডের কথা -যেখানে জীব আর ব্রহ্মের ঐক্যের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে—তার কি ব্যাখ্যা হবে? সেই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসকরা বলেন, যদি বেদ এমন সব কথা বলেন যা প্রত্যক্ষ-বিরোধী, তা হলে সেই কথাগুলির আপাত অর্থ যা, তা গ্রহণ করা চলবে না— সেগুলিকে গৌণ-ভাবে অন্য অর্থে নিতে হবে। লক্ষণার দ্বারা অর্থ নির্ণয় করতে হবে। জীব অল্পশক্তি, ব্রহ্ম সর্বশক্তি; জীব অল্পজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ। সুতরাং জীব আর ব্রহ্মের কখনও একত্ব বা অভেদত্ব সম্ভব হোতে পারে না। অতএব বেদ যদি এরকম অসম্ভব কথা বলেন, আমরা সব সময়েতেই জানি তা হলে অর্থকে একটু ভিন্ন করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা এরকম অর্থ করে নেব যে, যিনি যজমান, তিনি নিজেকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করবেন —যজমানকে ভাবতে হবে 'অহং ব্রহ্ম অস্মি'। এরকম ভাবনা করলে যজমানের একটি বিশেষ শুদ্ধি হয় এবং এই শুদ্ধি তাঁর পক্ষে প্রয়োজন কর্মাঙ্গরূপে। যেমন বলা হয়েছে যে, যূপকাষ্ঠকে সূর্যরূপে ভাবনা করবে। যূপকাষ্ঠ কিছু সূর্য নয়, প্রত্যক্ষ-বিরোধী কথা; সুতরাং 'আদিত্যো বৈ যূপঃ' এরকম কথা থাকলেও, আদিত্যকে যূপ বলে গ্রহণ করতে হবে না। সেখানে বুঝতে হবে যে, যূপকাষ্ঠকে আদিত্যরূপে ভাবনা করতে হবে। এই রকম ভাবনা করলে, তখন সেই যূপকাষ্ঠের শুদ্ধি হবে। আমরা জানি, অনেক সময় এরকম করে বস্তুর শুদ্ধি করা হয়। যাঁরা পূজা-অর্চা করেন, তাঁদের জানা আছে, আমরা জলশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি করি। এসব করার ফলটা কি? —না, এগুলি পূজার অঙ্গরূপে উপযোগী হবে। অশুদ্ধ যে সব বস্তু, তা কখনও পূজার অঙ্গ হোতে পারে না। সুতরাং এই যে যজমানকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করতে বলছেন—যিনি ব্রহ্ম নন তাঁকে 'আমি ব্রহ্ম' বলে ভাবনা করতে বলছেন, এর দ্বারা শুদ্ধি হবে; যেমন যূপকাষ্ঠকে সূর্যরূপে ভাবনা করলে তার শুদ্ধি হবে, যে শুদ্ধির দ্বারা সেটি পূজার অঙ্গ হবার উপযুক্ত হবে, যজ্ঞের অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত হবে। যজমানও সেই রকম 'আমি ব্রহ্ম' এই রকম চিন্তা করলে তার ভেতরে এমন একটি শুদ্ধি হবে যে শুদ্ধির ফলে তিনি যজ্ঞেতে যজমানরূপে কাজ করতে পারবেন। সুতরাং, এখানে তাৎপর্য হচ্ছে কর্মে; আর 'অহং ব্রহ্ম' যে কথাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ঐ কর্মের অঙ্গরূপ যে যজমান তাঁর শুদ্ধির জন্য। এই হল মীমাংসকদের কথা।

বেদ হল 'অন্ত্য' প্রমাণ অর্থাৎ শেষ প্রমাণ। তার অর্থ বোঝবার জন্য আমাদের লৌকিক প্রণালী অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। বেদের কথাগুলোকে আমাদের বুঝতে হবে যেমন করে বুঝে থাকি অন্য সব কথা। তবে বিশেষ এই যে, এখানে অর্থ গ্রহণ করবার জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রণালী গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য। বক্তা একজন জানা থাকলে তার বিবক্ষা অর্থাৎ সে কি বলতে চাচ্ছে, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। যেমন মা ছেলেকে বলছেন, 'বিষ খা'। এখানে মাকে আমরা জানি, মায়ের ও ছেলের

সম্বন্ধ জানি। মা বলছেন, 'বিষ খা', যা প্রাণঘাতক। আমরা বুঝি, এটা মায়ের বিবক্ষা হোতে পারে না। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় - বেদের কোন বক্তা নেই। সুতরাং বেদের তাৎপর্য গ্রহণ করা খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে কেবল শব্দগুলির ভেতর থেকে অর্থকে গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় মুখের ভঙ্গী দেখেও আমরা বক্তার বিবক্ষা বুঝি। আকার ইঙ্গিত গতি চেষ্টা ইত্যাদির দ্বারা মানুষের মনের কথাও জানা যায়— 'আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষণেন চ। নেত্র-বক্ত্রবিকারৈশ্চ লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ॥' ভেতরের কথাটা মানুষ বোঝে কেবল শব্দ থেকে নয়— এতগুলি তার উপকরণ রয়েছে। বেদের ক্ষেত্রে কিন্তু এক শব্দ ছাড়া অন্য কোন উপকরণ আমরা পাচ্ছি না। সুতরাং বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করতে যেয়ে কেন এত বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারি। এত মতবাদ হয়েছে, তা সত্ত্বেও কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হচ্ছে না। শাস্ত্রকাররা এ বিষয়ে খুব অবহিত, সচেতন। মীমাংসকরা বহু অধ্যবসায়ের ফলে বেদের অর্থ করবার একটা সুষ্ঠু প্রণালী আবিষ্কার করেছেন, যা বেদানুসারী অন্য অন্য সম্প্রদায়ও মেনে নিয়েছেন। সেই প্রণালীটি খুব বৈজ্ঞানিক। যে প্রণালী অনুসরণ করে আমরা লৌকিক অর্থকে গ্রহণ করি, ঠিক সেই প্রণালীই অনুসরণ করা হয়েছে—মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এটি খুব যুক্তিপূর্ণ। মীমাংসকদের প্রণালীকে ধরে নিয়ে, সেই প্রণালীই প্রয়োগ করে বিভিন্ন মতবাদীরা প্রত্যেকে আবার নিজের নিজের মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এও এক বিচিত্র ব্যাপার! বেদের ভেতরে এত বিভিন্ন রকমের কথা আছে যে, সেগুলির সামঞ্জস্য করা দুরূহ ব্যাপার। অনেক বড় বড় পণ্ডিত এই সামঞ্জস্যের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সমস্ত বেদ যে

এক কথা বলতে চাচ্ছে,— একথা বলার দুরাগ্রহ কেন আমরা করব? বেদে নানান জনের অবদান আছে। এক এক ঋষি এক এক কথা বলেছেন। প্রত্যেকের কথার যতটুকু মূল্য ততটুকুই আমরা গ্রহণ করব। তার চেয়ে বেশী করা— একের কথার সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ সৃষ্টি করতে যাওয়া, এটা দুরাগ্রহ মাত্র। যাঁরা বেদের অনুশীলন করেন, তাঁরা লক্ষ্য করবেন, পণ্ডিতদের এই কথা যেন নিরর্থক বা যুক্তিহীন নয়। কারণ আপাত-দৃষ্টিতে বেদের কথাগুলির ভেতরে যেন পারস্পরিক কোন সম্বন্ধ নেই— একটির সঙ্গে আর একটি যেন সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ। কতকগুলি বাক্য যেন একসঙ্গে করা আছে. যেগুলির মাথামুণ্ডু আমরা কিছু খুঁজে পাই না। কিন্তু মানুষ বুঝতে চায়, সে হঠাৎ বুঝতে না পারলেও গবেষণা চালায়, চালিয়ে একটা তাৎপর্য গ্রহণের চেষ্টা করে। মীমাংসকেরা সেই চেষ্টায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, বেদের কথাগুলি যতই অসম্বদ্ধ বলে মনে হোক না কেন, তার ভেতরে একটা অনুস্যূত সম্বন্ধ আছে; কেবল জানতে হবে কোন কথার সঙ্গে কোন কথার কি সম্বন্ধ। সম্বদ্ধ কথাগুলি যে সব সময় সহোচ্চারিত হবে অর্থাৎ একসঙ্গে বলা হবে তা নয়। এইসব কারণে তাঁরা বলেন:

'উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥'

বাক্যের তাৎপর্য বোঝবার জন্য এই ছ'টি উপায় আছে: (১) উপক্রম ও উপসংহার, (২) অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উক্তি, (৩) অপূর্বতা, অর্থাৎ বিষয়টা আগে কোথাও বলা হয়নি বা বিষয়টা প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রাপ্তব্য নয় এমন, (৪) ফল —নিষ্ফল কথা বেদ বলেন না; ফল দেখেও সিদ্ধান্ত বুঝতে হয়, (৫) অর্থবাদ—বেদে অনেক বাক্য আছে, যাদের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নেই— অর্থাৎ প্রকরণ-বহির্ভূত ক'রে স্বতন্ত্রভাবে পড়লে

তাদের ঠিক মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেগুলি নিরর্থক বা অপ্রমাণ নয়, বিধিবাক্যগুলির স্তুতিতেই তাদের তাৎপর্য; এবং (৬) উপপত্তি অর্থাৎ প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অর্থ নিরূপণের অনুকূল যুক্তি। বেদের অর্থ করতে হলে এই ছ'টি উপায় অবলম্বন করতে হয়। এখন আমরা যেগুলোকে অসম্বদ্ধ মনে করছি, এই প্রণালী অনুসরণ করে সেগুলোকেও সুসম্বদ্ধ করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত: বেদের এক জায়গায় একটি মন্ত্রের ভেতরে দুটি দেবতার উল্লেখ করা আছে; এখন মন্ত্রটি কোন্ দেবতার পূজায় ব্যবহার করব? সেটি কি দুটি দেবতারই পূজায় ব্যবহার করব, না, একটির পূজায়? একটির হলে, কোন্ দেবতার? এই ধরনের নানান রকমের প্রশ্ন! আমাদের কাছে এ-সব প্রশ্ন এখন নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, কিন্তু যখন যজ্ঞাদি প্রচলিত ছিল, তখন এগুলির প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং বেদের কথাগুলির ভেতরে একটা সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে হয়। বেদ কোথাও প্রলাপ বকছে না, একথা বেদ সম্বন্ধে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা সর্বদাই মনে রাখেন। এইজন্য ঐ ছ'টি উপায়ের সাহায্যে খুব সুষ্ঠু বিচারের ভেতর দিয়ে সব প্রশ্নের সমাধান করবার চেষ্টা মীমাংসকেরা করেছেন। করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কর্মেতেই বেদের তাৎপর্য। তাই যেখানে বিধিলিঙের প্রয়োগ নেই, সেখানেও বুঝে নিতে হবে বিধিলিঙ্ রয়েছে, যেমন—'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' থাকলে 'জুহোতি'র জায়গায় 'জুহুয়াৎ' আছে মনে করতে হবে, অর্থাৎ 'অগ্নিহোত্র করে', এর জায়গায় 'অগ্নিহোত্র করবে', এই বিধি দেওয়া হয়েছে, বুঝে নিতে হবে। বিধি এবং নিষেধেই সমগ্র বেদের তাৎপর্য। করো আর করো না, এটা করো, ওটা করো না—এ ছাড়া আর কোন তাৎপর্য নেই। এই হল মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত।

কিন্তু এ ছাড়াও মানুষের বুদ্ধি অন্যভাবে কাজ করে। সমস্ত বেদকে একটা সুসম্বদ্ধ বস্তু বলে মনে করলেও, আমাদের যে এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হবে যে, একমাত্র কর্মেতেই তার তাৎপর্য, এমন কিছু নয়। এক দিকে যেমন কর্মে তাৎপর্য আছে, অন্য দিকে তেমনি উপাসনায় তাৎপর্য আছে, আবার অপর দিকে তেমনি জ্ঞানে তাৎপর্য আছে—এ কথা বিশেষ করে অদ্বৈত-বাদীরা মানেন। আর এই যে জ্ঞানে তাৎপর্য, এ কথাটি অদ্বৈতবাদীরা ছাড়া আর কেউ মানেন না।

এখন আপত্তি হতে পারে, কর্ম বা উপাসনায় যেমন বিধি আছে, জ্ঞানেতেও তো সেই রকম বিধি আছে, বলা যেতে পারে। আত্মাকে 'দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' বলা হয়েছে। 'তব্য' প্রত্যয়ের মানে—করা উচিত, করবে,—বিধিলিঙ্। বিধির চিহ্ন—'তব্য' প্রত্যয়—সেখানে রয়েছে, তা হলে সেখানেও তো বিধিরই কথা। এই আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, না, ঐ সব জায়গায় বিধি কিছু নেই। আত্মাকে জানবে, এরকম বিধান দেওয়া যায় না। কারণ, আত্মাকে জানবার জন্য মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে, যে-প্রবৃত্তি তার সহজাত—সে-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করবার জন্য কোন বিধির প্রয়োজন নেই। যেমন, 'সুখম্ অনুভবেৎ', সুখ অনুভব করবে এরকম কোন বিধি হয় না। মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই সুখ অনুভব করে। ঠিক সেই রকম আত্মস্বরূপের যে জ্ঞান, তার জন্য কোন বিধির প্রয়োজন নেই। তা হলে 'দ্রষ্টব্যঃ' ইত্যাদি কথা বলা হল কেন? অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এগুলি বিধির ছায়া, বিধি নয়, অর্থাৎ দেখতেই বিধির মত, আসলে বিধি নয়। কারণ, এই আত্ম-স্বরূপানুভূতি, এতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। মানুষ তার স্বরূপকে সর্বদা চাইছে। যেহেতু সে আত্মা, সেই হেতু সে নিজের স্বরূপকে

প্রকাশ করতে, অনুভব করতে, তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে আপনা থেকেই চায়। তবে আত্মস্বরূপে সে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারছে না, কারণ কতকগুলি প্রতিবন্ধক রয়েছে। বিধিচ্ছায়াপর বাক্যগুলির প্রয়োগ শুধু সেই প্রতিবন্ধকগুলি দূর করবার জন্য। আত্মস্বরূপের অনুভবের পরিপন্থী মনের যে-সব সংস্কার বা বৃত্তি আছে, সেগুলিকে নিরস্ত করবার জন্যই ঐ 'তব্য'-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয়েছে। ওগুলি বিধি নয়।

তারপর বিচার্য এই যে, উপক্রম-উপসংহারাদি যে ছ'টি উপায়ে বেদের তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়, আগে বলা হয়েছে. মীমাংসকদের সেই প্রণালী, জ্ঞানকাণ্ডেও প্রয়োগ করা যায় কিনা। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, হ্যাঁ, তা করা যায়। শংকর তাঁর ভাষ্যে এটি বিস্তার করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন যে, এই আত্মজ্ঞানের কথা উপক্রমে বলা হয়েছে, উপসংহারে বলা হয়েছে, পুনঃপুনঃ তার উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ অভ্যাস আছে। আছে অপূর্বতাও—অপূর্ব এই জন্য যে, এই জ্ঞানটিকে আর অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। ফলও বলা আছে যে, আত্মজ্ঞানেতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং আনন্দের প্রাপ্তি। অর্থবাদ আর উপপত্তিও জ্ঞানেই যে বেদের তাৎপর্য, এই সিদ্ধান্তের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং কর্মেই সমস্ত বেদের তাৎপর্য মীমাংসকদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা মীমাংসকদের প্রণালীকে পূর্ণরূপে স্বীকার করেও, সিদ্ধান্তে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা আরও বলেন যে, মীমাংসকরা যে এই সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলে বলেন, তারও কোন যুক্তি নেই। যা যা তাঁরা এর বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন সেগুলি সব খণ্ডন করা যায় এবং শঙ্করাচার্য তা খণ্ডন করে দেখিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, কথাটা তো তিনি সূক্ষ্ম যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন; কিন্তু আর একজন আবার সূক্ষ্মতর যুক্তি প্রয়োগ করে তাঁর যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করবে কি না। শঙ্কর এ বিষয়ে গোঁড়া নন। তিনি বলছেন—হ্যাঁ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না আমার যুক্তি খণ্ডিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমি আমার সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকব না কেন? তারপরে শঙ্কর বলছেন—তিনিও বোঝেন, তাঁর যুক্তি খানিক দূর যেয়ে তার পরে যেন আর দাঁড়াবার মত ভূমি পায় না। যুক্তি কতদূর অবধি যেতে পারে? —না, যতদূর উপাধির নিবৃত্তির ক্ষেত্র। যুক্তির কাজ হচ্ছে আরোপের নিরাকরণ। আত্মবস্তুর উপর যত অনাত্মধর্ম আরোপিত হয়েছে, এই আরোপগুলির ক্রমাগত নিরাকরণ, নিবারণ করে যাওয়া—যাকে শাস্ত্রে 'অপবাদ' বলে। তারপর আমাদের যুক্তি থেমে যায়। কারণ, তারপর যুক্তির আর কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাকে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তা হলে আত্মবস্তুর প্রতিষ্ঠা কি করে হবে? যুক্তির ভেতর দিয়ে হবে? না। আত্মতত্ত্ব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তা হলে তা কি অপ্রতিষ্ঠ? না। অপ্রতিষ্ঠ নয়, স্বপ্রতিষ্ঠ—নিজে প্রকাশমান। সুতরাং তাকে আর অন্য উপায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হয় না। যেমন সূর্যকে দেখবার জন্য প্রদীপের দরকার হয় না। সূর্য স্বপ্রকাশ এটি ধরে নেওয়া হল, মানুষের ব্যাবহারিক দৃষ্টি দিয়ে শব্দ প্রয়োগ করে। কারণ এক আত্মবস্তু ছাড়া তত্ত্বতঃ আর কিছুই স্বপ্রকাশ নয়—'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—সূর্যাদি সব কিছু আত্মজ্যোতিতেই প্রকাশিত। তবে একটা লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আত্মতত্ত্ব বোঝান হচ্ছে—যেহেতু সূর্য নিজে স্বপ্রকাশ, এই জন্য তাকে প্রকাশ করবার জন্য আর একটা আলোর দরকার হয় না। ঠিক সেই রকম যেহেতু আত্মা

স্বপ্রকাশ, সেই জন্ম তাঁকে প্রকাশ করবার জন্ম আর কোন আলোর, আর কোন যুক্তির, কোন তর্কের প্রয়োজন হয় না।

উপনিষদ্ বলছেন, 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বেমহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি (ছান্দোগ্য উ. ৭।২৪)—সেই আত্মতত্ত্ব কোথায় প্রতিষ্ঠিত? না, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অথবা তাও বলা যায় না। এর তাৎপর্য কি? যদি বলা যায় স্বমহিমা - তাঁর নিজের মহিমা— সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তাহলে তিনি আর তাঁর মহিমা কি দুটি ভিন্ন বস্তু? যেমন 'গৃহস্বামী' বললে গৃহ আর তার স্বামী বা অধীশ্বর—ভিন্ন বোঝা যায়, তেমনি তিনি ও তাঁর মহিমা—দুটি কি ভিন্ন? না, তা নয়। কাজেই 'স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত' বলতেও বাধছে। উপনিষদ্ তাই বলছেন, তাও না বলো যদি, বলো তিনি স্বমহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত নন। এই রকম করে খুব বিশ্লেষণ করে, যেন ভয়ে ভয়ে আত্মস্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছে- খুব যুক্তির সাহায্যে এবং একথাও স্পষ্টভাবে স্বীকার করে যে, আত্মতত্ত্ব যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না, হোতে পারে না। তাই বলে সেটি অপ্রতিষ্ঠ নয়। এ দুটি কথা সঙ্গে সঙ্গে বলতে হচ্ছে। না বললে যেন পূর্বপক্ষের মতের সমর্থন হয়ে যায়। পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্তীকে বলছেন: তর্ক তোমার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। সিদ্ধান্তী: ঠিক কথা,— পারছে না। পূর্বপক্ষ: তা যদি না পারে, তাহলে তোমার সিদ্ধান্ত অপ্রতিষ্ঠ। অপ্রতিষ্ঠ সিদ্ধান্ত বাচালতা মাত্র, উন্মাদের প্রলাপ মাত্র। সিদ্ধান্তী: না, তা নয়—এটি স্বপ্রতিষ্ঠ। এর বিপরীত যা কিছু তোমরা বলো আত্মধর্ম বলে, সেগুলি যে আত্মধর্ম নয়, একথা প্রমাণ করতে পারি। অর্থাৎ সব রকমের আরোপের অপবাদ করতে পারি, নিরসন করতে পারি। তোমার সিদ্ধান্ত সহজে খণ্ডন করতে পারি। আর আমার সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার কথা যদি বলো, সে চেষ্টা আমি করিনি। কারণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, সে স্বপ্রতিষ্ঠ বলে।

সিদ্ধান্তীর এই কথাটি দার্শনিকতার দিক দিয়ে খুব প্রয়োজনীয় কথা, খুব ব্যাবহারিক কথা। যাঁরা পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আলোচনা করেছেন তাঁরা জানেন Bradley তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Appearance and Reality-তে (একটি গ্রন্থ, তার দুটি ভাগ— ১। Appearance ২। Reality) appearance-এর কথা বলেছেন অর্থাৎ যা কিছু আমরা দেখছি তা যেমন ভাবে দেখছি, সেটি তেমন নয়। মাত্র প্রতীতি হচ্ছে; appearance তার আছে, কিন্তু সত্যকে সেখানে আমরা অনুভব করছি না সত্যরূপে। এই কথাটুকু যে নিখুঁত যুক্তির সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন তা অপূর্ব! ভারি সুন্দরভাবে তিনি ঐ গ্রন্থের আর্ধেকটিতে appearance-কে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তার পরে তাঁর মনে হল যে, তা হলে সত্য কি, তা তো বলতে হয়। সেই চেষ্টা করলেন Bradley Reality-অংশে। তা পড়ে আমাদের মনে হয় তাঁর সে চেষ্টা যে খুব সার্থক হল, তা নয়। তার কারণ হচ্ছে, সে চেষ্টা কারো পক্ষেই সার্থক হয়নি। অনেক চেষ্টা করেও আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে পারছি না। সত্যের একটা সর্ববাদিসম্মত লক্ষণ পর্যন্ত বার করতে পারছি না। এই যে আমাদের অসামর্থ্য, এর ফলে বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। যুক্তি খুব কাজ করে, খুব উপযোগী হয় ঐ বিভ্রান্তিকে দূর করবার জন্য, অর্থাৎ আত্মায় আরোপিত ধর্মকে অপবাদ বা খণ্ডন করবার জন্য — নিরস্ত করবার জন্য। কিন্তু তার পর? তার পর বলছেন, 'শান্তোঽয়ম্ আত্মা'— এই আত্মা শান্ত, সমস্ত প্রবৃত্তিশূন্য। যখন সমস্ত আত্ম-ধর্মের অপবাদ অর্থাৎ নিরাকরণ করা হয়ে গেল,

তার পরে আর যুক্তির করণীয় কিছু রইল না। কোন বস্তু যদি আলোর ক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়ে, তা হলে সে প্রকাশিত হয়। যদি বস্তু না থাকে, তা হলে আলো কাকে প্রকাশ করবে? – প্রকাশ্য যদি না থাকে তো কাকে প্রকাশ করবে? প্রকাশ যদি কাকেও না করে, তা হলে সে নিজেকে প্রকাশ করবে কি? তারই উত্তরে— ঐ বলা হয়েছে, 'স্বেমহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি'। নিজেকে নিজেই প্রকাশ করলে, সে প্রকাশক ও প্রকাশ্য —দুই-ই হল। কিন্তু দুটো এক সঙ্গে হয় না। যে কর্তা, সে কর্ম হয় না। কাজেই নিজেকে প্রকাশ করে, এ কথা বলা যায় না। আর প্রকাশক অন্য কেউই নেই। সুতরাং, কি হবে? বলছেন, তা হলে কি 'জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গ' হবে?— সমস্ত জগৎটা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, আসল বস্তুকে জানাই যাবে না? তা হলে কি বলতে হবে— The thing is unknown and unknowable?— Reality, আত্মবস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়? না, তা নয়। যে বস্তু সদা প্রকাশশীল, তাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলা চলে না। আত্মবস্তু জ্ঞেয়ও বটে, জ্ঞেয় না-ও বটে— দুই-ই। জ্ঞাতও বটে, জ্ঞাত না-ও বটে। কি রকম? 'ন বেদেতি বেদ চ' (কেন উ. ২।২)— এই কথা। 'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি/নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্' (কেন উ. ২।১)— যদি মনে কর ব্রহ্মকে তুমি ভাল করে বুঝেছ, তা হলে ব্রহ্মের সম্বন্ধে তুমি অল্পই বুঝেছ। 'নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ' (কেন উ. ২।২)— আমি মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে ভাল করে জেনেছি; আমি এরকমও মনে করি না যে, ব্রহ্মকে আমি জানি। 'ব্রহ্মকে আমি জানি এবং জানি না'— এ তো হেঁয়ালির কথা, এ তো পাগলের কথা। 'জানি এবং জানি না'— দুটো কখনও একবস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য হোতে পারে না। হয় বল 'জানি', না হয় বল 'জানি না', না হয় বল 'আমার জ্ঞান সংশয়-জ্ঞান'। এই তিন রকম ছাড়া চতুর্থ রকমের কিছু থাকতে পারে না।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঐ তিনটির কোনটিই প্রযোজ্য নয়। তাঁকে আমি জানি', এ কথা বলতে পারি না কারণ, জানা মানে জ্ঞানের বিষয় করা,— তিনি কখনও বিষয় নন। 'জানি না' বলতে পারি না কারণ, নিত্য বস্তু, নিত্য প্রকাশমান বস্তুকে 'জানি না' কি করে বলব? 'ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে'. (বৃহ. উ. ৪।৩।২৩)— দ্রষ্টার যে দৃষ্টি, তার কখনও বিলোপ হয় না। সুতরাং, তাঁকে জানি না একথাও বলতে পারি না। আর সংশয়-জ্ঞান সাধারণতঃ হোলেও, সকলেরই যে হোতে হবে, এরকম কোন যুক্তি নেই। কারুর না কারুর অসন্দিগ্ধ আত্মসাক্ষাৎকার হচ্ছে। অতএব অদ্বৈত-বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম এমন এক বস্তু যাকে বেদ সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করতে পারে না। তা হলে 'সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি' কেন বলা হল?— এই জন্য বলা হল যে, ব্রহ্ম বা আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যে ভ্রান্তি আছে, তার অপসারণে সমস্ত বেদ উপযোগী এই অর্থেই বুঝতে হবে যে, সমগ্র বেদ তাঁর কথা জানাচ্ছে। আর আত্ম-তত্ত্বকে জানবার জন্য যা কিছু আমরা করছি— 'তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি / যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি'— যত কিছু তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন, ইন্দ্রিয়-সংযম কায়িক, বাচিক, মানসিক, এ সবের তাৎপর্য এইখানে মাত্র যে, এগুলি আমাদের অনাত্ম-ভ্রম দূর করে দেবে। এ ছাড়া এদের স্বয়ং সার্থকতা আর কিছুই নেই। সাক্ষাৎভাবে এদের কোন উপযোগিতা নেই; এটুকু মনে রাখা আমাদের খুব দরকার। এটি মনে থাকলে আমাদের আর তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সাধনের অহংকার থাকবে না। কারণ, অহংকার কি নিয়ে করব? যেগুলি নিয়ে করব, সেগুলি স্বয়ং সার্থক

নয়। স্বতঃ তাদের কোন দাম নেই। সেগুলি যেহেতু আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের আবরণের অপসারণে সহায়ক, এই জন্যই তারা প্রয়োজনীয়, যতদূর সেই কাজে তারা সহায় হবে, ততদূর তাদের সার্থকতা। আমাদের ভাবতে হবে— আমাদের সেই আবরণ কি অপসারিত হয়েছে? তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে একথা বলার কোন সার্থকতা নেই যে, আমার সাধন আছে, আমি সাধনসম্পন্ন।

আত্মতত্ত্বের উপদেশ করতে যেয়ে যমরাজ কেন ওঙ্কারের উল্লেখ করলেন, তা সংক্ষেপে আগেই বলেছি। এই ওঙ্কারের কথা পরবর্তী দু'টি মন্ত্রে বিশদভাবে বলা হয়েছে।*

* ২২শে জুন ১৯৭৫, রবিবার প্রাতে কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা। শ্রীসমীর-কুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন†

ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়*

প্রথম পর্ব: বৈদিক সমাজে নারীর উচ্চস্থান এবং পরবর্তী কালে ক্রমিক অবনমন

(১)

স্বাধীনতালাভের পর অতি সম্প্রতি আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সংবিধান নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও অধিকারগত ভেদ স্বীকার করে না। উভয়েই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, উভয়েরই এককালীন একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। উভয়েই যে কোনও সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হবার অধিকার রাখে। তাই বর্তমানে দেখি আমাদের দেশের রাষ্ট্রের নেতৃপদে যিনি অধিষ্ঠিত তিনি একজন মহিলা। আই. এ. এস চাকুরীতে মহিলারা সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করে নানা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হন। শিক্ষায় অসামান্য অধিকার লাভ করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন।

স্বাধীনতার পূর্বে কিন্তু এ অবস্থা ছিল না। অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে সমাজে নারীজাতির উন্নয়নের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। সে আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। তার আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দুনারীর অবস্থা দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।

অতি প্রাচীনকালে কিন্তু অবস্থা এমন ছিল না। ঠিক বলতে কি বৈদিক যুগে ভারতীয় নারীর অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। একরকম বলা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও অধিকারগত ভেদ ছিল না। পরে দেখি, স্মৃতির যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক অধিকারে বৈষম্য অনুপ্রবেশ করেছে। আরও পরবর্তী কালে দেখি নারীর অবস্থা আরও অধঃপতিত হয়েছে। নারী এই অবস্থায় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা' ১৯৭৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ (১৯৭৫) উপলক্ষ্যে এই বক্তৃতামালা ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।—সঃ

* প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পুরুষের বহুবিবাহে অধিকার স্বীকৃত, নারীর নয়। বিধবা হলে নারী নিতান্তই দাসীর অবস্থায় অবনমিত হয়। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর চিতায় আরোহণ করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয়। শিক্ষা হতে সে একরকম বঞ্চিত। কারণ গৌরীদান প্রথা প্রচলিত হওয়ায় বাল্যকালেই তার বিবাহ হয়ে যায় এবং তার পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়হীন পুরুষসমাজে আদৌ অনুভূত হত না।

সুতরাং ভারতীয় হিন্দুসমাজে মহিলাদের অধিকার-প্রসঙ্গে আমরা নানা অবস্থা দেখি। প্রথমে দেখি নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করছে। তারপর দেখি স্মৃতির যুগে তার অবস্থা খানিকটা অবনমিত হয়েছে। পরবর্তী কালে মধ্যযুগে নারীর অবস্থা চূড়ান্তভাবে অবনমিত হয়েছে। পরবর্তী কালে নানা মহাত্মার আনুকূল্যে এক দীর্ঘকালস্থায়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারী নিজের জন্মগত অধিকারে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্দোলনের আরম্ভ রামমোহন যখন সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন তখন হতে এবং ভারতের স্বাধীনতালাভের পর যখন ডঃ আম্বেদকার রচিত হিন্দুকোড ভারতীয় লোকসভায় পাশ হয়, তখন তার সমাপ্তি।

এই আন্দোলনে বহু উদারহৃদয় মহিলা ও পুরুষ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। পুরুষ-প্রভাবিত সমাজে নারীর এই চূড়ান্ত দুর্দশা মোচনের প্রয়োজনীয়তা পুরুষের মনে সাধারণত অনুভূত হয় না। অধঃপতিত সমাজে পুরুষের স্বার্থ একদিন নারীকে পুরুষের ভোগের পাত্রী ও সেবাদাসীরূপে পরিণত করেছিল। এই সামাজিক সুবিধা দীর্ঘকালস্থায়ী আচরিত প্রথা হিসাবে সমাজে অনেক দিন অনুমোদিত হয়ে আসছিল। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাবোধ আপনা হতে জাগে না। তার জন্য প্রয়োজন লুপ্ত সমাজচেতনা ও বিবেককে বাহির হতে আঘাতের। তা এসেছিল একটি অভাবনীয় পথে — একটি আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে ঘটনাচক্রে ইংরেজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। আরও এক বিস্ময়কর ব্যাপার, এ সাম্রাজ্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়নি, হয়েছিল একটি বণিকগোষ্ঠী দ্বারা। যাই হোক, শাসনকে সুচারুরূপে পরিচালিত করতে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এক্ট পাশ হল। সপরিষদ এক গভর্নর জেনারল-এর তত্ত্বাবধানে সাম্রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা হল এবং বিচার বিভাগের কাজ নিষ্পন্ন করবার জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হল।

তার ফল হল সুদূরপ্রসারী। এতদিন রাজকার্য নিষ্পন্ন হত মধ্যযুগের প্রথায়। ফার্সি ছিল সরকারের সহিত যোগাযোগের এবং বিচারালয়ের ভাষা। এখন ইংরাজী ভাষার ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হল। অতিরিক্তভাবে ইংরেজ হল এক নূতন সংস্কৃতির বাহক। এই সংস্কৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তা বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নির্মাণ করতে শিখেছে, যন্ত্রে সুতা উৎপাদন করতে ও বস্ত্র বয়ন করতে শিখেছে। তা সতেজ, নব যৌবনে উদ্দীপিত। অপর পক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি জরাগ্রস্ত, নানা সংস্কারের বন্ধনে নিপীড়িত এবং এক অচলায়তন গড়ে সমাজ-জীবনকে একান্তভাবেই স্তিমিত করে দিয়েছে। জরার শৈথিল্য হতে জাগাতে, নিদ্রার নিস্তেজ ভাব দূর করতে আঘাত হানবার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবার ক্ষমতা ধারণ করে এই তরুণ সংস্কৃতি। এদেশে যখন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে এই নূতন সংস্কৃতির ধারকের

উপর এদেশের শাসনভার অর্পিত হল, তখন সেই সঙ্গে ইংরাজী-চর্চার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। ভাষা ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে এই নূতন হাওয়ার ভারতের মানুষের মনে অনুপ্রবেশ ঘটল।

তার ফলে যা ঘটল তাকে আমরা বলে থাকি বাংলার 'রেনেসান্স'। 'রেনেসান্স' এর অর্থ হল নবজাগরণ। তা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল মধ্যযুগের শেষে যখন ফ্লোরেন্সে প্রাচীন লুপ্ত গ্রীক সংস্কৃতি আবার নূতন করে বিকাশ লাভ করেছিল। গ্রীক সংস্কৃতি যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-সমন্বিত। বর্তমান ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি তারই উত্তরাধিকারী। এক্ষেত্রে ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা ঘটেছিল তাকে নবজাগরণ বলা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যা ঘটেছিল তাকে কিন্তু ঠিক নবজাগরণ বলা যায় না। এখানে যা ঘটেছিল তা স্বতন্ত্র জিনিস। একটি প্রাচীন জরাগ্রস্ত সংস্কৃতি একটি প্রাণবান তরুণ সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষে এসে জেগে উঠেছিল। তা নবীন সংস্কৃতির মধ্যে যা ভাল পেয়েছিল তা গ্রহণ করেছিল। প্রাচীনকেও সম্পূর্ণ বর্জন করেনি; তার মধ্যে যা বর্জনীয় নয় তাকেও রেখেছিল। ফলে যা গড়ে উঠেছিল তা হল দুই বিভিন্নধর্মী সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত এক নূতন সংস্কৃতি। তাই হল নবভারতের সংস্কৃতি। এই সংঘাতের ফলে যে নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাতে যাঁরা মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের তথা ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এঁদের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় বেশ ত্যাগ করে নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। এই সংঘাতের প্রভাব সমাজের সকল বিভাগে নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের আন্দোলনরূপে বিস্তার লাভ করেছিল। ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য স্বদেশচেতনা এবং নারীসমাজের উন্নয়ন—সব দিকেই তা পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু হল এই ব্যাপক আন্দোলনের একটি দিক—নারী-সমাজের উন্নয়ন বিষয়ক আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ইংরেজের মাধ্যমে নবীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতেরই ফলশ্রুতি। পাশ্চাত্য সমাজে নারী পর্দাপ্রথা হতে মুক্ত ছিল, নারীকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত করা হত না। এই অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা চোখে দেখেও অনেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ত তাঁর সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে এই প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করতে পাঠিয়েছিলেন।

নারী-উন্নয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত হয় রামমোহন থেকে। তাঁর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেকালের প্রচলিত নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার প্রতি এবং তা রহিত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁরই দর্শিত পথের অনুসরণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীজাতির উন্নয়নের এবং পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন আন্দোলন করেন। নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা খুবই ব্যাপক ছিল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অনেক মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা ছিল। এই

প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের মনেও ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ-চিন্তায় নারীসমাজের দুর্দশামোচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উদয় হয়েছিল। এর জন্যই তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে কলিকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। নারীজাতির উন্নয়ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

এই আন্দোলন বিংশ শতাব্দীতেও উপচে পড়েছিল। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকাল-ব্যাপী আন্দোলনের ফলে যদিও নারীসমাজের কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল তবু নারীকে আপন অধিকারে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আরও কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক জুড়ে এই আন্দোলন চলেছিল। তারপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে জাতির মুক্তি-আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলনরূপে দেশের সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর এবং তারই আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে হিন্দু কোডে নারী-সমস্যারও একরকম নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে যাঁরা নারী-উন্নয়ন আন্দোলনকে সজীব রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার নাম প্রথমেই মনে আসে। তারপরে যাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের দুজন হলেন একই পরিবারের সন্তান এবং পরস্পর ভগিনী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এঁরা হলেন দুর্গামোহন দাশের কন্যা সরলা রায় ও অবলা বসু। সরলা রায়ের স্বামী ছিলেন ডঃ প্রসন্নকুমার রায় এবং অবলা বসু ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। আরও একজন শিক্ষাব্রতী নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন আচার্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এ বিষয়ে পারিবারিক আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরই পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপদেশে প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন।

আমরা এখন সংক্ষেপে দেখাব ভারতীয় সমাজে প্রাচীন কাল হতে কেমন ভাবে ক্রমশ নারী উচ্চস্থান হতে ভ্রষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে লোকাচার ও পুরুষের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সমাজে অধঃপতিত হয়েছিল। এই অধঃপতনের বেদনাদায়ক ইতিহাস তিনটি অধ্যায় দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমে দেখি বৈদিক যুগে নারী সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। পরের অধ্যায়ে দেখি নারী সম্বন্ধে সমাজের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে এবং ফলে সমাজে নারীর স্থান অনেক নীচে নেমে এসেছে। এটিকে স্মৃতির বা মনুর যুগ বলতে পারি। পরবর্তী কালে দেখি নারীর দুর্দশা চরম সীমায় অবনমিত হয়েছে। তখন পর্দাপ্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে। পতি তখন নারীর একমাত্র গতিতে পরিণত হয়েছে। এমন কি পতির মৃত্যুর পর একই চিতায় আত্মাহুতি দেওয়াকে এক উৎকৃষ্ট আদর্শরূপে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমান ভাষণে এই দুঃখকর ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রস্তাব করি।

(২)

আমরা দেখি বৈদিক যুগে নারী সমাজে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করত এবং এমন অনেক অধিকার ভোগ করত যা হতে তাকে পরবর্তী কালে বঞ্চিত করা হয়। এ বিষয়ে তথ্য বৈদিক সাহিত্য হতেই পাওয়া যাবে।

আমরা জানি নারীকে সহধর্মিণী বলে। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুন্দর। সংসারে পুরুষ ও

নারী সংসারধর্ম পালনে পরস্পর সহায়ক। তাই স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী। বৈদিক যুগে নারী সত্যই সহধর্মিণীর ন্যায় আচরণ করত। সেকালে যজ্ঞ-নিষ্পাদন ছিল ধর্মের বিশিষ্টতম অঙ্গ। আমরা দেখি বেদের একাধিক সূক্তে উল্লেখ আছে যে, নারী ও পুরুষ একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৩-তম সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে এই উক্তিটি পাই :

"হে ইন্দ্র, মর্ত্য হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে স্ত্রী-পুরুষে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে।" (১।১৭৩।২)

এ হতে অনুমান করা যায় যে নারী ও পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করতেন। উভয়েরই হোতা হবার অধিকার ছিল।

পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছে :

"যখন তুমি (অগ্নি) দম্পতীকে একান্তঃকরণ করে দাও, তখন তারা তোমাকে বন্ধুর মত গব্য দ্বারা সিক্ত করে।" (৫।৩।২)

এ থেকে মনে হয় বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করবার অধিকার ছিল। এর থেকে আমার মনে হয়, সেকালে পুরুষের মত নারীর একাধিক সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল ; তা না হলে নারীর যজ্ঞ করবার অধিকার কি করে আসে ?

আমরা জানি পুরুষের জন্য অন্নপ্রাশন হতে বিবাহ পর্যন্ত দশটি সংস্কার এখনও চালু আছে। অপর পক্ষে বিবাহই নারীর একমাত্র সংস্কার-রূপে স্বীকৃত। এ যে শুধু অনুমান, তা নয় ; এর সপক্ষে কিছু লিখিত প্রমাণও পাওয়া যায়।

নির্ণয় সাগর প্রেস হতে যে মনুস্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে তার পরিশিষ্টে মনুর উক্তি বলে প্রচলিত কতকগুলি শ্লোক দেওয়া আছে। এই শ্লোকগুলি বোধায়ন সূত্রেও আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল এই শ্লোকটি :

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা॥

এ হতে বোঝা যায়, প্রাচীন কালে মেয়েদের জন্য মৌঞ্জীবন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নকেও সূচিত করে। তাদের সাবিত্রী মন্ত্রজপ এবং অধ্যাপনেরও অধিকার ছিল। গুরুর কাছে শিক্ষা না পেলে এ সব অধিকার স্থাপিত হবে কি করে ? সুতরাং এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কারে পুরুষের যেমন অধিকার আছে নারীরও বৈদিক যুগে তেমন অধিকার ছিল। পরে অনুদার দৃষ্টি প্রণোদিত হয়ে পুরুষচালিত সমাজ নারীকে সে সব অধিকার হতে বঞ্চিত করে কেবল মাত্র বিবাহ সংস্কারকেই অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছে। তার কারণও স্পষ্ট ; নারীর জন্য এই সংস্কার স্বীকৃত না হলে পুরুষেরও ত বিবাহ হয় না।

বৈদিক যুগে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দুকোড প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ ছিল। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন। এমন কি বেদের সূক্ত অংশেও পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সংখ্যক সূক্তটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সূক্তটির দেবতা হলেন সপত্নীবাধন অর্থাৎ যে দেবতা সপত্নীকে বাধা করে বা অপসৃত করে। তা হতেই বোঝা যায়, সে কালেও বিবাহিত নারী সপত্নীদ্বারা পীড়িত হত এবং অতিষ্ঠ হয়ে দেবতার কাছে অপসারণ প্রার্থনা করত। আরও কৌতুকের কথা, এই সূক্তের ঋষি হলেন নিজেও মহিলা, নাম ইন্দ্রাণী। নারী না হলে নারীর সমস্যা কে

ভাল রকম অনুভব করবে? এখন সূক্তের প্রাসঙ্গিক অংশটির অনুবাদ উপস্থাপিত করা যেতে পারে:

"হে ওষধি, তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায় স্বরূপ তোমার তেজ অতি তীব্র; তুমি আমার সপত্নীকে দূর করে দাও।" (১০।১৪৫।২)

সেকালে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে কেউ আশ্চর্য হবে না; কিন্তু নারীর বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে অনেকেই নিশ্চিত অবাক হবেন। কিন্তু সে প্রথারও যে প্রচলন ছিল, বৈদিক সাহিত্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অষ্টম মণ্ডলের ২৯ সূক্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে প্রসঙ্গত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে এবং তাঁরা যে একই সঙ্গে বাস করতেন একথা সরসভাবে বোঝাতে একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করলে উপমাটির পরিচয় সহজেই মিলবে। বলা হয়েছে:

"দুই জন অশ্বী, একই স্ত্রীর সহিত বাস করেন এমন দুই পুরুষের মত এক সঙ্গে বাস করেন।"

(৮।২৯।৮)

উপমা সংগৃহীত হয়, কল্পিত নয়, বাস্তব অবস্থায় দৃষ্ট ঘটনা থেকে। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, একই নারীর একাধিক স্বামী বৈদিক যুগে থাকা সম্ভব ছিল।

আমার মনে হয়, বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদে একটি সূক্ত পাই যেখানে একটি মৃত পুরুষ এবং তার বিধবা পত্নীর কথা বলা হয়েছে। সেখানে যে বর্ণনা আছে, তাতে দেখা যায়, মৃত স্বামীকে ভূমিতে প্রোথিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে; এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে সমাধিস্থ করা হলে বিধবা পত্নীকে সংসারে ফিরে যেতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সূক্তটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে মনোমত পতি লাভ করে অঞ্জন ও ঘৃতে স্পৃষ্ট হয়ে গৃহে প্রবেশ করুন।" (১০।১৮।৭)

"হে নারী, সংসারে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যে তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিল, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা হয়েছে।" (১০।১৮।৮)

এ হতে স্পষ্টই বোঝা যায় পতির মৃত্যুর পর পত্নীকে আবার বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন করতে উপদেশ দেওয়া হত। পতির মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি কর্তব্য শেষ হয়ে যায়, কাজেই বৈধব্য জীবন যাপন করা অর্থহীন এমনই একটা ধারণা সেকালে সমাজজীবনে ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়।

হিন্দুর চোখে ঋষির স্থান সবার উচ্চে; কারণ তিনি বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। আমরা দেখি ঋগ্‌বেদে যে অসংখ্য সূক্ত আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্ত্রের ঋষির নাম মহিলা বলে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে তার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে:

১। ১ম মণ্ডল ১৭৯ সূক্তের দেবতা রতি, ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা,

২। ৫ম মণ্ডল ২৮ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা;

৩। ৮ম মণ্ডল ৯৬ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, ঋষি অত্রিকন্যা অপালা;

৪। ১০ম মণ্ডল ৩৯ ও ৪০ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, ঋষি কক্ষীবৎ-কন্যা ঘোষা;

৫। ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্তের দেবতা আত্মা, ঋষি অম্ভৃণ-কন্যা বাক্;

৬। ১০ম মণ্ডল ১৪৫ সূক্তের দেবতা সপত্নী-বাধন, ঋষি ইন্দ্রাণী।

সুতরাং আমরা উপরের তালিকাতে ছয় জন

মহিলা ঋষির নাম পাই। তাঁরা হলেন লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, বাক্ ও ইন্দ্রাণী। এঁদের মধ্যে বাক্ ঋষির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ সূক্তের মধ্যে গভীর তত্ত্বকথা আছে। পরবর্তী কালে উপনিষদের যুগে ব্রহ্ম বা আত্মার যে পরিকল্পনা বিকাশলাভ করেছিল এই সূক্তে বীজাকারে তার চিন্তা নিহিত আছে। এর মূলকথা হল আত্মা সর্বব্যাপী। পুরাণের যুগে এই সূক্তটিকে বৈদিক দেবীসূক্ত বলে গ্রহণ করে শক্তিপূজক তার মহত্ত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমরা দেখি বৈদিক যুগে যেমন নারীকে সূক্তরচনার ভার দিয়ে তার সর্বাপেক্ষা সম্মানের কাজে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, উপনিষদের যুগেও তার সেই মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় অনুরাগী দুই মহিলার উল্লেখ পাই। প্রথমা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী। তিনি স্বামীর সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী হতে চেয়েছিলেন। এই কাহিনী বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তা সেকালের নারীর পরা বিদ্যার প্রতি আকর্ষণের পরিচয় দেয়। তা বলে যে, তখন তাদের চিন্তা এবং ভাবনা সংসারকে অতিক্রম করে দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হত।

অপর মহিলাটির নাম হল গার্গী। একই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাঁর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সেকালে জনক রাজা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার জন্য বিতর্ক-সভা ডাকতেন। তাতে বিখ্যাত দার্শনিকরা নিমন্ত্রিত হয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। যিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে প্রমাণিত হতেন, তাঁকে রাজা পুরস্কৃত করতেন। আমরা দেখি এই বিতর্ক-সভায় গার্গীই যাজ্ঞবল্ক্যের সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নিয়েছেন। সুতরাং সে যুগে নারী ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করত এবং সে বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে খ্যাতিও অর্জন করত। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, নারীর বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি সেযুগে পুরুষের সহিত সমান বলেই স্বীকৃত হত।

আমাদের একটা ধারণা আছে যে, মধ্যযুগে লীলাবতী নামে এক মহিলা ছিলেন যিনি গণিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর সত্যতা নাই। প্রকৃত সত্য হল এই: বিজ্জবিড বা বর্তমান বিজাপুরের অধিবাসী ভাস্করাচার্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবত প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' চারভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি ভাগের একটি নাম দেওয়া হয়েছিল: লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহগণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়। সুতরাং লীলাবতী একটি গ্রন্থের একটি খণ্ডের নাম। কেন লীলাবতী নামকরণ হল সে বিষয়ে দুইটি কিংবদন্তী আছে। প্রথমটি বলে লীলাবতী ভাস্করাচার্যের বালবিধবা বা অনূঢ়া কন্যা ছিলেন এবং পিতা তাঁর নামেই এই নামকরণ করেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে তাঁর নিঃসন্তান পত্নী লীলাবতীর নামে এই নামকরণ। এই প্রসঙ্গে রমাতোষ সরকার প্রণীত, 'প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা' দ্রষ্টব্য।

(৩)

মনুর যুগে অর্থাৎ স্মৃতির যুগে সমাজে নারীর অবস্থা অনেক অবনমিত হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছু কিছু সুবিধা যে তখনও ছিল না, তা নয়। এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা মনুসংহিতার কাল সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নিতে পারি। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। তবে মনে হয় তা মহাভারতের পূর্বে রচিত। দেখা যায় মহাভারতে মনুস্মৃতির ২৬০টি শ্লোক উদ্ধৃত

হয়েছে। অবশ্য বলা যেতে পারে মনু মহাভারত হতে তা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংখ্যায় এত বেশী হওয়ায় এবং মনুসংহিতার কথা মহাভারতে উল্লিখিত থাকায় প্রথমটি ঘটারই বেশী সম্ভাবনা। প্রাচ্যবিদ্যাচার্য বেরিডেল কীথ-এর মতে মনুস্মৃতি খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হতে খ্রীষ্টাব্দ ২০০-এর মধ্যে রচিত হয়ে থাকবে। (A. Berriedale Keith, Sanskrit Literature, Part III, Chap. XII, Sec. 2)

মনুর কালে নারীকে সম্মান দেখাবার উপদেশ পাই। মনু বলছেন:

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
(৩।৫৬)

—অর্থাৎ যেখানে নারীগণ পূজিতা হন সেখানে দেবগণ প্রসন্ন হন ; যেখানে তাঁরা পূজিতা হন না, সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল।

তার যে একটা কারণ ছিল না, তা নয়। গার্হস্থ্য জীবনের শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্যের মেরুদণ্ড হল নারী। পরিবারের পরিবেশটি তারই আনুকূল্যে গড়ে ওঠে। তার কোলে সন্তান এলে সংসার আনন্দমুখরিত হয়। তার তত্ত্বাবধানে গৃহের শ্রী বর্ধিত হয়। সেটা সম্ভব করতে প্রয়োজন নারীর মনকে খুসী রাখা। তাই মনু বলছেন:

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥
(৯।২৬)

—অর্থাৎ সন্তানের জননী হিসাবে এবং গৃহের দীপ্তি হিসাবে নারী সদ্ব্যবহার পাবার অধিকারিণী। তাই মনুর মতে স্ত্রীর সঙ্গে শ্রীর কোনও পার্থক্য নাই।

তাই দেখি নারীর বিবাহিত জীবনকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি জন্মলগ্ন হতে বিভিন্ন বয়সে নানা বৈদিক সংস্কারের বিধান আছে। যেমন জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ হতে বাহিরে আগমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ উপনয়ন, বিবাহ। মনু এইসব সংস্কারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, কন্যা-সন্তানের পক্ষে উপনয়ন ব্যতীত অন্য-গুলিও প্রযোজ্য ; তবে সেগুলি মন্ত্রপ্রয়োগ না করে সম্পাদন করতে হবে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই:

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥
(২।৬৬)

তবে মনুর নির্দেশ হল বিবাহ সংস্কার নারীর ক্ষেত্রেও পুরুষের সহিত সমান মর্যাদায় নিষ্পন্ন করতে হবে। তাঁর মতে উপনয়নান্তে পুরুষের গুরুগৃহে বাস ও অগ্নিপরিচর্যার স্থান অধিকার করবে নারীর পতিসেবা ও সংসারের কাজ:

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥
(২।৬৭)

অপরপক্ষে দেখি নারীর জীবনকে সংকুচিত করে পতিকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার আদর্শ গড়ে উঠেছে। সেকালে নারী বিদ্যাচর্চা করত, দার্শনিক তর্কসভায় পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, এমন কি ঋষি হিসাবে বৈদিক সূক্ত রচনা করত। এখন সে অধিকার হতে তাকে বিচ্যুত করা হয়েছে। এখন হতে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়েছে এবং পতিসেবাই একমাত্র কর্তব্য বলে প্রচারিত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে মনুস্মৃতি হতে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

প্রথম বিধান হল নারীর সারাজীবনই পুরুষের অধীনে বাস করতে হবে ; তার কোনও অবস্থাতেই নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন বলে কিছু থাকবে না। এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকটি দেখা যেতে পারে:

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥
(৫।১৪৮)

বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির এবং বৈধব্য অবস্থায় পুত্রদের অধীনে থাকতে হবে—এই হল নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে 'বশে' শব্দটির তাৎপর্য বিশেষ লক্ষণীয়। সর্বক্ষেত্রেই নারীর পুরুষের আজ্ঞাধীন থাকতে হবে, এমন কি পুত্রেরও।

দ্বিতীয় নির্দেশ হল, স্বামীকে কেন্দ্র করেই নারীর জীবন গড়ে উঠবে, এর অতিরিক্ত নারীর কিছুই কর্তব্য নেই। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
(৫।১৫৫)

—অর্থাৎ নারীর পতি হতে পৃথক যজ্ঞ নেই, ব্রত নেই, উপবাস নেই ; কেবল পতির শুশ্রূষা করেই তার স্বর্গলাভ হয়।

এমন কি পতির মৃত্যুর পরও পতিই তার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে বিরাজ করবে, এমন উপদেশও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ না বলে উপদেশটি প্রয়োগ করছি এই কারণে যে, মনু কিছু বিকল্প ব্যবস্থাও রেখেছেন। তার বিষয় যথাসময় উল্লেখ করা হবে।

তাই দেখি পতি মৃত হলে মনু উপদেশ দিয়েছেন, আদর্শ পত্নীর কর্তব্য হবে বৈধব্য অবস্থায় থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা। তা করলেই অপুত্রক হলেও এমন সাধ্বী নারীর স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত বলে মনু আশ্বাস দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥
(৫।১৬০)

অবশ্য এটা আদর্শ, কিন্তু বাধ্যতামূলক বিধান নয়। কারণ, মনু পরে স্পষ্টই বলেছেন যে, সাধ্বী নারীদের দ্বিতীয় বিবাহ উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না। "ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কাচিদ্ ভর্তোপদিশ্যতে।" স্পষ্টতই এটা উপদেশ, অবশ্য-পালনীয় নির্দেশ নয়।

মনুস্মৃতির যুগে এসত্ত্বেও নারীর কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত ছিল যা দেখি পরবর্তী কালে প্রত্যাহৃত হয়েছে। সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

দেখা যায় মনুর বিধান অনুসারে নারীর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে। যে পিতার পুত্র-সন্তান নেই, কেবল কন্যা-সন্তান আছে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার কন্যার—মনু এই বিধান দিয়েছেন। আমরা জানি পরবর্তী কালে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, এই অবস্থায় কন্যা কেবল জীবনকালে পিতার সম্পত্তির উপস্বত্ব মাত্র ভোগ করবে এবং দৌহিত্র মাতার মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে। সুতরাং মনুর বিধান নারীর কিছুটা অনুকূল ছিল। প্রাসঙ্গিক নির্দেশটি এই :

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥
(৯।১৩০)

—অর্থাৎ আত্মাই ত পুত্র হয়ে জন্মায় এবং পুত্রের সঙ্গে দুহিতার কোনও ভেদ নেই ; সুতরাং কন্যা থাকতে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যে কেন পাবে ?

মনে হয় মনুর কালে নারীর শৈশব অবস্থায় বিবাহ প্রচলিত ছিল না। আমরা জানি পরবর্তী কালে গৌরীদানের আদর্শ হিন্দুসমাজকে পেয়ে বসেছিল। মনুর ব্যবস্থা কিন্তু অন্য ধরণের। বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট অভিরূপ বরকে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে। এমন কি এও বলা হয়েছে যে উপযুক্ত পাত্র যদি না জোটে তা হলে যৌবনবতী কন্যাকেও আমরণ অবিবাহিত রেখে দেবে, তবু

গুণহীন পাত্রে অর্পণ করবে না। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥
(৯।৮৯)

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু অধিকার নারীকে দেওয়া হয়েছে। প্রথম বলা হয়েছে যৌবনোদ্গমের পর তিন বছর অপেক্ষা করবে। তারপরেও যদি পিতা তাকে পাত্রস্থ না করে, তা হলে সে নিজে পতি নির্বাচন করে বিবাহ করবার অধিকারিণী হবে। এইভাবে স্বয়ংবরা হলে তার কোনও পাপ হয় না। (মনু ৯।৯১) সুতরাং দেখা যায়, সেকালে শিশুবিবাহ বা যৌবনোদ্গমের আগে বালিকাবিবাহের নির্দেশ ছিল না। এমন কি পিতা যদি কন্যাকে উপযুক্ত সময়ে পাত্রস্থ করতে অসমর্থ হতেন, তা হলে কন্যার আত্ম-নির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা ছিল এবং তা বৈধবিবাহ হিসাবে স্বীকৃত হত। তবে একেবারে যে বালিকাবিবাহ নিসিদ্ধ ছিল তা মনে হয় না। মনুর ধারণায় পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্যের অনুপাত হওয়া উচিত এক-তৃতীয়, অর্থাৎ পাত্রের যা বয়স হবে পাত্রীর হবে তার তিন ভাগের এক ভাগ। সুতরাং মনু বলেছেন, পাত্রের বয়স যদি ৩৬* হয় তা হলে পাত্রীর বয়স হওয়া উচিত ১২ বছর এবং পাত্রের বয়স যদি ২৪ হয় তা হলে পাত্রীর বয়স হওয়া উচিত ৮ বছর (মনু ৯।৯৪)। মনে হয় এই দ্বিতীয় নির্দেশ হতেই পরবর্তী কালে গৌরীদান প্রথা এত ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ করেছিল।

আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। দেখা যায়, পরিত্যক্তা নারীর বা বিধবার বিবাহে মনুর আপত্তি ছিল না। সেকালে এক শ্রেণীর সন্তানের নাম ছিল পৌনর্ভব। তার অর্থ হল এই যে, যদি কোন নারী স্বামীদ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে বা বিধবা হয়ে আবার বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করে তা হলে সেই সন্তান হবে পৌনর্ভব। তার অর্থ হল তার মা পুনরায় ভার্যা হয়ে তাকে লাভ করেছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূর্ত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
(৯।১৭৫)

এই প্রসঙ্গে মনু একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন উপরের দুই ক্ষেত্রে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে তাকে সংস্কার বলে পরিগণিত করা হবে না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে সংস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। যদি সেই নারীর কৌমার্যহানি না ঘটে থাকে, তা হলে তার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিবাহ সংস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। এই অবস্থায় পরিপূর্ণ বিবাহের মর্যাদা† দেবার কারণ যুক্তির দিক হতে বিবেচনা করলে বিলক্ষণ পাওয়া যায়।

(৪)

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় মনুর

---

* মনু ৯।৯৪তে ত্রিশ বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন, ছত্রিশ নহে। সুতরাং ১:৩ অনুপাতটি এক্ষেত্রে খাটে না। এতদ্ব্যতীত, কন্যার বয়স নয়, দশ, কিংবা এগারো এবং পুরুষের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ প্রভৃতি হইলেও তাহাদের বিবাহ মনুর অমনোনীত নহে। মনুর এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য মেধাতিথিভাষ্যে দ্রষ্টব্য। —সঃ

† এই বিষয়ে মতভেদ আছে। এইরূপ তথাকথিত বিবাহে কোনও সম্প্রদান-কর্তা না থাকায় ইহা যথাশাস্ত্র মুখ্য বিবাহ নহে। মর্যাদা দেওয়া এক কথা আর মুখ্য শাস্ত্রীয় বিবাহ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া অন্য কথা। মনু যে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৯।১৫৯-৬০) এবং পুনর্ভব পুত্রের যে দায়ভাগ নির্দেশ করিয়াছেন (৯।১৭৫) তাহা হইতেই আলোচ্যমান বিবাহের স্থান বোঝা যায়।—সঃ

কালে নারী বৈদিক সমাজে যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল তা হতে অনেকখানি অবনমিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেযুগে নারীর কিছু কিছু অধিকার ছিল। যেমন বিশেষ ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ও অবস্থা বিশেষে স্বয়ং পতি নির্বাচন করবার অধিকার এবং পতি-পরিত্যক্তা বা বিধবা হলে পুনরায় বিবাহ করবার অধিকার।

আমরা দেখব আরও কয়েক শতাব্দী পরে ধীরে ধীরে নারী তার নানা অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পুরুষচালিত সমাজের হৃদয়হীন এবং স্বার্থ-প্রণোদিত ব্যবস্থাপনায় একরকম পুরুষের দাসীতে পরিণত হয়েছে। এই অবনতি চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছায় সম্ভবত ইসলামের সহিত হিন্দু-সংস্কৃতির সংযোগের পূর্বেই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে এমন কি সমুদ্রযাত্রাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। তার অর্থ এই যে, হিন্দুর প্রাণশক্তি এমন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, সমাজ নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল। যে হিন্দু অবাধে সমুদ্রযাত্রা করে শুধু ব্যবসায় নয়, উপনিবেশ স্থাপনও করেছিল, তাকে নির্দেশ দেওয়া হল সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করতে হবে। অথচ আমরা জানি প্রাচীন হিন্দুরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সুমাত্রা যবদ্বীপ বালিদ্বীপ প্রভৃতির অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে ঘিরে তাদের ভাস্কর্য সঙ্গীত নৃত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল। এমন কি এই দ্বীপগুলির মানুষ যখন ইসলামধর্ম গ্রহণ করে, তখনও তারা হিন্দুসংস্কৃতি পরিত্যাগ করেনি। এখনও বালিদ্বীপবাসীরা হিন্দু রয়ে গেছে।

বাহিরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করবে না, বাহিরের সঙ্গে সংযোগসূত্র ছিন্ন করে দেবে এবং কোনও রূপে এক অচলায়তন সৃষ্টি করে নিজের যুক্তিহীন সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রাখবে, এই ছিল যেন এই ধরনের ব্যবস্থার যুক্তি। এর প্রধান কারণ মনে হয় দুটি। প্রথম, একটি রক্ষণশীল মনোভাব যা সমাজব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখে দিতে বদ্ধ-পরিকর এবং দ্বিতীয়, নারীকে সমাজে ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করে একান্ত হেয় অবস্থায় রাখতে বাধ্য করা।

জীবন্ত সমাজ গতিশীল হতে বাধ্য। কারণ, তার পরিবেশ চিরকাল এক থাকে না, তা নিত্য পরিবর্তনশীল। সেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সজীবভাবে বাঁচতে প্রয়োজন নূতন সমস্যা, নূতন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। প্রাচীন বলেই কোনও জিনিসকে চিরকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তা যদি নূতন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়, তাকে রাখা যেতে পারে; না হলে তাকে পরিত্যাগ করাই যুক্তিসম্মত। কিন্তু আমাদের দেশে এমন একটা রক্ষণশীলতার মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, যা কিছু প্রাচীন তা যুক্তিসম্মত হক বা না হক, পরবর্তী কালে তার উপযোগিতা থাকুক বা না থাকুক, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছে। এমন কি যা কোন শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত নয়, লোকাচারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তাকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, তা বহুকাল প্রচলিত।

দ্বিতীয়ত, পুরুষের স্বার্থপরতা ধীরে ধীরে নারীকে সকল ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে বঞ্চিত করে অন্তঃপুরে বন্দিনী পুরুষের দাসীতে পরিণত করেছে। যে নারীর কাছে উচ্চতম বিদ্যাচর্চার অধিকার অবারিত ছিল, যে নারী একদিন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টারূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল, সে নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়েছিল।

শিশু অবস্থায় বিবাহ দিয়ে গৌরীদান করে কন্যা সম্বন্ধে পিতা নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণ সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরে নিতে আরম্ভ করল। ফলে স্ত্রীশিক্ষা নিন্দনীয় বিষয় হয়ে উঠল। বাংলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, যে-মেয়ে বিদ্যাচর্চা করে সে বিধবা হয়। অল্পবয়সে বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় তার সম্ভাবনাও ঘুচে গিয়েছিল।

এই ব্যবস্থা পুরুষের স্বার্থের সপক্ষে দুই ভাবে কাজ করেছিল। উচ্চশিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ায় নারীর উন্নততর জীবনের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। ফলে নারীর একমাত্র অবলম্বন হল ধর্ম। তার স্বাভাবিক ধর্মবোধ তাকে অন্ধভাবে সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখাই ধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে শেখাল। কাজেই সামাজিক ব্যবস্থাকে অন্ধভাবে প্রতিপালন করা এবং প্রয়োগ করবার আগ্রহ তার বেড়ে গেল। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের অধঃপতিত সমাজের বেশীর ভাগ ব্যবস্থাই নারীর কল্যাণের বা স্বার্থের পরিপন্থী। ফলে নারী নিজেকে নিজেই শৃঙ্খলিত রাখতে পুরুষের প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়াল। মেয়েদের উচ্চস্বরে কথা বলতে নেই, মুখ হতে ঘোমটা সরাতে নেই, বাহিরের পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে নেই ইত্যাদি হাজারো বিধান প্রয়োগ করতে নারী নারীর প্রশাসক হয়ে দাঁড়াল। এ যেন যে শৃঙ্খলিত, সে-ই শৃঙ্খলকে ধরে রাখতে চায়।

দ্বিতীয়ত এই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্ভব হয়েছিল নারীকে শিক্ষাদান হতে বঞ্চিত করার ফলেই। যে একান্ত নিরক্ষর সে নিজের অধিকার বুঝবে কি করে? যাকে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার আদৌ সুযোগ দেওয়া হল না, সে নিজের কল্যাণ বা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ কোথায়, তা বোঝবার ক্ষমতা রাখে না। ফলে সমাজের শাসনকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করে। এমন কি যুক্তি দিয়ে বিচার করে কোনও প্রচলিত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাও নিষ্ঠার সহিত পালন করে চলে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের মা-দিদিমাদের যুগের একটি প্রাত্যহিক কর্মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের গৃহিণীর প্রাত্যহিক একটি কর্ম ছিল বাড়ীময় গোবর জল ছড়িয়ে তাকে শুদ্ধ করা।

এই প্রসঙ্গে আরোও কয়েকটি মৌলিক অধিকার হতে নারীকে বঞ্চিত করার কথা উল্লেখ করে এই ভাষণটি শেষ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারীর পতিকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রার নির্দেশ। আদর্শ নারী হবেন পতির ছায়ার মতন অনুগামিনী। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক হতে এই ব্যবস্থা যে কত ক্ষতিকর, সে দিকটা আদৌ ভেবে দেখা হয়নি; পুরুষের স্বার্থকেই এখানে বড় করে দেখা হয়েছে। কালিদাসের কল্পিত আদর্শ পত্নী হবেন গৃহিণী এবং সচিব সে শিক্ষা কোথায় ভেসে গেছে। সেকালে তাই দেখতাম মেয়েদের উল দিয়ে কাপড়ে লেখা ফোটাতে শিক্ষা দেওয়া হত 'পতি পরম গুরু'। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেকালের শিক্ষিতা মহিলা স্বামীকে চিঠিতে সম্বোধন করতেন 'শ্রীচরণেষু' বলে এবং চিঠি শেষ করতেন 'সেবিকা' বলে।

এর জন্যই পতি পরলোকে গমন করলে নারীর বৈধব্য অবস্থা অক্ষুন্ন রেখে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা। যা ছিল মনুর কালে একটি বিকল্প আদর্শ মাত্র, তা হয়ে উঠল এক আবশ্যিক নির্দেশ। এ নির্দেশ কুমারী অবস্থায় বিধবা হয়েছে এমন নারীর উপর যেমন প্রযোজ্য, তেমন প্রৌঢ়া বিধবার উপরও প্রযোজ্য। শুধু নিরামিষ আহার

নয়, লোকাচারকে ভিত্তি করে অনেক নিরামিষ খাদ্যও তার নিষিদ্ধ হল, যেমন পুঁইচড, মুসুর ডাল। একাদশীর দিনে ফলমূল আহারের পরিবর্তে নির্জলা উপবাস রীতিও গড়ে উঠল।

সম্ভবত এই ভাবেই সহমরণ-রীতিরও প্রসার ঘটেছিল। সতী প্রথার অনুমোদন কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মনুসংহিতাতে তার অনুমোদন ছিল না। অথচ দেখি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সারা ভারত জুড়ে হাজার হাজার সতীদাহ প্রতি বছর ধর্মের অঙ্গ হিসাবে সংঘটিত হচ্ছে। সমাজ অধঃপতিত হলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, হৃদয়বৃত্তিও কতখানি শুকিয়ে যায়, এই সহমরণ-প্রথা তার উদাহরণ। এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার হৃদয়হীনতা হিন্দুকে আদৌ বিচলিত করত না, করত সেকালের ইংরেজ প্রশাসকদের এবং তারা সরকারকে এই প্রথা রহিত করবার জন্য বার বার অনুরোধ করে চিঠি লিখত।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ছিল অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা। প্রাচীনকালে তা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। উপনিষদে দেখি প্রকাণ্ড তর্কসভায় মহিলা দার্শনিক পুরুষের সঙ্গে সমানে প্রতিযোগিতা করছেন। এমন কি রাজপরিবারেও তার প্রয়োগ শিথিল ছিল বলে মনে হয়। তা না হলে সীতার রামের সহিত চোদ্দ বছরব্যাপী বনবাস সম্ভব হল কি করে? মহাভারতে দেখি ধীবররাজের কন্যা সত্যবতী নৌকা নিয়ে যাত্রী পার করতেন।

অনেকের ধারণা, এই অবরোধ প্রথা মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শ হতে হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। আমার মনে হয় তার সপক্ষে কোনও প্রবল যুক্তি নেই। মুসলমান সমাজে অবরোধ বা পর্দাপ্রথা খুবই কঠোর ছিল; সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অবনতির যুগে হিন্দুসমাজের মধ্যেও অনুরূপ চিন্তার অনুপ্রবেশ মুসলমান-সমাজের সংস্পর্শে আসবার আগেই যে ঘটেছিল তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থা বীজাকারে মনুর নির্দেশের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মনুর এই শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সংভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ॥

(৮।৩৫৬)

এর অর্থ হল, যে-পুরুষ তীর্থে, অরণ্যে, বনে বা নদীসংগমে পরস্ত্রীর সহিত কথা বলবে তাকে 'সংগ্রহণ' দণ্ড দিতে হবে। সংগ্রহণ দণ্ড হল সহস্র পণ দণ্ড, এক হাজার মুদ্রা জরিমানার মত। এই উদ্ধৃতি দুটি কথা প্রমাণ করে। প্রথম, নারীদের অন্তঃপুরে ঠিক তখনও আবদ্ধ রাখা হত না; তাদের নানা স্থানে ভ্রমণের অধিকার ছিল। দ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও পরপুরুষের সহিত তার আলাপ শুধু নিন্দনীয় নয় দণ্ডনীয়ও ছিল।[১]

আর একটি শ্লোক পাই যা আরও তাৎপর্যপূর্ণ:

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥

(৯।১২)

এর অনুবাদ দাঁড়ায় এই: পুরুষের[২] নির্দেশে গৃহে রুদ্ধ থাকলেও নারী অরক্ষিতা। যারা

---

১ পরপুরুষের সহিত আলাপ করায় নারী নিন্দনীয় বা দণ্ডনীয়—মনুর উক্ত শ্লোক হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না; পরস্ত্রীর সহিত অসদুদ্দেশ্যে আলাপকারী পুরুষের দণ্ডের কথাই কেবলমাত্র ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে। সংগ্রহণের প্রকৃত অর্থ মনুর ৮।৩৫৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।—সঃ

২ মূলে পুরুষের বিশেষণ 'আপ্তকারী' আছে। মেধাতিথিভাষ্য অনুসারে আপ্তকারীর অর্থ: যাহারা যে সময়ে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন করে, অর্থাৎ অন্তঃপুররক্ষী—কঞ্চুকী।—সঃ

নিজেরা নিজেদের রক্ষা করে তারাই সুরক্ষিতা। এর মধ্যে একটি উৎপ্রেক্ষা এসে পড়ে যে, এমনও সেকালে ব্যবস্থা ছিল যে, পুরুষজাতি সেকালে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মেয়েদের অন্তঃপুরে অবরোধ করে রাখত। তার থেকেই সম্ভবত 'অন্তঃপুরিকা' 'অসূর্যম্পশ্যা' ইত্যাদি শব্দগুলির উৎপত্তি। এমনও কঠোর অবরোধ ব্যবস্থা ছিল যে, সূর্যকেও দেখতে দেওয়া হত না। কথাগুলি সংস্কৃত কথা। তাই মনে হয় অবক্ষয়ের দিনে পুরুষের স্বার্থবুদ্ধি নারীকে অন্তঃপুরে অবরোধের ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তী কালে কঠোর অবরোধপ্রথা তারই স্বাভাবিক পরিণতি। মুসলমান সমাজের পর্দাপ্রথা হয়ত সেই প্রবণতাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল। [ক্রমশঃ]

দার্শনিক স্পিনোজা

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

একটি মালা, একটি চন্দন-তিলক, কিছু অতিরঞ্জিত প্রশস্তি এবং শঙ্খের মাঙ্গলিক ধ্বনির সঙ্গে ক্যামেরার ক্লিক শব্দটি—এই বস্তুনিচয়ের সমবায়িক প্রভাবে লোভাতুর হয় না, এমন মানুষ কোটিকে গুটিক বললেও, বোধ করি, একটু বেশী বলা হোয়ে যায় না। সন্ত তুলসীদাস মানব-চরিত্রের এই মজ্জাগত দুর্বলতাকে প্রবল আঘাতে জর্জরিত করেছেন —

"মোটী মায়া সব কোই তঁজে,
ঝিনি তঁজি না যায়
পীর, পয়গম্বর, আউলিয়া,
ঝিনি সবকো খায়।"

কথাটির মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে—স্থূল ভোগ অনেকেই ছাড়তে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম ভোগ-স্পৃহা পীর, পয়গম্বরের মত আধিকারিক মানুষকেও নিস্তার করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে "লোকমান্যি হবার বাসনা" বলেছেন, সেই সূক্ষ্মভোগ কয়জন মানুষ ছাড়তে পারে? অধ্যাত্ম-পুরুষ বলে যাঁরা অভিবন্দনীয়, তাঁরাও এই লোকমান্যির বাসনায় কবলিত হোয়ে পড়েন। কিন্তু প্রকৃতির খাসমহলে অবরে সবরে এমন রাজাধিরাজের আবির্ভাব ঘটে যায়—যিনি সকল কাঙালপনার উর্ধ্বে—যাঁর জীবন এবং দর্শন এমন অত্যাশ্চর্য ঐকতানে ছন্দিত ও মন্দ্রিত হোয়ে উঠে যে, নাম যশ অর্থ ইন্দ্রিয়ভোগ—সকলই অকাম্য ও অর্থহীন হোয়ে পড়ে। এই দেববাঞ্ছিত ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— "স্পিনোজা ছিলেন তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তবে তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হোয়ে উঠে। প্রথম বয়সেই সমাজ তাঁকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে, কিন্তু কঠিন দুঃখেও সত্যকে তিনি ত্যাগ করেননি। সমস্ত জীবন সামান্য কয় পয়সায় তাঁর দিন চলত। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই তাঁকে মোটা অঙ্কের পেনসন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। শর্ত এই ছিল যে, তাঁর একটি বই রাজার নামে উৎসর্গ করতে হবে। স্পিনোজা কিন্তু রাজি হোলেন না। তাঁর বন্ধু মৃত্যুকালে আপন সম্পত্তি তাঁকে উইল করে দেন; সে সম্পত্তি তিনি গ্রহণ না

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ), কলিকাতা। কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যসেবী।

করে দাতার ভাইকে দিয়ে দেন। তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন আর তিনি যে মানুষ ছিলেন, এ দু'টোকে এক কোঠায় মিলিয়ে দেখলে তাঁর সত্যসাধনার যথার্থ স্বরূপটি পাওয়া যায়, কেবলমাত্র তার্কিক বুদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়। তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলব্ধি ও প্রকাশ।"

আবাল্য বৈরাগী এই মানুষটির গোটা জীবন কেটে গেছে ভয়ানক আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্যে। একটির পর একটি বই লিখেছেন, য়ুরোপের বিদগ্ধ-মণ্ডলীতে উঠেছে প্রবল গুঞ্জন এবং শেষে হাইডেল-বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যক্ষের পদটি গ্রহণের জন্য ব্যগ্র আমন্ত্রণও পেয়েছেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা ছাড়া আর সকল বিষয়ে স্বাধীনতাই স্পিনোজার থাকবে এমন একটি শর্ত তিনি মানতে রাজি হোলেন না। প্রত্যাখ্যাত হোল সেই পরম কাম্য পদটি—যা এসেছিল তাঁর সারস্বত কৃতিত্বের স্বীকৃতি-স্বরূপ। স্পিনোজার জীবনীকার এই স্বাতন্ত্র্য-ভাবনার উপর মন্তব্য করেছেন—"He preferred to starve and to speak the truth as he saw it."

প্রথম বইটি হোচ্ছে ধর্মবিচার। নির্মম শাস্তা এক ঈশ্বরের ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে তিনি গ্রহণ করলেন এক করুণাময় প্রেমাধীন পরমেশকে। নীতিশাস্ত্রের উপর এক অত্যাশ্চর্য পুঁথি লিখে ফেললেন। এই পুস্তকটির ভাষা হোচ্ছে ল্যাটিন, প্রকরণ হোচ্ছে জ্যামিতিক। আদর্শে গ্রীক, ব্রুণের সর্বেশ্বরবাদের দীপিকায় উদ্ভাসিত, ইতালীয় ভাবরসে রসাশ্রিত আর ডেকার্টের যান্ত্রিক সূত্র সক্রিয় রয়েছে ভিত্তি-ভূমিতে। প্রত্যয়ের বিচারে পুঁথির আধেয়টি প্রাচীন হিব্রু প্রবক্তাদের আত্মিক অনুভূতিতে জ্যোতিষ্মান। এমন সর্বজনীন ও সর্বভূমীন প্রতিভা বিশ্বের প্রাতিভমণ্ডলীর প্রশস্তিলাভ করবে, তাতে বিস্ময়ের হেতু নেই।

স্পিনোজা তাঁর অসামান্য প্রতিভায় জগৎ, জীবন ও ঈশ্বরের সম্বন্ধিত সমস্ত পৃচ্ছার উপর আলোকপাত করেছেন। স্পিনোজার জগৎ অনাদি ও অন্তহীন স্থানে কালে উভয়তঃ। ইতি যেখানে নেই, সেখানে 'নেতি'-র অবকাশ কোথায়? স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর জন্ম বা মৃত্যু হোতে পারে কিন্তু সামগ্রিক নিষ্কল দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ সর্বব্যাপী সর্বকালীন এবং সম্পূর্ণ। এই অকল্পনীয় শাশ্বতের কোলে বৃহত্তম নভশ্চারী নক্ষত্রও অণু-পরমাণুর মত তুচ্ছ। বিশ্বপ্রকরণের বিরাটতার সামনে মানুষের কল্পনাশক্তি স্তব্ধ বিমূঢ় হোয়ে পড়ে। এই অভাবনীয় সীমাহীনতার কোলে লীলায়িত হোয়ে উঠেছে সৃষ্টির প্রকল্প—কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায়। "Spinoza asserts, 'God is the world'." ঈশ্বর রয়েছেন দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্ববস্তুতে অনুস্যূত, তেমনি সর্ববস্তু রয়েছে ঈশ্বরে বিধৃত। লতা পাতা ফুল ফল মাটি পাথর আকাশ বাতাস—সব কিছুই ঈশ্বরীয় সত্তায় আবিষ্ট। ঠিক মনে হয় যেন রণিত, স্তনিত হোয়ে উঠছে একটি প্রাচীনতর অভিবন্দনা—যঃ দেবঃ অগ্নৌ, যঃ অপ্সু যঃ বিশ্বম্ ভুবনম্ আবিবেশ। যঃ ওষধীষু, যঃ বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

এই সর্বাবেশ ঐশী ধারণার বিপরীত তরঙ্গে পরাবৃত্ত ছন্দে ফুটে উঠেছে সর্বেশ্বরবাদ। শঙ্করাচার্য সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন—শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥ —জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়। ব্রহ্ম একাধারে কূটস্থ ও তুরীয় —সর্বব্যাপী ও সর্বময়। দার্শনিক ভাবনার জগতে স্পিনোজার অবদান এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায়।— "দেখ, দেখ, ভগবান সম্বন্ধে কেমন বলিতেছেন, *to define Him is to limit Him, to determine Him is to negate Him. Of Him we can say that He is.'*

—ঠিক আমাদের বেদান্তের মত 'তিনি সৎ' —ইহাই স্পিনোজা বলিতেছেন।"[১]

স্পিনোজার দার্শনিক প্রতীতি তাত্ত্বিকতাকে অতিক্রম করে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চকেও প্রভাবিত করেছে। ওয়াল্ট হুইটম্যান তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন। একজন চাষা, শ্রমিক, একটি ভবঘুরে মাতাল, একজন মুটে বা অর্ধভুক্ত কবি এদের জীবনের সার্থকতা কোথায়? স্পিনোজার মতে প্রত্যেকটি জীবনই মূল্যবান, কারণ এরা প্রত্যেকে ঐশী সত্তার অচ্ছেদ্য অংশ এবং সামগ্রিক বিশ্ব-প্রকরণে প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সৃষ্টির ঐকতানবাদনে যে ধ্বনী বাজায় তারও অবদান অবহেলার বস্তু নয়। তাই স্পিনোজার মতে—"Each of us is an essential thread in the infinite tapestry of life, a significant note in the symphony of God, a contributory stroke of the brush in the painting of God—in a word, an intimate part of God." সামাজিক মূল্যায়নে যে যেখানেই থাকুক না কেন—অনন্ত ধাবন-পথে প্রতিটি প্রাণেই মঞ্জুরিত হোয়ে উঠবে মহত্তম সত্যের আস্বাদ। স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও একটি অনবদ্য ঋক্ ধ্বনিত হোয়েছে—man travels not from error to truth but from lower truth to higher truth. পূর্ণের পরশ রয়েছে সর্ববস্তুতে ও সর্বজীবে। পূর্ণ বিকশিত হোতে চান সর্বত্র।

এই প্রতীতির অনিবার্য ফলশ্রুতি হোচ্ছে—সমগ্র মানবজাতি—দেহে ও আত্মায়—একই সত্তায় গঠিত ও পুটিত। একজন মানুষ তাই নিজেকে আঘাত না করে অপরকে আঘাত করতে অক্ষম। প্রতিবেশীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার দার্শনিক ও তাৎক্ষণিক অর্থ হোচ্ছে—নিজের হাতে নিজের চোখ বা আঙুল বিনষ্ট করা। "And so, asserts Spinoza, in order to be happy, you must love yourself. But to love yourself is to love mankind and to love mankind is to love God. And this is the reason for which we have come into the world." এই জাগ্রত উদারতম জীবন-বোধের সমান্তরালে সমুদ্ধৃত করা যায় নাকি আর একটি নন্দিত বাণী?—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্পিনোজার বিচারিত অভিমতে, প্রেমই মানুষকে তুরীয়লোকের আনন্দ-আস্বাদ দিতে সক্ষম—মানুষের জীবনবোধ ঐশীবোধে প্রাণিত ও দেহান্বিত হোতে পারে, শুধু প্রেমের ইন্দ্রজালে। এই প্রেমের বিচ্ছুরিত জ্যোতি থেকে জন্ম নেয়—"অভীঃ"! তাই 'মৃত্যুর গর্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।' মৃত্যু এখানে পরিনির্বাণ নয়—নবজীবনের তোরণদ্বার। দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু সনাতনী আত্মার অভিপ্রয়াণ চলেছে জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত-বিসারিত দৃশ্যপটভূমিতে।

আর অনুভূতির নন্দনায়িত ভুবনে? আকাশের নক্ষত্র থেকে পৃথিবীর একগাছি তৃণ—সর্বত্র সকলের সঙ্গে—'মানব-আমি'—স্বতন্ত্রবোধে বিচ্ছিন্ন আমি, 'দ্বৈপায়ন-আমি'—সম্বন্ধিত হোয়ে আসছি অজানিত অভাবিত কাল-কালান্তর থেকে। ফুল এত ভাল লাগে কেন? ফুল আর আমি যে এক—একই আদিমতম উপাদানে গঠিত পুটিত ও গ্রথিত। প্রজ্বলিত প্রজ্ঞায় তাই স্পিনোজা বলছেন

১ মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর পুণ্য স্মৃতিকথা—উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৭৩

—"You are an important page in the book of life. Without you the book would not have been complete." শাশ্বত সামগ্রিক জীবন-পুঁথির তুমি যে একখানি প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা। আর তুমি ছাড়া তো ভাই এই জীবন-পুঁথি সম্পূর্ণ হোত না! এই বিচিত্র বাণীর অমোঘ আঘাতে রবীন্দ্র-মানসে ব্যঞ্জনায়িত হোয়ে উঠেছে বাহার রাগিণীর দোলায় দোলায় একটি ছন্দিত স্তবক—

"আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানারূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে
কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।"

এবার তুমি এসো

শ্রীমতী মানসী বরাট

মাতিয়ে দিয়ে যে খেলাতে,
মুখ লুকালে অন্তরালে,
আজ জীবনের শেষ বেলাতে
ছিঁড়েছি সেই মায়ার জালে।
সকল খেলার সাধ মিটেছে,
নেইকো অবশেষও
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
এবার তুমি এসো।

একলা বসে শূন্য ঘাটে,
পাইনি খেয়া তরী,
হেলায় কাটে বেলা আমার—
নেইকো পারের কড়ি।
অন্ধকারে দিক ঢেকেছে,
নেইকো আলোর রেশও,
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
এবার তুমি এসো।

প্রার্থনা

স্বামী জীবানন্দ

শত শত জবা মাগো তব পদে শোভা পায়,
মন মোর জবা হয়ে চরণে লুটাতে চায়।
মনে আছে কত কালি, কালো দেখি তাই কালী,
দূর থেকে দেখি ব'লে কালো রূপ দেখি হায়!
(মা) সব কালো মুছে দাও আলো-করা রাঙা পায়।
মনে কত জাগে সাধ, সব সাধে সাধো বাধ,
সব আশা ভেঙে দাও নিঠুর চরণ-ঘায়।
মন মোর সদা যেন তব পদে থেকে যায়॥

হারিয়ে গেছি

'অবধূত চট্টোপাধ্যায়'

তোর গভীরেই হারিয়ে গেছি
মা গো তোকে খোঁজার ছলে
যেমন ক'রে নুনের পুতুল
গ'লে যায় নীল সাগর জলে।
এখন যে শেষ খোঁজাখুঁজির—
বাইরে ব'সে বোঝাবুঝির—
আমার নিজের খোঁজ মিলেছে
মা তোর বুকের অতল তলে।
তোর গভীরেই হারিয়ে গেছি
মা গো তোকে খোঁজার ছলে॥

পথ যেখানে ছাড়া ছাড়া
সেখানটাতে সবার ধাঁধা—
দ্বন্দ্ব তো নেই সে পথ চলায়,
'সব' যেখানে 'এক'-এ বাঁধা!
খুঁজতে তোকে কোথায় নামি?
'অসীম' যে গো তুই ও আমি!
'অসীম' হ'য়ে 'অসীম'কে তোর
আর কি মা গো খোঁজা চলে!
তোর গভীরেই হারিয়ে গেছি
মা গো তোকে খোঁজার ছলে॥

চরণাশ্রয়

শ্রীঅনাদিনাথ ঘোষ

আদ্যাশক্তি মহামায়া তুমি ভগবতী।
তব পাদপদ্মে আমি করিনু প্রণতি ॥
স্নেহময়ী কৃপাময়ী জগত-জননী।
পতিতপাবনী তুমি অভয়-দায়িনী ॥
বিষয়-সম্পদ যত সকলি অসার।
সার বস্তু একমাত্র চরণ তোমার ॥
তোমার চরণে মাগো শরণ যে লয়।
মরণের ভয়ে তার কাঁপে না হৃদয় ॥
যত আছে ধর্ম্ম কর্ম সংসার মাঝার।
তোমার চরণ সেবা সকলের সার ॥
ছেলের মঙ্গল শুধু মা করে চিন্তন।
দরদী আর কে আছে মায়ের মতন ॥

মাতা যদি করে কভু তনয়ে তাড়ন।
সে তাড়না শুধু তার মঙ্গল কারণ ॥
পাতকী বলিয়ে যদি অন্যে পায়ে ঠেলে।
মাতা কিন্তু স্নেহভরে নেন্ তাকে কোলে ॥
ভজন-পূজন আমি কিছু নাহি জানি।
ভরসা আমার তব চরণ দু'খানি ॥
বিষয়-বাসনা তাই দিয়ে বিসর্জন।
আশ্রয় করেছি মাগো তোমার চরণ ॥
আশ্রিতকে কর তুমি সতত রক্ষণ।
সেই হেতু নাহি মোর ভয়ের কারণ ॥
তোমার নিকটে করি এই আকিঞ্চন।
জন্মে জন্মে পারি যেন সেবিতে চরণ ॥

রাঙাজবার হাসি

শ্রীমতী অমিয়া দেবী

শক্তি মায়ের কালো পায়ে রাঙাজবার রাঙা হাসি।
ঐ হাসিতে ভুলে শ্যামা সব ছেড়েছে সর্বনাশী ॥
আর কিছু তার নেই যে মনে—
চেয়ে আছে জবার পানে,
ভুবন ভুলা রূপ যে মায়ের, পেয়ে রাঙাজবার হাসি ॥

জবার মালা গলায় পরে নেচে বেড়ায় এলোকেশী।
আবার দেখি দুই চরণে মুঠো মুঠো জবার হাসি ॥
রাঙাজবার ধন্য জনম—
পেয়ে মায়ের রাঙা চরণ,
যে চরণে তুচ্ছ ওগো গঙ্গা গয়া বারাণসী ॥

শ্যামা-সঙ্গীত

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

অন্য মন্ত্রে কাজ কি রে মন ভজ শুধু কালী তারা
রামপ্রসাদ আর শ্রীরামকৃষ্ণ যেই নামেতে মাতোয়ারা ॥
ঐ মন্ত্র জপে পাগল ভোলা ;
সার করে মার চরণ-তলা—
বিবেকানন্দ বিবেক লভি হয়েছিল গৃহছাড়া ॥

কালী নামের মন্ত্র নিয়ে চন্দ্র সূর্য দেয় রে আলো
(যদি) মনের কালো ঘুচাতে চাও কালী নামের প্রদীপ জ্বালো।
এ নাম জপে কমলাকান্ত
ঘুচালো তার মনের ধ্বান্ত
তুই কেন মন আজো ভ্রান্ত ঘুরে মরিস পথ হারা ॥

মাতৃসঙ্গীত

শ্রীনকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বল মা তারা, কোনখানে তুই করিস অধিষ্ঠান,
কোন দেউলে, কোন শ্মশানে দিস মা ব্রহ্মজ্ঞান।
কোন সাধকের মনের কোণে,
থাকিস মা তুই সঙ্গোপনে,
কোন পাগলের সাথে মা তুই, করিস অভিমান।
বিশ্ব নিয়ে করিস খেলা,
কোথায় মা তুই সারাবেলা,
কোথায় রচিস অনন্তকাল, ভাঙাগড়ার গান ?
কূলহারার কূল ভাঙ্গা কূল,
জুড়ে আবার ভাঙ্গিস মা ভুল,
দে মা এবার পথহারায় পথেরই সন্ধান।

সমালোচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ গীতামৃত : শ্রীকার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক : শ্রীকার্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বারদ্রোণ, পোঃ হটুগঞ্জ, ২৪ পরগণা ; পৃষ্ঠা ৬২, মূল্য ১.২৫।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামৃত অবলম্বনে বহু গান, কবিতা, নাটকাদি রচিত হচ্ছে। এভাবেই যুগে যুগে আবির্ভূত ভগবানের জীবন ও বাণীকে অবলম্বন করে সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের নব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। আর এভাবেই সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যান তিনি—যিনি পরম করুণায় আবির্ভূত হন মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য। অবতারপুরুষের সুমহান জীবনচরিত এই সকল লোকগীতি সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমেই উচ্চকোটির মননশীলতা থেকে নেমে এসে ভূমি-স্পর্শ লাভ করে জাতিকে যুগকে নব সংস্কার দিয়ে চির নূতনের পথে চালিত করে থাকে। তা একদিকে যেমন দর্শন যুক্তি-বিচারের ক্ষেত্রকে প্রসারিত নবান্বিত করে অপরদিকে তেমনি আপামর-জনসাধারণের প্রাণের প্রদীপ হয়ে মানুষের চিরায়ত সম্পদ— আপনার জিনিস হয়ে ওঠে ও সকলকেই টেনে এনে দাঁড় করায় সত্যের ধ্রুবজ্যোতির সম্মুখে। কারণ, এ যে দেবান্বিত সংস্কৃতি— পরাকাষ্ঠায় উপনীত কৃষ্টি।

এই দিক থেকে সার্থক এই গীতামৃত। কথা-অমৃত ছন্দান্বিত ও সুর-সমৃদ্ধ হয়ে হল গীত-অমৃত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ থেকে উদ্ধৃতিগুলি প্রত্যেক গানের পরেই দেওয়াতে ছোট্ট এই গীতিগুচ্ছের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে। গানকে বুঝতে গেলে বাণীর পটভূমিকার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন হয়— আর তা রসিকজন পাবেন একেবারে উৎসমুখ থেকে। এই প্রয়োজনীয় কাজটি সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন স্বামী বেদান্তানন্দ। তাই সঙ্গীতরসিকগণের কাছে গ্রন্থটি যেমন রসোত্তীর্ণ, সাধক ও মননশীল ব্যক্তিগণের কাছেও তেমনি ধ্যান ও মননের সহায়ক।

গ্রন্থটিতে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি আছে। প্রতিটি গানের সুর ও তালের উল্লেখ করাও প্রয়োজন। নূতন সংস্করণে এবিষয়ে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রচ্ছদপটটি মনোরম ও ভাবসমৃদ্ধ। আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

Meditation : By the Monks of the Ramakrishna Order : প্রথম ভারতীয় সংস্করণ (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ১৬১ ; মূল্য ৪.৭৫।

Vivekananda Speaks to Young Men : (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৬৩, মূল্য ৭৫ পয়সা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ হইতে পুস্তক দুইটি প্রকাশিত।

প্রথমোক্ত পুস্তকটির রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র, লণ্ডন হইতে ১৯৭২ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ। বিদেশ হইতে বই আমদানী দুষ্কর ও তাহাতে বইয়ের দাম ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাকে অতিক্রম করিয়া যায়। সুতরাং এই ভারতীয় সংস্করণ হওয়াতে সাধারণের প্রভূত উপকার হইয়াছে।

যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, যাঁহারা বর্তমান ব্যগ্র ব্যস্ত জীবনযাত্রায় দীর্ঘকাল শাস্ত্র অধ্যয়নে কাটাইতে পারেন না এবং যাঁহারা সকল কিছুই আধুনিক দৃষ্টির আলোকে দেখিতে অভ্যস্ত— তাঁহারা সরল ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার আলোকে ধ্যান সম্পর্কিত শাস্ত্র-সম্মত গভীর তত্ত্বের আস্বাদ এই গ্রন্থে পাইবেন— সন্দেহ

নাই। সঙ্গে সঙ্গে জটিল জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত ক্লিষ্ট পর্যুদস্ত নষ্টপ্রায় মানসিক ভারসাম্য বিশিষ্ট মানুষ আশার আলোক ও মানসিক স্থৈর্যের পথ-নির্দেশও ইহাতে পাইবেন। সুতরাং বইখানির উপযোগিতা অনেক। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে একটি মাত্র ধ্যানপদ্ধতি নির্দেশ করিয়া তাহাতেই সকলকে মনস্থির করিতে হইবে, এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রদর্শিত পথে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের তিনজন সন্ন্যাসীর ব্যক্তি-জীবনে অনুশীলিত শাস্ত্রসম্মত বিভিন্ন ধ্যান-পদ্ধতি বিষয়ক রচনা গ্রন্থটির পাঁচটি অধ্যায়ে সংকলিত। উদ্দেশ্য— পাঠক আপন সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুযায়ী স্বকীয় পদ্ধতি বাছিয়া লইয়া তাহার অভ্যাস করিবেন ও আপন জীবনকে পরম শ্রেয়ের পথে চালিত করিবেন। ইহাতে সর্ব মত-পথের প্রতি সমশ্রদ্ধা ও সকল পথই যে এক লক্ষ্যাভিসারী এই তত্ত্বই ব্যবহারিক দৃষ্টির আলোকে দেখান হইয়াছে— এই বৈশিষ্ট্যে গ্রন্থটি অনন্য। পরিশিষ্টে যোজিত স্বামী যোগেশানন্দ-লিখিত About the Guru 'গুরু সম্পর্কে' রচনাটিও সরল ভঙ্গিমায় গভীর আলোচনায় সমৃদ্ধ। এজাতীয়-গ্রন্থ যে কোন প্রকাশন সংস্থার গৌরব।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি স্বামী বিবেকানন্দ যে-সকল প্রাণপ্রদ বাণী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে একদা উচ্চারণ করিয়াছিলেন ও লিখিয়াছিলেন— তাহারই এক সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন। এই সঙ্কলনের উদ্দেশ্য যুবকগণকে স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে সহায়তা করা। বর্তমানে যুবকগণ নানা কারণে বিভ্রান্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও অশান্ত। স্বামীজীর বাণী ও রচনার মধ্যেই তাহারা একটি বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের সন্ধান পাইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

আমরা পুস্তক দুইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩০ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৫২-৬৫ সালের মধ্যে আশ্রমে একটি মন্দির, একটি ছোট পুস্তকাগার ও একটি ডিসপেন্সরি-ভবন আশ্রম-সংলগ্ন একখণ্ড জমির উপর নির্মিত হয়।

ত্রাণকার্য: ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে বিহারের নিদারুণ খরায় আশ্রম সীমিত অর্থ ও লোক-বল সত্ত্বেও বিপুল উৎসাহে ত্রাণকার্য পরিচালনা করে। ১৯৬৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও মিশন জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবা করে এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের মধ্যে ও পরে বাংলাদেশে পুনর্বাসন কার্যে আত্মনিয়োগ করে।

দিব্যায়ন: ১৯৬৮ সালে আদিবাসী ও তপশীলী জাতিদিগের স্বয়ংভর করিবার উদ্দেশ্যে 'দিব্যায়ন' নামে একটি শিক্ষণ-কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৯৬৯ সালে উহার উদ্বোধন করা হয়। এই শিক্ষণ-কেন্দ্রে প্রতি ৬ সপ্তাহে ২০ জন শিক্ষার্থী অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১৬০ জন কৃষিবিজ্ঞান, হাঁস-মুরগী পোষা ও উদ্যানপালনবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। দিব্যায়নের শিক্ষাকে ব্যাপকতর প্রয়োগাত্মক রূপ দান

করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র নামে একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র স্থাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশন হইতে পৃথক্ সংস্থা হইলেও উহা মিশন আশ্রমের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কার্য পরিচালনা করে।

এই কার্যের সাফল্যে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর (বিহার) এবং মেঘালয় হইতে শিক্ষার্থিগণ আসিতে থাকে। সার, বীজ এবং পক্ষীপালন কেন্দ্রের উৎপাদন রাখিবার জন্য সংরক্ষণশালাটি নির্মিত হয় ১৯৭১ সালে। ১৯৭৩ সালে সভাকক্ষ ও ছাত্রদিগের আবাস ও অন্যান্য কর্ম-পরিচালনার জন্য একটি প্রশস্ত ভবনের উদ্বোধন করা হয়।

দিব্যায়নের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা, খাওয়া ও ক্ষেতের পোশাক প্রভৃতি বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। ভূমিহীন কৃষককেও শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যে-কোন সংস্থা শিক্ষার্থী নির্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারেন, কেবল তাঁহাদিগকে জানাইতে হইবে যে, তাঁহাদের প্রেরিত শিক্ষার্থী দিব্যায়নের সুশৃঙ্খল শিবির জীবন যাপন করিতে ও নিয়মাবলী মানিতে স্বীকৃত।

পুস্তকাগার : পূর্বের স্থাপিত ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে দিব্যায়ন শিক্ষণ-কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বহু গ্রন্থাদি যুক্ত করাতে উহার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

চিকিৎসা : স্থানীয় অভাবগ্রস্ত লোকদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়।

ধর্মপ্রচার : ঈদ, খ্রীষ্টমাস ঈভ, গুরু নানকের জন্মোৎসব, দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতি যথারীতি পালিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি আশ্রমে ও বহু গ্রামে পালিত হয়।

আশ্রমে নিয়মিতভাবে হিন্দী ও বাংলাতে সপ্তাহে দুইদিন ধর্মপুস্তক পাঠ ও আলোচনা হয়। রাঁচি শহরে ও আশেপাশে উৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রমের সন্ন্যাসিগণ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করেন। প্রতি বৎসর স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্থানীয় বালক-বালিকাদিগের মধ্যে প্রবন্ধ- বক্তৃতা- ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭২-৭৪ বর্ষদ্বয়ের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার, পাঠাগার হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সরি ও ছাত্রাবাস পরিচালনা আশ্রমের নির্দিষ্ট কর্ম।

ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারকল্পে নিম্নলিখিত কার্যসূচী রূপায়িত হয় : প্রার্থনা-গৃহে সকলের জন্য ধ্যানজপ ও প্রার্থনাদির ব্যবস্থা করা; পাক্ষিক রামনাম কীর্তন, নৈমিত্তিক পূজা; রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ নানকাদি মহামানবদের আবির্ভাব-দিনে জীবনী আলোচনা; প্রতি শনি ও রবিবারে ধর্মীয় আলোচনা; দিল্লী কালকা নাঙ্গল পাতিয়ালা সিমলা শ্রীনগর আদি স্থানে ভাষণ প্রদান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে হিন্দী, পাঞ্জাবী ও ইংরাজীতে বিশেষ বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা।

সিমলা ও নাঙ্গলের ভক্তগণ সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ করেন এবং তাঁহাদের বিশেষ অধিবেশনে আশ্রমাধ্যক্ষ ও অন্যান্য স্বামীজীবৃন্দ আমন্ত্রিত হইয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

পুস্তকাগারে ১৯৭২-৭৩ সালে ১,৫৭২টি বই ছিল তন্মধ্যে ৩৩৩টি বই ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে বই-এর সংখ্যা ছিল ১,৬০৭, ব্যবহৃত হয় ৪৮১টি বই।

হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে ৪,৫১৪ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ১,৬০৫। ১৯৭৩-৭৪-এ উক্ত সংখ্যাদ্বয় ছিল যথাক্রমে ৩,৩১১ ও ৮৭১।

কলেজের ছাত্রদের জন্য ৪০টি আসন-বিশিষ্ট একটি ছাত্রাবাস সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১০৩টি শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগে মোট ৩,৭৫০ জন রোগী চিকিৎসিত হন; গড়পড়তা দৈনিক রোগীর সংখ্যা ছিল ৯০; অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ২,১১৫।

বহির্বিভাগে মোট ২,২৮,৬২৮ জন রোগী চিকিৎসিত হন তন্মধ্যে ৩৬,৮৫১ জন নূতন। গড়পড়তা দৈনিক রোগীর সংখ্যা ছিল ৬২৬।

রক্ত-মলমূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ১৮,৯৫৩; ৩,৫৮১টি এক্সরে ফটো তোলা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ইনফ্রা-রেড রশ্মি ইত্যাদি দেওয়ার সংখ্যা ৭৬৯।

নন্দবাবা চক্ষু বিভাগের অন্তর্বিভাগে ৬৪৯ ও বহির্বিভাগে ৭,৭৩৭ জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং উভয় বিভাগের মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,১০৪।

শেঠ মানেকলাল চিনাই ক্যান্সার অন্তর্বিভাগে ৫৫ জন ও বহির্বিভাগে ৭৭ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

হোমিওপ্যাথি বিভাগে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২১,৬০৬, তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ৪,২১৯।

কোশিকালনে প্রতি পক্ষকালে আয়োজিত চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে দৈনিক চক্ষু রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। মার্চ ১৯৭৪-এ উক্ত স্থানে একটি চক্ষু শিবির পরিচালিত হয় এবং পূর্ব বৎসরের ন্যায় বহু চক্ষু রোগীর শল্যচিকিৎসা করা হয়।

চিকিৎসা ব্যতীত ১৩ জন দুঃস্থকে নিয়মিত ও ২০ জনকে সাময়িক অর্থ-সাহায্য, ৪১৬ জন দুঃস্থ ছাত্রকে পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষার উপকরণ দান প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে মোট ৩,১২৬ টাকা খরচ করা হয়।

বৃন্দাবনের মত তীর্থক্ষেত্রে এই বৃহৎ সেবাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। ৩১. ৩. ৭৪ তারিখে সেবাশ্রমের সঞ্চিত ঋণ ছিল ৩৬,২৮৭ টাকা। উক্ত ঋণ পরিশোধ এবং আশু প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যের জন্য কর্তৃপক্ষ সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মোট ২,৭৬,২৮৭ টাকা সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ আশ্রমটি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরটি ১৫. ২. ৭৩ তারিখে উৎসর্গ করা হয়। ঐদিন হইতে মন্দিরেই প্রত্যহ মঙ্গলারতি, 'শ্রীরামকৃষ্ণ সুপ্রভাতম্‌' আবৃত্তি, বেদপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, সন্ধ্যারতি ইত্যাদি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা ও স্বামীজী, আচার্য শংকর শ্রীবুদ্ধ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি, খ্রীষ্টমাস ঈভ এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যথারীতি পালিত হয়। একাদশী আদি তিথিতে নিয়মিত রামনাম ও শ্যামনাম কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ৩. ৩. ৭৪ তারিখে সাধারণ সভায় বক্তৃতাদি হয়। স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী হইতে অংশবিশেষ লইয়া ১০. ২. ৭৪ তারিখে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিন্দী, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয় তাহার পুরস্কারসমূহও পূর্বোক্ত জনসভায় প্রদত্ত হয়।

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণ নিম্নরূপ :

ধর্ম ও সংস্কৃতি : আশ্রমে নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা প্রার্থনাদি ছাড়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কীর্তন ও ধর্মালোচনা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি এবং ৺কালীপূজা যোগ্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি, খ্রীষ্টমাস ঈভ

এবং শিবরাত্রিও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষা: পুস্তকাগারে ও পাঠাগারে আলোচ্য বর্ষে ৮টি সংবাদপত্র ও ৫৭টি সাময়িকী রাখা হয়। মোট পুস্তক-সংখ্যা ৩,৮৯২, তন্মধ্যে ৩,০৯৩টি পুস্তক ব্যবহৃত হয়। পাঠকগণের দৈনিক গড় উপস্থিতি ছিল ৪১।

বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র ছিল ৬৯৮ জন। উত্তর প্রদেশ বোর্ডের পরীক্ষায় মোট ১১৫ জন পরীক্ষার্থীর পাশের হার ছিল শতকরা ৯৮'২৬, তন্মধ্যে ৬৮ জন প্রথম, ৪১ জন দ্বিতীয় ও ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। একজন ছাত্র ১১শ স্থান অধিকার করে। ১৮ জন ছাত্র জাতীয় এবং ২৯ জন ছাত্র রাজ্য-ছাত্রবৃত্তি লাভ করে। ১৫৩ জন ছাত্র বিনা বেতনে ও ৪৮ জন অর্ধেক বেতনে পড়িবার সুযোগ লাভ করে। বিভিন্ন সরকারী ও অন্যান্য ছাত্রবৃত্তি পায় ৭৫ জন ছাত্র।

চিকিৎসা: দাতব্য বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে মোট ১,৭৬,৩৪৮ জন রোগীর চিকিৎসা হয়, সাধারণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল ৩২৩, ইনজেকসনের সংখ্যা ৩৭,৯৬৫। রক্ত-মল-মূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ৮৮৪, এক্স-রে বিভাগে পরীক্ষার সংখ্যা ২৪৪। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ দাতব্য চিকিৎসালয়টি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এবং সাধারণ পুস্তকাগার ও পাঠাগারটির উন্নয়নকল্পে সহৃদয় জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণ নিম্নরূপ:

৫২টি* শয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগে ১,৪৭২ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে ৬০৫ জনের শল্য-চিকিৎসা করা হয়। বহির্বিভাগে মোট ৯০,৫৪১ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে নূতন রোগী ছিল ২১,৫০০।

জুলাই ১৯৭৩-এ একটি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেন্সরির উদ্বোধন করা হয়। হরিদ্বার হইতে লাকসার রুরকি এবং হৃষীকেশ পর্যন্ত যাইবার তিনটি পথে প্রতি পথে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া ইহা প্রেরিত হয়। নয় মাসে গ্রামসমূহের রোগীর সংখ্যা ছিল ৬২,৭৬৩, তন্মধ্যে ৩৩,৪৫৯ জন নূতন। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার ভ্যানে একটি এক্স-রে মেশিনও আছে।

রক্ত-মল-মূত্রাদির ২২,৯৯৪টি নিদর্শন পরীক্ষিত হয়। হাসপাতালটিতে একটি শোণিত-ব্যাঙ্ক আছে। ৪,৪২২টি এক্স-রে ফটো তোলা হয়, ১০৫ জন রোগীর ই. সি. জি. করা হয় এবং বৈদ্যুতিক চিকিৎসা বিভাগে ১৭২টি কেসের (Cases) চিকিৎসা করা হয়।

গোশালা হইতে আলোচ্য বর্ষে ৩৭,৫১৪ কেজি দুধ রোগী ও কর্মীদের প্রয়োজনে সরবরাহ করা হয়। ৩'৫ একর জমিতে আশ্রমের কৃত সব্জি বাগানে মোট ১৫,৬৮৪ টাকার সব্জির ফলন হয়।

পাঠাগার ও পুস্তকাগারে মোট ৪,৫০৩টি বই আছে; ৩০টি সাময়িকী ও ৬টি দৈনিক পত্রিকাও রাখা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে নিত্য পূজা আরাত্রিকাদি ও প্রতি একাদশীতে রামনাম কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যোগ্য সমারোহে পালিত হয়।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও স্থানীয় ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন-এর সভা এই সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেবাশ্রমের চিকিৎসকগণ তাহাতে যোগদান করেন।

সেবাশ্রমের বহির্বিভাগের সম্প্রসারণ ও কর্মি-ভবনাদির নির্মাণ অবিলম্বে করণীয়। উহার জন্য মোট ৮,২০,০০০ টাকা প্রয়োজন।

---

* এপ্রিল ১৯৭৪-এ চক্ষুবিভাগ খোলার পর শয্যাসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৫।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

নওয়াপাড়া (যশোহর, বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ গত ২৮শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি স্মরণে এক ধর্মসভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয়ের উপর সকল বক্তাগণ গুরুত্ব আরোপ করিয়া ভাষণ দেন। স্থানীয় সকল ধর্মমতের বক্তা ও শ্রোতা উক্ত সভার আলোচনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভাষণ দেন জনাব এম. এম. আমিনদ্দিন (সভাপতি), স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীবিমল বসু স্বামী পরদেবানন্দ ও শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।

খুলনা (বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ গত ২৯শে এপ্রিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি স্মরণে এক ধর্মসভার আয়োজন করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' এই বাণীর তাৎপর্য লইয়া সকল বক্তাই আলোচনা করেন ও বাংলাদেশের নবজাগরণে এই বাণী-বাহিত ভাবধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাষণ দেন শ্রীবিমলচন্দ্র বসু শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মণ্ডল শ্রীনন্দদুলাল বসু স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীঅমরেন্দ্র মজুমদার শ্রীঅসিতবরণ ঘোষ পরমানন্দ রায় ও স্বামী পরদেবানন্দ (সভাপতি)।

চাঁদপুর (বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি স্মরণে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এক ধর্মসভার অয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আশ্রম-সেক্রেটারি শ্রীবিমলচন্দ্র বসু লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী আলোচনা করেন।

সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক গত ১৪ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদা-দেবীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিদিন ৪।৫ হাজার ভক্তের সমাবেশ হইত। প্রায় ৫০০০ ভক্ত নরনারী ভক্ত নরনারী একদিন বসিয়া প্রসাদ পান। ধর্মসভা কীর্তন রামায়ণকথা যাত্রাভিনয় ভজন ভাগবত-কথকতা এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। বক্তাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ অমৃতত্বানন্দ চিৎসুখানন্দ শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। কীর্তনে কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধারানী গোস্বামী, ভাগবত পাঠে কান্তিলতাদেবী, যাত্রাভিনয়ে শিবপুর রামকৃষ্ণ মন্দির, রামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তনে 'মায়ের খেলা' বরাহনগর এবং রামায়ণ-কথায় শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ব্যানার্জী সকলকে আনন্দ দান করেন।

চন্দননগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘ কর্তৃক গত ২৬শে ও ২৭শে এপ্রিল '৭৫, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পুণ্য জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য ও স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। শ্রীযুত শ্রীকান্ত কোলে ও শ্রীমতী সান্ত্বনা ঘোষের পরিচালনায় স্থানীয় বালক-বালিকাগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

মঙ্গলারতি ঊষাকীর্তন গুরুবন্দনা রামকৃষ্ণ-বন্দনা ও বেদপাঠের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের উৎসবের সূচনা হয়। স্বামী নিস্পৃহানন্দের পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতিসহ প্রভাতফেরি শহরের কয়েকটি অঞ্চল পরিক্রমা করে। ষোড়শোপচারে পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও কথামৃতপাঠ উৎসবের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদধিক এক হাজার ভক্ত নরনারী ও কয়েক-শত দরিদ্র-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন ধর্মসভায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ (সভাপতি) প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রহড়া বালকাশ্রমের বালকগণ ভজন-গীতি এবং শ্রীধ্রুব চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

পাঁচগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ২৬-২৯শে এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় শ্রী এস্. কে. সরকার অধ্যাপক রেজাউল করিম ব্রহ্মচারী অসিতচৈতন্য (সভাপতি) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাষণ দেন। বাউল গান, কৃষ্ণযাত্রা, শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পালাকীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ কীর্তনদল গ্রাম পরিক্রমা করে। প্রায় ১৪ শত ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান।

আরিট রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত ৩রা মে মঙ্গলারতি ভজন প্রভাতফেরি পূজা হোম চণ্ডীপাঠ প্রসাদ-বিতরণ কালী-কীর্তন ও কথামৃত-পাঠ হয়। পরদিন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের লইয়া সারাদিনব্যাপী একটি যুবশিক্ষণ-শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী নির্জরানন্দ। অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সহায়তায় উক্ত শিবিরে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং স্বামী চিৎসুখানন্দ ভাষণ দেন। উভয় দিবস শ্রীবাণীকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীভীষ্মচন্দ্র মণ্ডল শ্রীশ্যামসুন্দর দাস প্রমুখ গায়কগণ ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ৩রা ও ৪ঠা মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। স্বামী ভবানন্দ স্বামী ইজ্যানন্দ স্বামী বিকাসানন্দ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী স্বানুভবানন্দ ভাষণ দেন। বীরনগর নাট্যসংস্থা কর্তৃক 'ভক্ত ভৈরব গিরিশচন্দ্র' ও 'মহাতীর্থ কালীঘাট' যাত্রাদ্বয় অভিনীত হয়। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম গীতাপাঠ প্রসাদ-বিতরণ ইত্যাদিও উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী পরানন্দ ও উৎসাহী ভক্তগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পরলোকে কমলা সরকার

গত ২৮শে ভাদ্র ১৩৮২ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা কমলা সরকার সম্বলপুরে (উড়িষ্যায়) ৬৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। আবাল্য ব্রহ্মচারিণী তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ৺সুশীলকুমার সরকারের প্রথমা কন্যা। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সারদা আশ্রমের কর্মী হিসাবে অতিবাহিত করিয়া শেষ জীবনে সম্বলপুরস্থিত পৈতৃক বাসভবনে তপস্বিনীর জীবনযাপন করেন। বাল্যে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার পরম সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

পরলোকে বিমলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

গত ১৫ই আষাঢ় ১৩৮২ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য বিমলাচরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে মর্তধাম ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৩ বৎসর। ১৩২৮ সনে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি সস্ত্রীক দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ছিল ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী কনকসার গ্রামে। দেশ বিভাগের পরেও তিনি বহুদিন ঐ দেশে ছিলেন। পরে জামসেদপুরে চলিয়া আসেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাদপদ্মে তাঁহাদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক, এই প্রার্থনা।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১৫ই ভাদ্র। (১৩০৬ সাল) [১৬শ সংখ্যা।]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

এক পরিচ্ছেদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

এক এক জায়গায় একেবারে পথ নাই—কোথায় যাই খানিকটা একেবারে খাড়া উঠিয়াছে- আমি ত চলিতে পারি না—কি করিয়া যাই! পা রাখিব এমন স্থানও পাইতেছি না—ওদিকে পাছে একেবারে নীচে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে কাঁটা গাছকেও অবলম্বনস্বরূপ ধরিতে হইতেছে। হাতে ফুটিতেছে, কিন্তু প্রাণনাশাশঙ্কা অপেক্ষা তাহাও সুখকর বিবেচিত হইতেছে। নেপালী বন্ধুটী সময়ে সময়ে হাত ধরিয়া লইয়া তুলিতেছে। জোহারের ছুতারটী আমার গায়ের কাপড় ও লাঠি লইয়াছে। আমরা কোনরূপে চলিয়াছি। মঙ্গলপুরীর কমণ্ডলুর জলটী এক জায়গায় উলটিয়া গেল। সকলেরই কাঁটায় কাপড় জামা প্রভৃতি ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল—তথাপি চলিয়াছি। কেন চলিয়াছি, কোথায় চলিয়াছি? গুহার উদ্দেশে—ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং, তাহা যদি প্রত্যক্ষ হয়, দেখিতে। দূরে দেখা গেল, দুজন ভুটিয়া অন্য পথ দিয়া আসিতেছে। বুঝিলাম, আমরা বালককে পথপ্রদর্শক লইয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। এইরূপ অনেক পথ, প্রায় এক মাইল, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে করিতে অবশেষে লক্ষ্য স্থলে পঁহুছিলাম। খানিক উপরে দেখা গেল গুহার মুখ। একরূপ হামাগুড়ি দিয়াই উঠিলাম, সঙ্গে বাতি ছিল জ্বালা গেল।

গুহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। ভয়ে বিস্ময়ে মন চমকিত! কি দেখিব, কি দেখিব, ভাবিয়া বিহ্বল, এখনি ত দেখিব। দেখি সম্মুখে একটী নর-কঙ্কাল, আমার ঠিক স্মরণ নাই, উহা সম্পূর্ণ দেখিয়াছিলাম কিনা, কিন্তু সুরেশ্বরানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, হাঁ একটি পূর্ণ নর-কঙ্কাল আসীন ভাবে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম। আরও ভিতরে গিয়া দেখিলাম, অনেক মড়ার মাথা গড়াগড়ি যাইতেছে। আরও দূরে গিয়া একখানি আসন দেখা গেল, একটা তীর লোহার ফলাযুক্ত দেখিলাম। আরও খানিক দূর গিয়া একটা কেরোসিনের বাক্সের মত ডালাহীন বাক্সে ১০।১৫টী মড়ার মাথা। গুহার ভিতরে আর অধিক দূর যাওয়া যায় বলিয়া বোধ হইল না। ফিরিতেছি, এমন সময় আর একটী অপূর্ব্ব বস্তু নয়নগোচর হইল। পশমের কাপড়ে শেলাই করা একটা কি জিনিষ। কাছে, ছুরী ছিল, আলেখিয়ারা কাটিল; দেখা গেল, পশমের টুপী মাথায়

* ভাদ্র, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সং

দেওয়া একটী কঙ্কালার্দ্ধ। আমাদের অনুমান হইল বৃদ্ধ; ইতিমধ্যে সুরেশ্বরানন্দ গুহার বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিতেছেন, শীঘ্র বাহিরে আইস, শীঘ্র বাহিরে আইস, সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

আমরা ক্রমশঃ বাহিরে ফিরিলাম, এক্ষণে আমরা বিচার করিতে লাগিলাম, এ ব্যাপারটী কি? লছমী দতের কথা অতিরঞ্জিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা কোন মহাত্মা দেখিলাম না, কেবল হাড় দেখিলাম, চামড়া বা মাংসের কোন সম্পর্কই নাই, কিন্তু কথা এই, এতগুলি নরশিরই বা কোথা হইতে আসিল? যাহারা প্রত্ন-তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের ইহা গভীর গবেষণার বিষয় হইতে পারে। কেহ অনুমান করিবেন, ইহা হয় ত কোন কালে একটী সমাধিস্থান ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত গ্রামের নিবাসীরা ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না। কেহ কেহ বলিয়াছিল, মহাত্মা; কেহ কেহ এখানে আসিতেই ভয় করে। যাহা হউক, নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে গুহার বহির্দ্দেশে আসিয়া আমাদের আলেখিয়া বন্ধুগণ ভুটিয়াগণকে আশ্বাস দিতে লাগিল, আমরা এখানকার প্রেতদিগের শান্তি বিধান করিয়া যাইতেছি, তোমরা অতঃপর এখানে আসিতে ভীত হইও না। তাহাদের কাছে কি আশাপুরী ধূপ না কি ছিল, তাহা প্রজ্বলিত করিয়া একটু চিনি নিবেদন করিয়া দিয়া সকলকে একটু একটু প্রসাদ দিল।

এইবার আমরা ফিরিতে লাগিলাম। আমরা যাইবার সময় পথ ভুলিয়াছিলাম। এবার ঠিক পথে চলিলাম। তথাপি অনেক দূর কাঁটা গাছ ধরিয়া অতি কষ্টে কেবল পা রাখা যাইতে পারে, এমন পথের উপর দিয়া অতি কষ্টে অনেকদূর আসিয়া তবে অপেক্ষাকৃত সহজ উতার পাইলাম। শীঘ্রই পাহাড় হইতে নামিয়া পড়িলাম। শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্ত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ধর্ম্মশালায় পঁহুছিলাম। পঁহুছিয়া দেখি, লছমীদত ও গার্ব্বিয়াঙের পোষ্টমুন্সী। আরও অনেক ভুটিয়া আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া অপূর্ব্ব গুহার ব্যাপার শুনিতে লাগিল।

নাসদীয় সূক্ত।

(বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রেবর্ত্তী।)

ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্তটীকে "নাসদীয় সূক্ত" কহে। "নাসদাসীৎ" বাক্যটী এই সূক্তের প্রথমে উক্ত হওয়ায় সূক্তটীর নাম নাসদীয় সূক্ত হইয়াছে। এ সূক্তের ঋষি প্রজাপতি ও দেবতা পরমাত্মা। কবিত্বের সংস্ফূর্ত্তি ও দার্শনিক গভীরতায় এই সূক্তটী জগতে অতুলনীয়। প্রজাপতি ঋষি ইহাতে মহাপ্রলয়াবস্থা বর্ণন করিয়াছেন। মনের নিঃশেষলয়ে বা নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় জীবের যে ভাব অনুভূত হয়, তাহাও ইঙ্গিতে এ সূক্তে সূচিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কবিতায় ইহার যথাযথ বঙ্গানুবাদ দিতে চেষ্টা করিলাম।

সদসৎ কিছু নাহি ছিল সে প্রলয় ঘোরে;
না ছিল পৃথিবী, ব্যোম, দিগ্, দেশ তদূপরে।
কি আকৃতি ছিল তার? অবস্থিতি কোথা কার?
ভোক্তা ভোগ্য প্রবিভাগ ছিল না সুস্থির।
তবে কি সলিল ছিল গহন গভীর? ১।

মৃত্যু. অমরতা কিম্বা দিন রাত্রি ভেদজ্ঞান—
না ছিল সে মহালয়ে ;　চন্দ্র-সূর্য্য তিরোধান !!!
অদ্বিতীয় সে মহান্,　　বায়ুশূন্য প্রাণবান্,
মায়া সনে অভিন্ন ছিলেন অবস্থিত।
সে আত্মা ব্যতীত কিছু না ছিল বিদিত ॥ ২ ॥

সর্ব্ব অগ্রে গূঢ় ছিল অন্ধকারে অন্ধকার ;
লুপ্ত চিহ্ন ছিল সবি ;—জলে জলে জলাকার।
অসতে আচ্ছন্ন দিশি,　　ছিল সেই সর্ব্বগ্রাসী,
অদ্বিতীয় পরমাত্মা তপস্যার বলে,
প্রকটিত করিলেন মহিমা সকলে ॥ ৩ ॥

সবার প্রথমে ইচ্ছা হয়েছিল আবির্ভূত ;
মন জন্মিবার সেই হইল কারণীভূত।
অসতে সতের সৃষ্টি,　　ধ্যানেতে করিয়া দৃষ্টি,
ঋষিগণ জানিলেন রহস্য সৃষ্টির ;
নিগূঢ় বিচার তাহা করিয়া সুস্থির ॥ ৪ ॥

বিতত সে রশ্মিজাল বিকীর্ণ হইল ক্রমে,
পার্শ্বে, নিম্নে, উর্দ্ধদিকে, পূর্ব্বসৃষ্টি সুনিয়মে।
প্রজাপতি অগণন,　　মহিমার বিজৃম্ভণ—
হইল, সে তপস্যার দুর্লঙ্ঘ্য নিদেশে।
ভোক্তা রহিলেন উর্দ্ধে, ভোগ্য অধোদেশে ॥ ৫ ॥

কেবা জানে অবিতথ সৃজনের এ বৃত্তান্ত ;
কে পারে বর্ণিতে এর কোথা আদি কোথা অন্ত।
জন্মিল বা কোথা হতে,　　কেন বা নানাত্ব ইতে,
তাঁর সৃষ্ট দেবতারা জানিবে কেমনে—
কোথা হতে হল সৃষ্টি ; অন্যে কেবা জানে ? ৬ ॥

উৎপত্তি হইল কোথা ?　লীলা প্রকাশিল কেবা ?
কেহ কি করে'ছে সৃষ্টি ?　অথবা করেনি কিবা ?
এ প্রশ্নের সদুত্তরে,　　তিনি শক্ত এ সংসারে ;
পরম আকাশে যিনি প্রভু ভগবান্।
তিনি না জানিলে সৃষ্টি কেবা জানে আন্ ॥ ৭ ॥

শারীরকসূত্র রামানুজ ভাষ্যম্।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিতম্।)

[প্রথম সূত্রের মূল ভাষ্যের কিয়দংশ, বঙ্গানুবাদ সহ—বর্তমান সম্পাদক]

[১ম বর্ষ] ১লা আশ্বিন। (১৩০৬ সাল) [১৭শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত।)*

১। কামনা করা বড দোষের ; কিন্তু, আমার জ্ঞান হ'ক, ভক্তি হ'ক, এইরূপ যে কামনা, তাতে কোন দোষ হয় না। যেমন "হিনচা শাক" শাকের মধ্যে নয়, "মিছরি" মিষ্টির মধ্যে নয়, অর্থাৎ, এ সকল যদি রোগীকে দেওয়া যায়, তা হ'লে উপকার বই অপকার হয় না ; তেমনি ভক্তি-কামনা কামনার মধ্যে নয়।

২। মুক্ত পুরুষ সংসারে কি রকম থাকে জান ?—যেমন "পান-কৌড়ি" জলে থাকে, কিন্তু তাদের গায়ে জল লাগে না ; যদিও গায়ে একটু জল লাগে, তা হ'লে একবার গা ঝেড়ে ফেল্লেই তখনই সব চলে যায়।

৩। নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান ?—পাঁকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

৪। চিনিতে বালিতে মিশে থাকলে, পিঁপড়ে যেমন বালি ফেলে চিনি খায় ; তেমনি সাধু ও পরমহংসেরা এ সংসারে সদ্বস্তু যে সচ্চিদানন্দ, তাঁকেই গ্রহণ করে, আর অসদ্বস্তু যে কামিনী কাঞ্চন সে সমস্ত ত্যাগ করে।

৫। সৎ ও অসৎ লোকের স্বভাব কিরূপ জান ? যেমন কুলো ও চালুনী। কুলোর স্বভাব—মন্দ ফেলে ভাল রাখা ; আর চালুনীর কায—ভাল ফেলে মন্দ রাখা। তেমনি সৎ লোক মন্দ ফেলে ভাল ও অসৎ লোক ভাল ফেলে মন্দ গ্রহণ করে।

৬। যেমন কোনও ধনী লোকের কাছে যেতে হ'লে সেপাই শান্ত্রীর অনেক খোসামোদ করতে হয়, তেমনি ঈশ্বরের কাছে যেতে হ'লে অনেক সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ আদি নানা উপায়ের দ্বারা যেতে হয়।

---

* শ্রাবণ, ১৩০৬ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

দিব্য বাণী

ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বং চ গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু সক্তস্তথাপি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

—শঙ্করাচার্য: গুর্বষ্টকম্, ৩, ৪

ষড়ঙ্গসহ চারি বেদ কারো কণ্ঠস্থ থাকিলেও,
কবি, শাস্ত্রবিদ্ হইলেও কেহ, সুলেখক হইলেও,
কি ফল তাহাতে, কি ফল তাহাতে, কি ফল তাহাতে বল
যদি শ্রীগুরুর চরণপদ্মে মন না লগ্ন হল!

স্বদেশে ধন্য, বিদেশে মান্য কেহ বা যদিও হয়,
চরিত্রবান্, সদাচারে সদা রতও যদি বা রয়,
কি ফল তাহাতে, কি ফল তাহাতে, কি ফল তাহাতে বল
যদি শ্রীগুরুর চরণপদ্মে মন না লগ্ন হল!

কথাপ্রসঙ্গে

নিম্বার্কের দৃষ্টিতে গুরুশিষ্যতত্ত্ব

বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে, সাধনার বিভিন্ন স্তর ও ভাবভূমি হইতে গুরুশিষ্যতত্ত্ব আলোচিত হইতে পারে এবং অধিকারিবিশেষে প্রত্যেকটি আলোচনারই উপযোগিতা অবশ্যই আছে। 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই'—অদ্বৈতভাবের দ্যোতক এই বহু-প্রচলিত কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক একাধিকবার উচ্চারিত হইয়াছে, ইহা কথামৃত-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর-দর্শন হইলে গুরুশিষ্যবোধ থাকে না, যতক্ষণ ঈশ্বর-দর্শন না হয় ততক্ষণই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লিখিত ব্যাখ্যার তাৎপর্য অবশ্য ইহা নহে যে, অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে যাঁহার গুরুশিষ্য-ভেদবোধ অপসারিত হইয়াছে, তিনি ব্যবহারভূমিতেও গুরুশিষ্যসম্বন্ধ স্বীকার করেন না। প্রত্যুত জ্ঞানলাভের পূর্বে যাঁহার সহিত তাঁহার যে-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, তাহা স্বাভাবিকভাবেই—অভ্যাসবশেই তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হয়, কোনও ক্ষেত্রে মর্যাদাহানি হয় না।

একটু অদ্বৈতবেদান্ত পড়িয়া অনেকে মন্দিরে দেববিগ্রহের সম্মুখে প্রণত হওয়া অগৌরবের ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, এমন কি শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মস্তক অবনত করিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হন। তাঁহাদের ধারণায় আসে না, যে-ব্রহ্মজ্ঞান সামান্য একটু প্রণামের দ্বারাই খণ্ডিত হয়, তাহার মূল্য কতটুকু। অনধিকারী সাধকের মুখে 'নির্বাণষট্‌কম্'-এর 'গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্' শোভা পায় না। ভয়েরও কারণ আছে—উৎপাত বাড়িতে পারে। আচার্য শংকর তাহা জানিতেন। এই কারণে তাঁহার রচিত 'তত্ত্বোপদেশ'-গ্রন্থে মণ্ডন মিশ্রকে উপলক্ষ্য-মাত্র করিয়া প্রবর্তক সাধকদের উদ্দেশ্যেই লিখিয়া গিয়াছেন: শ্রুতির নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, শিষ্যের পক্ষে আমরণ কায়মনোবাক্যে বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর বন্দনীয়, শিষ্য সর্বদা অদ্বৈতভাব অভ্যাস করিবে, কিন্তু কার্যে কখনও অদ্বৈতভাব করিবে না— ত্রিভুবন সম্পর্কে অদ্বৈতভাব পোষণ করিলেও, গুরুর সহিত কখনও অদ্বৈত-সম্পর্ক স্থাপিত করিবে না।[১]

শংকর যে উপরি-উক্ত কথাগুলি শুধু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও প্রকৃত আচার্যের ন্যায় 'অভিন্ন-শ্রুত-চারিত্র'-এর অনুত্তম আদর্শ স্থাপন করিতে দেবদেবী-গণের বন্দনা গাহিয়াছেন, গুরুস্তোত্র রচনা করিয়াছেন, গৌড়পাদের অজাতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেও, ভাষ্যশেষে পরমগুরুর উদ্দেশে লিখিয়াছেন: 'পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি'— সেই পরমগুরুর শ্রীচরণে আমি বারংবার অবনত হইয়া প্রণাম জানাই।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বলিয়াছিলেন, 'মা আজকাল দেখছি সব উড়ে যায়!' শ্রীশ্রীমা তাহাতে হাসিয়া বলেন, 'দেখো বাবা, আমাকেও যেন উড়িয়ে দিও না।' স্বামীজী

---

১ যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্মণা বাচা শ্রুতেরেবৈষ নিশ্চয়ঃ॥
ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ। (৮৬-৭)

ইহা শুনিয়া বলেন, 'গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়াবে কোথায় মা ?'

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

—যদিও আমার গুরু (নিত্যানন্দ প্রভু) ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী সেবক, তথাপি তাঁহাকে আমি শ্রীচৈতন্যদেবের স্বরূপ-প্রকাশ বলিয়াই মনে করি।

গীতা ভাগবত আদি বহু গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার, কয়েকটি মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থের রচয়িতা পদকর্তা ও পদ-সঙ্কলয়িতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকম্'-এ লিখিয়াছেন :

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভো র্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

—সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরু সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই কীর্তিত এবং সজ্জনগণও সেইরূপই ভাবনা করেন, কিন্তু আমি আমার গুরুদেবের (শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী ঠাকুরের) চরণারবিন্দ এই মনে করিয়া বন্দনা করি যে, তিনি আমার প্রভুর প্রিয়, অর্থাৎ তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় —এই ভাবনাতেই আমি পরিতৃপ্ত।

এই ভাবে দেখা যায়, মহাপুরুষগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী শাস্ত্রসম্মতভাবে গুরুতত্ত্ব আস্বাদন করিয়াছেন। ভেদাভেদদর্শনের মহান প্রবক্তা আচার্য নিম্বার্ক গুরুশিষ্যতত্ত্বের যে-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে আত্মসমর্পণই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহার মতে শিষ্য সরাসরি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না—তাহাকে প্রথমে নিজ দীক্ষাগুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়; আত্মসমর্পিত শিষ্যকে গুরুই ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। একটি উপমার সাহায্যে নিম্বার্কাচার্য বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়াছেন। উপমাটি যজ্ঞের। প্রাচীনকালে যজ্ঞের অতিশয় মাহাত্ম্য ছিল। এই কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে যত্র তত্র যজ্ঞের উপমা, যজ্ঞের কথা দেখা যায়। নিম্বার্কদেব যে-উপমাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা এইরূপ : যজ্ঞকালে ঘৃত প্রথমে অর্পণে অর্থাৎ স্রুব বা হাতায় রাখা হয়, পরে অর্পণস্থিত সেই ঘৃত অগ্নিতে সমর্পিত হয়। গুরুশিষ্যপ্রসঙ্গে গুরু অর্পণস্থানীয়, শিষ্য ঘৃতস্থানীয় এবং অগ্নি ঈশ্বরস্থানীয়। ইহা স্পষ্ট যে, উপমাটি একটু স্থূল এবং এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবেই স্মরণ রাখিতে হয় যে, উপমা একদেশীই হইয়া থাকে।

নিম্বার্কের মতে উপরি-উক্ত তিনটি তত্ত্বের —ঈশ্বরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও শিষ্যতত্ত্বের—প্রতীক হইতেছে ওঙ্কার। তাই ওঙ্কারের সাহায্যেও তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ওঙ্কার তিনটি অক্ষরের দ্বারা গঠিত - অকার, উকার ও মকার। অকার ঈশ্বরের বাচক। গীতাতেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন : অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি—অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার। উকার গুরুর বাচক। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বিদগ্ধ আচার্য সুন্দর ভট্ট ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'উন্নয়তি ইতি উঃ'— উকারের অর্থ হইতেছে উন্নায়ক, নেতা, গময়িতা বা প্রাপক অর্থাৎ গুরু, যিনি শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধান করিয়া তাহাকে পরমধামে বা ঈশ্বরে পঁহুছাইয়া দেন। মকারের অর্থ জীব—এক্ষেত্রে শিষ্য। সুন্দর ভট্ট লিখিয়াছেন : শ্রুতিতে আছে, 'পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ' - এই পুরুষ হইতেছেন পঞ্চবিংশ; তত্ত্বের মধ্যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতেছে জড়া প্রকৃতি এবং চেতন জীব হইতেছে পঞ্চবিংশ; বর্গীয় বর্ণসমূহের মধ্যে মকার পঞ্চবিংশ; সুতরাং মকার ক্ষেত্রজ্ঞবাচক অর্থাৎ জীবতত্ত্ব বা শিষ্যতত্ত্বের প্রতীক। নিষ্কর্ষ ইহাই যে, অকার ও মকারের

মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যে সংযোগসেতু হইতেছেন উকারপ্রতীক গুরু। ফলতঃ ওঙ্কার জপের নিগূঢ় ভাব হইতেছে—শিষ্য গুরুর মাধ্যমে ইষ্টে অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ওঙ্কারকে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি ওঙ্কারকে 'আদিগুরু' ঈশ্বরের বাচক বলিয়াছেন। আচার্য শংকর তাঁহার রচিত 'পঞ্চীকরণ'-এ মাণ্ডূক্য উপনিষদ অনুসরণ করিয়া অকার উকার ও মকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ অকার উকার ও মকার—এই বর্ণত্রয়ের উচ্চারণস্থান বিচার করিয়া ওঙ্কার কিরূপে ঈশ্বরের একটি সার্বজনীন নাম হিসাবে সকল ধর্মের মানুষেরই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞান-সম্মতভাবে দেখাইয়া একটি মৌলিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। আচার্য নিম্বার্কের ব্যাখ্যাতেও অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে অভিনবত্ব দেখা যায়। পতঞ্জলির আদিগুরুতেই তিনি ওঙ্কারকে পর্যবসিত করেন নাই, গুরুশিষ্যতত্ত্বকেও ওঙ্কারান্বিত করিয়াছেন— আদিগুরুর সহিত জগতের সকল গুরু ও সকল শিষ্যকেও আদিবাণী প্রণবে স্থান দিয়াছেন।

আচার্য নিম্বার্কের মতে শিষ্য গুরুর নিকটে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিলে, শিষ্যের আর কিছুই করণীয় থাকে না। অবশিষ্ট সব কিছুই গুরু স্বয়ং করিয়া দেন। কিন্তু গুরুতে আত্ম-সমর্পণের অর্থ হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা নহে। গুরু যে-দীক্ষামন্ত্র দেন, তাহার আপ্রাণ সাধনাই গুরুতে আত্মসমর্পণ। নিম্বার্কদেব লিখিয়াছেন :

যা দেয়া গুরুণা বিদ্যা ভবসম্বন্ধধ্বংসিনী।

তাং তদুক্তমার্গেণ ধারয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ॥

—গুরু যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন, তাহার দ্বারাই শিষ্যের অনাদি-প্রকৃতিসম্বন্ধ বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভ ঘটে; সুতরাং উত্তম শিষ্য গুরুর উপদিষ্ট মার্গ অনুসারে সেই বিদ্যার ধারক হইবেন।

অধিকারী শিষ্যের নিকট গুরু শিষ্যসম্পর্ক অপেক্ষা মধুরতম সম্পর্ক আর কিছুই থাকিতে পারে না। এই সম্পর্ক জাগতিক হইয়াও জগদতীত, কারণ এই সম্পর্কের ফলেই, যিনি বিশ্বরূপ হইয়াও বিশ্বাতীত, যিনি রসস্বরূপ, প্রেম-স্বরূপ, সেই পরম পুরুষকে লাভ করিয়া সাধক কৃতকৃত্য হন। এই সম্পর্ক কিভাবে নিবিড়তম হইবে, তাহারও নির্দেশ দিয়াছেন প্রেমিক আচার্য নিম্বার্কদেব :

দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণৈ র্মায়াং হিত্বা সমাহিতঃ।

ভৃত্যবৎ পুত্রবৎ সেবেৎ প্রিয়াবন্মিত্রবৎ তথা॥

—দেহ ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণের প্রতি আমাদের যে মমতা তাহাই মায়া। সেই মায়া পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই শ্রীগুরুর—ইহা নিশ্চিত জানিয়া শিষ্য সমাহিত চিত্তে উক্ত দেহ ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণের দ্বারাই ভৃত্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায়, প্রিয়ার ন্যায়, মিত্রের ন্যায় শ্রীগুরুর সেবা করিবেন।

জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই; গুরুর মাধ্যমে উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে।...গুরু আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি —এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন করিতে হইবে, তাহার পর ধ্যান যতই প্রগাঢ় হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার বাহ্যরূপ আর দেখা যায় না, তখন সেখানে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বিরাজমান। —স্বামী বিবেকানন্দ

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা ঃ পরমাণু-নিষ্ঠ-শ্যামতায়াঃ অনাদিত্বস্য উভয়বাদিমতে অনঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চ অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ সতী, উত অসতী, উত সদসতী, সদসদ্‌বিলক্ষণা বা? আদ্যে আত্মনঃ ভিন্না, উত অভিন্না, ভিন্নাভিন্না বা, ভিন্নাভিন্ন-বিলক্ষণা বা? ন আদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, আত্মনঃ অনাদিত্বেন অবিদ্যানিবৃত্তেঃ জ্ঞানসাধ্যত্বানুপপত্তেঃ। ন অপি তৃতীয়ঃ, বিরোধাৎ। অতএব ন চতুর্থঃ অপি, ভিন্নাভিন্নত্ব-ব্যতিরেকেণ প্রকারান্তরাভাবাৎ।

ন চ প্রথম-দ্বিতীয়ঃ। অসত্ত্বে শশশৃঙ্গতুল্যায়াঃ তস্যাঃ সাধ্যত্বানুপপত্তেঃ, পুরুষার্থত্বাভাব-প্রসঙ্গাৎ চ। ন অপি তৃতীয়ঃ, বিরোধাৎ, উক্ত-পক্ষদ্বয়দূষণাপত্তেঃ চ। ন চ চতুর্থঃ অপি, সদসদ্‌বিলক্ষণত্বে অনির্বচনীয়ত্বেন তস্যাঃ অজ্ঞানাবস্থান-প্রসঙ্গাৎ, অনির্বচনীয়াজ্ঞান-নিবৃত্তেঃ অনির্বচনীয়ত্বানুপপত্তেশ্চ। ন হি ঘটনিবৃত্তিঃ ঘটঃ ভবতি। ততঃ চ সর্বথা অপি অনুপপত্তেঃ ন অজ্ঞানস্য নিবৃত্তিঃ সম্ভবতি ইতি আশঙ্ক্য ন তাবৎ অজ্ঞানস্য কল্পকাভাবেন অকল্পিততয়া অজ্ঞান-নিবৃত্ত্যসম্ভবঃ। দীপাদিবৎ তস্য স্ব-পর-নির্বাহকত্বাৎ তস্য স্বপ্রকাশে আত্মনি বস্তুতঃ অসম্ভবেন কল্পিতত্বস্য এব বক্তুম্ উচিতত্বাৎ। 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ' (ছাঃ ৮।৩।২), 'ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাঃ' (ছাঃ ৮।৩।১), 'নাসদাসীন্নো সদাসীৎ' (ঋ. সং ১০।১২৯।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ চ।

ন অপি অনাদিভাবত্বেন তস্য নিবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ, অনাদিভাবস্য অনিবৃত্তিঃ ইতি সামান্যব্যাপ্তেঃ জ্ঞানেন অজ্ঞাননাশঃ ইতি অনুভবসিদ্ধ-বিশেষব্যাপ্তি-বিরোধেন, 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' (ছাঃ ৭।১।৩), 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ' (শ্বেঃ ১।১।১০), 'নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে' (কঠ ১।৩।১৫), 'তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে' (মুঃ ৩।২।৬) ইত্যাদি শ্রুত্যা, 'জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ' (গীতা ৫।১৫)', 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা ৭।১৪), 'অহমজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি' (গীতা ১০।১১), 'তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্ নিবেশিতে। যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ॥' ইত্যাদি স্মৃত্যা চ।

অজ্ঞানব্যতিরিক্তস্থলে সংকোচস্য এব উচিতত্বাৎ। তস্য অন্যাভির্ভাবত্বানঙ্গী-কারাৎ। অভাববিলক্ষণত্বমাত্রেণ ভাবত্ব-ব্যপদেশাৎ চ ইতি অভিপ্রেত্য অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ সদ্রূপা আত্মাভিন্না চ ইতি আহ—সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিম্ ইতি। সংসারস্য কর্তৃত্বাদিরূপস্য কারণং যৎ ধ্বান্তম্ অজ্ঞানং তস্য বিনাশং নিবৃত্তিরূপম্ হরিং বৃত্ত্যারূঢ়ং সৎ অজ্ঞানবিরোধি চৈতন্যম্ ইতি অর্থঃ।

অনুবাদ : (পূর্বপক্ষীর এই কথার বিরুদ্ধে যদি বলা যায় যে, নৈয়ায়িকমতে পরমাণুর শ্যামরূপ অনাদি এবং ভাবপদার্থ হইলেও, পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে যখন কার্যদ্রব্যের আরম্ভক হয়, তখন ঐ কার্যদ্রব্যে পরমাণুর শ্যামরূপ বিনষ্ট হইয়া ভিন্নরূপ উৎপন্ন হয়, সুতরাং পরমাণুর শ্যামরূপ অনাদি এবং ভাবপদার্থ হইলেও, তাহার বিনাশ ঘটে। অতএব যাহা অনাদি এবং ভাবপদার্থ, তাহাই নিত্য—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলেন—) নৈয়ায়িক-সম্মত পরমাণুনিষ্ঠ শ্যামরূপ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সম্মত নহে। (বিচারস্থলে স্বপক্ষ স্থাপনের জন্য যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়, সেই দৃষ্টান্তটি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সম্মত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নৈয়ায়িক-সম্মত পরমাণুর শ্যামরূপ নিত্য নহে—এইরূপ দৃষ্টান্ত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের সম্মত না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে।) ।

আরও জিজ্ঞাস্য এই, অজ্ঞান-নিবৃত্তি কি সদ্রূপা, অথবা অসদ্রূপা, অথবা সদসদ্রূপা অথবা সদসদ্বিলক্ষণরূপা ? প্রথম পক্ষে (অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি সদ্রূপা—এই পক্ষে) উহা কি আত্মা হইতে ভিন্নরূপা, অথবা অভিন্নরূপা, অথবা ভিন্নাভিন্নরূপা অথবা ভিন্নাভিন্ন-বিলক্ষণরূপা ? (অজ্ঞাননিবৃত্তি সদ্রূপা হইয়া আত্মা হইতে ভিন্নরূপা, এই বিকল্পের উত্তরে বলা হইতেছে—) প্রথম বিকল্পটি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি হয় (আত্মা হইতে ভিন্ন অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ আর একটি সদ্বস্তু স্বীকার করিলে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মার অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাঘাত হয়)। দ্বিতীয় বিকল্পও যুক্তিসহ নহে, কারণ (সদ্রূপা অজ্ঞাননিবৃত্তি আত্মাসহ অভিন্ন হইলে) অজ্ঞাননিবৃত্তিও আত্মার ন্যায় অনাদি বলিতে হইবে এবং অনাদি আত্মা যেমন জ্ঞানসাধ্য নহেন, তদ্রূপ অজ্ঞাননিবৃত্তিও জ্ঞানসাধ্য হইবে না। তৃতীয় বিকল্পটিও (সদ্রূপা অজ্ঞাননিবৃত্তি আত্মাসহ ভিন্নাভিন্নরূপা) সম্ভব নহে, কারণ ভিন্নাভিন্নত্ব পরস্পর-বিরোধী (যে দুইটি বস্তু একই সময়ে একই অধিকরণে থাকিতেই পারে না, সেই দুইটি বস্তুকেই পরস্পর-বিরোধী বলা হয়। এখানে অজ্ঞাননিবৃত্তি আত্মার সহিত ভিন্ন এবং অভিন্ন—এইরূপ স্বীকার করিলে পূর্বের নিয়মানুসারে বিরোধ ঘটে)। এইজন্যই চতুর্থ বিকল্পটিও হইতে পারে না। কারণ ভিন্ন অথবা অভিন্ন, এই দুই পক্ষ ব্যতীত অন্য প্রকারান্তরই হইতে পারে না।

প্রথমোক্ত শঙ্কার দ্বিতীয় বিকল্পটিও (অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি অসদ্রূপা) হইতে পারে না, কারণ (অসৎ হইলে) শশশৃঙ্গতুল্য একান্ত অসৎ (অর্থাৎ তুচ্ছ) অজ্ঞাননিবৃত্তির (জ্ঞান-) সাধ্যত্বই উপপন্ন হইবে না। (অথচ জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ নিয়ম)। আর অজ্ঞান-নিবৃত্তি না হইলে পুরুষার্থ (মোক্ষ-) সিদ্ধিও হইবে না।

তৃতীয় বিকল্পটিও, (অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি সদসদ্রূপা) বিরোধ হয় বলিয়া এবং পূর্বোক্ত (সদ্রূপা ও অসদ্রূপা এই) উভয় পক্ষ স্বীকারে যে সকল দোষ হয়, সে সকলেরই এইস্থলে প্রাপ্তি ঘটিবে বলিয়া—যুক্তিসহ নহে।

চতুর্থ বিকল্পও (সদসদ্বিলক্ষণত্ব) হইতে পারে না, কারণ অজ্ঞাননিবৃত্তি সদসদ্বিলক্ষণ, ইহা স্বীকার করিলে তাহা অনির্বচনীয় হওয়ায় (অজ্ঞাননিবৃত্তিতে) অজ্ঞানের স্থিতিই (কার্যতঃ) স্বীকৃত হইয়া পড়িবে। আর অনির্বচনীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তিও অনির্বচনীয়—একথাও উপপন্ন হয় না। (দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়) ঘটের নিবৃত্তি কখনও ঘটস্বরূপ হয় না। অতএব কোন প্রকারেই

অজ্ঞাননিবৃত্তি সিদ্ধ না হওয়ায় উহা (অজ্ঞানের নিবৃত্তি) হইতেই পারে না। (এই সকল শঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন —) কল্পকের অর্থাৎ অধ্যাস-সামগ্রীর অভাববশতঃ অজ্ঞান অকল্পিত (অনধ্যস্ত), সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তিও সম্ভব নহে (কারণ কল্পিত বস্তুরই নিবৃত্তি সম্ভব) এরূপ বলিতে পার না। কারণ দীপাদির ন্যায় অজ্ঞান স্বপরনির্বাহক (দীপ যেমন নিজের ও অন্য বস্তুর প্রকাশন-কার্যের জনক, অজ্ঞানও তদ্রূপ নিজের ও অন্য পদার্থের অধ্যাসের জনক)। আর স্বপ্রকাশ আত্মাতে অজ্ঞান বস্তুতঃ থাকিতে পারে না (কিন্তু 'আমি অজ্ঞ'- এইরূপে উহা অনুভূত হয়) বলিয়া অজ্ঞান আত্মাতে কল্পিত, ইহাই বলা উচিত। এ বিষয়ে (আত্মাতে অজ্ঞানের অবস্থান বিষয়ে) শ্রুতি-প্রমাণও আছে, যথা—'মিথ্যা অজ্ঞানকৃত তৃষ্ণাভেদ দ্বারা অবিদ্যাদি দোষ-সহায়ে স্বরূপ হইতে বহিষ্কৃত', 'আত্মস্থ সত্যকামাদি গুণসকল মিথ্যা আবরণরূপ', 'সৃষ্টির পূর্বে সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না, (কিন্তু এক তমোরূপ অজ্ঞানই ছিল)'।

অজ্ঞান অনাদি-ভাবরূপ বলিয়া তাহার নিবৃত্তি উপপন্ন হয় না, একথাও বলিতে পার না। কারণ, (তাহা হইলে) অনাদি-ভাবরূপ পদার্থের নিবৃত্তি হয় না, এই সামান্য (সাধারণ) ব্যাপ্তির, জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নাশ হয়, এই বিশেষ (অসাধারণ) ব্যাপ্তির সহিত বিরোধ হয়।* (অজ্ঞান অনাদি ও ভাবরূপ বলিয়া নিবৃত্ত হয় না — এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি- ও স্মৃতি- বিরুদ্ধ, ইহাই দেখানো হইতেছে—) 'আত্মবিৎ শোক অতিক্রম করেন', 'পুনঃ অন্তকালে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি হয়', 'তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়', 'সেই যতিগণ (লিঙ্গশরীর-ভঙ্গরূপ) চরম মরণকালে (উপাধি ত্যাগ করতঃ) ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন'— এই সকল শ্রুতির সহিত এবং—'জ্ঞান দ্বারা যাহাদের আত্মবিষয়ক সেই অজ্ঞান নাশ হইয়া যায়', 'যাহারা আমার শরণাগত হয় অথবা আমাকে লাভ করে, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিয়া থাকে', 'আমি অজ্ঞানোৎপন্ন তমঃ (মোহাদি) নাশ করিয়া থাকি', 'যিনি হৃদয়ে নিবিষ্ট হইলে অর্থাৎ যাঁহাতে চিত্ত সমর্পিত হইলে যোগী অবিদ্যারূপিণী মহতী মায়াকে অতিক্রম করেন, সেই অমেয় (জ্ঞানাতীত) চৈতন্যরূপী আত্মাকে নমস্কার।'— এই সকল স্মৃতির সহিতও বিরোধ ঘটে।

অতএব অনাদি-ভাবরূপ পদার্থের নিবৃত্তি হয় না, এই নিয়ম একটু সঙ্কোচ করিয়া অজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত স্থলেই উহা প্রযোজ্য হইবে। বিশেষতঃ আমরা অজ্ঞানের একান্ত ভাবরূপত্বও স্বীকার করি না, কারণ অজ্ঞান অভাব-বিলক্ষণ অর্থাৎ অভাবরূপ নহে, এইটুকু বুঝাইবার জন্যই তাহার ভাবত্ব-ব্যপদেশ অর্থাৎ ভাবরূপত্ব কথিত হয়। এই অভিপ্রায়েই অজ্ঞান-নিবৃত্তি সদ্রূপা ও আত্মাসহ অভিন্না—ইহা মনে রাখিয়াই আচার্য বলিতেছেন—] **'সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিম্'** ইত্যাদি। কর্তৃত্বাদিরূপ সংসারের কারণ যে ধ্বান্ত অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহার বিনাশ অর্থাৎ নিবৃত্তিরূপ যে হরি অর্থাৎ (অখণ্ডাকারা) বৃত্তিতে আরূঢ (অভিব্যক্ত) অজ্ঞানবিরোধী চৈতন্য (তাঁহাকে আমি বন্দনা করি) —ইহাই অর্থ।

[ক্রমশঃ]

---

* যাহা অনাদি এবং ভাবরূপ তাহার নিবৃত্তি হয় না, ইহাই নিয়ম। আত্মা ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্ত। এখানে ইহাকেই সামান্য ব্যাপ্তি বলা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ নিয়মের সহিত বিরোধ ঘটিলে সামান্য নিয়ম বর্জনীয় হয়। অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, ইহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং অজ্ঞান জ্ঞান-নাশ্য, ইহা বিশেষ ব্যাপ্তি। এই স্থলে পূর্বোক্ত সামান্য ব্যাপ্তি দুর্বল।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

১লা ফাল্গুন, ১৩২৪

জয়রামবাটী।

কল্যাণবরেষু

তোমার ২৬শে মাঘের পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর এখন বড়ই দুর্ব্বল, তবে অন্য কোনও গ্লানি নাই। শরৎ এখান হইতে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। আমি কবে কলিকাতা যাইব তাহার ঠিক নাই। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ তোমার মাতাঠাকুরাণী

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণং

শ্রীশ্রীজগদম্বা আশ্রম
কোয়ালপাড়া
কোতলপুর পোঃ
বাঁকুড়া জেলা
১৩২৬।১০ বৈশাখ

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারাণী পূর্ব্ববৎই আছে। তুমি শ্রীশের হস্তে যে পেঁপে পাঠাইয়াছিলে তাহা এবারে আমি খুব খাইয়াছি। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশলাদি লিখিও। বাকী মঙ্গল। ইতি

আঃ তোমার মাতাঠাকুরাণী

(৩)

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

জয়রামবাটী
পোঃ দেশড়া
৩০ ভাদ্র*

পরমকল্যাণীয়

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমাদের ওদিকে চাউলের দর খুব বেশী জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। এদিকে ৬৷৹/৭৲ টাকা করিয়া চাউল যাইতেছে। আমি শারীরিক একপ্রকার ভাল আছি। বাকি সকলে ভাল আছে। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ, বাকি মঙ্গল। ইতি

আঃ মাতাঠাকুরাণী

---

* পোস্টকার্ডটিতে 'দেশড়া' ডাকঘরের ছাপ আছে: 18 SE. 19 (18th September 1919)।—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

গৃহস্থ ভক্তগণের সংসারে অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা মা পছন্দ করিতেন না। ভগবানেরই সংসার, সেখানে আমাদের যে-কাজে তিনি রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাহা যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করার জন্য সতত চেষ্টান্বিত হওয়া প্রয়োজন,—তাঁহার সকল সন্তানকে ইহাই তাঁহার শিক্ষা। ভক্তগণকে মা উপদেশ দিতেন: 'দুঃখ কষ্ট হয়, ঠাকুরকে ডাকো, তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন।' স্বীয় কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিয়া মা বলিতেন, 'ঠাকুর, যাঁর পরনের কাপড় ঠিক থাকত না, তাঁরই আমার জন্যে কত চিন্তা!' মা বলিতেন, ঠাকুরের তাঁহার জন্য খুব ভাবনা ছিল। মা কোথায় থাকিবেন, কিরূপে খাওয়া-পরা চলিবে—এজন্য চিন্তিত হইয়া বিশিষ্ট ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন ঠাকুর, 'হ্যাগা, ছ-সাত শ টাকা হলে একজন মেয়েমানুষের পাড়াগাঁয়ে থাকা চলে?' মা বলিয়াছেন, 'ঠাকুর সেজন্য কিছু টাকা যোগাড় করে দিয়েছিলেন।' মাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাগা, টাকা কোথায় রেখেছ?' মা বলিলেন, 'মশলার হাঁড়িতে।' ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'টাকা ঐভাবে রাখে!' টাকা যোগাড় হইয়াছিল কিছু (৬০০৲ বলিয়া শুনা যায়)। পরবর্তী কালে উহা বলরাম বসুর জমিদারী সেরেস্তায় জমা থাকে এবং মাসে মাসে মাকে সুদ হিসাবে কিছু দেওয়া হইত (৬৲ টাকা)। এই প্রসঙ্গে তাঁহার জন্য ঠাকুরের ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া মা সহাস্যে বলিতেন, 'এখন দ্যাখো, তাঁর ইচ্ছায় কত টাকা আসছে আর যাচ্ছে।' কামারপুকুরে মা ঠাকুরের ঘর ভাগে পাইয়াছিলেন; ঠাকুর তাঁহাকে সেই ঘর না ছাড়িয়া, রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মা চিরকাল সেই ঘর সযত্নে মেরামতাদি করাইয়া রক্ষা করেন। শেষকালে তিনি তথায় বাস করিতে না পারিলেও, যখন খালি থাকিত, কামারপুকুর-দর্শনার্থী তাঁহার সন্তানগণকে সেই ঘরে রাত্রিবাস করিবার জন্য বলিতেন। পরমাত্মৈকদৃষ্টি ত্যাগবিগ্রহ এই অদ্ভুত সন্ন্যাসিনীর ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞান ও ব্যবহার দেখিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বুঝা যায় দেহধারী জীবের কি ভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা প্রয়োজন, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার দেহধারণ—নিজে করিয়া দেখাইয়া দেওয়া, যখন যাহা করিবে ষোল আনা মন দিয়া করিবে। সারবস্তু শ্রীভগবানের ভজন যেমন মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তন্ময়চিত্তে একাগ্র হইয়া করিতে হয়, তেমনই সংসার অসার বস্তু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াও, যতদিন দেহ আছে, সুচারুরূপে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বুদ্ধিবিবেচনাপূর্বক যথাসম্ভব অপরকে উদ্বেজিত না করিয়া জীবনযাত্রা-নির্বাহ করা আবশ্যক।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, জনৈক সন্তানের সেবার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া মা মূল্যবান বস্ত্র কিনিতে টাকা খরচ না করিয়া সাধুভক্তের সেবার জন্য কিছু ধান্যজমি কিনিয়া দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মামাদের বাড়ীসংলগ্ন কলু-পুকুরের পাড়ে একখণ্ড জমি বিক্রী হইবার কথা ছিল—সেই জমি শতাধিক মূল্যে ক্রয় করা আরম্ভ হয় এবং সেই ভক্ত সাকুল্যে টাকাও পাঠাইয়া দেন। কিন্তু পরে বিক্রেতার মত পরিবর্তিত হয়, তিনি জমি বিক্রী করিবেন না

বলেন। মা দিন কয়েক পরে একটি সন্তানকে, যিনি এই ব্যাপারের কিঞ্চিৎ জানিতেন, লিখিলেন, 'বাবা! জমি ত এখন কেনা হলো না, টাকা হাতে থাকলেই খরচ হয়ে যায়, সেজন্য কোয়ালপাড়ায় কেদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি. ধান কিনে রাখবার জন্যে — এই সময় ধান খুব সস্তা। যখন প্রয়োজন হবে ধান বিক্রী করলেই টাকা পাওয়া যাবে। আরও কিছু টাকা দিয়ে (২০০) দু'শো টাকা পুরো করে দিয়েছি ধান কিনে রাখবার জন্যে।' জমি সুবিধামত না পাওয়ায় আর ক্রয় করা হয় নাই, কিন্তু কিছুকাল পরে যখন এই ধান্য খরচ হইল তখন উহার দাম চতুর্গুণ। অবশ্য মায়ের কৃপায় জয়রামবাটীতে তাঁহার ও সাধুভক্তের সেবার জন্য বহু ধান্যজমি সংগ্রহ হইয়াছে পরবর্তী কালে।

জয়রামবাটীতে নূতন বাড়ী নির্মাণ হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়েত উহার উপর চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য করিয়াছিল এবং মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রথম বৎসর জনৈক সন্তান, যিনি তখন সেখানে ছিলেন, বার্ষিক ট্যাক্স ৪৲ টাকা দিয়াছিলেন। পরবর্তী বৎসরে মা দেশে ছিলেন। ট্যাক্স লইতে আসিলে চেষ্টা করিয়া ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য উপস্থিত সন্তানকে আদেশ করিলেন। মা তাঁহাকে বলেন, 'এখন আমি এখানে রয়েছি, না হয় ট্যাক্সর টাকা দিয়ে দিলুম, কিন্তু পরে যে সাধু-ব্রহ্মচারী থাকবে, তাকে হয়ত ভিক্ষে করেই খেতে হবে। সে কোথায় টাকা পাবে? চেষ্টা কর ট্যাক্স বন্ধ করার জন্যে।' এজন্য মা বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া নিজের নামে পত্র লিখাইয়া সন্তানকে প্রেসিডেণ্টের কাছে পাঠাইয়াছিলেন এবং সেবার ট্যাক্স দিতে হইলেও পরবর্তী বৎসরে উহা বন্ধ হইবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। পরবর্তী বৎসরে মা আবার যথাসময়ে একজন সন্তানকে পাঠাইয়া তদারক করেন এবং উহা বন্ধ হয়।

প্রতি বৎসর যথাসময়ে চাল ডাল গুড় ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিস যখন আমদানী ও সস্তা হইত, মা সে সব ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেন। বর্ষার পূর্বে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ এবং ঘর-দরজা মেরামত, মটকা মোড়া, চাল ছাওয়া প্রভৃতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করাইতেন। কোন জিনিস যাহাতে অপচয় না হয়, গোবর দিয়ে ঘুঁটে করানো, পার্শেলের প্যাকেট কাগজ পত্রাদি সব গুছাইয়া রাখা এবং সময়ানুসারে কাজে লাগানো প্রভৃতিতে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। তরকারী ও ফলের খোসা, ভাতের ফেন এবং গরীব দুঃখী কেহ না আসিলে উদ্বৃত্ত ভাত ডালও অপচয় না করিয়া সেগুলি যাহাতে গরুকে দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। এই সকল কাজে গোলাপ মার সতর্ক দৃষ্টি ও সুব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া অপর সন্তানদিগকে শিখাইতেন, 'গোলাপ আমার কোন জিনিস নষ্ট করবে না, আকের খোসাগুলি পর্যন্ত শুকিয়ে রাখে উনুন ধরাবার জন্যে।'

অনেক সন্তান মাসে মাসে নিয়মিতভাবে, কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে মাকে টাকা পাঠাইতেন তাঁহার সেবার জন্য। পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় প্রতিমাসে নিয়মিত ১০৲ টাকা পাঠাইতেন, সময় সময় অতিরিক্তও দিতেন। কুপনে ভক্তগণ স্বীয় অন্তরের কথা ও প্রণিপাতাদি জ্ঞাপন করিতেন। মা সেই সকলের যথাযথ উত্তর দেওয়াইতেন, সকলের বিশেষ তৃপ্তি ও আনন্দ হইত মায়ের টিপ সই দেখিয়া, শুভাশীর্বাদ পাইয়া। এক সময়ে একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে মাকে একখানি পত্র লেখে এবং ঐ সঙ্গে একটি 'মায়ের স্তব' — স্বরচিত কবিতা— পাঠায়। নানা কারণে মা ব্যস্ত থাকায় ঐ পত্রের জবাব দিতে দেরী হয়। ইতিমধ্যে সেই মেয়েটি আর একখানা পত্র লিখিয়া জানিতে চায়, মা তাহার পত্র ও কবিতা পাইয়াছেন কিনা। মা পত্র শুনিয়া মৃদুহাস্যে

বলিলেন, 'প্রশংসা শুনতে চায়।' তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন। কবিতার প্রাপ্তিস্বীকার, প্রশংসা ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া শুভাশীর্বাদসহ পত্র লিখিলেন।

একজন ভক্ত মাকে সর্বদা টাকা পাঠান, মায়ের বাড়ী যাতায়াত করেন দূরদেশে থাকিলেও। মায়ের বাড়ীর কাজে এবং সন্তানগণের জন্যও যথাসাধ্য খরচ করেন। মা ও মায়ের বাড়ীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক টান দেখা যাইত। তিনি যে চাকরী করেন, তাহাতে মাহিনা খুব বেশী নহে, সেজন্য আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া খরচ করিতে পারেন না, মনে ক্ষোভ হয়। তিনি মাকে এক পত্র লিখিলেন, তাঁহার আর একটি চাকরী পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে মাহিনা বেশী, সেজন্য চেষ্টা করিবেন কিনা। যে চাকরীতে নিযুক্ত আছেন তাহাতে আয় কম, কিন্তু বহুদিন হইতে সেখানে আছেন, সকলের সঙ্গে জানাশুনা হইয়াছে, সুখে শান্তিতে কাটাইতেছেন। নূতন চাকরীতে আয় বাড়িবে, ইচ্ছা মতো ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাবনা, কিরূপ লোকের সঙ্গে পড়িবেন; দুঃখ অশান্তি বাড়িবে কিনা ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা মনে আসিতেছে। মায়ের মতামত জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মা ভাল করিয়া পত্রখানি শুনিলেন, চিন্তা করিলেন, তৎপরে বলিলেন— 'যা আয় আছে তাতেই ত চলে যাচ্ছে ঠাকুরের কৃপায়; টাকার জন্যে নূতন স্থানে গিয়ে অজানা লোকের মধ্যে শেষে দুঃখ অশান্তি না বাড়ে। সন্তুষ্ট হয়ে যেখানে আছ সেখানেই পড়ে থাকা ভাল মনে হয়— লিখে দাও।'

মায়ের একটি সন্তান লিখিয়াছেন, তিনি বিবাহ না করিয়া ত্যাগের পথেই জীবনযাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু তাঁহার পিতা ঘোর বিরোধী। নানা উপায়ে তাঁহাকে সংসারে টানিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পত্রের করুণ লেখা শুনিয়া মায়ের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, 'দেখ দেখ, বাপ হয়ে ছেলের মাথায় কুড়ুল মারতে চায়, ছেলের সর্বনাশ করতে চায় - ছেলে দুঃখে লিখেছে!' মা ছেলেকে আশ্বাস দিয়া আশীর্বাদ জানাইয়া, জবাব দিলেন। তাঁহার কৃপায় ছেলের সকল বিপদ কাটিয়া যায়। ধীরে ধীরে পিতার মতি-গতি পরিবর্তিত হয়, তিনি ছেলের উপর প্রীত হইয়া তাহার ধর্মপথের সহায়ক হন এবং ছেলেও প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিয়া শেষ সময়ে আন্তরিক প্রীতি ও শুভাশীর্বাদ লাভ করেন।

একজন পত্রে লিখিয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহার যে ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন— তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে রোজগার করিয়া খাওয়াইবে ভরসা করিয়াছেন, সে মাতা-ঠাকুরাণীর নিকট কিছুকাল পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সম্প্রতি সে পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া সাধু হইবার উদ্দেশ্যে এক আশ্রমে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গর্ভধারিণী শোকে শয্যাশায়ী। তিনি বৃদ্ধ, নিরুপায়, চোখে অন্ধকার দেখিতেছেন। পত্রে অতি করুণ ভাষায় তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী নিবেদন এবং ছেলেটিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। পত্র শুনিয়া মা খুবই আপসোস করিলেন, বলিতে লাগিলেন, 'হায়! না জানি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে কত অভিসম্পাত করছেন! করবারই ত কথা। কত কষ্ট করে, কত আশা-ভরসায় ছেলেকে মানুষ করেছেন, এখন সে হঠাৎ পালিয়ে গেল!' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুব সান্ত্বনা দিয়া জবাব লেখা হইল। মা জানাইলেন, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না, ছেলে তাঁহাকে কিছু জানায় নাই। সে নিজের ইচ্ছাতেই সাধু হইয়াছে— তিনি কি করিবেন, এই বিষয়ে তাঁহার কোন হাত নাই। ভগবানের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে

বলিয়া জানাইলেন— ভগবান অবশ্যই তাঁহাদের রক্ষা করিবেন, তাঁহারা যেন দুশ্চিন্তা ত্যাগ করেন। পরে মা পত্রলেখক সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বাবা! এই বোকাগুলো কেন হঠাৎ এই রকম করে, আর বাপ-মাকে কষ্ট দেয়, নিজেও কষ্ট ভোগ করে! কিছুকাল ধরে আশ্রমে যাতায়াত, কিছুকাল সাধুসঙ্গে বাস করতে হয়, দেখে দেখে বাপ-মায়ের সহ্য হয়ে যায়, বুঝতে পারে ছেলের মতিগতি, তখন ছেড়ে গেলে আর মনে এত লাগে না।' মায়ের এই সন্তানটি তখন বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, তবে কিছুকাল বাপ-মায়ের নিকটেই থাকিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের মত করাইয়া সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁহারা যতকাল জীবিত ছিলেন, পরস্পর খোঁজখবর রাখা, দেখা সাক্ষাতে ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন।

মায়ের একটি বিশিষ্ট সন্তান মায়ের শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার কাজের সফলতার জন্য। সন্তানটি বহু পূর্বে মায়ের দেশে আসিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তৎপরে আর একবার জয়রামবাটী আসিয়া কয়েক দিন মায়ের শ্রীচরণসমীপে বাস ও স্বরচিত মনোহর গানে মায়ের মনোরঞ্জন করেন। তিনি নানাপ্রকারে ঠাকুরের জীবন ও বাণী প্রচারের চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশায় শ্রীশ্রীমার শুভাশীর্বাদপ্রার্থী। মা পত্র শুনিলেন, স্নেহাশীর্বাদ জানাইলেন, 'ঠাকুরের কৃপায় তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হউক' লিখাইলেন। তৎপরে লেখক সন্তানকে শুনাইয়া ধীর স্বরে বলিলেন, 'তাঁর ইচ্ছাতেই হবে।'

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন হইতে কয়েকজন ভক্তের নামসংযুক্ত একটি মুদ্রিতপত্র জয়রামবাটীতে আসিয়াছে— মায়ের পূর্ববঙ্গে যাওয়ার আয়োজন হইতেছে। জনৈক সন্তান মায়ের নিকট এই বিষয় উত্থাপন করিলে তিনি উহার কিছুই জানেন না বলিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'চাঁদা তুলবে ত?' কি আশ্চর্য, প্রকৃতপক্ষে চাঁদার জন্যই আবেদন— মায়ের ভ্রমণব্যয় নির্বাহার্থে। মায়ের সূক্ষ্মদৃষ্টির কথা ভাবিয়া সন্তান বিস্মিত—নীরব। মা বলিতেছেন, 'বাবা! লোকগুলো হুজুগ নিয়েই আছে! কেবল হুজুগ আর হুজুগ! আর চাঁদা তোলা। এই স্থাখো ঠাকুরকে নিয়ে এক নতুন হুজুগ উঠেছে!' মাকে নিজেদের অঞ্চলে লইয়া যাইবার জন্য নানা স্থানের ভক্তগণের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা হইত এবং সময় সময় তাঁহারা বিশেষ আগ্রহী হইয়া আয়োজন উদ্যোগও করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। মাকে প্রার্থনা করিলে তিনি বলিতেন, 'বাবা! আমি কি জানি! ঠাকুরের যা ইচ্ছা তিনি যখন যেখানে রাখবেন।' খুব বেশী পীড়াপীড়িতে বড়জোর বলিতেন, শরৎকে জিজ্ঞেস করো।' শরৎ মহারাজ ত কিছু বলিতেনই না। উদ্বোধনে বাড়ী করিয়াছেন এত কষ্ট করিয়া, কত সাধ মনে সেখানে রাখিয়া মায়ের সেবা করিবার, তাহাই সহজে পূর্ণ হয় না।

(ক্রমশঃ)

বরাভয়-করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চ তান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন-বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণ-পদ দেখ না
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা॥'

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আমাদের আরাধনার যীশুখৃষ্ট*

স্বামী বুধানন্দ

(১)

আজ এই পুণ্যসায়াহ্নে এই বহু সাধনসিদ্ধির সাগর-সঙ্গমে আমরা সমবেত হয়েছি যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের আগমনী উৎসবে। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২৫শে ডিসেম্বর। ২৪শে ডিসেম্বরের এই উৎসবকে তাই আগমনী উৎসব বলা চলে।

খৃষ্টদেবের আবির্ভাব দিবসটি মানুষের ধর্মের ইতিহাসে একটি চির-ভাস্বর দিন, কারণ ঐ দিনটিতে জগতে এমন একটি অত্যাশ্চর্য ঈশপ্রকাশ হয়েছিল যার অগুণতি রশ্মি-প্রভায় মানুষের ধর্ম-দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে আছে। আধুনিক মানুষ নিজ কর্মের জটিল-কুটিলতায় যতই বিভ্রান্ত হোক না কেন, সে যতই স্বয়ম্ভর হবার চেষ্টা করুক না কেন, তার উপর খৃষ্টদেবের সামূহিক প্রভাব সত্যই বিস্ময়কর।

এই দিনে পৃথিবীর সকল দেশে গির্জায়, খৃষ্টীয় মঠে, বা সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে, পর্ণগৃহে, রাজপ্রাসাদে, পান্থশালায়, অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্র-বক্ষে চলমান জাহাজে, এমন কি পথের পাশের আস্তাবলে,—বহুশত-ভাষাভাষী ভক্তগণ, হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর স্তুতি, অর্চনা ও আরাধনা করছেন। এই জগৎজোড়া বিরাট পূজায় আমরাও আজ আমাদের হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ এনেছি খৃষ্ট-দেবের শ্রীচরণে।

বাইবেলের New Testament বা নববিধানে খৃষ্ট-কথায় এই অমোঘ আশ্বাস-বাণী রয়েছে: 'For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.'—"যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে সমবেত হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।"

তাঁর এই সত্যবাণীর আশ্বাসে আমরা বিশ্বাস করি, আমরা যখন এখানে শ্রীঠাকুরের মন্দিরে তাঁর নামে এতজন একত্র হয়েছি, তিনি নিশ্চয়ই নিগূঢ়-ভাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তাঁকে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনায় পাওয়াটাই আজ সায়াহ্নের সবচেয়ে মূল্যবান কথা।

শ্রীঠাকুরের কথায়ও রয়েছে: যেখানে তাঁর কথা হয়, সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়।

ঠাকুর তো বিশ্বজোড়া থেকেও এইখানেই বিশেষভাবে আছেন, কারণ নরেনের কাছে প্রতি-শ্রুতি তো দেওয়াই আছে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ উপস্থিতির দরবারে খৃষ্টদেবের আজকের সন্ধ্যার এই উপস্থিতি এক মহানন্দময় আধ্যাত্মিক মহাসমারোহ। এ সত্যটি ধ্যানের বস্তু—এ যেন সনাতনের ঘরে এই ঈশতনয়ের প্রেম-সংহতি।

(২)

আমরা হিন্দু হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে কেন যে খৃষ্টদেবের ভজনা করি, এটি কোন কোন খৃষ্টান ধর্ম-যাজকের কাছে, এমন কি কোন কোন হিন্দুর কাছে সম্যক্ বোধগম্য নয়। তাঁরা এ বিষয়ে নিজেদের কৃষ্টি অভিরুচি ও বুদ্ধির আলোক বা অন্ধকার অনুযায়ী যে সব নানা কথা ভাবেন ও বলেন সে বিষয়ে আলোচনা এ সভায় নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের সর্বান্তরিক যীশু-আরাধনার মূলে যে নিগূঢ় মরমিয়া সত্য-ধৃতি রয়েছে, তার বিশদ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আজকের

---

* ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিপি।

দিনে আছে। সংঘের প্রত্ন-প্রথা বজায় রাখার জন্যে যে আমরা এ উৎসব করে চলেছি তা নয়। এ প্রত্ন-প্রথার মূলে যে সত্যটি সেটি আমাদের আলোচনার বস্তু। আমাদের যীশু-আরাধনা সামগ্রিক রামকৃষ্ণ-আরাধনার একটি প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত অনিবার্যরূপে যীশুভক্ত হবেন—প্রাণের দায়ে নয়, প্রেমের দায়ে।

মনে নিশ্চয় পড়ছে সকলের—ঠাকুরের সাধন-সমাপ্তির দিনগুলির কথা। দ্বাদশ বৎসর সাধনান্তে ষোড়শীপূজা সম্পন্ন করে ঠাকুর স্বকীয় সাধন-যজ্ঞ সবে সম্পন্ন করেছেন।

ভক্তের ভিড় তখনও জমে উঠেনি। শম্ভু-চরণ মল্লিকের নিকট বাইবেল পড়া শুনে শ্রীঈশার দিব্য জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ঠাকুর জানতে পারেন। তার অব্যবহিত পরে যদুলাল মল্লিকের উদ্যান-বাটিতে বিলম্বিত এক চিত্রে মাতৃক্রোড়ে বাল-ঈশ-মূর্তি দর্শন করেন। ঐ ছবিখানি দেখতে দেখতে কি ভাবে সে ছবি জীবন্ত-জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল এবং সেই জ্যোতিরশ্মি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে ভাবের আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং কিরূপে তিনি খৃষ্ট-সম্বন্ধীয় দর্শনাদিতে নিমগ্ন হয়ে জগন্মাতার মন্দিরে যেতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন—এসব কাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী পাঠকের সুবিদিত।[১]

এই ভাবপ্রবাহ তিনদিন তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে রেখেছিল। তৃতীয় দিনের শেষে পঞ্চবটীর তলে বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুর দেখলেন এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থির-দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে দেখতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বুঝলেন যে, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখলেন বিশ্রান্ত নয়নযুগল এঁর মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করেছে এবং নাক একটু চাপা হলেও মুখশ্রীর কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। তাঁর সৌম্য সুশান্ত প্রেমগভীর মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখে বিস্ময়ে অভিভূত ঠাকুর ভাবলেন—কে ইনি? দেখতে দেখতে ঐ মূর্তি যখন ঠাকুরের নিকটে এল, তখন তাঁর পূত হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃ ধ্বনিত হতে থাকল: 'ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা থেকে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিতদান এবং মানুষের হাতে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরমযোগী ও প্রেমিক খৃষ্ট ঈশামসি!'

তারপর এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল, যার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য মানুষের ধর্ম-ইতিহাসে কতদূর বিস্তার লাভ করেছে ও করবে সে সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবনা এখনো শুরু হয়নি।

দেবমানব ঈশা এগিয়ে এসে ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাঁর দেহে বিলীন হলেন। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারালেন। তারপর সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হয়ে রইলেন। এরূপে যীশুখৃষ্টের দর্শন লাভ করে ঠাকুর তাঁর অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মাত্রেই যীশুর অবতারত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় যীশুখৃষ্টের অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান হতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়, কারণ পণ্ডিতকুলের উন্নত বা উন্মত্ত সমালোচনার দৌরাত্ম্যে পাশ্চাত্যেই এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহের সৃষ্টি করা হয়েছিল। আজও তার রেশ কাটেনি।

কিন্তু আমাদের কাছে এর চেয়েও বড় কথা এই যে, ঈশামসি ঠাকুরকে আলিঙ্গন করে তাঁর দেহে বিলীন হলেন। এই যে পূর্ণের সঙ্গে

---

১ লীলাপ্রসঙ্গ (১৩৭৭) সাধকভাব, পৃঃ ৩৭০-১

পূর্ণের মিলন হল—এই মহাসাগর-সঙ্গমে আমাদের যীশু-আরাধনার বেদী – পারমার্থিক বেদী। এ বেদী নশ্বর কোন বস্তুতে তৈরী নয়। তাই এ বেদী কেউ ভাঙতে পারবে না। এ বেদী মানুষের হাতের তৈরী বেদী নয়। আমাদের সাধ্য নেই, এই মহা একীকরণের পরে শ্রীরাম-কৃষ্ণকে আমরা যীশুখৃষ্ট থেকে আলাদা করে দেখি। তাই বলছিলাম রামকৃষ্ণভক্ত অনিবার্যরূপে যীশুভক্ত। আমাদের আজকের উৎসবের মরমিয়া মূল ঐখানে। এ সত্যটি আজ আমরা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করব।

উচ্চাঙ্গের সমালোচকেরা খৃষ্ট সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের অনুভূতির প্রমাণানুগ শেষ কথা, শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এই যে: তিনি ঈশ্বরাভিন্ন, পরমযোগী ও প্রেমিক।

তা হলে কি হল?

ভাগবত-অঙ্কটুকু একটু কষে দেখা যাক্। শ্রীঠাকুরকে আমরা জানি জ্যোতিত-যুগ-ঈশ্বর, নিষ্কারণ-ভকতশরণ, যোগসহায়, চির-উন্মদ প্রেম-পাথাররূপে।

তাহলে দু'এ এক, এক-এ দুই হল কি না! অবতার সব সময়ে এক ঈশ্বরেরই অবতার। একই উৎস থেকে আসা। কথামৃতে আছে—মণি একদিন ঠাকুরকে বাইবেলের যীশুভক্ত ভগিনীদ্বয়ের গল্প বলছিলেন। শুনে ঠাকুর মণিকে বললেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা তোমার এসব দেখে কি বোধ হয়?

মণি—আমার বোধ হয়, তিন জনেই একবস্তু। —যীশুখৃষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি—এক ব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ: এক এক! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর) — দেখছো না—যেন এর উপর এমন করে রয়েছে!

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—যেন বলছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েই রয়েছেন।"[২]

যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণের পারস্পরিক আধ্যাত্মিক মগ্নতা বা মরমিয়া একীকরণের মধ্যে মানুষের ধর্মের ভবিষ্যতে যে এক মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ধর্মের ভবিষ্যতে যুগ যুগ ধরে এ সত্য অভিব্যক্ত হবে। যাত্রা সবে শুরু হয়েছে।

সে কথায় পরে আসছি।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আত্মিক বিবর্তনের ধারাটি ধরে চললে দেখা যাবে ঐ মহা একীকরণের পর থেকে রামকৃষ্ণ সংঘ ও অনুগামীদের যেন খৃষ্টদেব নিজপ্রেমে ধারণ করে রয়েছেন—এঁকে এখন যে নামেই অভিহিত করুন।

ঠাকুরের দেহান্তের পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর রাতে আঁটপুরে ত্যাগমূর্তি নরেন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ঠাকুরের নয়জন ত্যাগী সন্তান যখন ধুনী জেলে সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করেন, তার পূর্বে উদ্দীপ্ত নরেন্দ্রনাথ যীশুর মহাজীবনের জ্বলন্ত অনুপ্রেরণাকে সকলের সুমুখে আদর্শরূপে ধরে দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ঐ দিন যীশু-জন্মের প্রাক্-উৎসবের দিন। সে দিন তাঁদের সত্যি সত্যি মনে হয়েছিল যীশু যেন অদৃশ্য সাক্ষিরূপে তাঁদের মধ্যে বিরাজ করছেন—ঠাকুর তো রয়েইছিলেন সকলের অন্তর্যামিরূপে। শুনেছি পরিব্রাজক-জীবনে যখন তাঁর অন্য কোন সংগৃহীত বস্তুই সঙ্গে ছিল না, একখানি ভগবদ্-গীতা ও একখানি Imitation of Christ স্বামীজীর সঙ্গে থাকত।

---

২ কথামৃত ৩।১৯।৩

যীশুখৃষ্টে যে স্বামীজীর অগাধ ভক্তি ছিল তার উৎসও ঐ রামকৃষ্ণ-যীশু যীশু-রামকৃষ্ণ - মরমিয়া একীকরণেই রয়েছে তত্ত্বের দিক থেকে। অবশ্য তার অন্য কারণও ছিল, যেটা হয়ত বৌদ্ধিক বিচারের দিক থেকেও তিনি পেয়েছিলেন। স্বামীজীর যীশুভক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল যখন পাশ্চাত্যে তাঁর কোনও অনুগামী শিশু যীশুর একটি চিত্রকে আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। স্তম্ভিত বিবেকানন্দ সেদিন বলেছিলেন: 'বলেন কি! আমি করব এঁকে আশীর্বাদ! যীশু যখন সশরীরে ধরাধামে ছিলেন, আমি যদি প্যালেস্টাইনে থাকতুম আমি তাঁর পদযুগল যে আমার চোখের জলে ধুয়ে দিতুম তা নয়, আমার বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিতুম।'

শিকাগো ধর্মসভায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী প্রথম দিনে চারটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করায় যে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়েছিল, তার কারণ সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা হয়েছে। এমন কি হতে পারে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-যীশু-ভক্ত বিবেকানন্দের শব্দ-ঝংকারের অনুরণন যীশুর অনুগামীদের অন্তরের তন্ত্রীটি ঝংকৃত করেছিল তাঁদের অজ্ঞাতে? স্বামীজীর বেদান্ত-বাণী যে পাশ্চাত্য গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার কয়েকটি কারণও দর্শিত হয়েছে। আমাদের তো মনে হয়, তার একটি শ্রেষ্ঠ কারণ স্বামীজীর অগাধ খৃষ্টভক্তি, যার পশ্চাতে রয়েছে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের খৃষ্ট-দর্শন ও অনুভূতি।

স্বামীজীর অনুগামী পরবর্তী কালের বেদান্ত-প্রচারকগণ দেখেছেন যে, গির্জার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মশিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ গৃহছাড়া ধর্মান্বেষীরা যীশু-ভক্তি হারিয়ে শূন্যহৃদয়ে বেদান্তের উন্মুক্ত উদারতায় যখন উপস্থিত হন, তখন তাঁরা যেন নূতন জীবন পান। নৈর্ব্যক্তিকের বাধা-বন্ধনহীন তেপান্তরে কিছুদিন যদৃচ্ছা ভ্রমণ করতে করতে, সেখানেও অবসন্নপ্রায় হয়ে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করেন। তাঁর অহেতুক প্রেমে ও সরস আত্মীয়তায় কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা ঘরের ছেলেমেয়ের মত নূতন ঘরে আনাগোনা করতে থাকেন। তাঁদের একথা মনেই হয় না যে, তাঁরা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তির রেশটি ধরে হঠাৎ একদিন পুনরায় আবিষ্কার করেন যীশুখৃষ্টকে— কী সুন্দর, কী অভিনব, কী অতুলনীয়! এমনি করে শ্রীরামকৃষ্ণ পাশ্চাত্যে ধর্ম-ঘরছাড়াদের ঘরে ফিরিয়ে আনছেন— নিজের ঘরে বা যীশুর ঘরে। এ তো দুই ঘর নয়—একের একত্বের ঘর। এটি সম্ভব হচ্ছে দক্ষিণেশ্বরের ঐ মরমিয়া অঘটনটির সংঘটনে। ঐ ঘটনার তাৎপর্যের ঢেউ কোথায় যে পৌঁছচ্ছে তার হদিশ রাখে, সাধ্য কি মানুষের!

'Blessed are the pure in heart for they shall see God.'— বলেছিলেন যীশু।

"'যাঁদের হৃদয় পবিত্র, তাঁরা ধন্য, কারণ তাঁরাই ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন' এই একটি বাক্যে সকল ধর্মের সারবস্তু ব্যাখ্যাত হয়েছে। তুমি যদি এ সত্য শিখে থাক, ধর্ম সম্বন্ধে যা পূর্বে বলা হয়েছে, যা পরে বলা হতে পারে, তুমি তার সব কিছু সার জেনেছ। কারণ ঐ বাক্যে সব কিছুই বলা হয়েছে। পৃথিবীর সব শাস্ত্র যদি হারিয়ে যায়, তবু ঐ একটি শিক্ষা জগৎকে ত্রাণ করতে পারবে।" - এ বাণীটি কিন্তু খৃষ্টদেবের কোন গোঁড়া প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের নয়। এ বাণীটি স্বামীজীর। স্বামীজী কিছু ভাবালুতা প্রবণ দুর্বল-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ছিলেন না। তবু তিনি কেন খৃষ্টের একটি বাণীতে সর্বধর্মের সার নিহিত আছে, এটি বলে খৃষ্টদেবকে ধর্মাচার্যদের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন?

আধুনিক যুগে বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্য হচ্ছেন স্বামীজী। বেদান্তপ্রাণ স্বামীজী যে খৃষ্টদেবকে

তাঁর হৃদয়ের সম্যক্ ভক্তি দিয়ে পূজা করতেন, তার উল্লিখিত মরমিয়া কারণ ছাড়াও আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। সে কারণটি এই যে যীশু-জীবনীতে তিনি দেখেছিলেন কার্যে পরিণত বেদান্তের একটি অপূর্ব জীবিত-চরিত্র। একজন মহান ধর্মাচার্যের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ভাষ্য হচ্ছে তাঁর নিজের জীবন। এ কথাও বলা যেতে পারে খৃষ্টদেবের শিক্ষার যে মহত্ত্ব রয়েছে তাঁর নিজের জীবন তার চেয়েও মহত্তর।

স্বামীজীর শিক্ষায় আছে, এ বিশ্বে সবচেয়ে উন্নততম নীতি হচ্ছে সর্বকল্যাণে পূর্ণ আত্মাহুতি দেবার নীতি — এই অমোঘ নীতিটিই রূপকের মাধ্যমে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ঘোষিত হয়েছিল। সৃষ্টির মূলে রয়েছে পরমপুরুষের পূর্ণ আত্মাহুতি। যাঁর জীবনে এই নীতি যত গভীরভাবে প্রতি-ফলিত ও কার্যে পরিণত হয়, তিনি তত উন্নত আধ্যাত্মিকতার বিচারে। যীশুখৃষ্টের জীবনে আমরা দেখতে পাই এই নীতির অভাবনীয় অভিব্যক্তি, যার তুলনা এ জগতে আর নাই।

জীবনে ফলিত বেদান্তকে স্বামীজী দুটি ভাব-প্রাণ-প্রেম-ঘন শব্দে ব্যক্ত করেছেন: 'ত্যাগ ও সেবা'। ত্যাগের অর্থ আত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশের জন্য, ভগবদ্দর্শনের জন্য সকল বাধাবন্ধজয়ী সক্রিয়তা; আর সেবার অর্থ অন্যদের ঐ দিকে এগিয়ে যেতে সর্বতোভাবে নিঃস্বার্থ সশ্রদ্ধ সহযোগিতা দেওয়া। খৃষ্টদেবের জীবনে বেদান্তের আদর্শের এই ফলিত পরিপূর্ণতা যে স্বামীজীকে অভিভূত করেছিল, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর বাণী ও রচনায় রয়েছে। ত্যাগ ও সেবার চেয়েও বেদান্তের শেষ কথা: প্রেম। সকল ধর্মের শেষ কথাই হচ্ছে প্রেম। যীশুর প্রেমের ধর্ম কালজয়ী হয়ে মানুষের আশার বস্তু হয়ে রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামীদের হিন্দুত্ব এইখানে যে, তাঁরা সকল সত্য ঈশপ্রকাশকেই তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করেন। তা ছাড়া যীশু-জীবনীতে তো সনাতন ধর্মের মূল নীতিগুলিই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

(৩)

প্রত্যেক প্রাচীন ধর্মের মধ্যেই দুটি শক্তির বিকাশ দেখা যায়: একটি শক্তি হচ্ছে রক্ষণশীলতা, আর একটি প্রবহমাণতা। রক্ষণশীলতা ধর্মকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখে, প্রবহমাণতা ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে চলে নব নব বিকাশের পথে, নূতনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, নূতনকে আপন করে নিতে শেখায়। যে কোন ধর্মের সম্যক্ স্বাস্থ্য নির্ভর করে এ দুটি শক্তি-বিকাশের ভার-সাম্যের ওপর। কিন্তু একটি ধর্মে যখন রক্ষণ-শীলতারই শুধু দুর্দম ও নিষ্ঠুর ব্যাপৃতি দেখা যায়, তখন সে ধর্মের বড় দুর্দিন। কারণ বেঁচে থেকেও সে ধর্ম তখন হারিয়ে ফেলে নিজ অনুগামীদের জীবনে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ফুল ফোটানোর তৎপরতা। ইহুদী ধর্মের এমনি এক দুর্দিনে খৃষ্টদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। একদিকে চলছিল 'বাগ্-বৈখরী শব্দঝরী'-বিলাসীদের ধর্মের অন্তঃসারহীন কূটকুশল ব্যাখ্যা; অন্যদিকে ধর্মধ্বজী বাহ্যাচার-সর্বস্ব পরাক্রান্তদের উৎপীড়ন সমাজের উপর, তা ছাড়া ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শোষণ ত ছিলই।

এক কথায় তখন ইহুদী ধর্মে চলছে ঘোর গ্লানি। গীতায় ব্যাখ্যাত সনাতন ধর্ম-নিয়মে তখনই আবির্ভূত হন ধর্মসংস্থাপনকারী যুগপুরুষ যীশুখৃষ্টরূপে।

পূর্ব পূর্ব যুগে ছিল দুষ্কৃতদের মাথা কেটে ধর্ম-সংস্থাপন করার রক্তারক্তি একটি ব্যাপার। ধর্ম-সংস্থাপনের ব্যাপারে মনে হয় একটি বিবর্তনের ধারা চলে এসেছে বিশেষ করে বুদ্ধ-যুগ থেকে। বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসংস্থাপনে অন্যের মাথা কাটার ব্যবস্থা নেই—শুধু আছে মাথা দেওয়ার ব্যাপার। কারণ হয়ত এ-ও হতে

পারে যে, কটা মাথাই বা কাটা যায়, শাসনের চেয়ে প্রেমের সেবাই হয় বহুকালস্থায়ী—ধর্মের ব্যাপারে।

যীশুখৃষ্ট ধর্মসংস্থাপন করলেন অতি সরল ও ঋজু ভাবে। যে ধর্মরাজ্য ঘোষণা করলেন—তার অনুশীলনশৈলী দুটি—যোগ ও প্রেম। "ঈশ্বরাভিন্ন পরমযোগী ও প্রেমিক"— যীশুর এই পরিচয়ই ত ঠাকুরের পূতহৃদয়ের অন্তস্থলে প্রকাশ পেয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে !

যীশুর সাধক-জীবনের বিশেষ কোন বার্তাই আমাদের জানা নেই। জন ব্যাপ্টিস্টের কাছে প্রত্ন-প্রথানুযায়ী দীক্ষা নেবার কিছুকাল পরে ধর্মরাজ্য ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে জন ব্যাপ্টিস্টের শিরচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় ধর্মরাজ্যে একটি বিরাট শূন্যতাও এসে পড়েছিল।

বললেন সব কথা একেবারে ন্যাজামুড়ো বাদ দিয়ে—জানতেন সময় অতি অল্প—মাত্র তিন বছর—অনেক দিনের জন্য অনেক কাজ করে রেখে যেতে হবে। সত্যধর্মের পরিপূরক হিসেবেই এসেছিলেন, কাজেই জন্ম-বিদ্রোহী হয়েও ধর্মের প্রত্ন-প্রথায় যা কিছু সত্য ছিল তাতে আঘাত করলেন না—সেগুলিকে বরং উজ্জীবিত করলেন। তাই জন ব্যাপ্টিস্ট যখন বলেছিলেন, 'তোমার জুতো বইবার যোগ্য আমি নই, আর তুমি এসেছ আমার কাছে জলীয় দীক্ষা নিতে?' যীশু তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'প্রাচীনদের এই প্রথা মেনে নাও।' জর্ডানের জলে যখন তাঁর দীক্ষা হলো তাঁর মধ্যে ঐশী শক্তির পূর্ণপ্রকাশ তিনি তখন অনুভব করলেন। তারপর থেকে একটানা চলল তাঁর অগ্নিমন্ত্রে ধর্মান্বেষীদের দীক্ষা দান।

ঈশ্বর আছেন কিনা এই নিয়ে যীশু কারো সঙ্গে তর্ক বিচারে বসেননি। বলেছেন: "হও পবিত্র-হৃদয়, দেখতে পাবে ভগবানকে। জীবন হবে ধন্য।"

কেমন করে হব পবিত্র-হৃদয়? প্রাণের সকল শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসো। আর নিজেকে যেমন ভালবাসো তেমনি করে ভালবাসো প্রতিবেশীকে। কিন্তু আছেন জেনেও ভগবানকে ভালবাসি কি করে? অস্তি-মাত্র ভগবানের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকা চলে, কারণ কে জানে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ব্যাপারে তাঁর কিছু যায় আসে কিনা! কিন্তু যদি জানতে পারি জগদীশ্বরের প্রেমের সাগরের একটি ঢেউ পুরোপুরি আমার জন্যে তুলে রাখা আছে, তাঁর অনেক অতি আপন জনের মধ্যে আমিও অতি আপনার একজন—তখন কি করে আর উদাসীন থাকা যায়? যে জেনেছে সে ভগবানের ভালবাসা পেয়েছে, সে ভগবানকে না ভালবেসে কি পারে?

ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ কি? না দয়িতের জন্যে পরমপ্রিয় প্রাণটি পর্যন্ত দিতে পারা। জীবের জন্য জীবন দিয়ে যীশু ভালবাসার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর ভালবাসার টানে অগুণতি মানুষ ঈশ্বরকে অবলীলাক্রমে ভালবাসতে শিখেছে।

এই হল খৃষ্টের ধর্মের সারকথা—সকল ধর্মের সারকথা।

তিনি এই প্রেমকে কুতর্কের ও ধর্ম-ব্যবসায়ী-দের সকল ফন্দির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করলেন। ধর্মের এই কালজয়ী প্রাণদায়ী অমৃত উদ্ধার ক'রে নিজ হৃদয়ের প্রেমভাণ্ডে পূর্ণ ক'রে—দিয়ে গেলেন ইহুদী জাতিকে, সমগ্র মানব-সন্তানকে।

রাত্রি তিনি কাটাতেন ধ্যানে, প্রার্থনায়, যোগে। দিনে তাঁর একমাত্র কাজ ছিল 'দুঃখ-তপ্তানাং প্রাণিনাম্ আর্তিনাশনম্' আর ধর্মান্ধদের চোখ-উন্মীলন। সমুদ্রেরও তল আছে কিন্তু ঈশার প্রেম অতলস্ত। তাঁর মধ্যে যে আশ্চর্য যোগ-শক্তির বিকাশ হয়েছিল, তা দিয়ে তিনি মৃতকে দিয়েছেন জীবন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি, খঞ্জকে চলমানতা, মূককে বাক্‌শক্তি, কুষ্ঠরোগীকে

নিরাময়তা। এটা ইন্দ্রজাল দেখানোর জন্যে নয়— সব করেছেন প্রেমে।

ঘর ছিল না, দোর ছিল না, ছিল না মাথা রাখবার জায়গা। কোথা হতে আহার জুটবে ছিল না সে ভাবনা, তবু সব সময় ভিড় লেগেই ছিল। দেশশুদ্ধ লোক যীশুর অনুগামী।

ধর্মধ্বজীদের, পুরুতকুলের টনক নড়ল: আরে এতো দেখছি আমাদের ভাতে মারবে! ষড়যন্ত্র চলতে থাকলো।

আচার মানতেন না যীশু। অন্তর দেখতেন। অন্তর্যামী কিনা! যত রাজ্যের ভ্রষ্টাচার, ভ্রান্ত, পতিত, সকলের জন্যে তাঁর প্রেম উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। পাপীকে কোনদিন একটি ফুল দিয়েও আঘাত করেননি। বলতেন: যাদের স্বাস্থ্য ভাল তাদের আর বৈদ্যের প্রয়োজন কি? আমি রুগ্ন ও দুর্বলের ও পতিতের জন্যই এসেছি। তাদের কাছে তিনি ছিলেন 'কুসুমাদপি' মৃদু।

কিন্তু তাঁর বজ্রনির্ঘোষ অত্যন্ত ভীষণভাবে বর্ষিত হত ভণ্ড কপটাচারীদের শিরে।

তারা সকলে জটলা করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারলে। সে কি নির্মম প্রতিশোধ ভ্রান্ত মানুষের!

হাতে বিদ্ধ পেরেকের ক্ষত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে: একজন দুষ্কৃতী অন্যকে শ্লেষ বাক্য বলছে: তিনি অন্যকে তো পরিত্রাণ করেছেন, এখন নিজেকে করুন না দেখি পরিত্রাণ!

হায় তারা জানত না, যীশু নিজেকে বাঁচাতে আসেননি। তাদেরই পাপমোক্ষণের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দিতেই এসেছিলেন। এই ঈশ-প্রেম-অভিজ্ঞানটি মানুষের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

যিনি মৃতকে জীবন দিতে পারতেন, বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে তিরস্কারে শান্ত করতে পারতেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ক্রুশমৃত্যু এড়িয়ে যেতেও পারতেন। কিন্তু এড়ালে আসাটাই ব্যর্থ হয়ে যেত।

জীবনে তিনি দিলেন প্রেম। মরণে তিনি দিলেন সে প্রেমের অমেয়ত্ব।

তথাকথিত মৃত্যুর পরে উত্থিত হয়ে তিনি পরিচয় দিলেন তাঁর অত্যাশ্চর্য ঈশশক্তির। আর তিনি সঞ্চার করলেন বোধশক্তি নিজ শিষ্যগণের মধ্যে।

ইহুদী পুরুতেরা যদি জানত মৃত্যুর পর কি ভাবে হবে খৃষ্টদেবের জলন্ত প্রেমের অগ্নিবিন্যাস জগৎময়, তা হলে হয়ত তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধই করত না। আর সেটিই হয়ত হত নিদয়তার পরাকাষ্ঠা। কারণ তা হলে আমরা আমাদের এমন প্রেমময়কে এমন নিবিড়ভাবে পেতুম না। তাই আমাদের কারুর বিরুদ্ধেই নিষ্ঠুরতার নালিশ নেই।

শুধু চাই তাঁর অমোঘ আশিস্, যাতে শক্তিমান হয়ে তাঁর শিক্ষা জীবনে মরণে কর্মে ধর্মে মানুষের সভ্যতায় অনুশীলন করে আমরা ধন্য হতে পারি।

পান্থনিবাস মাঝে কে হাসে শিশু শশী।
গগন ছাড়িয়া চাঁদ ভূতলে উদয় আসি॥
চাঁদ ওতো নয় হায়, চাঁদ পড়ে তারই পায়,
ত্রিভুবন আলো করে শ্রীমুখেতে দেব-হাসি॥
সেই হাসি নিরখিয়া পুলকে পূরিল হিয়া,
গগনে উঠিল গান জয় জয় ঈশামসি॥

—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

তুলসী

কালিদাস রায়

সেবিয়াছ সযতনে সুমার্জিত গৃহাঙ্গনে বেদিকার পরে,
ধূপে দীপে সাঁজে ভোরে তুষিয়াছ গঙ্গানীরে বৈশাখ-বাসরে।
প্রতিদান লও তারি, আজিকে খেয়ার কড়ি পথের সম্বল,
স্নিগ্ধ মোর ছায়া-ক্রোড়ে মুদ ভবনদীতীরে নয়ন-যুগল।
আমি বৎস হরিপ্রিয়া মঞ্জরী অঞ্জলি দিয়া করি আশীর্বাদ
কাণ্ডারী ক্ষমুন ত্বরা তোমার জীবনভরা সব অপরাধ।
শুননাক উচ্ছ্বসিত মায়ার ছলনা যত হাহাকার-রোল,
ক্ষীণ কণ্ঠে মনে মনে বল বৎস মোর সনে হরি-হরি-বোল।

---

* কবিশেখরের অপ্রকাশিত কবিতা।— সঃ

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

অধ্যাপক রেজাউল করীম

আজ থেকে আশি বছর আগেকার কথা। ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন লণ্ডন শহরে ভারতের মর্মবাণী প্রচারের জন্য অবস্থান করছিলেন, সেই সময় একদিন একজন বিদেশিনী বিদুষী মহিলার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হল। এই মহিলার নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল। এই সাক্ষাৎকারটা যেন বিধাতৃ-নির্দিষ্ট। কোথায় সুদূর আয়ারল্যাণ্ডের একজন খ্রীষ্টান ধর্মযাজকের বিদুষী কন্যা মার্গারেট নোব্‌ল, আর কোথায় ভারতের এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী! তাঁদের উভয়ের চালচলন, আচারবিচার এমন কি গোটা জীবনদর্শনটা একেবারে স্বতন্ত্র। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে কতকগুলি অনন্যসাধারণ লক্ষণ দেখেই এই বিদেশিনী মহিলাটি তাঁর প্রতি অতি সহজেই আকৃষ্ট হলেন। যেন এক টুকরা শক্তিশালী চুম্বক একটি লৌহদণ্ডকে তীব্রভাবে নিজের দিকে সবেগে আকর্ষণ করে নিল। স্বামীজীর কথাবার্তা, তাঁর মুখে ধর্ম ও দর্শনের গভীর ব্যাখ্যা শুনে মার্গারেট নোব্‌ল একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সেই সাক্ষাৎকারের সময় মার্গারেটের মনে একথা এতটুকু জাগেনি যে তিনি অচিরেই স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন এবং ভারতের পথে পাড়ি দেবেন। যা কেউ কল্পনা করেনি অবশেষে তাই ঘটে গেল। জগতে অনেক বড় বড় ঘটনার সূত্রপাত এই রকম সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়েই হয়ে থাকে। অতঃপর মার্গারেট ক্রমে ক্রমে বিবেকানন্দকে আপন বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে লাগলেন। তিনি স্বামীজীর সেই প্রদীপ্ত প্রতিভা ও জ্বলন্ত ব্যক্তিত্বের নিকট মাথা নত করলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হলেন। পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষাদীক্ষা তিনি যথেষ্ট লাভ করেছিলেন

তাঁর জিজ্ঞাসু মন সব কিছুকেই সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে চাইল। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে তিনি তাঁর মৌলিক প্রশ্নের কোন সদুত্তর পেলেন না। জানবার জন্য তিনি পড়াশুনা করলেন প্রচুর। জানলেন অনেক কিছু। কিন্তু তিনি যা চাইছিলেন তা পেলেন না পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডারে। তিনি বুঝলেন যে, এতদিন ধরে তিনি যা অনুসন্ধান করছিলেন তা ভারতের এই বীর সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যাত বেদান্ত-দর্শনের মাধ্যমেই লাভ করতে পারবেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র ইউরোপ নয়— ভারতবর্ষ। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিনা দ্বিধায় ভারতবর্ষে চলে এলেন—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে। এখানে এসে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আরো শুনলেন এবং তাঁর আদর্শকেই সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেন। সেই আদর্শকে সামনে রেখে ভারতের সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। এই বিদেশিনী মহিলাকে ভারতবর্ষও সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করল। তাঁকে নিজের ভগিনী বলে সাদর অভিনন্দন জানাল। তিনি আজ ভারতের সর্বত্র 'ভগিনী নিবেদিতা' বলেই পরিচিতা।

ভগিনী নিবেদিতা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর তারিখে এক আইরিশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ও পিতা ছিলেন ধর্মযাজক এবং মাতা ধর্মপ্রাণা মহিলা। তাই শৈশবকাল থেকেই একটি গভীর ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে মার্গারেট লালিত পালিত হয়েছিলেন। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তিনি শৈশবকাল থেকেই অন্তরের মধ্যে ধর্মজীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। কে যেন তাঁকে একটা নির্দিষ্ট সৎকাজ করার জন্য আহ্বান করতো, কে যেন তাঁকে বলতো— আর কেন বদ্ধ ঘরের মধ্যে পড়ে আছ? বেরিয়ে পড়, মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ কর। এই আহ্বান তীব্রতর হয়ে তাঁর কানের কাছে অহরহ বাজতে লাগল স্বামীজীকে আচার্যপদে বরণ করার পর থেকে। ফলে তিনি তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষে চলে এলেন— এদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে।

তাঁর মনে ভক্তিবাদের অন্তরালে ছিল একটা বলিষ্ঠ যুক্তিবাদ। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের দ্বন্দ্বে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন না। কিন্তু নিবেদিতার মনের দ্বিধা সহজেই কেটে গেল, যখন তিনি রামকৃষ্ণদেবের সার্বজনীন শিক্ষার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হলেন। তিনি নিঃসন্দেহে বুঝলেন যে, এইখানে যুক্তি ও ভক্তির সমন্বয় হয়েছে— দুটি মতবাদই একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে। সে আদর্শ হচ্ছে, শিবজ্ঞানে জীবের পূজা। ব্যাপকতর অর্থে মানব-সেবা। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শ থেকেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন এবং সেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন।

নিবেদিতার পূর্বে বহু পণ্ডিত ও সুধী পর্যটক ভারতবর্ষকে জানতে চেয়েছিলেন এবং জেনেও-ছিলেন কিছুটা। তাঁরা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁদের গ্রন্থে ভারতবর্ষের আত্মার পরিচয় নেই। তাঁদের কোন কোন রচনার মধ্যে ভারত-প্রেমের অভাব দেখা যায়। তাঁরা কেবল ঐতিহাসিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে দেখেছেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় গ্রীক পণ্ডিত মেগাসথিনিস ভারতের বিবরণ লিখে গেছেন। ইতিহাসের দিক থেকে তাঁর গ্রন্থটি মূল্যবান। চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময় ভারত পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারত-বিবরণ রচনা করেছেন। পাঠান-যুগে ইবনে বতুতা ভারত-বিবরণ লিখে গেছেন।

মোগল-যুগে ভারতের কথা লিখেছেন সার টমাস রো, মানুচী, বার্নিয়ার প্রমুখ পাশ্চাত্য পর্যটকগণ। তাঁরা কেউ ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে ভালবাসেন নি। কিন্তু নিবেদিতা ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে ভালবেসেছিলেন এবং সর্বতোভাবে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর নিকট ভারতবর্ষ শুধু একটি ঐতিহাসিক বিষয় নয়। ভারতবর্ষ তাঁর নিকট একটা আদর্শ, একটা জীবনদর্শন ও শিক্ষালাভের বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। সত্যই নিবেদিতা ভারতবর্ষকে একেবারে আপনার করে নিয়েছিলেন।

ভারতের বহুবিধ জনহিতকর কাজে নিবেদিতা নিজেকে আন্তরিকভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। বিদ্যালয় স্থাপন, বিবিধ প্রকার ত্রাণকার্য, গঠনমূলক কাজ— এসবের মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীর অন্তরের ভিতর প্রবেশ করেন। সে যুগে দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে-সব আন্দোলন হয়েছিল, তিনি সে-সব আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। আয়ারল্যাণ্ড যাঁর জন্মভূমি তিনি অন্যদেশের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না। এইসব জনসেবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ভারতের ইতিহাস ধর্ম সংস্কৃতি দর্শন ইত্যাদির সহিতও গভীরভাবে পরিচিত হলেন। প্রাচীন ভারতের বিবিধ প্রকার গ্রন্থাদি পাঠ করলেন। এই সব গ্রন্থ পাঠ করে তিনি এদেশের প্রাচীন ও শাশ্বত আদর্শের সন্ধান লাভ করলেন।

বেদ উপনিষদ গীতা রামায়ণ মহাভারত—এসব গ্রন্থও গভীরভাবে পাঠ করলেন। শুধু তাতেই সন্তুষ্ট হলেন না। এ দেশের সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের উপর কতকগুলি তথ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধও রচনা করলেন। স্থানে স্থানে সে সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিলেন। তাঁর এই সব প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি প্রাচ্যদেশের চিন্তাকে পাশ্চাত্যদেশের সুধীসমাজের নিকট উপস্থিত করলেন। ভারতের সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ধর্ম এমনকি লোকগাথা শিল্পকলা—এসবই ছিল তাঁর আলোচনার বিষয়। নিবেদিতার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ দেশে বিদেশে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। তাঁর নানা রচনার মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - The Web of Indian Life, Cradle Tales of Hinduism, The Master as I saw him, Religion and Dharma. নিবেদিতার ছিল সীমাহীন ভারত-প্রেম। যাকে ভালবাসব তার সমস্ত দিকটাই জানতে হবে ও বুঝতে হবে। তার গুণ যেমন জানতে হবে তেমনি দেখতে হবে তার ত্রুটি। নিবেদিতা ঠিক সেইরূপই করেছিলেন। তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভারতপ্রেম। ভারতের জীবন-দর্শন নিয়ে যেসব আলোচনা তিনি করেছেন তাতে আছে তাঁর অন্তর-ভরা সহানুভূতি ও উদার হৃদয়ের অকপট ছাপ। তিনি ভারতের সব কিছুকেই হৃদয় মন দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। কেবলমাত্র দর্শকের কৌতূহল নিয়ে এদেশের কোন কিছুকে দেখেন নি। তিনি এদেশের লোকের সহিত একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন বসবাস করেছেন, তাদের দৈনন্দিন জীবনপদ্ধতির সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছেন। নিজে এদেশের লোকের মত জীবন যাপন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত এদেশেরই একজন হয়ে পড়েছেন। আমাদের দেশের ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি দেখেছেন সত্য, কিন্তু অপরাপর বিদেশীর মত এই সব ত্রুটি বিচ্যুতিকেই ভারতের আসল রূপ বলে সিদ্ধান্ত করে বসেন নি। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও ভারতের গভীর মর্মমূলে যে সত্য আছে তার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর ছিল একটা পরিপূর্ণ মন, অপরকে ভালবাসবার একটা অসাধারণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি। সেইজন্য এদেশের বাহ্যিক বস্তুর অন্তরালে যে একটা ভাবগম্ভীর সৃষ্টিশীল শক্তি অহরহ ক্রিয়া করে যাচ্ছে, তার পরিচয়

তিনি লাভ করতে পেরেছিলেন। এ দেশের বর্তমান জীবনের সঙ্গে অতীত জীবনের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে তা তিনি সহজেই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাঁর রচিত "The Web of Indian Life" একটি অপূর্ব গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি যিনি পাঠ করবেন, তিনিই বুঝবেন, নিবেদিতা কি অন্তর দিয়েই না ভারতবর্ষকে ভালবেসেছেন। পাঠক এই গ্রন্থে এমন একটি বস্তু দেখতে পাবেন, যা তিনি পূর্বে দেখেন নি। নিবেদিতা স্বপ্নদর্শিনী লেখিকা নন। প্রত্যক্ষ-ভাবে ভারতের বিভিন্ন ধরনের জীবনধারার সহিত তাঁর একটা নিবিড় পরিচয় ছিল। তিনি যেভাবে চিন্তা করেছেন, যেভাবে ভারতের ঐতিহ্যকে পাঠ করেছেন, তা খুব কম লেখকই করতে পেরেছেন। বস্তুতঃ তিনি নিজের জীবনকে ভারতের আদর্শ দ্বারা গঠিত করবার জন্য আপ্রাণ সাধনা করেছেন। অতীতের ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমাদের দেশের বহুলোকের ধারণা অস্পষ্ট। সেই অতীত ভারতবর্ষের একটা চিত্র ও তার মূলগত আদর্শ-টিই নিবেদিতার এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। যে বাস্তব ভারতে আমরা বাস করি, সেই ভারতকেও এই গ্রন্থে তিনি অঙ্কিত করেছেন। ভারতের আছে একটা প্রাণপূর্ণ জীবন। যে ভারত সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য শিল্প দর্শন ধর্ম—সেই ভারতের একটা সামগ্রিক সুস্পষ্ট চিত্র পাই তাঁর গ্রন্থে।

ভারতের জন্য উৎসর্গিত এই মহাপ্রাণ বিদুষী মহিলা আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর একান্ত আপন জন। শ্রীরামকৃষ্ণ, জননী সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁদেরই চরণাশ্রিতা ভগিনী নিবেদিতা আজ ভারতের ঘরে ঘরে সমাদৃত। পরমহংসদেব সেবাধর্মের যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন, সেই আদর্শকেই স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা বাস্তবে রূপায়িত করে গেছেন। ভারতের ধর্মনৈতিক আদর্শের ক্রম-বিকাশের ইতিহাসে ভগিনী নিবেদিতার নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকবে। তিনি কোন-দিনই বিস্মৃত হবেন না।

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন

ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্ব ঃ নারী-উন্নয়নে রামমোহনের ভূমিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

(১)

রামমোহন একটি বহু-বিতর্কিত নাম। তাঁর জীবনকালে তিনি নিজে অনেক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মৃত্যুর পরে বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দারুণ বিতর্ক এখনও চলছে। এমন কি তাঁর জন্মতারিখ নিয়েও বিতর্ক। কেউ বলেন তিনি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কেউ বলেন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় তারিখটি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মেনে নিয়েছিলেন এবং ব্রিস্টলে তিনি যে সমাধি-মন্দির নির্মাণ করেন তাতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরিবার হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর জন্মতারিখ নির্দিষ্ট করেছেন। সম্প্রতি দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসবের তারিখ নির্ধারিত করবার জন্য সরকার যে বিশেষজ্ঞের সমিতি নিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। এই সব কারণে সাধারণ ব্রাহ্ম-

সমাজ তাঁর জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থায় ১৯৭২-৭৪ পর্যন্ত দুই বৎসর ধরে উৎসবের আয়োজন করেন।

তাঁকে নিয়ে এমন বিতর্ক গড়ে ওঠবার সম্ভবত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর স্বাধীন যুক্তিভিত্তিক মত প্রচারের দুঃসাহসের জন্য তিনি একদিকে যেমন ইংরেজ মিশনারীদের সহিত বিতর্কে যুক্ত হয়ে পড়েন, তেমন অপরদিকে রক্ষণপন্থী হিন্দুসমাজের সহিতও বিতর্ক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। ফলে মৃত্যুর পরও তাঁর সম্পর্কে হিন্দুসমাজের মানুষের মধ্যে একটি প্রতিকূল মনোভাব রয়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে এক নূতন সংস্কারপন্থী সমাজের প্রবর্তক হিসাবে তিনি এই সমাজের মানুষের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁদের প্রভাব প্রচুর এবং শিক্ষার গুণে তাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

ফলে এমন একটি পরিবেশ গড়ে উঠল যা বিতর্ক উৎসাহিত করে। তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মানুষ নূতন আন্দোলনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁকে পথিকৃতের ভূমিকা দিতে দ্বিধা করলেন না। অপরপক্ষে হিন্দুসমাজের চিন্তানায়করা তার প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। এমন কি তিনি এক অবৈধ সন্তানের পিতা বলে প্রমাণ করবারও চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক দ্বিশতবার্ষিক উৎসবে এই বিতর্ক কতখানি তিক্ততা ধারণ করেছে তা আমরা অনেকেই অবগত। বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় বিস্তারিতভাবে এর মধ্যে প্রবেশ করবার প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে আমার ধারণায় একজন নিরপেক্ষ গবেষক দিয়ে এ বিষয় একটি আলোচনা হওয়া উচিত। তা না হলে রামমোহনের প্রতি আমাদের কর্তব্য যথোচিতভাবে সম্পাদন করা হবে না।

এত বিতর্ক সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহন একজন শক্তিধর অনন্যসাধারণ মানুষ ছিলেন। মেধা সাহিত্য-কীর্তি সহৃদয়তা অন্যায়ের বিরোধিতা শিক্ষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল চিন্তা এবং উপাসনা-রীতির সংস্কারে আগ্রহ তাঁর জীবনের নানা কীর্তিতে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া অসঙ্গত হবে না।

রামমোহনের জ্ঞানপিপাসার সীমা ছিল না। অতি অল্পবয়সে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অধিকার স্থাপন করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'তুহ্ ফাৎ উল্ মুবাহ্‌হিদ্দীন' নামে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত এবং মূল অংশ ফারসী ভাষায় লিখিত। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মিরাত উল্ আখ্‌বার' নামে একটি ফারসী পত্রিকা স্থাপন করেন। বাল্যে রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পান নি। তিনি ইংরাজীতে অধিকার স্থাপন করেন তাঁর বন্ধু ও মনিব ডিগবি নামে এক পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর সহযোগিতায়। ফলে তিনি এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তাঁর ইংরাজী রচনার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি যখন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের দুই পাদ্রীর সহযোগিতায় বাইবেলের অংশ অনুবাদের ভার নেন তখন সেই প্রসঙ্গে হিব্রু ভাষাও আয়ত্ত করেন। তাঁর ধর্মপিপাসা তাঁকে সংস্কৃতে অধিকারলাভে উৎসাহিত করে। তিনি সংস্কৃতে কতখানি ব্যুৎপত্তিলাভ করেছিলেন তার প্রমাণ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বেদান্তগ্রন্থ'। ব্রহ্ম-সূত্রের অনুবাদ ব্যতীত তাতে একটি মূল্যবান ব্যাখ্যা সংযুক্ত ছিল। তাঁর চেষ্টায় একই সময় বাংলায় পাঁচখানি প্রাচীন উপনিষদের অনুবাদ হয়। পরিণত বয়সেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা শিথিল হয় নি। দেখা যায় বিলাতে প্রবাসকালে তিনি যখন একবার প্যারিসে যান তখন ফরাসী ভাষা

চর্চা আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উডফোর্ডকে লিখিত তাঁর পত্রে তিনি এ বিষয় উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আরও কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সংবাদ কৌমুদী' নামে একটি বাংলা সংবাদপত্রও প্রবর্তন করেন। তা তাঁর মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিল। এইটুকু বিবরণই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেবে।

এমন মানুষের মধ্যে যেমন আশা করা যায়, ঔদার্য ও সৌজন্যবোধ পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট ছিল। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার জন্য তিনি নানাভাবে নিপীড়িত ও নিন্দিত হয়েছিলেন। রক্ষণপন্থী হিন্দুসমাজের মানুষ যে তাঁর প্রতি নানা অপ্রিয় উক্তি ও কুৎসা প্রচার করতেন তার প্রমাণ আছে। তিনি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী বিগ্রহপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবু প্রাচীনপন্থী হিন্দুর ধর্মবোধের উপর আঘাত হানতে চান নি। এ বিষয় তাঁর মনোভাব ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রাস্ট ডীড রচিত হয় তাতে প্রতিফলিত আছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশটির এখানে অনুবাদ স্থাপন করা যেতে পারে :

"উপাসনা বা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে, যে প্রাণী বা জড়পদার্থকে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী কর্তৃক পূজার পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তার নিন্দা বা অবহেলা করা হবে না, বা ঘৃণার ভঙ্গীতে উল্লেখ করা হবে না।"

তাঁর অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম-প্রবণতার দৃষ্টান্ত মিলবে তাঁর নারীজাতির দুর্দশা মোচনের চেষ্টা হতে। তা-ই বর্তমান ভাষণের আলোচনার বিষয়। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে পরিপূর্ণ আলোচনা হবে।

দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের যে অংশে প্রচণ্ডতম আঘাত এসেছিল, তা হল ধর্মের ক্ষেত্রে এবং সে সংঘাত দানা বেঁধে উঠে রামমোহনের নেতৃত্বে। হিন্দুরা ঈশ্বরকে বিগ্রহ-আকারে পূজা করতে অভ্যস্ত। নূতন সংস্কৃতির বাহক হয়ে যারা এল, তারা তাকে পৌত্তলিকতা বলে নিন্দা করল। এই নিয়ে যে সংঘাত সৃষ্টি হল, তা উনবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি দশক জুড়ে বিস্তৃত। বিচিত্র তার ইতিহাস। তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংঘাতের ইতিহাসের সঙ্গে। এখানে প্রশ্ন হল বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্র গৃহীত হবে, না গণতন্ত্র গৃহীত হবে। সে সংঘাত এখনও চলেছে। অনুরূপভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বিতর্কমূলক বিষয় ছিল বিগ্রহহীন উপাসনা ভাল, না প্রতীকভিত্তিক উপাসনা ভাল। তার মীমাংসা হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনে। বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

রামমোহনের শক্তি ও সামর্থ্যের অধিক অংশই নিযুক্ত হয়েছিল এই ধর্ম-আন্দোলনে। তিনি বিগ্রহপূজার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি হল ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন। এ বিষয়টিও অপ্রাসঙ্গিক হলেও তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, তা দেখায় তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। রামমোহনের নিজস্ব মতে চলবার ইচ্ছা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর ধর্মচিন্তায়। দেখা যায়, প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব তথা চিত্তাকর্ষক প্রলোভন তাঁর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

এই প্রবন্ধে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিগ্রহপূজার রীতি তাঁর ভাল লাগে নি।

যিনি অনন্ত জগতের আধার তাঁকে বিগ্রহের মধ্যে স্থাপন করবার পেছনে তিনি কোনও যুক্তি খুঁজে পান নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা রীতি' দেশের অকল্যাণ সাধন করেছে এবং সেই কারণে 'এই ভ্রান্তির দুঃস্বপ্ন হতে তাদের জাগ্রত করবার' ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। (Abridgement of Vedanta)। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন এবং পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তার জন্য সমাজের রক্ষণশীল অংশের তিনি একান্ত বিরাগভাজন হন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে নিরস্ত করতে পারেন নি। এমন কি তাঁর মাতাও তাঁর প্রতি বিরূপ হন।

দ্বিতীয়ত তিনি খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক আদর্শের উন্নত মানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এই সময় তিনি ব্যাপ্টিস্ট মিশনের দুই পাদ্রীর সহায়তায় চারটি গসপেল-এর বাংলা অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন উইলিয়ম আডাম। স্বাধীন চিন্তার ফলে রাম-মোহনের ধারণা হয় খ্রীষ্টধর্মের ত্রিতত্ত্ব যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না। ঈশ্বরের অতিরিক্তভাবে তাঁর পবিত্র আত্মার (Holy Ghost) এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে কল্পনা তাঁর মতে অযৌক্তিক। ফলে খ্রীষ্টধর্মের আর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদরূপ থাকে না। তাঁর যুক্তিকে স্বীকার করে নেওয়ায় আডাম তাঁর নিজ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন।

এর আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে তিনি মিশনারীদের সঙ্গে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেব ত তাঁকে **'intelligent heathen'** বলে উপহাস করেন। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি দেখে কলিকাতার বিশপ তাঁকে খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে বলে এই প্রলোভন দেখান যে, তা হলে 'তিনি জীবনে এবং মরণান্তে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশেই সম্মানিত হবেন এবং বর্তমান কালের ভারতীয় "এপসল" (apostle) হিসাবে উত্তর-পুরুষের নিকট খ্যাত হবেন।' তিনি সে প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের পথিকৃৎ হিসাবে ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক এখনও চলেছে তা বাদ রেখেও একথা নিশ্চিত বলা চলে যে তিনি ভারতের নবজাগরণের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ভারতের ঘুমভাঙা-নিয়া। প্রাচীন জরাজর্জরিত সমাজকে যুক্তি-হীন সংস্কার এবং আচার এমন নির্জীব করে তুলেছিল যে, তাকে ঘিরে সত্যই এক অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছিল। রামমোহনই প্রথম তার প্রাচীর ভেঙে বাহিরের আলোবাতাস প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

প্রাচীনকে ভেঙে নূতনকে গডবার পথ প্রস্তুত করতে দুটি গুণের প্রয়োজন। প্রথম হল স্বাধীন চিন্তা করে যা পাব তা প্রচার করবার দুঃসাহস। রামমোহনের যে সে গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল, সে বিষয় এখনি যে তথ্যগুলি স্থাপন করা হল তার দ্বারাই প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয় কথা হল, নূতন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত প্রাচীন সংস্কৃতির সংঘাত ঘটাবার জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রচার। নূতন সংস্কৃতি বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তা বিশ্বাসবাদকে ত্যাগ করে যুক্তিবাদকে গ্রহণ করেছে। ভারতের জরাগ্রস্ত সংস্কৃতির ঘুম ভাঙাতে এই নূতন সংস্কৃতির সহিত সংঘাতের প্রয়োজন। তার জন্য দরকার ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকে দেশের মানুষের কাছে সহজলভ্য করা। এ বিষয় যাঁরা প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন রামমোহন তাঁদের অন্যতম।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব এসে পড়ে। এ কথা ঠিক যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজে উদ্যোগী

হয়ে ইংরাজী শিক্ষার এদেশে প্রবর্তনে বিরোধী ছিল। এ প্রসঙ্গে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ ডিরেকটারদের একজন মন্তব্য করেন যে, 'যুক্তি-সম্মত বুদ্ধি উপদেশ দেয় যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে, যে শিলাখণ্ডের আঘাতে আমেরিকার ক্ষেত্রে আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে, তাকে দূরে রেখে পরিহার করে চলা।' (ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, পৃঃ ৯৫)। তাই দেখি, দেশী প্রথায় শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বারাণসী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এমন কি হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরবর্তী কালেও কলিকাতায় আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করতে উদ্যোগী হন।

সুতরাং হিন্দু কলেজ বেসরকারী প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। তাই হয়েছিল প্রথম পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের মিলন সোপান। তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল : "তাকে সেই মূল স্রোতে পরিণত করা যার সাহায্যে প্রকৃতজ্ঞান (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান) ইয়োরোপীয় উৎস হতে ভারতীয় মনে সংক্রামিত হবে।" এই প্রসঙ্গে রামমোহনের হিন্দু কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। মোটামুটি যাঁরা প্রমাণ করতে চান তাঁর কোনও যোগ ছিল না, তাঁদের মূল অস্ত্র এই তথ্য যে, রামমোহন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সময় কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যিনি প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী তিনি যে তাতে বিশেষ বাধা না থাকলে প্রকাশ্য ভূমিকা নেবেন না, তা হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয় হিন্দু কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যর হাইড ইস্ট-এর মন্তব্যই সব থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। তিনি ১৬।৫।১৮১৬ তারিখে জে. হ্যারিং-টনকে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে উক্তি করেছেন যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা সভায় একজন রাম-মোহনের চাঁদা দানের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি করেন এই যুক্তিতে যে, তিনি হিন্দুধর্মবিদ্বেষী। পিয়ারীচরণ মিত্র বলেন, তার ফলে রামমোহন প্রকাশ্যভাবে হিন্দু কলেজ স্থাপনে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। এই কাহিনী তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি তথ্য পাই যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবসারভার (Calcutta Christian Observer)-এর জুলাই ১৮৩২ সংখ্যায় বলা হয়েছে ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রসঙ্গ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের 'আত্মীয় সভায়' প্রথম উত্থাপন করেন। রামমোহনের মতিগতি বিচার করলে তিনি যে তার সমর্থন করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই সকল তথ্য হতে মনে হয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহানুভূতি ও আগ্রহ ছিল। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি হেদুয়ার নিকট এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ তাঁর প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাদ্রী আলেক-জাণ্ডার ডাফকে কাছেই অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভূমি সংগ্রহ করে দেন। তা-ই বর্তমানে স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষানীতি সম্বন্ধে রামমোহনের প্রগতিশীল মত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে কলিকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভূমিকা হতে। তখন লর্ড আমহার্স্ট ভারতের গভর্নর জেনারল। সরকারের একটি নূতন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন রামমোহন ১১।১২।১৮২৩ তারিখ চিহ্নিত একটি দীর্ঘ পত্র লর্ড আমহার্স্টকে লেখেন। তাতে

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলি বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তাদের মর্ম এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

তিনি লেখেন, তাঁর আশা ছিল সরকার এখানে 'তৎকালীন ইয়োরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষণের' ব্যবস্থা করবেন। পরিবর্তে হিন্দু পণ্ডিত পরিচালিত একটি সংস্কৃত শিক্ষালয় স্থাপনের সিদ্ধান্তের কথা শুনে তিনি হতাশ হয়েছেন। তাতে এ দেশের তরুণরা দুহাজার বছর পূর্বে যা শিখত তাই শিখবে।

তারপর তিনি সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সংস্কৃত একটি কঠিন ও দুরূহ ভাষা। প্রথমত সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর অধিকার স্থাপন করতেই বারো বছর কেটে যাবে। বেদান্তের সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক চিন্তা শিক্ষার্থীদের সমাজে ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য ঠিক ভাবে গড়ে তুলতে পারবে কিনা সন্দেহ। কারণ তা শিক্ষা দেয় বিশ্ব স্বপ্নবৎ মায়া, এ শিক্ষা ইহজগতের প্রতি মানুষকে উদাসীন করে দেয়। মীমাংসা পড়েই বা কি হবে? কারণ তা বেদের মহিমা কীর্তনে মুখ্যত নিযুক্ত। ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই বা ব্যবহারিক জীবনে কি কাজে লাগবে? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে লর্ড বেকন-এর পূর্বে যে নূতন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সংস্পর্শ-বর্জিত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গেই তুলনীয়।

সুতরাং তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ভারত সরকারের যদি ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি সাধনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে 'আরও উদার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থায়' উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং তাতে 'গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা এবং অন্য উপযোগী বিজ্ঞান' শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় রামমোহন এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলেন, যা ভারতকে মধ্য-যুগের অন্ধকার হতে বর্তমান যুগে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। প্রাচীন অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে পশ্চিমের হাওয়া আমাদের মধ্যে প্রবাহিত করবার প্রয়োজনীয়তা তিনি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে ঘিরে যতই বিতর্ক থাকুক, তাঁর সপক্ষে যে সব দাবী করা হয়েছে তাদের যতই ভূমিসাৎ করবার চেষ্টা হক, এ কথা অনস্বীকার্য রয়ে যায় যে, রামমোহন ভারতে নবযুগের প্রবর্তক, তিনি ভারতের ঘুম-ভাঙানিয়া, তিনি নবভারতের পথিকৃৎ।

(২)

রামমোহনের প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল নিশ্চিত ধর্ম-সম্পর্কিত সংস্কার। কিন্তু তাঁর সহানুভূতি-পরায়ণ মন নারীজাতির প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিল। সমাজে নারীজাতির উপর নানাভাবে অত্যাচার তাঁকে এ বিষয় প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য চূড়ান্ত অবিচারের পরিচয় পাওয়া যায় সতীদাহ-প্রথার প্রচলনে এবং সেই প্রসঙ্গেই সমাজে নারীজাতির অধঃপতনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

একটি কাহিনী আছে যে, তাঁর পরিবারে একবার সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই কারণেই তিনি সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করবার সিদ্ধান্ত করেন। কাহিনীটি হল এই: ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী সতী হয়ে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প করেন। রামমোহন তাঁকে সেই সংকল্প পরিত্যাগ করাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হন না। চিতায় আগুন

জলে উঠলে তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বাহিরে আসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর আত্মীয় ও পুরোহিতের দল বাধা দেন। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য চোখে দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি এই বর্বর প্রথা রহিত করবেন। কাহিনীটি কোন লিখিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। রাজনারায়ণ বসু নাকি তাঁর পিতার নিকট এই কাহিনী শুনেছেন।

রামমোহনের অন্যতম জীবনীকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁর মূল যুক্তি হল, এই সময় তিনি দেশে উপস্থিত ছিলেন না। তার সপক্ষে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রামমোহন ১৮০৪ হতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডিগবির অধীনে দূরবর্তী অঞ্চলে নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে রামগড়ে (হাজারিবাগ জেলা), তারপর যশোহরে এবং ভাগলপুরে এবং পরে রংপুরে তিনি ডিগবির সঙ্গে থাকতেন। ডিগবি ১৮০৯ হতে ১৮১৪ পর্যন্ত রংপুরের কালেকটার ছিলেন। রামমোহন তাঁর অধীনে সেখানেই কাজ করতেন। সুতরাং ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যুর সময় যদি সতীদাহ হয়ে থাকে, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

সে যাই হক, এই সতীদাহ-প্রথা নিবারণ আন্দোলন প্রসঙ্গেই রামমোহনের নারীজাতির প্রতি সহানুভূতির পরিচায়ক লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। সহমরণ সম্বন্ধে তিনি প্রথম পুস্তিকা রচনা করেন ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। পুস্তিকাটির নাম 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ'। এটি সহমরণের সপক্ষে ও বিপক্ষে সহানুভূতিশীল দুই ব্যক্তির আলোচনারূপে প্রকাশিত হয়। এর বিপক্ষে কাশীনাথ তর্কবাগীশ একটি প্রতিবাদমূলক পুস্তিকা প্রচার করেন। সুতরাং ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রত্যুত্তরে রামমোহন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' লিখতে বাধ্য হন। তাতেই নারীজাতির প্রতি পুরুষ-পরিচালিত সমাজের নিগ্রহের কাহিনী করুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন : বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু বিবাহিত জীবনে তাকে পশুরও অধম বলে গণ্য করা হয়। বাড়ীতে তাকে দাসীর মত খাটানো হয়। তার কাজ হল বাসন মাজা, ঘর মোছা, দুবেলা রান্না করা। রান্নায় কোনও ত্রুটী হলে স্বামী ও শাশুড়ী তাকে গালিগালাজ করে। খাওয়া হয়ে গেলে যা উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে তাকে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। স্বামীর অর্থবল থাকলে স্ত্রীর চোখের সামনে সে রক্ষিতা পোষণ করে···। যেখানে স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে, সেখানে তার সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয়। এই ধরনের ঘটনা ত নিত্য ঘটে। কিন্তু রামমোহনের পক্ষে চোখের জল রোধ করা অসম্ভব হয় যখন তিনি দেখেন যে, নারীর উপর এত অত্যাচারের পরেও, কারও তার প্রতি এমন অনুকম্পা ফুটে ওঠে না যে, হাত-পা বেঁধে যখন তাকে পতির চিতায় ফেলে পুড়িয়ে মারা হয়, তখন বাধা দেবার প্রয়োজন বোধ করে।

উপরের উক্তিগুলি দুই দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নারী-জাতির অবস্থা পুরুষের স্বার্থে কতখানি শোচনীয় হয়েছিল, তার একটি উজ্জ্বল চিত্র আমাদের চোখের সামনে স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত তা দেখায় তাঁর হৃদয় কতখানি সংবেদনশীল ছিল এবং সেই কারণে নারীজাতির সামাজিক উন্নয়নের কতখানি প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন।

একই কারণে নারীজাতির অর্থনৈতিক

উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছিলেন। এ বিষয় জনমত গঠন করবার জন্য তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুস্তিকা ইংরাজীতে রচনা করে প্রকাশ করেন। তার বিষয় হল হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে অধিকার প্রাচীন কালে স্বীকৃত হয়েছিল তার ওপর অনধিকার প্রবেশ। সেখানে তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে বিধবা পত্নী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুত্রের সমান অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার অধিকারী ছিলেন; কিন্তু পরবর্তী কালে সে অধিকার হতে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে।*

(৩)

সুতরাং তাঁর বৌদিদির সতী হওয়ার দুর্ভাগ্য তাঁর ভাগ্যে ঘটে থাকুক বা নাই থাকুক তিনি যে সতীদাহের মত বীভৎস রীতি তুলে দিতে উদ্যোগী হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই দেখি ধর্মই তাঁর জীবনের মূল আকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য তুমুল আন্দোলন করেন। উপরে উল্লিখিত 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' নামে যে দুটি পুস্তিকা তিনি রচনা করেন, সে দুটি সেই আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব।

হিন্দুসমাজের মানুষের মনে সতীদাহ-প্রথা ভাগ্যহীনা সতীর প্রতি কোনও সহানুভূতিশীলতা ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শাসনভার প্রাপ্ত হবার পর, ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের কাছে তা অত্যন্ত বর্বর ও বীভৎস মনে হয়েছিল। তার কারণ সুস্পষ্ট। হিন্দুর বিবেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ইংরেজের মন এ বিষয় সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ছিল। তাই দেখি ইংরেজ শাসন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শাসক ঐ প্রথার বিরোধিতা করেছে।

দক্ষিণ ভারতের ত্রিপেটিতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপটেন টমিন নামে এক রাজপুরুষ এক সতীকে উদ্ধার করে আনেন বলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহাবাদে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সতীদাহের অনুমতি দেন এবং সপরিষদ গভর্নর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর কাছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন: 'হিন্দুদের সংস্কার এবং প্রচলিত রীতি যথাসম্ভব সহ্য করতে হবে স্বীকার করি; কিন্তু যে প্রথা মানুষের স্বভাবের বিরোধী আমি তার অনুমতি আমার শাসনাধীন স্থানে দিতে পারি না। উত্তরে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাধা না দিতে পরামর্শ দেন।

তারপর দেখি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জে. আর. এলফিনস্টোন নামে বিহার জেলার ম্যাজিস্ট্রেট একটি বারো বৎসরের বালিকার সহমরণ নিষেধ করেন। এ বিষয় কোনও সরকারী নির্দেশ না থাকায়, তিনি সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ চেয়ে পাঠান। তখন তদানীন্তন গভর্নর জেনারল লর্ড ওয়েলেসলি নিজামত আদালতের নিকট এ বিষয় উপদেশ চেয়ে পাঠান। তাঁরা এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করে কতকগুলি নির্দেশের খসড়া পাঠান। কিন্তু এ বিষয় কিছুই করা হয় নি।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেট সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ না থাকায় নিজামত আদালতের নিকট নির্দেশ চেয়ে পাঠান। তখন লর্ড হেস্টিংস গভর্নর জেনারল। তিনি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয়ে একটি নির্দেশ প্রচার

* পুস্তিকাটির নাম হল Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindu Law of Inheritance.

করেন। তার মর্ম হল, হিন্দুরীতি অনুসারে যেখানে তার অনুমোদন নেই সেখানে তা রহিত করা; যেমন যে ক্ষেত্রে বিধবা সতী হতে অনিচ্ছুক, বয়সে ষোল বছরের নীচে বা অন্তঃসত্ত্বা বা তাকে মাদকদ্রব্য সেবন করান হয়েছে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নিষিদ্ধ তালিকায় আর একটি বিষয় যোগ করা হয়, যে বিধবার শিশুসন্তান আছে তার প্রসঙ্গেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায়, সতীদাহের সংখ্যা বেশ বেশী হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় কলিকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা সব থেকে বেশী। ১৮১৫ হতে ১৮১৮ অবধি তালিকা এই রকম ছিল :

খ্রীষ্টাব্দ	সতীদাহের সংখ্যা
১৮১৫	৩৭৮
১৮১৬	৪৪১
১৮১৭	৭০৭
১৮১৮	৮৩৯
	মোট ২,৩৬৫

এই তালিকা হতে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, প্রথমত সরকারের সতীদাহ-প্রথা আংশিক দমনের চেষ্টা ফলবতী হয় নি। প্রতি বৎসরই, চেষ্টা সত্ত্বেও, সতীদাহের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দ্বিতীয়ত, কলিকাতা অঞ্চলেই সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। চার বছরে মোট ২,৩৬৫ সতীদাহের ঘটনার মধ্যে একা কলিকাতাতেই ১,৫২৮টি ঘটে। কলিকাতার মানুষ কি আরও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল ?

এইচ ওকলি নামে হুগলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তার এক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় ১৮১৩ পর্যন্ত সতীদাহ-প্রথা সম্পর্কে সরকারের কোনও নির্দেশ ছিল না। পরে যে নির্দেশ প্রবর্তিত হল, সেই অনুসারে সরকারী কর্মচারী প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর ক্ষেত্র অনুসারে অনুমতি দেবার ফলে, মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, শাসকজাতির সতীদাহ-প্রথায় অনুমোদন আছে। তা দেখায় যে, আধাআধি ব্যবস্থায় কোনও ফল হয় না। যা বিগর্হিত, যাকে নীতিবোধ সমর্থন করে না, তাকে কঠিন হস্তে দমন করতে হয়।

কিন্তু কঠিন হস্তে দমন করার সাহস বিদেশী প্রশাসক-মণ্ডলীর তখন ছিল না। তারা এসেছিল বিদেশ হতে বাণিজ্য করতে। ভাগ্যের আকস্মিক আনুকূল্যে তারা হয়ে বসেছে এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রশাসক। যাদের শাসন করবে তারা ভিন্ন জাতি, তাদের ধর্ম ভিন্ন, জীবনধারণ-প্রথা ভিন্ন। ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, যতদিন নির্ঝঞ্ঝাটে শাসন করা যায় তার চেষ্টা করলে। সামাজিক রীতি বা ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে তাই তারা ভয় পেত। ফলে যদি অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, আর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, তাদের সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

কাজেই দেশের মানুষদের মধ্যে যাদের বিবেক ক্রিয়াশীল তাদের এগিয়ে আসতে হয়। রাম-মোহনের জীবনীকার শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কোলেট-এর বিবরণ অনুসারে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারল-এর কাছে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দুটি আবেদন-পত্র পেশ করা হয়। দ্বিতীয় আবেদন-পত্রটি তিনি দেখেছেন। তাতে কলিকাতার অনেক খ্যাতি-মান ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

তার প্রতিবাদে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধির পক্ষ হতে আর একটি আবেদন-পত্র স্থাপন করা হয়। তাতে সরকার সম্প্রতি সতীদাহ-প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করতে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা রহিত করবার জন্য আবেদন করা হয়। তার প্রতিবাদে সরকারের নিকট আর একটি আবেদন-পত্র স্থাপন করা হয়। তাতে সতীদাহ-প্রথার বীভৎসতা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি

এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বিশ্বাসযোগ্য চাক্ষুষ প্রমাণের ভিত্তিতে আবেদনকারিগণ অবগত আছেন, অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যেখানে যাদের স্বার্থ বিধবার মৃত্যু ঘটানোর সহিত জড়িত এমন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর প্ররোচনায় নারী স্বামীর চিতায় উঠতে বাধ্য হয়েছেন ; এমনও হয়েছে যেখানে শোকের প্রথম আঘাতে সহমরণে হঠকারিতার সহিত সম্মত হয়ে, পরে ভয়ে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছেন এমন নারীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চিতায় জোর করে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং যতক্ষণ না অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়েছে ততক্ষণ কাঁচা বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখা হয়েছে ; এমন ঘটেছে যে চিতা হতে উঠে পালিয়ে গেলে আত্মীয়েরা তাকে ধরে তুলে এনে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে. আপনার বিনীত আবেদনকারীদের ধারণায় এই সব দৃষ্টান্তগুলিই সকল শাস্ত্র অনুসারে এবং সকল জাতির সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে হত্যারই সমস্থানীয়।"

এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা আবেদন করেন সতীদাহ-প্রথা রহিত করতে সরকার যেন আরও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই আবেদন-পত্রখানি অগস্ট ১৮১৮ তারিখের দ্বারা চিহ্নিত। রামমোহন সম্ভবত এই দরখাস্তখানি রচনা করেন। তাতে রামমোহনের স্বহস্তের লেখাও পাওয়া যায়। সুতরাং এইভাবে রামমোহন, সতীদাহ-প্রথা রহিত করবার সপক্ষে যে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এই প্রসঙ্গেই তিনি 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' নামে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু তখনও লর্ড হেস্টিংস ভারতের গভর্ণর জেনারল। তিনি এ বিষয় কোনও নূতন নির্দেশ দেন নি। সম্ভবত তিনি যে নীতি পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন তাই বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গভর্ণর জেনারল-এর পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্থলে এই পদে যিনি নিযুক্ত হন তিনি হলেন লর্ড আমহার্স্ট।

ইতিমধ্যে সতীদাহের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তার সংখ্যা ছিল ৬৩৯। পূর্ব বৎসরের তুলনায় তা শতকরা দশভাগ বেশী। ফলে বিষয়টির প্রতি নিজামত আদালতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বিচারক স্মিথ সতীদাহ-প্রথা রহিত করবার সুপারিশ করলেন। বিচারপতি রস তার সমর্থন জানালেন। বিষয়টি কাউনসিলে স্থাপিত হল। কাউনসিলের সহ-সভাপতি বেয়লি প্রস্তাব করলেন প্রথাটি এমন অঞ্চলে রহিত করা হক, যেখানে সরকারের রাজ্য সম্প্রতি বিস্তৃত হয়েছে এবং লর্ড হেস্টিংস-এর নির্দেশ তখনও প্রবর্তিত হয় নি, যেমন দিল্লী, নর্মদা ও কুমায়ুন অঞ্চল। এ প্রস্তাবটির তারিখ হল ১৩ জানুআরি ১৮২৭। সহ-সভাপতি কোম্বারমেয়ার বেয়লির প্রস্তাব গ্রহণ করতে সুপারিশ করলেন।

লর্ড আমহার্স্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। প্রথমত তাঁর ধারণায় আংশিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা কার্যকর হয় না। অপরপক্ষে প্রথাটি সম্পূর্ণ বিলোপ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় জ্ঞান বিস্তারের ফলে ধীরে ধীরে এই প্রথার আপনি বিলোপ ঘটবে। তাঁর মনোভাব ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর নির্দেশ হতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার প্রাসঙ্গিক অংশের বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল :

'সতীদাহ-প্রথাকে নিষিদ্ধ করে কোনও প্রস্তাব দিতে আমি প্রস্তুত নই। এই কুপ্রথার প্রতি আমি উদাসীন এমন ধারণা উৎপাদিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও আমি স্পষ্টই স্বীকার করি যে, আমার ইচ্ছা এই সুপারিশ করা যে এদেশের

মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানের বিস্তার ঘটছে তার ওপর নির্ভর করা হক, এই আশায় যে এই জঘন্য কুসংস্কার ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে।”

কিন্তু নিজামত আদালতের বিচারকগণ ছাড়বার পাত্র নন। বিচারক বেয়লি আবার সতীদাহ-প্রথা রহিত করবার সুপারিশ করে পাঠালেন। লর্ড আমহার্স্ট-এর প্রতিক্রিয়ায় কোনও পরিবর্তন ঘটল না। তিনি আবার দেশের মানুষের মনে সুবুদ্ধির উদয়ের ওপর নির্ভর করে বিষয়টি চাপা দিলেন। তারিখটা ছিল জানুআরি ১৮২৮। তার দুমাস পরেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন।

তাঁর জায়গায় যিনি নূতন গভর্নর জেনারল নিযুক্ত হয়ে এলেন, তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রশাসকদের অন্যতম লর্ড উইলিয়ম বেন্টিংক। দেশের কল্যাণসাধন করতে তিনি যা ভাল বুঝতেন তার নির্দেশ দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ বিষয় তিনি সত্যই দুঃসাহসী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা-প্রসারকে সরকারের নীতি হিসাবে তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য রীতিতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষণের জন্য তিনিই কলিকাতায় মেডিকাল কলেজ স্থাপন করেন। কাজেই এ হেন মানুষের হাতে সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল।

ঠিক বলতে কি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে সরকারী নীতি কি হবে তা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই একটা আন্দোলন চলে আসছিল। অন্য প্রশাসকরা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কেবল হেস্টিংসই এ বিষয় কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কারণও বোঝা যায়। বিদেশী সরকারের কোনও একটি প্রথা রহিত করতে দশবার ভাবতে হয়। তাঁদের ভাবতে হয় তাতে দেশীয় প্রজারা অসন্তুষ্ট হবে কিনা; ফলে সিপাহিরা বিদ্রোহী হবে কিনা ইত্যাদি। তাই প্রথাটি নীতিবিরুদ্ধ হলেও তাকে সোজাসুজি দমন করতে সাহস পেতেন না।

বেন্টিংক এসে দেখেন সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি কাজের মানুষ, সাহসী মানুষ; তিনি ত বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন না। বিষয়টি যে নীতিবিরুদ্ধ এবং সবল হস্তে দমন করার যোগ্য, সে বিষয় তাঁর দ্বিধা ছিল না। কতখানি ঝুঁকি নেওয়া যায়, তাই ছিল তাঁর বিবেচনার বিষয়।

তিনি জানতেন ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ভারতীয় সিপাইদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রথম তিনি খবর নিলেন সতীদাহ-প্রথা রহিত হলে সিপাইদের মধ্যে কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হবে কিনা সেই বিষয়। গুপ্ত অনুসন্ধানের ফলে তিনি এই জেনে নিশ্চিন্ত হলেন যে, সিপাইদের ওপর তার কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না।

এদিকে নিজামত আদালতের বিচারকগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ জন বিচারকই এই প্রথা রহিত করবার জন্য আবার সুপারিশ করে পাঠালেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন, এই প্রথা রহিত হলে সরকারের কোনও বিপদ ঘটবে না।

তখন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বেন্টিংক রামমোহনকে পরামর্শ দেবার জন্য ডেকে পাঠালেন। এ বিষয় রামমোহন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে বিষয় বেন্টিংক একটি লিখিত বিবরণ রেখে গেছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

“তাঁর (রামমোহনের) মতে এই প্রথা, তার বিরুদ্ধে নানা বাধা স্থাপন করে এবং পুলিশের পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে অলক্ষ্যে এবং নিঃশব্দে দমন করা যায়। তাঁর আশঙ্কা এ বিষয় কোন বিধি প্রয়োগ করলে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।”

রামমোহনের উপদেশ হতে বেন্টিংক যা বুঝেছিলেন তাও তিনি লিখেছেন। তাঁর ধারণায়, রামমোহনের উপদেশের তাৎপর্য হল ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করার পর যদি আইন করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়, তা হলে ভারতীয় হিন্দুর আশঙ্কা হবে যে, মুসলমান রাজাদের অনুসরণে এরপর ইংরেজ তাদের ধর্ম হিন্দুর উপর চাপিয়ে দেবে।

রামমোহনের এই আচরণ ব্যাখ্যা করা শক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, তা তাঁর পূর্বের এবং পরবর্তী আচরণের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না। ১৮১৮ *খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ-প্রথা* নিরোধের সপক্ষে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে সতীদাহ-প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করায় তৃপ্তি লাভ করেছিলেন সে বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কিছু প্রমাণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে।

বেন্টিংক ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে একটি রেগুলেশন পাশ করে যখন সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলেন, তখন সমাজের রক্ষণশীল অংশ এই আইন প্রতিরোধ করতে আন্দোলন শুরু করল। জানুআরি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাবাসীর পক্ষে ৮০০ মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে গভর্নর জেনারল-এর কাছে এই নূতন নির্দেশ তুলে দেবার অনুরোধ করে একটি আবেদন-পত্র পাঠানো হয়। তার সমর্থনে ১২০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত একটি অভিমত স্থাপিত হল, যা বলল সতীদাহ-প্রথা হিন্দুধর্মের অঙ্গ। মফঃস্বলের পক্ষ হতেও ৩৮৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বাক্ষরিত একটি অনুরূপ প্রতিবাদ-পত্র স্থাপিত হল।

ওদিকে সরকারের নির্দেশের সমর্থনেও একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে দুটি পৃথক্ আবেদন-পত্র স্থাপিত হল। দ্বিতীয় আবেদন-পত্র রামমোহনস্বাক্ষরিত এবং সম্ভবত তাঁরই রচিত। তা রক্ষণপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করে সরকারের নূতন নির্দেশের জন্য 'গভীর কৃতজ্ঞতা' এবং 'চূড়ান্ত শ্রদ্ধা' নিবেদন করেছিল। (Government Gazette, Vol. XVI. No. 858 dt. 18.1.1830 দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয়ত দেখি, ১৬৷১৷১৮৩০ তারিখের একটি অভিনন্দন বেন্টিংককে সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তা ইংরাজীতে রচিত ও বাংলায় অনূদিত ছিল। তাতে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতির স্বাক্ষর ছিল। তার মর্ম হল সতীদাহ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়, তা কতকগুলি স্বার্থান্ধ মানুষের প্ররোচনায় গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, তা রহিত করার জন্য লর্ড বেন্টিংক-এর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তা অতিরিক্তভাবে সেকালের বাংলাভাষার কিছু নমুনা আমাদের নিকট স্থাপন করবে:

"অধীনেরা এই নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্তি করিতেছে যে এ অধমদের সর্বান্তঃকরণের সহিত শ্রীল শ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার…কৃপাপূর্বক গ্রাহ্য করেন।"

সুতরাং রামমোহনের উপদেশ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। সম্ভবত তার এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এখানে তিনি ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিকোণ হতেই বিচার করে তার স্বার্থের অনুকূলে যে উপদেশ দেওয়া উচিত তা দিয়েছিলেন।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, বেন্টিংক ঝুঁকি নিয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে সতীদাহ-প্রথা রহিত করেছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহস তাঁর বিচক্ষণতারও পরিচয় দেয়। তাঁর মানবিকতা-বোধ এই বর্বর রীতিকে সহ্য করতে

পারে নি। অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিবেচনা করাও তাঁর কর্তব্য ছিল। সে কর্তব্য তিনি অবহেলা করেন নি। সিপাইদের উপর তার প্রতিক্রিয়া হবে না, তিনি জেনেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি জেনেছিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রের সমর্থন সতীদাহ-প্রথার পিছনে নেই। তাই তিনি এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন নি।

তাঁর মন যে এইভাবেই কাজ করেছিল, তার সপক্ষে এই নির্দেশের সমর্থনে যে যুক্তি প্রযুক্ত হয়েছিল, তা হতে বোঝা যায়। তাতে এই প্রথা রহিত করবার অনুকূলে দুটি যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। প্রথম, এই প্রথা মানবধর্মের বিরোধী, তা অত্যন্ত অমানুষিকভাবে নিষ্ঠুর। দ্বিতীয়, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে কোথাও তার সমর্থন নেই।

[ক্রমশঃ]

পরলোকে ডক্টর আর্নল্ড টয়েনবী

বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ডক্টর আর্নল্ড টয়েনবী গত ২২শে অক্টোবর ১৯৭৫ ইংলণ্ডের ইয়র্ক শহরে একটি নারসিং হোমে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৬ বৎসর।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি Winchester ও Balliol কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং উভয় স্থানেই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯১২ হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি Balliol কলেজে গ্রীস ও রোমের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন; ১৯১৯ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইজানটাইন ও আধুনিক গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপকপদে বৃত হন; ১৯২৪ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত Royal Institute of International Affairs-এ যোগদান করেন এবং পর বৎসর উহার অধ্যয়ন-অধিকর্তা নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক ইতিহাসের গবেষণা-অধ্যাপকও ছিলেন।

১৯২৭ সালে তিনি পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তাঁহার রচিত 'A Study of History'-নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ছয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের দ্বাদশ তথা অন্তিম খণ্ড ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরব্যাপী সাধনার ফলশ্রুতি উক্ত গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, মানুষের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ধর্মেরই ইতিহাস।

পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতামালা পুস্তকাকারে 'America and the World Revolution' নামে প্রকাশিত হয়। গ্রীক ইতিহাস, তুরস্ক এবং অন্যান্য বিষয়ে নানা গ্রন্থ ছাড়াও তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'The World and the West' (১৯৫২ সালের Reith বক্তৃতামালা), 'An Historian's Approach to Religion' (১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের Edinburgh Gifford বক্তৃতাসমূহ), 'Christianity Among the Religions of the World' (১৯৫৮), 'East to West : A Journey Round the World' (১৯৫৮) এবং 'Between Oxus and Jumna' (১৯৬১)।

ডক্টর টয়েনবী ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Emeritus, ব্যালিয়ল কলেজের Honorary Fellow এবং British Academy-র Fellow। Royal Institute হইতে অবসর গ্রহণের পর Rockefeller Foundation-এর অনুদানে তিনি দেড় বৎসর বিশ্ব-পরিক্রমা করেন।

অধ্যাপক টয়েনবী যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিনয়-নম্র। তিনি তাঁহার লেখার সমালোচনার সমাদর করিতেন। সমালোচনা সঠিক বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী রচনায় রদবদল করিতেন।

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী ঘনানন্দ রচিত ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার, লণ্ডন হইতে প্রকাশিত 'Sri Ramakrishna and His Unique Message'-নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ডক্টর টয়েনবী ৮১ বৎসর বয়সে যে অমূল্য কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পরিণত জীবনের চরম ও পরম সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত। সেই ভূমিকার কিয়দংশ নিম্নে ভাষান্তরিত করিয়া আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি :

'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী অনন্ত, কারণ তাহা জীবনচর্যায় বিধৃত।···ধর্ম কেবলমাত্র অধ্যয়নের বিষয় নহে, উহা এমন কিছু যাহা উপলব্ধি করিতে হয়, জীবনে রূপায়িত করিতে হয় এবং এই ক্ষেত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যত্ব সুপরিস্ফুট—তিনি ক্রমান্বয়ে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত সাধনা সমাপ্ত করিয়া ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সাধনাও করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার ধর্মীয় সাধনা ও উপলব্ধি এতদূর ব্যাপক ছিল যে. ভারতে বা অন্য কোনও দেশে সম্ভবতঃ কোনও ধর্মসাধকের তাহা অনায়ত্ত।··· যে-স্থানে ও যে-সময়ে তাঁহার ও তাঁহার বাণীর প্রয়োজন ছিল, সেই স্থানে ও সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ও তাঁহার বাণী প্রচার করেন।··· এমন এক পৃথিবীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে-পৃথিবী সর্বপ্রথম তাঁহারই জীবনকালে, আক্ষরিক অর্থে, বিশ্বসংযোগসূত্রে গ্রথিত হইতেছিল। আমরা এখন পৃথিবীর ইতিহাসের সেই পরিবৃত্তি-কালীন অধ্যায়ে বাস করিতেছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, আত্মহননে মানবজাতির অবলুপ্তি রোধ করিতে হইলে একটি অধ্যায় যাহার সূচনা ছিল পাশ্চাত্য, তাহার উপসংহার হওয়া উচিত ভারতীয়। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রযুক্তিবিদ্যার কলা-কৌশলে জড়জগৎ সম্মিলিত হইয়াছে। কিন্তু এই পাশ্চাত্য কৌশল শুধু দূরকে নিকট করে নাই, বিশ্বের জাতিসমূহকে প্রচণ্ড মারণাস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছে এমন এক সময়ে, যখন তাহারা পরস্পরকে জানিতে ও ভালবাসিতে না শিখিয়াই সরাসরি বিপজ্জনক নৈকট্যে আসিয়াছে। বিশ্ব-ইতিহাসের এই অতীব সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশ্বমানবের পরিত্রাণের একমাত্র পথ ভারতীয় পথ। সম্রাট অশোক ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-নীতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রামাণিক সাক্ষ্য—ইহারই মধ্যে নিহিত আছে সেই মানসিকতা ও ভাবাদর্শ যাহার দ্বারা মনুষ্যজাতির পক্ষে এক পরিবারভুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠা সম্ভব ; এবং পরমাণবিক যুগে আমাদের আত্মধ্বংসের ইহাই একমাত্র বিকল্প।'

পরলোকে কবিশেখর কালিদাস রায়

কবিশেখর কালিদাস রায় গত শনিবার ২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫, রাত্রি ১০-৪০ মিনিটে তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কবিশেখর ১৮৮৯ সালের ৯ই জুলাই বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে এক বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বহরমপুর কে. এন. কলেজ হইতে সম্মানের সহিত স্নাতক হইয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে এম. এ. পড়েন। ১৯১৩ সালে রংপুর জেলার উলিপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরে কলিকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশনে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য ছাত্রগণ তাঁহাকে যেমন সম্ভ্রম করিত, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহারের জন্যে তেমনই শ্রদ্ধাও করিত। বস্তুতঃ তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন এবং অধ্যাপনার অতিরিক্ত ছাত্রদের চরিত্র গঠনেও সহায়তা করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যসাধনা শুরু হয় এবং মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুন্দ' প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলির নাম: কিসলয় (১৯১১), পর্ণপুট ১ম (১৯১৪), ব্রজরেণু (১৯১৫), বল্লরী (১৯১৬), ঋতুমঙ্গল (১৯২০) পর্ণপুট ২য় (১৯২১), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২), লাজাঞ্জলি (১৯২৪), রসকদম্ব (১৯২৫), চিত্তচিতা (১৯২৫), আহরণী (১৯৩২), হৈমন্তী (১৯৩৬), বৈকালী (১৯৩৮), ব্রজবাঁশরী (১৯৪৫), আহরণ (১৯৫০), গাথাঞ্জলি (১৯৫৭), সন্ধ্যামণি (১৯৫৮), পূর্ণাহুতি (১৯৬৮), তৃণদল (১৯৭০) ও গাথামঞ্জরী (১৯৭৪)। ইহা ছাড়া তিনি সাতটি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন: গীতগোবিন্দ, গীতালহরী, কাব্যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার ও ইন্দুমতী (রঘুবংশ)।

প্রথম পাঁচ ছয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরই তাঁহার অসামান্য কবি-প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (রংপুর শাখা) ১৯২০ সালে তাঁহাকে 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

মুখ্যতঃ কবি হইলেও বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে তিনি তাঁহার বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। বহু প্রবন্ধ, সাহিত্য-সমালোচনা, কথিকা ইত্যাদির দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পুস্তকগুলির মধ্যে 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য', 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', 'পদাবলী-সাহিত্য', 'শরৎ সাহিত্য', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ', ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রম্যরচনাবলী 'চণক সংহিতা', 'চালচিত্র' ও 'রঙ্গচিত্র' গ্রন্থত্রয়ে প্রকাশিত। শেষ গ্রন্থ 'শরৎ সান্নিধ্যে' যন্ত্রস্থ।

কবিতা সমালোচনা রম্যরচনা ইত্যাদির মাধ্যমে কবিশেখর সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর যাবৎ বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। ফলতঃ সাহিত্যিক মহলে তিনি সর্বদাই অগ্রজের সম্মান ও সমাদর লাভ করিতেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি বিশ্বভারতী হইতে 'দেশিকোত্তম', রবীন্দ্রভারতী হইতে ডি. লিট্ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬৮ সালে তিনি 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' সম্মানিত হন। ১৯৬৩ সালে তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' প্রাপ্ত হন। আধুনিক

কবিতার সহিত তাঁহার কবিতাবলীর তুলনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা নিশ্চিত সত্য যে, তাঁহার অসংখ্য কবিতা চিরদিনই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ 'চৈতন্যমঙ্গল'-গ্রন্থের রচয়িতা ষোড়শ শতকের সাধক-গীতিকার লোচন দাস কবিশেখর কালিদাস রায়ের পূর্বপুরুষ। বৈষ্ণব পদকর্তা উদ্ধব দাস কবিশেখরের মাতৃকুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। উভয় বংশের বৈষ্ণবীয় ভাবধারা স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে। বৈষ্ণবসুলভ দীনতা সরলতা অমায়িকতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

'উদ্বোধন' পত্রিকার তিনি একজন অনুরাগী লেখক ছিলেন। এই পত্রিকার ৩৭তম বর্ষ হইতে ৭৫তম বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় তাঁহার রচিত ১০২টি কবিতা ও ১৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই পত্রিকার প্রতি শেষ অর্ঘ্যস্বরূপ তাঁহার 'তুলসী' কবিতাটি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। আকারে ক্ষুদ্র অথচ আন্তর সম্পদে সমৃদ্ধ, সরল সাবলীল ছন্দে রচিত কবিতাটিতে কবির প্রতি 'হরিপ্রিয়া'র যে আশীর্বাণী কবি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে ভাগবত-জীবনের ফলশ্রুতিস্বরূপ পরম আশ্বাসের প্রতীক।

কবির স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

প্রসঙ্গতঃ

গত আশ্বিন ১৩৮২ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-যাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়'-শীর্ষক প্রবন্ধটির অন্তর্গত দুইটি গান সম্বন্ধে স্বামী প্রভানন্দ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পোঃ বিবেকানন্দ-নগর, পুরুলিয়া) নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে শ্রীম যেখানে পুরা গান দেন নাই, আংশিকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে গানের প্রথম ছত্র বা ছত্রাংশই দিয়াছেন—কখনও কোন গান উহার ৪র্থ পঙক্তির একটি পদ দিয়া চিহ্নিত করেন নাই। সুতরাং ডক্টর দত্ত কথামৃতে উল্লেখিত 'মহিষমর্দিনী' গানটির পূর্ণরূপ তাঁহার 'মনে হয়' বলিয়া নীলকণ্ঠেরই রচিত 'তারা ধন্য মা তোর লীলাখেলা নীরদ-বরণী' ইত্যাদি যে-গানটি দিয়াছেন (পৃঃ ৫০১), তাহার পরিবর্তে রঘুনাথ রায় দেওয়ান রচিত নিম্নোক্ত গানটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী—

'মহিষমর্দিনীরূপে ভুবন করে উজ্জ্বল।
অমল কমলদল নিন্দিত চরণতল,
শশধর-নিকর নখররূপে প্রকাশিল ॥ ইত্যাদি

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শাক্ত-পদাবলী', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৮৫)।

(২) কথামৃতে উল্লেখিত 'শিব শিব'-গানটি সম্বন্ধে ডক্টর দত্ত বলিয়াছেন যে তাঁহার মনে হয় উহার পূর্ণরূপ নীলকণ্ঠ রচিত 'জয় জয় শিব ত্রিগুণধারী' ইত্যাদি (পৃঃ ৫০১-২)। কিন্তু এই গানটিতে 'শিব শিব'-পদদ্বয় একেবারেই নাই। সুতরাং উহার পরিবর্তে নিম্নোক্ত গানটি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী—

'শিব শিব বল জীব, ঘুচিবে অশিব সব,
শিব নাম ভরসা করি বিশ্ব পালেন কেশব' ইত্যাদি

(দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রকাশিত 'সঙ্গীত সংগ্রহ', অষ্টম সংস্করণ, পৃঃ ২৩)।

—সম্পাদক

বল দেখি মা কোথায় যাবো

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়*

বল্ দেখি মা কোথায় যাবো,
ষড়রিপুর দহন থেকে
কোথায় গেলে মুক্তি পাবো ॥

দিবানিশি জ্বলছি যে মা
এ জ্বালা কি ঘুচ্‌বে নাকো,
মনের কালি মুছে দিয়ে
হৃদয় আলো ক'রে থাকো ॥

আমি তোমার অধম ছেলে
আমায় দূরে ঠেলিস্ নে মা
পাথর ঢাকা মনের কোণে
দেখি কিছুই নেইতো জমা ।
শূন্য ঘরে একাই কাঁদি
সান্ত্বনা কেউ দেয় না মাগো,
(এখন) কৃপা কর্ মা দয়াময়ী,
আমি মা তোর সঙ্গে যাবো ॥

---

* বি. এ., সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

সবি প্রভু তোমারি সৃজন

শ্রীসুনীল কুমার ভট্টাচার্য*

সবি প্রভু তোমারি সৃজন ।
ঐ যে আকাশ, এই যে বাতাস,
নদী, পাহাড়, বন ।

এই কথা কেউ মনে রাখে
কেউ, দুর্বিপাকে ভুলে থাকে,
আড়ালেতে বসে তুমি
হাসো সর্বক্ষণ ।

সকলকে যায় ফাঁকি দেওয়া
শুধু তোমায় বিনা,
সাগরেরও তলে বাজে
তোমার আঁখির বীণা ।

ডুব দিয়ে তাই অহংজলে
কোনো ফলই নাহি ফলে,
সোজাপথে গেলেই তবে
তুমি আপনজন !
সাধু জানে, এই পথও যে
তোমারি সৃজন ।

---

* আকাশবাণীর অনুমোদিত গীতিকার ।

সমালোচনা

God of All : by Claude Alan Stark. Published by Claude Stark, Inc., Cape Cod, Massachusetts 02670, (1974), pp. xix + 236, price 12 dollars.

লেখক ক্লড এলান স্টার্ক একজন খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারক। তিনি দশ বছর যাবৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও মার্কিনদেশে বেদান্তপ্রচারক স্বামী অখিলানন্দের নিকট সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর জীবনে স্বামী অখিলানন্দের প্রভাব ছাড়াও কঙ্গোবাসী প্রটেস্টাণ্ট ধর্মনেতা Mama Ndona Santu-র প্রভাব সুগভীর। ক্রমে ক্রমে ক্লড বিভিন্ন ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উদারদৃষ্টির আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর গভীরে প্রবেশ করেছেন। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন ধর্মের মত পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের যে ঈশ্বরানুভূতি, তাকে অবলম্বন করে বিবদমান মানবজাতির মধ্যে যথার্থ ঐক্যসাধন এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার অবসান ঘটান সম্ভব।

সকল ধর্মই এক ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার বিভিন্ন পথ মাত্র— এই মতবাদ শুধু প্রচার ক'রে, বা এ বিষয়ে ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বা বিভিন্ন ধর্মমতগুলির বৈচিত্র্য অগ্রাহ্য ক'রে বা বিভিন্ন ধর্ম-মতে বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের জন্য কোন আগ্রাসী নীতি অনুসরণ ক'রে সমন্বয়-সমস্যার সমাধান হবে না। জটিল এই সমস্যাটির একটি সম্ভাব্য সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরানুভূতিভিত্তিক জীবন ও বাণী, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করেছেন প্রধানতঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের ইংরাজী অনুবাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ চয়নের সমন্বয় করেননি, তিনি বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ করেননি অথবা তিনি কোন মৌলিক ধর্মমত সৃষ্টি করেননি। যখন যে ধর্মমত সাধনা করেছেন, তিনি তার সব কিছু অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। এই সকল সাধনভজনের পিছনে তাঁর কোন মতলব ছিল না। খাঁটি ভক্তের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্নভাবে রসস্বরূপ শ্রীভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করা। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ নানাভাবে এই রস আস্বাদনের জন্য সত্যানুসন্ধীর স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে বিভিন্ন সাধনপথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সর্বানুস্যূত উপলব্ধি মানবসমাজের ঐক্যসাধনের একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সত্যের প্রতি গভীর প্রীতি। তাঁর সাধনজীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা। হিন্দু মতানুযায়ী যে বিশাল সাধনরাজ্য তার যত্র তত্র শ্রীরামকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিচরণ বিস্ময়কর, কিন্তু ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় মতানুসারে তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধান ধর্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। প্রচলিত খ্রীষ্টীয় মতগুলির দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করে ও মুসলিম শরিয়ৎ হাদিসের মাপকাঠিতে বিচার করে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব অনুভূতির আকৃতি-প্রকৃতি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যস্বতন্ত্র উপলব্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন খ্রীষ্টীয় মতাবলম্বীদের কাছে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতমহলে।

লেখকের মতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাব শুধুমাত্র হিন্দুসাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানতঃ শান্ত দাস্য ও অপত্যভাবের প্রাধান্য দেখা গেলেও রাজা সলোমনের মধুরভাব, পাডুয়ার সেণ্ট এণ্টনির বাৎসল্যভাব, সুফী সন্তদের সখ্য ও মধুর ভাবের সাধন ধর্মজগতে সুবিদিত। লেখকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতসাধনার কিছুকাল ছাডা তাঁর সমস্ত সাধনাই ছিল ভক্তিপথানুসারী। ভক্তিপথ ধরে বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের যে সিদ্ধি, তাও বিভিন্ন মতপথের একটি নির্ভরযোগ্য ঐক্যভূমি।

তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে, ঈশ্বর ও জগৎসংসারের মধ্যে ভাবের সেতু রচনা করেছিলেন। তেমনি সন্ন্যাসী ও সংসারীদের আপাতবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্যবিধান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড অবদান। তাঁর দৃষ্টিতে ঈশ্বর জগৎ ও মানুষ সব কিছুই এক সত্তায় সত্তাবান। এই ভাবসূত্র ধরে স্বামী বিবেকানন্দ নরসেবা প্রবর্তন করেছিলেন। এই সেবার ভাব কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। হিন্দু মুসলিম খ্রীষ্টান যে কেউ তার প্রতিবেশীকে ঈশ্বরের সন্তান, বা তাঁর অংশ বা স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করে অধ্যাত্মসাধনায় নিশ্চিতভাবে অগ্রসর হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রমুখ তাঁর শিষ্যবৃন্দ ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মাধ্যমে। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রসারের কাহিনী বলতে গিয়ে লেখক স্বামী অখিলানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তির বাস্তব প্রয়োগরূপে দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থে স্বামী অখিলানন্দের প্রচার-কার্যের ভূমিকার বিস্তৃত আলোচনা খাপছাড়া মনে হয়।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের রূপায়ণে যে সম্ভাব্য বাধা সেগুলি লেখক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের জীবনে ধর্ম ও ঈশ্বরের স্থান সীমিত। অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসীর জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ নয়, ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী সৎ জীবন যাপন করা। এই সকল অসুবিধা দূর করবার জন্য লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবন নিয়মানুগভাবে বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তিনি বিশ্বের বিদ্বজ্জনকে আহ্বান করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য।

গ্রন্থখানি রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন প্রসারের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বামী প্রভানন্দ

পরলোক : অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১ রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ৩১। (১৩৮১), পৃঃ ১৫৩ + ১০ = ১৬৩, মূল্য পাঁচ টাকা।

পুস্তকখানি পরলোক বা মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি তত্ত্ববহুল ও তথ্যবিপুল সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। ইহাতে পরলোকের যৌক্তিকতা শাস্ত্রীয়, লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচিত হইয়াছে। মানুষ পরলোকের জ্ঞান লাভ করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন ও ঈশ্বরমুখী হউক—এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থকার পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। পরলোকতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম ও

বিশাল। যাঁহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁহারা পরকাল পরলোক পূর্বজন্ম পরজন্ম স্বীকার করেন; যাঁহারা দেহসর্বস্ব জড়বাদী তাঁহারা নাস্তিক, পরলোক ও জন্মান্তরে অবিশ্বাসী। গ্রন্থকার উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি এবং ক্রান্তদর্শী ঋষি ও শুদ্ধচিত্ত সাধকদের প্রত্যক্ষানুভূতিসমূহকে ভিত্তি করিয়া পরলোক-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার আধুনিক যুগে পাশ্চাত্তাদেশীয় বিজ্ঞানী স্পিরিচুয়ালিস্ট বা প্রেততত্ত্ববিদ্গণ প্রেতাবতরণ-চক্রে মিডিয়াম বা মাধ্যমের সাহায্যে জীবিতদের সঙ্গে বিদেহীর ভাবের আদান-প্রদানের যে বিস্ময়কর ও অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও কতিপয় প্রত্যক্ষীভূত দৃষ্টান্ত দ্বারা সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন।

'বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট অদৃশ্য সূক্ষ্ম কণাগুলি লইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা জড়দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশরীরের আবরণে আবৃত হইয়া পরলোকে চলিয়া যায়। বিমূঢ় অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞানিগণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পান' (গীতা ১৫।৮,১০); 'চলার পথে মানুষ যেমন এক পায়ে সম্মুখের মাটি আশ্রয় করিয়া অন্য পায়ে পিছনের মাটি ছাড়িয়া দিয়া অগ্রসর হয়, বর্ষাকালের ঘেসো জোঁক যেমন একটি ঘাস আশ্রয় করিয়া অন্য ঘাস ত্যাগ করে, ঠিক সেইরূপ দেহী মরণকালে সূক্ষ্মশরীর আশ্রয়পূর্বক স্থূলদেহ ত্যাগ করে এবং পরলোকে চলিয়া যায়' (ভাগবত ১০।১।৩৮-৪০); 'সকল জীবেরই পুনর্জন্ম হয়। কেবল ঈশ্বরকে জানিলেই পুনর্জন্ম হয় না' (গীতা ৮।১৬); 'আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেই সর্বভূতের জন্ম হয়, জীবগণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই জীবিত থাকে, আবার মৃত্যুর পর আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেই প্রবেশ করে ও মিলিয়া যায়' (তৈ. উ. ৩।৬), —পুস্তকে আলোচিত এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের ধারণা জ্ঞান আরও স্পষ্টীকৃত ও সুদৃঢ় করিবে এবং সংশয়বাদী অবিশ্বাসীদের সন্দেহজাল ক্রমশঃ ছিন্ন করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধি জাগ্রত করিতে সাহায্য করিবে। পুস্তকখানির প্রচার বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণদায়ক।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা গত ২৪শে আশ্বিন হইতে দিবসত্রয় মহাসমারোহে যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আবহাওয়া ভাল থাকায় প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজার তিন দিন প্রত্যহ হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয় এবং মহাষ্টমীর দিন প্রায় ৩০,০০০ ব্যক্তি প্রসাদ পান।

গত বৎসরের ন্যায় এইবারেও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নোদ্ধৃত ২২টি কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়:

আসানসোল, বালিয়াটি, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখ্‌নৌ, মালদহ, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য

বাংলাদেশে বাগেরহাট বরিশাল ঢাকা দিনাজপুর নারায়ণগঞ্জ ও শ্রীহট্ট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসার অতিরিক্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাদ্য ও বস্ত্রাদি গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বিতরিত হয়।

ভারতে সেবাকার্য

বন্যাত্রাণ :

গত ২৭শে অগস্ট (১৯৭৫) পাটনা শহর ও শহরতলিতে রামকৃষ্ণ মিশন পাটনাস্থিত শাখা-কেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যাত্রাণ কার্য আরম্ভ করে। সাতটি অঞ্চলে বন্যার্তদের মধ্যে আটা ছাতু চিঁড়া ডাল লবণ ইত্যাদি এবং নূতন ও পুরাতন পরিচ্ছদ বিতরিত হয়। ২৫টি কুটীরও নির্মিত হয়। বহু রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং কলেরা ও টাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক ইনজেকশনও দেওয়া হয়। পাটনা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী মানের অঞ্চলে ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে রাঁচি (মোরাবাদী) শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ২,৫০০ লোককে খাওয়ানো হয় এবং ৫০টি কুটীর নির্মিত হয়।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় তমলুক শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে আটা ও পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরিত হয়।

করিমগঞ্জ (আসাম) শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত বন্যাত্রাণ কার্য গত সেপ্টেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়।

অন্যান্য সংবাদ

গত ৯ই অক্টোবর (১৯৭৫) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন **সারদাপীঠের** শিল্প-বিদ্যালয়ের নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন।

এপ্রিল ১৯৭৫-এ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে **মাদ্রাজ** রামকৃষ্ণ মিশন **বিবেকানন্দ কলেজের** ৫ জন স্নাতক এবং ৪ জন স্নাতকোত্তর ছাত্র উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুরস্কার ও পদকাদি লাভ করে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র (শ্রীমান রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়) ১৯৭৫ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় ও সমস্ত শাখার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের অপর তিনটি ছাত্র বাণিজ্য শাখায় ৫ম স্থান এবং কৃষি শাখায় ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করিয়াছে। শতকরা ১০০ জন ছাত্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে চিকাগো ধর্মমহাসভার ৮৩ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ ধর্মসম্মেলন গত ১৪ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এম্. এ. মাসুদ, ডঃ বক্‌শিস্ সিং, স্বামী উমানন্দ, অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র সিন্‌হা, বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড জন্. ডব্‌লু সাদিক্ যথাক্রমে হজরত মহম্মদ, গুরু নানক, শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব এবং যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। সভার প্রারম্ভে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং সভান্তে আশ্রম পরিচালক সমিতির সদস্য শ্রীগোপীনাথ দাঁ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কার্যবিবরণী

রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমটি ১৯২৭ সালে রাজকোটে মোরবী (Morvi)-র মহারাজের রেস্ট হাউসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৪ সালে বর্তমান নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সমগ্র গুজরাত প্রদেশে ইহা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র কেন্দ্র। আলোচ্য কেন্দ্রের ১লা এপ্রিল ১৯৭১ হইতে ৩১শে মার্চ ১৯৭৪—এই তিন বৎসরের একত্রে প্রকাশিত কার্যবিবরণী নিম্নরূপ :

আশ্রম: নিয়মিত পূজা পাঠ আরতি প্রার্থনা ও নৈমিত্তিক বিশেষ পূজা হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিয়মিত ধর্মীয় আলোচনা ও বিশেষ উৎসবাদিতে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবধারা প্রচারের জন্য সন্ন্যাসিগণ দূর গ্রামেও যান।

প্রকাশন বিভাগ: আশ্রমের প্রকাশন বিভাগ হইতে এ পর্যন্ত মোট ৭৫টি ক্ষুদ্র বৃহৎ পুস্তক গুজরাতী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষত্রয়ে ৫টি নূতন বই প্রকাশিত ও ৮টি বই পুনর্মুদ্রিত হয়।

চিকিৎসা: দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয় দুইটিতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা :

বর্ষ	মোট রোগী	নূতন রোগী
১৯৭১	৬৬,২৩৭	৬,২২৯
১৯৭২	৬৮,৩৭৬	৬,৪০২
১৯৭৩	৫৫,১৯৫	৫,৫৫৫

বিদ্যার্থি-মন্দির: গুরুকুলপ্রথা অনুসারে বর্ণাদি-নির্বিশেষে প্রায় ৮০ জন ছাত্রকে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কয়েকজন দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রকে আংশিক বা পূর্ণব্যয়মুক্ত ভাবে রাখা হয়। মেধা অনুসারে বৃত্তিও দেওয়া হয়। ছাত্রদের এস্. এস্. সি. পরীক্ষার ফল গত তিন বৎসরই শতকরা ১০০। ১৯৭২ ও ৭৩ সালের পরীক্ষায় একজন করিয়া ছাত্র বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হয়।

ব্যয়মুক্ত পুস্তকালয় ও পাঠাগার: এই বিভাগটিতে পুস্তক-সংখ্যা প্রতি বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ষানুক্রমে পুস্তকাদির সংখ্যা দেওয়া হইল :

	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭৩-৭৪
পুস্তক-সংখ্যা	১৯,০০৪	১৯,৪৯৪	২০,৭৯৯
ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা	১৫,০০৪	১৬,৪২৫	১৮,৬০০
সদস্য-সংখ্যা	১,০৪২	১,১২৬	১,১১৫
দৈনিক উপস্থিতির গড়	১৮৪	১৮৬	১৬৯

১০টি দৈনিক সংবাদ পত্র ও ১১৫টি সাময়িকীও রাখা হয়। শিশুদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী-স্মারক প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা: ১৯৬৭ সালে প্রথম প্রবর্তিত প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতাটি সমগ্র

গুজরাত প্রদেশের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের জন্য পরিচালিত হয়। ১৯৭০ সালে প্রবর্তিত বক্তৃতা আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি কেবলমাত্র রাজকোটের বিদ্যার্থীদের জন্য পরিচালিত হয়। বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

ত্রাণকার্য: ১৯৬৮ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রম যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করিয়াছে, তাহার তালিকা মাত্র নিম্নে দেওয়া হইল:

১। সুরাতে বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ ২। কচ্ছে খরাত্রাণ ৩। রাজকোট ও সুরেন্দ্রনগরে বর্ষণ ও বন্যাকবলিতদের মধ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ ৪। রাজকোটে ও সৌরাষ্ট্রের কয়েক অংশে খরাত্রাণ ৫। বনস্কণ্ঠ জেলায় বন্যাত্রাণ ও ২০০ পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম সহ একটি আদর্শ পল্লীর নির্মাণ এবং ৬। নগরপারকার হইতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে ৬০০ পশমের কম্বল ও গরম কাপড় বিতরণ।

আশ্রমে নির্মীয়মাণ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরটি সম্পূর্ণ করিতে ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইহা ছাড়া আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নাদির জন্য আরও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ অর্থসাহায্যের জন্য সহৃদয় জনগণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:

১৮৬টি শয্যাযুক্ত ইনডোর জেনারেল হাসপাতালে ১৯৭৩ সালে ২,৯৬০ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। রাস্তা হইতে আনীত রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৭। গড়ে দৈনিক ১২১টি শয্যায় রোগী ছিল। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ২,৬০৩।

বহির্বিভাগে (শিবালায়ে অবস্থিত শাখা সহ) প্রতিদিন গড়ে ৭২১ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ২,২২,৭২০, তন্মধ্যে নূতন ৬৩,৬২৭ জন। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১০,৮৪২, অন্তর্বিভাগসহ মোট ইন্‌জেক্‌সনের সংখ্যা ৪০,১৭০।

হোমিওপ্যাথি বিভাগ: লাকসা ও শিবালা উভয়স্থানে ৬ জন হোমিওপ্যাথ বহু রোগীর চিকিৎসা করেন।

ক্লিনিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল লেবরেটরী, এক্স-রে ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

অশক্ত ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের আশ্রয়-ভবন দুইটিতে ২৩ জন পুরুষ ও ২৭ জন মহিলা ছিলেন। বর্তমান উচ্চ দ্রব্যমূল্যের বাজারে উক্ত বিভাগ দুইটি চালাইতে গত কয়েক বৎসরের বকেয়া ঋণসহ এই বৎসরের ঘাটতির মোট অঙ্ক ২০,৫৮৬.৯০ টাকা।

বাহিরের দুঃস্থদের সেবাকল্পে ৫২ জন দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধাকে মাসিক এবং ৪০ জনকে সাময়িক অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। ইহাতে মোট ব্যয় হয় ১,৭৫৪ টাকা। ইহা ছাড়া ৫১২ টাকা মূল্যের ৬০টি তুলোর কম্বল এবং পুরাতন কম্বল ও পরিচ্ছদ বহু দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে বিতরিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের আয় ৫,৮৭,১০৫.৭৪ টাকা ও ব্যয় ৭,০৭,২৮৩.৪৯ টাকা, ফলে ঘাটতি হয় ১,২০,১৭৭.৭৫ টাকা; পূর্ব পূর্ব বৎসরের বকেয়া ঘাটতিসহ মোট ঘাটতির পরিমাণ ২,৪৯,৩০৯.৭৮ টাকা। সেবাশ্রম-কর্তৃপক্ষ উক্ত ঘাটতি পূরণ ও সেবাশ্রমের অন্যান্য আশু প্রয়োজনের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

ম্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:

শিক্ষা: বালকাশ্রমে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়া-পরা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। পাঠ্য-

পুস্তক ও বিদ্যাশিক্ষার অন্যান্য উপকরণও বিনামূল্যে দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি, উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪১টি ও কলেজের ৬টি, মোট ৪৯টি ছাত্রকে বালকাশ্রমে রাখা হয়। ছাত্রদের জন্য সপ্তাহে একটি নীতি-শিক্ষার ক্লাস করা হয়। ভগবদ্গীতা বিষ্ণুসহস্রনাম ইত্যাদি আবৃত্তি করিতে এবং ভজন গাহিতে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রধান উৎসবাদি ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব-তিথি যোগ্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালিত হয়।

দাতব্য চিকিৎসা: মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ২১,৬৯৯, তন্মধ্যে নূতন রোগী ৫,০৩০ জন। ইন্‌জেক্‌সনের সংখ্যা ৮৮৯, দাঁত তোলার সংখ্যা ১১৬ ও রক্ত ও মূত্র পরীক্ষার সংখ্যা ২৭০।

দরিদ্র ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ, পোশাক ও বিছানাদির জন্য এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আশ্রম-কর্তৃপক্ষ সহৃদয় জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করিয়াছেন।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৭৩-৭৪ সালের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ:

বৎসরের শেষে বিদ্যার্থীদের মোট সংখ্যা ছিল ১০১, তন্মধ্যে ৬৮ জন বিনা খরচায় ও ১১জন অর্ধেক খরচায় ছিল। বিদ্যার্থিগণ স্বয়ং তাহাদের আবাস স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও দৈনন্দিন অন্যান্য বহুতর কাজ করা ছাড়াও আশ্রমের সীমানার অন্তর্বর্তী ক্ষেত্রে 'অধিক ফসল ফলানো'র প্রচেষ্টায় প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করে। চার একর জমিতে উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ ফসল তাহাদেরই শ্রমের ফল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষাতে বিদ্যার্থীদের পাশের হার ছিল ৯৬%। বি. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে অনার্স লাভ করে ৮ জন, তন্মধ্যে ভূবিদ্যায় একজন ছাত্র প্রথম ও পদার্থবিদ্যায় একজন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। বি. এ. (অর্থনীতি)-তে একজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পায়। একজন ছাত্র প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

আশ্রমের বৃত্তিকরী বিভাগের উৎপাদন বাড়িয়াছে। এই বিভাগের আয় দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যকল্পেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। গোশালায় পশুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩০টি হইয়াছে। ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষে হাত লাগান হইয়াছে। ফল ও সব্জি বাগান এবং চাষ হইতে সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া গিয়াছে।

বুক-ব্যাঙ্কে আলোচ্য বর্ষে ২,০০০ টাকা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক যোগ করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও বিদ্যার্থী আশ্রমে কালীপূজা সরস্বতীপূজা ইত্যাদি নৈমিত্তিক পূজাদি, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের জন্মতিথি এবং ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আশ্রমে শুভ পদার্পণ স্মরণে বার্ষিক উৎসব এবং খ্রীষ্টমাস ঈভও অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশস্ত সভাগৃহে সর্বসাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মীয় আলোচনা হয় এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠান ছায়াছবি প্রদর্শন ইত্যাদিও হয়।

সর্বসাধারণের জন্য পরিচালিত পুস্তকাগার ও নিঃশুল্ক পাঠাগারে বহু সংখ্যক পাঠক পড়িতে আসেন। ৪০০ নূতন বই ও কারিগরী বিদ্যার কিছু বিদেশী সাময়িকীও এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত দান পাওয়া যায় ৪০,৯৬৯ টাকা, তন্মধ্যে ১৮,৪৪০ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৪৫ ভাগের অধিক ছিল প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের দান।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ'। ইহা সরকারী অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত হয়। এই ত্রৈবার্ষিক পলিটেকনিকে ছাত্রেরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। মোট ৪৩০ জন ছাত্রের মধ্যে ৯৬ জন সিভিল, ২৪০ জন মেকানিক্যাল ও ৯৪ জন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা পায়। শিল্পপীঠের দুই জন ছাত্র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শেষ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শিল্পপীঠের নিজস্ব গ্রন্থাগারে ৬,০০০ বই আছে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী শিবেশানন্দ** গত ১১ই অক্টোবর (১৯৭৫) বৈকাল ৪.২৫ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মস্তিষ্কে রক্ত-সংবহনের আকস্মিক বৈকল্যের ফলে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৫ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া ১৯৩১ সালে স্বীয় মন্ত্রগুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ ব্যতীত জামতাড়া কেন্দ্রেও তিনি সংঘসেবা করেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠেই অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বাগবাজার রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদামন্দিরের কার্যবিবরণী (১৯৭৩-৭৫) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২১৫ ও ২২০ এবং মাধ্যমিক বিভাগে ৫৯২ ও ৫৭১। মাধ্যমিক বিভাগটিতে ১৯৭৪-এর জানুআরি হইতে দশ-শ্রেণীর স্কুলের নূতন-পাঠ্যক্রম চালু করা হইয়াছে। 'সঞ্চয়িকা' নামে ছাত্রীদের জন্য একটি ব্যাঙ্ক ১৯৭৪ সালে প্রবর্তিত হয় ও তাহাতে ৩০৪ জন ছাত্রী মোট ৯৩০.২৫ টাকা জমা রাখিয়াছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল: ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ৫৮ ও ৬০ জন পরীক্ষার্থিনীর সকলেই পাশ করে। ১৯৭৪ সালে ৩ জন ছাত্রী দুইটি শাখায় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২য়, ৫ম ও ৯ম স্থান অধিকার করে। অনুরূপভাবে ১৯৭৫ সালে ৪ জন ছাত্রী গৃহস্থালি-বিজ্ঞানে ৫ম, ৭ম, ৮ম ও ১০ম স্থান লাভ করে।

পুস্তকাগার: ৩১।৩।৭৫ তারিখে মোট পুস্তক-সংখ্যা ছিল ৮,৮৫১। উভয় বর্ষে ছাত্রীগণ ১,৭৭৬ ও শিক্ষিকাগণ ১,১৭৬টি পুস্তক ব্যবহার করেন।

শিল্পবিভাগ: ছাত্রী-সংখ্যা বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ৮৮ ও ৯২। লেডী ব্রেবোর্ন সীবনকার্যের ডিপ্লোমা পরীক্ষায় আদ্য মধ্য ও অন্ত্য ফল: ১৯৭৩-এ মোট পরীক্ষার্থিনী ৩৭; উত্তীর্ণ ৩৩। ১৯৭৪-এ উক্ত সংখ্যা যথাক্রমে ৪৩ ও ৩২। ইহাদের অনেকেই পুরস্কারাদি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার পূর্বে আয়োজিত প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের তৈরী শিল্পাদি দ্রব্য বিক্রয় হয় যথাক্রমে ৯,৫৪২.৪৩ ও ১০,২৭২ টাকায়।

সারদামন্দির : ইহা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-নিরতা সন্ন্যাসিনী ও পাঠরতা ছাত্রীদের আবাস। আবাসিক ছাত্রীগণ মন্দিরে সেবা-পূজা ও পাঠ-আলোচনাদিতে অংশগ্রহণ করে ও যাবতীয় গৃহস্থালির কার্য নিজেরাই সম্পাদন করে। ১৯৭৪-এ মোট ৪১ জন ছাত্রীর মধ্যে ৬ জন এবং ১৯৭৫-এ ৩১ জনের মধ্যে ৩ জনের বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মোৎসব, অবতারগণের জন্মতিথি ইত্যাদি যোগ্য সমারোহে পালিত হয়।

উৎসব

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৫-২৭শে এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং রামায়ণ গান পরিবেশন করেন বেতারশিল্পী শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। আলোকচিত্র সহযোগে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী প্রদর্শন পূজা কথামৃতপাঠ ভক্তসম্মেলন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি কর্তৃক গত ১৭ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হইয়াছে। পূজা-অর্চনা ভোগ-রাগ প্রসাদ-বিতরণ ও বক্তৃতাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সর্বশ্রী নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ মাইতি, লক্ষ্মীকান্ত দাস, জীবনকৃষ্ণ দাস ও গৌরীপদ দাস তাঁহাদের ভাষণে ছাত্রছাত্রী ও যুবকদের স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে জীবন গঠন করিতে বলেন। ২০শে জুন ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য সেবাসমিতির শিশু-শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উভয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পিগণ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২৫শে মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মঙ্গলারতি বৈদিক-স্তোত্রপাঠ প্রভাতফেরি শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, প্রায় চারি হাজার ভক্ত নরনারীর মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ, সারাদিনব্যাপী ভজন-কীর্তন ও 'বিবেকানন্দ' ছায়াছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ সমিতি—অনাথভাণ্ডার কর্তৃক গত ১লা জুন ১৯৭৫ বহুবাজার-স্থিত ভাণ্ডার-গৃহে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে পূজা চণ্ডীপাঠ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের *নামগান সানাই-সঙ্গীত ও প্রসাদবিতরণ হয়।* অপরাহ্ণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী চিৎসুখানন্দ শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য জীবন ও উপদেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভায় ধন্যবাদ প্রদান করেন সমিতির সভাপতি শ্রীঅশোক কুমার দাস। সন্ধ্যার পর বহুবাজার মিলন চক্র রামকৃষ্ণ-গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন।

কসবা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সংঘ কর্তৃক গত ৯ই জুন ফলহারিণী কালিকাপূজা দিবসে সংঘের রথতলা আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'ষোড়শীপূজা' স্মরণে যথারীতি উৎসব-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে সংঘের সভ্যগণ ছাড়াও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বহু ভক্তের উপস্থিতিতে পূজা পাঠ ভজনাদি হয় এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 'ষোড়শীপূজা'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। পরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তেজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত শ্রাবণ মাসে গুরুপূর্ণিমা উৎসব ভক্তি-সঙ্গীত কথামৃত-পাঠ বিশেষ পূজা প্রসাদ-বিতরণ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা আশ্বিন। (১৩০৬ সাল) [১৭শ সংখ্যা।]

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

পালজাহাজ ও যুদ্ধজাহাজ

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের সিভিল্ ওয়ারের সময়, ঐকরাজ্য-পক্ষেরা একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল, সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিলো। বিপক্ষের গোলা, তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগ্‌লো, জাহাজের কিছুই বড করতে পাল্লে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে যোডা হতে লাগ্‌লো, যাতে দুষ্‌মনের গোলা কাষ্ঠভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়্‌তে চ'ল্‌লো। তা-বড তা-বড় তোপ ; তোপ যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাস্‌তে, ছুঁড়তে হয় না—সব কলে। পাঁচশ লোকে যাকে একটুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ একটা ছোট ছেলে, কল টিপে, যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্ছে, নাবাচ্ছে ও ঠাস্‌ছে, ভর্‌ছে, আওয়াজ কর্‌ছে, আবার তাও চকিতের ন্যায়। যেমন জাহাজের লোহার দেল মোটা হতে লাগ্‌লো, তেমনিই সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চ'ল্‌লো। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের দেলওয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড জাহাজই হন্ না, ফেটে চুটে চৌচাকলা। তবে এই "লুয়ার বাসর ঘর," যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবে নি ; এবং যা, "সতোনি পর্ব্বতের" ওপর না দাঁড়িয়ে ৭০ সত্তর হাজার পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, — ইনিও 'টরপিডোর' ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্চেন কতকটা চুরটের চেহারা একটী নল ; তাঁকে তিগ করে ছেড়ে দিলে, তিনি জলের মধ্যে মাছের মত ডুবে ডুবে চলে যান। তার পর, যেখানে লাগ্‌বার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, অমনি তার মধ্যের রাশীকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থ সকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফারণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্ত্তিটা হয়, তাঁর 'পুনর্মূষিকো ভব,' অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাঠ কুঠরত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিনমন। মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পডে যায়, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রায় "কিমা"তে পরিণত অবস্থায়। এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈয়ার হওয়া অবধি, জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয় না। দু একটা লড়াই, আর একটা বড জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে লডাই হবার পূর্ব্বে, লোকে যেমন ভাব্‌তো, যে দু পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম্ সব উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু নয়।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি

* শ্রাবণ, ১৩৮২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে ত, উভয় পক্ষের ফৌজ ম'রে দু মিনিটে ধূন্ হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগ্‌তো ত, উভয় পক্ষের জাহাজের নাম নিসানাও থাক্‌তো না। আশ্চর্য্য এই যে, যত তোপ বন্দুক উৎকর্ষ লাভ কর্‌ছে, বন্দুকের যত ওজন হাল্‌কা হচ্ছে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটি হচ্ছে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্ছে, যত ভর্‌বার ঠাস্‌বার কল কব্জা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্ছে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্ছে। পুরাণো ঢঙ্গের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দো ঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ কর্‌তে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিযে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদ্‌মি, অব্যর্থসন্ধান। আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ ক'রে খালি হাওয়া গরম করে। অল্প স্বল্প কল কব্জা ভাল। মেলা কল কব্জা মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি ক'রে, জড়পিণ্ড তৈয়ার করে। কারখানায় যে লোকগুলো কায করে, তারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই এক ঘেয়ে, একটা জিনিষের এক টুক্‌রো গড়্‌ছে। পিনের মাথাই গড়্‌ছে, সুতোর যোড়াই দিচ্ছে, তাঁতের সঙ্গে এগু পেছুই কচ্ছে, আজন্ম। ফল, ঐ কাযটিও খোয়ান, আর তার মরণ—খেতেই পায় না। জড়ের মত এক ঘেয়ে কায কর্ত্তে কর্ত্তে, জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুল মাষ্টারি, কেরানিগিরি ক'রে, ঐ জন্যই হস্তীমূর্খ জড়পিণ্ড তৈয়ার হয়।

যাত্রী জাহাজ।

বাণিজ্য এবং যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙ্গের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য জাহাজ এমন ঢঙ্গে তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু চারটা তোপ বসিয়ে, অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়া হুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়; তথাপি সাধারণগুলি সমস্তই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বল্লেই হয়। আমাদের দেশের ও ইউরোপের বাণিজ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি, আই, এস্, এন্, কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম ফরাসি, অষ্ট্রিয়া লয়েড, জর্ম্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি এণ্ড ও কোম্পানির যাত্রী জাহাজ সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী, লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য। এবার আমরা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদ্‌মি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলো। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে, যে কোনও কালা আদ্‌মি এমিগ্রাণ্ট আফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্ছি, কেউ আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে কোথাও বেচ্‌বার জন্য বা কুলি করবার জন্য নিয়ে যাচ্ছে না, এইটী তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় "নেটিভ্।"
নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে, অর্থাৎ যে কেউ "নেটিভ্" বাহিরে যাচ্ছে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত অমুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব

নেটিভ্। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সব এক জাত—"নেটিভ"। কুলির আইন কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল "নেটিভের জন্য"। ধন্য ইংরেজ সরকার! এক ক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব "নেটিভের" সঙ্গে সমত্ব বোধ কল্লেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোর দায়ে ধরা পড়েছি। এখন সকল জাতির মুখে শুনছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য্য। তবে পরস্পরের মধ্যে মত ভেদ আছে, কেউ চার পো আর্য্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা, তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য। আর শুনি ওঁরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই, ওঁরা কালা আদ্‌মি নন্। এদেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মত। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্ত্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা, পরদা, ইত্যাদি ইত্যাদি ও সব ওঁদের ধর্ম্মে আদৌ নাই। ও সব ঐ কায়েৎ ফায়েতের বাপ দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্ম্মটা ঠিক ইংরেজদের মত। ওঁদের বাপ দাদা ঠিক ইংরেজদের মত ছিল, কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কাল হয়ে গেল! এখন এসনা এগিয়ে? সব "নেটিভ", সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন,—ও সব "নেটিভ্"। সেজে গুজে বসে থাকলে কি হবে বল? ও টুপি টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বল? যত দোষ হিন্দুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁসে দাঁড়াতে গেলে, লাথি ঝাঁটার চোট্‌টা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরাজরাজ! তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ত হয়েছেই, আরও হোক্ আরও হোক্। কপ্‌নি ধুতির টুক্‌রো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু পায়ে শুধু মাথায় হিল্লি দিল্লি যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়্‌লেই, দিশি ধর্ম্ম ছাড়্‌লেই, দিশি চাল চলন ছাড়্‌লেই, ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম; কর্ত্তেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ,—পালা পালা, সাহেবিতে কায নেই, নেটিভ কব্‌লা! "সাধ করে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত"। ধন্য ইংরাজ সরকার! তোমার "তক্‌ৎ তাজ্ অচল রাজধানী" হউক। আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোক্‌বামাত্রই বল্লে, "ও চেহারা এখানে চলবে না"। মনে কল্লুম, বুঝি পাগড়ি মাথায়, গেরুয়া রঙ্গের বিচিত্র ধোকড়া মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে, নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরাজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি—ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইউরোপি পোষাক পর্‌লেই মুস্কিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধর্‌লুম। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, "অমুক জিনিসটা দাও"; বল্লে "নেই"। "ঐ যে রয়েছে"; "ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্ছে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই"। "কেন হে বাপু"? "তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।" তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মত ভাল লাগ্‌তে লাগ্‌লো। যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি। বলে "ছুঁচোর গোলাম

চামচিকে তার মাইনে চোদ্দ সিকে।" একটা ডোম বল্‌ত "আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌ম্‌!" কিন্তু মজাটী দেখেছ? এই জাতের বেশী বিটলামি-গুলো—যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

(পুনঃ) যাত্রী জাহাজ।

বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলাণ্টিক পারাপার করে, তার এক একখান আমাদের এই গোলকোণ্ডা জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে ক'রে জাপান হতে পাসিফিক্ পার হওয়া গিয়েছিলো, তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মধ্যখানে প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী ও "ষ্টীয়ারেজ" এদিকে ওদিকে। আর এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। "ষ্টীয়ারেজ" যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে যত খুব গরীব লোক যায়, যারা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ কর্ত্তে যাচ্ছে। তাদের থাকবার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাহাদের ষ্টীয়ারেজ নাই, তবে ডেক যাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায় তারা বসে শুয়ে যায়। তা দূর দূরের যাত্রায় ত একটীও দেখ্‌লুম না! কেবল ১৮৯২ খৃঃ অব্দে চীনদেশে যাবার সময় বম্বে থেকে কতকগুলি চীনি লোক বরাবর হংকং পর্য্যন্ত ডেকে গিয়েছিলো। [ক্রমশঃ]

রামানুজচরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরাপ্রভাব।

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

আর এক পরিচ্ছেদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

মনে করিয়াছিলাম, 'আমার তিব্বত ভ্রমণের এক পরিচ্ছেদ' এক পরিচ্ছেদেই শেষ করিব। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের অনুমতি লঙ্ঘন করিতে সাহসী না হওয়ায় উহার পরিশিষ্টস্বরূপ গুটিকতক কথা বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। পাঠকবর্গের সহিত ছাংরু হইতে বিদায় লইয়াছি—এই ছাংরুতে ৩৪ দিন কাটিল। পাধান মাঝে মাঝে আসেন, খবর নেন। তিনি বলিলেন, আপনারা একটু আগে যান, আমি শীঘ্রই আপনাদের গিয়া ধরিব। আমরা মনে করিলাম, পাধানের সঙ্গে যাওয়াই ভাল। সুতরাং রহিয়া গেলাম। [ক্রমশঃ]

---

* কার্ত্তিক, ১৩২২ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

দিব্য বাণী

ধন্যাস্ত এব ভুবি ভক্তিপরাস্তবাঙ্ঘ্রৌ
ত্যক্ত্বান্যদেবভজনং ত্বয়ি লীনভাবাঃ।
কুর্বন্তি দেবি ভজনং সকলং নিকামং
জ্ঞাত্বা সমস্তজননীং কিল কামধেনুম্ ॥

—দেবীভাগবত, ১।৭।৪০

হে দেবি! ত্যজিয়া অন্য দেবদেবী তোমাতে স'পিয়া মন,
তোমারি চরণ-চারুশতদল ক'রি অবলম্বন,—
নিখিল ভুবন-শরণদায়িনী সবার জননীরূপা
সকল কামনা পূরণ করিয়া করিছ সবারে কৃপা—
জানি' অবিরাম ভজনে তোমার নিরত যাঁহারা র'ন,
সুখদুখভরা এই ধরণীতে তাঁরাই ধন্য হন।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিদায়িনী

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের সুপ্রসিদ্ধ নেতা কেশবচন্দ্র সেন যখন ভক্তসঙ্গে বেলঘরিয়ায় একটি উদ্যানে ব্রহ্মোপাসনায় নিরত ছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন তাঁহাকে দেখিতে যান। তাহার পর হইতে কেশবচন্দ্রও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ইহার ফলে কেশবচন্দ্রের উপাসনার ধারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। পূর্বে তিনি ও তাঁহার সম্প্রদায় খোল-করতালসহ ব্রহ্মনাম করিতেন—উপনিষদের ব্রহ্মকে পিতৃভাবেই উপাসনা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আলাপ-পরিচয়ের ফলে তাঁহারা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নাম ও হরিনাম খোল-করতালসহ কীর্তন করিতে আরম্ভ করেন।

কথামৃত পাঠ করিলে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে কেশবকে মাতৃ-উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। পৌর্ণমাসীর এক সন্ধ্যায় কেশব সদলবলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্দর্শনে আসিয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপাসনা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও কয়েকটি কথা বলেন এবং কেশব ও তাঁহার ভক্তগণ ওই কথাগুলির আবৃত্তি করেন। উহাদের মধ্যে একটি কথা: 'ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম।' উহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন: 'যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আমি মা বলি; মা বড় মধুর নাম।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—ওই কথাগুলি তিনি কেশবচন্দ্রকে মাঝে মাঝে বলিতেন; কেশবও তাঁহার অনুরাগী হইয়া দক্ষিণেশ্বরে খুব আসিতেন এবং ক্রমে অনেক পরিবর্তিত হইয়া যান ও কালী মানিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতেও দেখা যায় শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে বলিতেছেন:

> এত কাল পিতা বলি কি কাজ করিলে।
> এইবার ডাক তুমি ব্রহ্মময়ী বলে॥

শ্রীযুত কেশবও—

> মূর্তিমতী শক্তি দেখি আনন্দের ভরে।
> আনন্দময়ীরে ডাকে সমাজ-মন্দিরে॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু যে কেশবচন্দ্রকেই কালী মানাইয়াছিলেন তাহা নহে, অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া নরেন্দ্রনাথকে কালী মানাইয়াছিলেন—নরেন্দ্রনাথ যেদিন কালীকে মানেন, সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আনন্দের অবধি ছিল না। স্বীয় গুরু দশনামী সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরীকেও তিনি কালী মানাইয়া ছাড়িয়াছিলেন। আরও কতজনকে যে তিনি অনুরূপভাবে আদ্যাশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা কে বলিবে! পূর্বোক্ত তিন জন বিশিষ্ট পুরুষের কথা সুপ্রসিদ্ধ বলিয়াই গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

কেশবচন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন: 'মাকে বাদ দিয়ে বাপকে ধরা যায় না। মা-ই বাপকে দেখিয়ে দেবেন চিনিয়ে দেবেন, তবে তো হবে!' কথাগুলি অমূল্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, এই স্থূল বাহ্য জগতে যেমন সব নিয়ম আছে, সূক্ষ্ম অন্তর্জগতেও—আধ্যাত্মিক রাজ্যেও—ঠিক সেই রকম সব ব্যবস্থা আছে।

এই কারণেই শিবকে জানিতে হইলে শক্তির—নারায়ণকে পাইতে হইলে তৎশক্তি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণ গ্রহণ প্রয়োজন। আচার্য রামানুজ তাঁহার 'শরণাগতিগদ্যে' ইহা অতি

সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীপতির কৈঙ্কর্য-লাভের জন্য তিনি প্রথমেই শ্রী-দেবীর পাদপদ্মে নিবেদন জানাইতেছেন: নিত্যদাস্যপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অনন্যশরণা-গতি আমার চিত্তে যাহাতে অবিরত অবিচলভাবে বিদ্যমান থাকে, এই উদ্দেশ্যে আমি একান্তভাবে শ্রীভগবানের অনুরূপ অসংখ্যকল্যাণগুণগণযুক্তা পদ্মবনালয়া অখিলজগন্মাতা অশরণশরণ্যা ভগবতী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি, ইত্যাদি। প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর উক্তি: আমার আশীর্বাদে তোমার চিত্তে তোমার প্রার্থিত শরণা-গতির ভাব অবিরত বিদ্যমান থাকুক। তাহার দ্বারাই তোমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

এইরূপ বিশদভাবে না হইলেও আচার্য নিম্বার্করচিত 'দশশ্লোকী'র পঞ্চম শ্লোকে শ্রীরাধিকার বর্ণনায় **'অনুরূপসৌভগাম্'** ও **'সকলেষ্টকামদাম্'** এই দুইটি বিশেষণ-পদে ওই ভাবেরই ব্যঞ্জনা রহিয়াছে—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়ই সমভাবে গুণান্বিতা; অধিকন্তু সর্বাভীষ্টদায়িনী, অর্থাৎ তিনি সাধকের সকল বাঞ্ছাপূরণকারিণী—কৃষ্ণভক্তিও তাঁহারই করুণায় লভ্যা।

উপনিষদেও আমরা এই তত্ত্ব বিবৃত দেখি। যক্ষকে—যজনীয় ব্রহ্মকে—দর্শন করিয়াও দেবগণের প্রতিনিধি অগ্নি ও বায়ু তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ইন্দ্রেরও প্রায় একই অবস্থা। কিন্তু তিনি দেবরাজ—অধিকতর সাধনবলসম্পন্ন। হয়তো বা তিনি শক্তি-উপাসক—উপনিষদটির ইঙ্গিত এই-রূপই মনে হয়। এইজন্য, অথবা কারণ যাহাই হউক, আমরা দেখি 'বহুশোভমানা উমা হৈমবতী' ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে যক্ষের স্বরূপ জানাইয়া দিলেন। শরণাগত জিজ্ঞাসু দেবরাজ ব্রহ্মকে জানিলেন উমারই কৃপায়—সেই উমা, যিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত নিত্যযুক্তা বলিয়া তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিতে সমর্থা*, সেই উমা—

> 'শান্তপূতা হিমগিরিসুতা
> শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর
> জননী যে সর্বভূতে স্থিতা…
> কৃপা যাঁর সত্যের দুয়ার
> খুলি এক বহুতে দেখায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অদ্ভুতা-নন্দজী বলিয়াছিলেন: "কালী দুর্গা প্রভৃতি 'বিদ্যা'—এঁরা শিবের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন…সীতা রামের কাছে সকলকে পাঠিয়ে দিতেন।" ইহাও পূর্বোক্ত ধরনেরই কথা। সীতা রামময়জীবিতা—সুতরাং তাঁহার শরণ লইলে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালাভ যে সহজ হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। বাহ্যজগতে আমরা দেখি মায়ের স্নেহ-করুণা পিতার অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জগতেও ইহা সমভাবে সত্য।

যে-তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার অক্ষম প্রয়াসে এত কথার অবতারণা, সেই তত্ত্ব শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে কিভাবে রূপায়িত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই আমরা অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীমা তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবেই দত্তচিত্ত হইতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন, ইহা আমরা তাঁহার জীবন-চরিতে বারংবার লক্ষ্য করি। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

জয়রামবাটীতে একজনকে দীক্ষাদানের পর শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনিই গুরু।' শিষ্যটি প্রশ্ন করিলেন, 'মা, আপনি তো বললেন, ঠাকুর গুরু; তাহলে আপনি কে?' শ্রীশ্রীমায়ের উত্তর: 'বাবা, আমি কিছুই না—ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট।'

---

* 'হৈমবতী নিত্যম্ এব সর্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ততে ইতি জ্ঞাতুং সমর্থা'—কেনোপনিষদ্‌ভাষ্যে আচার্য শংকর।

একদিন জনৈক ভক্তকে কুশলপ্রশ্ন করিলে তিনি যেই বলিলেন, 'মা, আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি', তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমা তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের ওই এক বড দোষ। সব কথায় আমাকে যোগ দাও কেন? ঠাকুরের নাম করতে পার না? যা কিছু দেখছ, সব ঠাকুরের।'

জনৈক শিষ্যের প্রশ্ন: 'মা, উপাসনার সময়ে ঠাকুরের নাম জপ করার কি দরকার?' শ্রীশ্রীমা: 'হ্যাঁ, তা করবে।' শিষ্য: 'কেন তার কি দরকার? তুমি আর ঠাকুর তো এক।' এই কথায় শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উত্তর দিলেন: 'না, না, এক হলেও আমি কখনও ঠাকুরকে ছাড়তে বলতে পারি না।'

শ্রীশ্রীমায়ের জনৈকা শিষ্যা ও তাঁহার সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমাকে বলেন, 'মা, আমাদের কি হবে?' মা বলিলেন, 'ঠাকুরকে ডাকো।' তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'আমরা তো ঠাকুরকে দেখি নি, আমরা আপনাকে জানি।' মা: 'তোমরা কি আমায় ডুবে মরতে বলো?—যেমন, একজন "জয় গুরু" ব'লে গুরুনামে বিশ্বাস ক'রে নদী পার হয়ে গেল। গুরু তা দেখলেন। দেখে ভাবলেন, "আমার নামের এত জোর!" তিনি "আমি, আমি" ক'রে জলে নামলেন, পরে ডুবে মরলেন!'

জনৈক সেবককে শ্রীশ্রীমা জীবের দুঃখে শ্রীশ্রীঠাকুরের দুঃখ, জীবোদ্ধারের জন্য তাঁহার বারংবার দেহধারণ করিয়া অশেষ দুঃখকষ্ট বরণের কথা বলিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া সেবকটি বলিলেন, 'খালি ঠাকুরের কেন মা, আপনারও তো! ঠাকুর আর আপনি তো এক।' মা উত্তর দিলেন, 'ছিঃ ওকথা বলতে আছে, বোকা ছেলে! আমি যে তাঁর দাসী।...সব ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই।'

এই ধরনের আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা হইতেই আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই গুরু, ইষ্ট বা অবলম্বনীয় আদর্শরূপে ভক্তসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া স্বয়ং নেপথ্যে থাকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অন্য কথায় বলা যায়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণভক্তি-দায়িনীর ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকারিবিশেষের জন্য তিনি আপন স্বরূপ প্রকটিত করিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার ভূমিকা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিদাত্রীর।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য অক্ষয়কুমার সেন তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী' বলিয়া বারংবার শ্রীশ্রীমায়ের বন্দনা গাহিয়াছেন। এই বন্দনার একটু ইতিহাস আছে। ১৮৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ আমেরিকাতে পাঠ করিয়া দেখেন যে, উহার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ হিসাবে 'গুরুবন্দনা' ও 'ভক্তবন্দনা' শীর্ষক দুইটি পরিচ্ছেদে কোথাও শ্রীশ্রীমায়ের কোনও উল্লেখ নাই। তখন তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত একটি পত্রে পুঁথিখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেও ইহাও মন্তব্য করেন যে, গ্রন্থটির প্রথমে শক্তির বন্দনা না থাকায় 'মহাদোষ' হইয়াছে এবং পরবর্তী সংস্করণে যেন এই ত্রুটি দূর করা হয়। ফলতঃ দেখা যায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডে 'গুরুমাতা-বন্দনা'-পরিচ্ছেদের পর হইতে অন্তিম পঞ্চম খণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরেই শ্রীশ্রীমায়ের বন্দনা সংযোজিত হইয়াছে। বহু বন্দনাতেই নিম্নোদ্ধৃত পয়ার দৃষ্ট হয়:

জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥

শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী। প্রশ্ন উঠিতে পারে, সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই তো শরণ লওয়া যাইতে পারে—শ্রীশ্রীমায়ের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বলা যায়: প্রয়োজন না থাকিতে

পারে, যদি হিম্মত থাকে! 'আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী' ইত্যাদি কথা বলা সহজ, শুনিতেও ভাল, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলি অন্তঃসারশূন্য কথা—ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তুলনামূলক বিচারের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন মানুষ—কঠোর তাঁহার শাসন। সিংহ-ব্যাঘ্রদেরই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, পিপীলিকা-শ্রেণীকে নহে। একেবারে নিখুঁত না হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাহাকেও সহজে আমল দিতেন না। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, তিনি কাহারও এতটুকু বেচাল দেখিতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীও বলিয়াছিলেন: 'মাকে ডাকবে। তাহলেই সব হয়ে যাবে। ঠাকুর কিন্তু বড় তুষ্টু। একেবারে ঠিক ঠিক না হলে তাঁর কৃপা হয় না। মা—বড় ভাল।'

মনে রাখিতে হইবে কামারহাটির দরিদ্রা ব্রাহ্মণী পরমযোগিনী সিদ্ধা 'গোপালের মা' ভক্তগণ-প্রদত্ত অযাচিত নিত্যপ্রয়োজনীয় সামান্য কয়েকটি জিনিস গ্রহণ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেও নিষ্কৃতি দেন নাই, খুবই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া 'গোপালের মা' বলরাম মন্দিরে গৃহীত দ্রব্যগুলি দক্ষিণেশ্বরেই বিলাইয়া দিতে চাহিলে শ্রীশ্রীমা অপার মমতায় বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন: 'উনি বলুনগে। তোমার দেবার ত কেউ নেই, তা তুমি কি করবে মা—দরকার বলেই ত এনেছ।'

সুতরাং আমরা যদি নিখুঁত না হই, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে শরণ লওয়ার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীশ্রীমা মাতৃভাব প্রচারের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির পর সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কাল স্থূলদেহে ছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন হইলেও লীলায় ভেদ, উপাসনায় ভেদ স্বীকার করিতেই হয়। লীলার কোনও অংশ বাদ দেওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীশ্রীমা আপন মহিমায় নিত্য বিরাজিতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী মাত্রেরই ইহা সহজে ধারণায় আসে। মহাকালের অমোঘ বিধানে স্থূলে সেই লীলার সমাপ্তি ঘটিলেও, সূক্ষ্মে উহা অদ্যাপি অব্যাহত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণভক্তিদায়িনীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের অনন্য ভূমিকা অগণিত বহুজনকে কৃতার্থ করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য আবির্ভাব-তিথি স্মরণে তাঁহার ভুবনপাবন শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া আমরা আমাদের ভক্তি-প্রণতি জানাই:

'রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥'

অকাতরে দিতে কাতরে অভয় করুণারূপিণি এলে মা ধরায়।
অহেতু কৃপায় জীব-দুখনাশে অশেষ যাতনা সহিলে হেলায়॥
প্রাণ মন কায় রামকৃষ্ণ-পায়, তনয়ের প্রতি পূর্ণ করুণায়।
অযাচিতে কৃপা বিতরিলে সদা পাপী তাপী সাধু অসাধু সবায়॥
অদ্বৈত-বিজ্ঞান বেঁধেছ অঞ্চলে, ইষ্টের দর্শন ইচ্ছামাত্র মিলে,
তবু লক্ষ মন্ত্র দিনান্তে জপিলে নহবতে বসি' সন্তান-মঙ্গলে।
অকাম প্রার্থনা 'ভক্তি-নির্বাসনা' শিখালে মা তুমি অবোধে কৃপায়,
তাই শুধু চাই নাশ গো বাসনা, অচলা ভকতি দাও রাঙ্গা পায়॥

—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : ন চ আত্মাভিন্নায়াঃ অজ্ঞাননিবৃত্তে র্জ্ঞানসাধ্যত্বানুপপত্তিঃ। যস্মিন্ সতি যস্য অগ্রিমক্ষণসম্বন্ধঃ, অসতি যস্মিন্ যস্য অভাবঃ তৎ তৎসাধ্যম্ ইতি সাধ্য-লক্ষণস্য—জ্ঞানে সতি অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপাত্মনঃ অগ্রিমক্ষণসম্বন্ধঃ, জ্ঞানাভাবে অজ্ঞান-নিবৃত্ত্যভাবঃ অজ্ঞানম্ ইতি—অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপাত্মনি সত্ত্বোপপত্তেঃ, ভিন্নসত্তাকয়ো র্ভাবাভাবয়ো র্বিরোধাভাবাৎ চ। নিত্যসিদ্ধায়াম্ অপি অজ্ঞাননিবৃত্তৌ সাধ্যত্বভ্রান্ত্যা বা পুরুষপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেশ্চ 'প্রপঞ্চোপশমং (শান্তং) শিবম্' (মা. উ. ৭) ইত্যাদি শ্রুত্যা তস্য আত্মাভেদসিদ্ধেশ্চ সর্বথা অপি অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ-প্রয়োজনসম্ভবেন স্তোত্রারম্ভঃ যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। ঈড়ে স্তৌমি ইতি অর্থঃ। ১।

ননু ব্রহ্ম স্বস্মাৎ অন্যৎ জগৎ আরভতে, উত ব্রহ্ম এব জগৎ জায়তে? ন আদ্যঃ, দ্বৈতাপত্তেঃ। একস্য নিরবয়বস্য আরম্ভকত্বানুপপত্তেঃ চ। দ্বিতীয়ে তু ব্রহ্ম সর্বাত্মনা জগদাকারং ভবতি, একদেশেন বা? ন আদ্যঃ, মুক্তানাং প্রাপ্যস্থলাভাবপ্রসঙ্গাৎ। নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মণঃ এব মুক্তপ্রাপ্যত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, ব্রহ্মণঃ নিরবয়বত্বাৎ। সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ, 'নিষ্কলম্' ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাৎ চ—ইতি আশঙ্ক্য 'নিরংশেঽপ্যং-শমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ। তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী'॥ (পঞ্চদশী ২।৫৮) ইত্যাদি ন্যায়েন উত্তরম্ আহ—

মূলস্তোত্রম্ :

যস্যৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ
প্রাদুর্ভূতং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্থম্।
যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং সুখদুঃখৈ
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥২॥

যস্য ইতি। যস্য পরমাত্মনঃ **একাংশাৎ**, একদেশতুল্যাৎ মায়াবচ্ছিন্নাৎ। **ইত্থং** ভোক্তৃভোগ্যাকারেণ **এতৎ** অনুভূয়মানং **জগৎ প্রাদুর্ভূতম্** উৎপন্নম্ ইতি অর্থঃ। ব্রহ্মণঃ বস্তুতঃ নিরবয়বত্বে অপি মায়াবচ্ছেদেন অনির্বচনীয়াংশত্বাৎ একদেশাৎ এব ইদং জগৎ উৎপন্নম্। তথা চ শ্রুতিঃ—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' (ঋগ্বেদ, ১০।৯০।৩) ইতি। অস্যাঃ চ অয়ম্ অর্থঃ—বিশ্বা ভূতানি ব্রহ্মাণ্ডাত্মকং সকলম্ ইদং জগৎ ইতি যাবৎ। তস্য ব্রহ্মণঃ পাদঃ অংশঃ ইতি অর্থঃ। ত্রিপাৎ

পাদত্রয়ম্ অস্য ব্রহ্মণঃ অমৃতং মোক্ষরূপং দিবি স্বপ্রকাশাত্মনি স্বরূপে এব বর্ততে। ন প্রপঞ্চসম্বন্ধঃ তত্র অস্তি ইতি অর্থঃ। ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চসম্বন্ধরহিতপ্রদেশঃ শ্রীবাদরায়ণেন অপি সূত্রিতঃ— 'বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিম্ আহ' (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।১৯) ইতি। বিকাররূপেণ অবর্তমানং ব্রহ্মণঃ ভাগত্রয়ম্ অস্তি। তথাহি-স্থিতিম্ অবস্থানং ব্রহ্মণঃ আহ উক্তা শ্রুতিঃ ইতি সূত্রার্থঃ*। তথা চ উক্তপ্রকারেণ ব্রহ্মণঃ জগদাকারেণ অবস্থানে অপি ন মুক্তপ্রাপ্যস্থলাঽভাব-শঙ্কা ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ : [আত্মার সহিত অভিন্ন অজ্ঞান-নিবৃত্তির জ্ঞানসাধ্যত্ব অনুপপন্ন, ইহাও বলা যায় না (অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহাও বলা যায় না।) কারণ, যাহা থাকিলে অন্যটির অগ্রিম-ক্ষণ-সম্বন্ধ থাকে (অর্থাৎ যে-বস্তুটি থাকিলে তাহার অব্যবহিত পরক্ষণে অন্য যে-বস্তুটি থাকিবেই) এবং যাহা না থাকিলে অন্যটিরও অভাব হয় (অর্থাৎ যাহা না থাকিলে অন্য যে-বস্তুটি থাকিতেই পারে না), তাহাই (সেই অন্যটিই) পূর্বোক্তের সাধ্য—ইহাই সাধ্যত্বের লক্ষণ। (অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ আত্মাতেও এই সাধ্যত্ব-লক্ষণের সমন্বয় কিভাবে হয়, তাহা দেখান হইতেছে) জ্ঞান থাকিলে অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ আত্মার অগ্রিম-ক্ষণ-সম্বন্ধ অর্থাৎ সমকালীন বিদ্যমানতা থাকে, জ্ঞানের অভাব হইলে অজ্ঞান-নিবৃত্তিরও অভাব হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। অতএব অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ আত্মাতে পূর্বোক্ত সাধ্যত্ব-লক্ষণ সমন্বিত হয়। (বিশেষতঃ) অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ আত্মার সত্তার স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট ভাব ও অভাবের (একই অধিকরণে যে) বিরোধ (তাহাও এখানে) নাই।

(আরও দেখ—) অজ্ঞান-নিবৃত্তি আত্মাতে নিত্যসিদ্ধ হইলেও (কারণ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাতে অজ্ঞান কোনও কালেই নাই) তাহাতে সাধ্যত্ব-ভ্রান্তিবশতঃ (অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্য) পুরুষের প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় (অর্থাৎ ভ্রান্তিবশতই লোকে আত্মাতে অজ্ঞান অনুভব করিয়া থাকে এবং সেই অজ্ঞান দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হয়)। 'মঙ্গলময় ব্রহ্ম প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারাও অজ্ঞান-নিবৃত্তি আত্মাসহ অভিন্ন, ইহাই সিদ্ধ হয়। (সুতরাং) সর্বপ্রকারেই দেখা গেল অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সম্ভব, অতএব স্তোত্রারম্ভ যুক্তিযুক্তই বটে—ইহাই ভাবার্থ।]

ঈড়ে—স্তুতি করি, ইহাই অর্থ। ১।

[(শঙ্কা) : ব্রহ্ম কি নিজ হইতে ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন অথবা ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হন? প্রথম বিকল্পটি হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি হয় (অর্থাৎ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাঘাত হয়)। (আরও) এক নিরবয়ব ব্রহ্মের আরম্ভকত্ব অনুপপন্ন হয়।†

* ব্রহ্মের বিকারাতীত নির্গুণ স্বরূপ বিদ্যমান। 'চ'-শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের বিকারমাত্রবিষয়ক রূপও সূচিত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম কেবলমাত্র সোপাধিকই নহেন, নিরুপাধিকও। ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ অবস্থাই—'এতবান্ অস্য মহিমা... ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' এই শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই সূত্রটির সম্পূর্ণ অর্থ। টীকাকার আংশিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

† কোনও কার্য একটিমাত্র কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম এক, বিশেষতঃ নিরবয়ব। সুতরাং ব্রহ্ম কখনও জগদ্রূপ কার্যের কারণ বা জনক হইতে পারেন না।

দ্বিতীয় বিকল্পে (প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে) ব্রহ্ম কি তাঁহার সর্বদেশেই (সর্বাংশেই) জগদাকার ধারণ করেন, অথবা একদেশে (এক অংশে)? প্রথমটি (অর্থাৎ ব্রহ্মের সার্বিক পরিণাম) হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মুক্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য স্থলের অভাব হইবে (অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অবশিষ্ট না থাকায় মুক্ত পুরুষগণ তুরীয় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারিবেন না), কারণ নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই মুক্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য স্থল। দ্বিতীয় কল্পও সঙ্গত নহে (অর্থাৎ ব্রহ্মের এক অংশ জগদাকার ধারণ করে এই কথাও হইতে পারে না), কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব। সাবয়ব হইলে ব্রহ্মের অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ হইবে, * এবং 'ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ নিরবয়ব' ইত্যাদি শ্রুতিসহ বিরোধও উপস্থিত হইবে। —এই শঙ্কার উত্তরে]

'ব্রহ্ম তাঁহার সর্বাংশে অথবা একাংশে জগদাকার ধারণ করিয়াছেন, এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী পুরুষের প্রশ্নের উত্তরে নিরংশ ব্রহ্মেতে অংশ আরোপ করিয়া শ্রোতৃহিতৈষিণী শ্রুতি তদনুরূপ উত্তরই প্রদান করিয়া থাকেন' ইত্যাদি যুক্তি (ন্যায়) অবলম্বনপূর্বক আচার্য উত্তর দিতেছেন : (মূলস্তোত্র, শ্লোক ২—৬১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয় : যস্য একাংশাৎ ইত্থম্ এতদ্ অশেষং জগৎ প্রাদুর্ভূতং, যেন পুনঃ ইত্থং পিনদ্ধং, যেন ব্যাপ্তং, যেন সুখদুঃখৈঃ বিবুদ্ধং, তং সংসার-ধ্বান্তবিনাশং হরিম্ ঈড়ে । ২।

অনুবাদ : যাঁহার এক অংশ হইতে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা (এই জগৎ) দৃঢ়রূপে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত, সুখদুঃখপূর্ণ সমগ্র জগৎ যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত, সংসারের কারণীভূত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ-কারী সেই হরিকে আমি বন্দনা করি । ২।

(টীকা): **যস্য** ইতি— যে পরমাত্মার **একাংশাৎ**—একদেশতুল্য মায়াবচ্ছিন্ন রূপ হইতে **ইত্থং** ভোক্তৃভোগ্যাকারে **এতৎ**—এই অনুভূয়মান **অশেষং জগৎ প্রাদুর্ভূতং**—সমগ্র জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই অর্থ।

[ব্রহ্ম বস্তুতঃ নিরবয়ব হইলেও মায়ারূপ অবচ্ছেদে তাঁহার অনির্বচনীয় অংশ স্বীকৃত হয়, সুতরাং ব্রহ্মের (মায়িক) এক অংশ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে (এইরূপ বুঝিতে হইবে)। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ আছে, যথা—'এই বিশ্ব ও সর্ব প্রাণী ব্রহ্মের এক পাদস্বরূপ। ইহার (অবশিষ্ট) তিন পাদ অমৃতস্বরূপ। তাহা প্রকাশমান (স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত)।' এই শ্রুতির অর্থ এইরূপ—নিখিল ভূতসমূহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক এই সমগ্র জগৎ এই ব্রহ্মের একপাদ অর্থাৎ এক অংশ মাত্র। এই ব্রহ্মের অপর ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ মোক্ষস্বরূপ দ্যুলোকে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপে বিদ্যমান। সেখানে (আত্মস্বরূপে) প্রপঞ্চের কোন সম্বন্ধই নাই, ইহাই অর্থ। শ্রীবাদরায়ণও (ব্রহ্মসূত্রে) সূত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মের প্রপঞ্চসম্বন্ধশূন্য প্রদেশ বর্ণনা

---

* যাহা সাবয়ব তাহাই অনিত্য—ইহা অব্যভিচরিত নিয়ম। ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে অনিত্য হইবে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। এই বিষয়ে এইরূপ অনুমান হইতে পারে : ব্রহ্ম (পক্ষ) অনিত্য (সাধ্য), যেহেতু সাবয়ব (হেতু)। ঘট প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

করিয়াছেন—'বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ' ইতি। ব্রহ্মের বিকার-(কার্য) রূপে অবর্তমান অর্থাৎ বিকাররহিত তিনটি ভাগ আছে। উল্লিখিত শ্রুতি ব্রহ্মের ঐরূপ স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন, ইহাই সূত্রের অর্থ। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মের জগদাকারে অবস্থান হইলেও (স্বীকার করিলেও) মুক্ত পুরুষদিগের প্রাপ্য স্থলের অভাব শঙ্কা হইতে পারে না, ইহাই ভাবার্থ।*

---

* সটীক সানুবাদ 'হরিমীড়ে'-স্তোত্রের সম্পাদনায় আমরা যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যাপক, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ মহোদয়ের বিশেষ সহায়তা পাইয়াছি ও পাইতেছি। মূল্যবান বহু পাদটীকার সাহায্যে গ্রন্থোক্ত বিষয়ের উপর প্রচুর আলোকপাত করা হইয়াছে। সমস্ত পাদটীকাগুলিই তৎকর্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।—সঃ

শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

স্বামী জীবানন্দ

মাতা যা সৃষ্টিকর্ত্রী ত্রিভুবনরচনে সিদ্ধহস্তা প্রপাত্রী
তস্যাঃ পীযূষধারা পরমকরুণয়া নির্গতা চানিরুদ্ধা।
রম্যা হৃদ্যা কৃপার্দ্রা পরমরসঘনা স্বানুরাগপ্রদাত্রী
সা কল্যাণী সুপূজ্যা সততমবতু মাং জ্ঞানভক্তিপ্রহীণম্॥ ১

রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুদিব্যে সমুদয়সুতনো মাতৃভাবো হি দেব্যা
দাত্রী বিজ্ঞানভক্তেঃ সুভজননিরত-প্রীতিসাম্যান্বিতেভ্যঃ।
নম্রীভূতে মনুষ্যেঽপরিমিতকরুণা তে সদাহং হি জানে
মাতর্মে সর্বদা তে চরণকমলয়োর্দেহি ভক্তিং বিশুদ্ধাম্॥ ২

মিষ্টত্বং মাতৃভাবে সকলসুভবনে সর্বদৈবানুভূতং
সর্বে মর্ত্যাঃ পৃথিব্যাং হি সুজনকুজনা গীতিনিষ্ঠাঃ সদা তে।
দৈবাধীনা কৃপা তে সুবিমলহৃদয়ে প্রার্থনীয়া সুভক্তৈ-
র্বন্দে রাত্রিন্দিবং তে পদকমলযুগং পাহি মাং তে প্রপন্নম্॥ ৩

নমঃ শ্রীসারদাদেব্যৈ ব্রহ্মাণ্ডমাতৃমূর্তয়ে।
সর্বদেবীস্বরূপায়ৈ শ্রীরামকৃষ্ণশক্তয়ে॥ ৪

ভাবানুবাদ : মাতা যিনি সৃষ্টিকর্ত্রী নিপুণা সৃজনে ত্রিভুবন,
সৃষ্ট জীবগণে সদা সযতনে করেন পালন,
অমৃতের ধারা তাঁর অনিরুদ্ধ হ'ল যে এবার,
বহির্গত করুণায় ভাসাতে এ জগৎ সংসার!
রম্যা রসঘনা সৌম্যা হৃদ্যা স্নিগ্ধা কৃপাবিগলিতা
সেই মাতা শ্রীসারদা মাতৃভক্তি বিলাতে নিরতা।

সর্বভাবে পূজনীয়া মহাদেবী স্থকল্যাণী মোরে
জ্ঞানভক্তিহীন জনে কর ত্রাণ মাগো কৃপা ক'রে।
শুদ্ধদেহে মাতৃভাব প্রতি দিব্য রক্তে বিস্ফুরিত,
বিজ্ঞানভক্তির দাত্রী যোগ্যজনে ভজননিরত।
বিনম্র মন্থয্যে মার করুণা অনন্ত বুঝি প্রাণে,
কৃতার্থ কর মা দীনে পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তিদানে।
মাতৃভাবে কী মাধুর্য স্থভবনে নিত্য অনুভূত,
স্বজন কুজন সব মর্ত্যবাসী তব স্তুতিরত।
দৈবাধীন কৃপা তব শুদ্ধচিত্তে চায় ভক্তজনে,
নিশিদিন বন্দি পদ রক্ষা কর প্রপন্ন সন্তানে।
সর্বদেবীরূপা জননী সারদা রামকৃষ্ণশক্তি,
মাতৃমূর্তি যাঁর ব্রহ্মাণ্ড বিশাল পদে তাঁর নতি।

শ্রীশ্রীসারদা-বন্দনা

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত*

জননীং সারদাং বন্দে নিত্যাঞ্চ স্নেহসারদাম্।
সারাৎসারাং মহামায়াং চৈতন্যরূপিণীমহম্॥
সর্বশাস্ত্রেষু যা বিদ্যা পরাপরেতি গীয়তে।
স্তূয়তে যা পরৈর্দেবৈ র্ব্রহ্মাত্মিকা সনাতনী॥
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তরূপা সা লোকমাতা স্থপালিকা।
মানুষীং তনুমাশ্রিত্য কৃপয়া স্বয়মাগতা॥
দক্ষিণেশ্বরতীর্থেষু রামকৃষ্ণ-সহায়িকা।
কল্যাণকারিণী ধন্যা সর্বলোকনমস্কৃতা॥
প্রপন্নানাং শরণ্যা যা দুঃখাতিমৃত্যুনাশিনী।
তাং বন্দে সততং ভক্ত্যা বরাভয়প্রদাং শুভাম্॥

সুশান্তরূপা মধুভাষিণী যা
দয়ার্দ্রচিত্তা সুগুণালয়া চ।
প্রপন্নদুঃখার্তিবিনাশিনীং তাং
নমামি বন্দ্যাং জননীং সুধন্যাম্॥

---

* কাব্যতীর্থ

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

· [যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

জয়রামবাটী
*

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্রে তোমাদের কুশল পেয়ে সুখী হইলাম। তোমার আসিবার যদি ইচ্ছা থাকে ত এস, তবে এখন ভীষণ ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমার শরীর ভাল আছে। রাধু [ও] তাহার খোকা ভাল আছে। অপরাপর সকলের কাহারও শরীর ভাল নাই। আশা করি বাবাজীবন কুশলে আছ। আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং অপরাপর সকলকে জানাইবে। ইতি

আঃ তোমাদের মাতাঠাকুরাণী

---

* পোস্টকার্ডটিতে 'দেশড়া' ডাকঘরের ছাপ আছে : 10 DE. 19 (10th December 1919)।—সঃ

(২)

শ্রীশ্রীহরি শরণং

কলিকাতা
উদ্বোধন আঃ
২৮ চৈত্র *

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার প্রেরিত ৮৲ টাকা পাইয়াছি। আমার আবার আজ ৪।৫ দিন জ্বর হইয়াছে। অদ্য দুইটি ভাত খাইলাম; কিন্তু সামান্য জ্বর আছে। দুর্ব্বলতা খুব বেশী, কিছু খাইতে রুচি নাই। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। বাকী মঙ্গল। ইতি

আঃ তোমাদের মাতাঠাকুরাণী

---

* পোস্টকার্ডটিতে 'বাগবাজার' ডাকঘরের ছাপ আছে : 10 APR 20 (10th April 1920)।—সঃ

(৩)

শ্রীশ্রীহরি শরণং

কলিকাতা
৬ই বৈশাখ*

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার শরীর খুব খারাপ, জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়া আছি; এখন উঠিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই, আর অন্যত্র যাইব কি করিয়া। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

আঃ মাতাঠাকুরাণী

---

* পোস্টকার্ডটিতে Ranchi Secretariat ডাকঘরের ছাপ আছে : 21 APR 20 (21st. April 1920)।—সঃ

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[শ্রীমতী ফুলরাণী সেনমজুমদার কে লেখা]

(১)

শ্রীশ্রী৺জয়তি

কলিকাতা

১৩।৮।২২

পরম কল্যাণীয়া মা,

তোমার পত্র পাইলাম। সম্প্রতি এখানকার কুশল। যোগীন মা ও গোলাপ মা পূর্ব্বের ন্যায় আছেন—বৃদ্ধবয়সে যেমন হইয়া থাকে, আজ এটা কাল ওটা, এইরূপ। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার শরীরও সম্প্রতি মন্দ নাই। তুমি দীক্ষাদি বিষয়ে যাহা লিখিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরে যাহা হয় স্থির করা যাইবে। আপাততঃ শ্রীশ্রীঠাকুরকে যেমন ডাকিতেছ সেইরূপ ডাকিবে। খুব সম্ভব ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত আমি কলিকাতাতেই থাকিব। বেলুড় মঠের ও এখানকার সকলের কুশল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বিলাস মহারাজ এখানেই আছেন ও ভাল আছেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা

২৭।১০।২৬

পরম কল্যাণীয়াসু

তোমার পত্র পাইয়াছি। বৃদ্ধ বয়সের শরীর একটু আধটু খারাপ হইয়াই থাকে। তজ্জন্য চিন্তিত হইবার কোনও কারণ নাই। এখন উহা অনেকটা ভালই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তোমার শোকসন্তপ্ত প্রাণে শান্তি দিন্—ইহাই প্রার্থনা করি। সংসারে সকলকেই দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয় কিন্তু যাহারা তাঁহার আশ্রিত শত বিপদেও তাহারা ধৈর্য্যহীন হয় না। তাঁহার কৃপায় তোমার মনেও বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় হউক—সুতরাং তাঁহারই শরণাগত হইয়া পড়িয়া থাক। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা তোমরা জানিবে। এখানকার কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

---

* শ্রীআনন্দ দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের ছোটবেলা হইতেই শিক্ষা দেওয়া হয়, চতুর্বর্গ লাভই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষ এই শাস্ত্রীয় শব্দ শুনে বটে, কিন্তু উহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। সে মনে করে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সুখে শান্তিতে জীবন-ধারণ এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহার সকল চেষ্টা উদ্যম পরিশ্রম। মাতাপিতা বাল্যকাল হইতেই পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দেন, কিভাবে থাকিলে তাহারা সুখে শান্তিতে থাকিবে। কিন্তু হায়! কয়জন সুখে শান্তিতে জীবন কাটায়? জগতে অনেক বিদ্বান বুদ্ধিমান মহৎ লোক দেখা যায়, তাঁহারাও লোককে সুখশান্তি লাভের জন্য নানা পন্থা নির্দেশ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণ মানুষ তাঁহাদের উপদেশ ষোলআনা কার্যে পরিণত করিতে অক্ষম হয় আর সুখশান্তিও পায় না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটেও বহু স্ত্রী-পুরুষ যাইতেন, সুখশান্তি পাইবার আশাতেই সন্দেহ নাই এবং তিনিও তাঁহাদের অন্তর বুঝিয়া অধিকারী বুঝিয়া নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতেন, দেখা গিয়াছে। আধ্যাত্মিক রাজ্যে ইহা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ ও দীক্ষাদান বলিয়া পরিচিত। মায়ের দীক্ষাদান-ব্যাপার বিচিত্র ব্যাপার। সংসারে আমরা বড় বড় কাজের পরিমাপ করি, বাহ্যিক আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রকাশ দেখিয়া, তাই দীক্ষা-ব্যাপারও ঘটা করিয়াই সাধারণতঃ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। মায়ের সন্তানগণ যদি বা প্রথমে মনে মনে কিছু ঐশ্বর্যের ভাব লইয়াই অগ্রসর হইতেন, তথাপি 'বাবা, এসো'—এই স্নেহমাখা কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্রই তাঁহাদের সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলাইয়া এক অননুভূত অলৌকিক মাধুর্যের রাজ্যে প্রবেশ করাইত। পথভ্রষ্ট দিশাহারা সন্তান মাকে পাইত, সুখশান্তি লাভের পথ উন্মুক্ত হইত। 'তুমি মা, আমি সন্তান'—নিত্য সম্পর্ক; আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিত। কোথায় দুঃখ কষ্ট তিরোহিত হইত। সন্তান সেই মুহূর্তে মাতৃ-স্নেহের ভিতর দিয়া যে অপার্থিব বস্তুর সন্ধান পাইত, তাহাই তাহার জীবনপথের পাথেয়—চিরকালের জন্য তাহা সঞ্চিত হইয়া যাইত। প্রারব্ধ কর্ম সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াইতেছিল, প্রাণ-যায়-অবস্থা, স্মৃতিবিভ্রম - আর আশা নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই সুমধুর স্নেহস্বর ভাসিয়া আসিত—'বাবা, এসো'—তৎক্ষণাৎ প্রাণে বল আসিত, অভয় বাণী ঝঙ্কৃত হইত 'ভয় কি? ঐ যে মা হাত বাড়াইয়াছেন, কোলে তুলিয়া লইবেন।'

মায়ের মাধুর্যঘন মূর্তি—কোন ব্যাপারে বাহ্যাড়ম্বর নাই। সন্তানকে খেলনা দেওয়া, নাওয়ানো, পরানো, খাওয়ানোর মতোই দীক্ষা দেওয়া। অতি সরল সহজ ব্যাপার। মা শিখাইয়া দিলেন তাঁহার সন্তানকে—ভগবানকে কি নামে ডাকিতে হইবে, কি রূপে ধ্যান করিতে হইবে, তিনি কে হন—তাঁহার সহিত কি সম্পর্ক—ইহাই দীক্ষা। মায়ের অদ্ভুত দীক্ষাদানপ্রণালী যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের কথার মর্ম বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

শুনা যায়, বৃন্দাবনে যাইয়া মা প্রথম দীক্ষাদান করেন পূজনীয় যোগীন মহারাজকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে। তৎপরেই তাঁহার কৃপাস্রোত প্রবাহিত হইয়া বহু লোককে পবিত্র করিয়াছিল। মহারাজগণ

তাঁহাদের আশ্রিত স্নেহভাজনদিগকে এবং ঠাকুরের প্রাচীন গৃহস্থ ভক্তগণও অনেকে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগতদিগকে পাঠাইতেন মায়ের কৃপালাভের জন্য। একে অন্যের নিকট শুনিয়া, আবার দৈবযোগেও কেহ কেহ মায়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। আমরা মায়ের শেষ লীলায় প্রকটিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। সাধারণতঃ মা নিত্যপূজার শেষে দীক্ষার্থীকে পরম স্নেহে আহ্বান করিয়া কাছে বসাইয়া সামান্য আচমন, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মরণ ও আত্মসমর্পণ করাইয়া, দীক্ষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা জিজ্ঞাসানন্তর মন্ত্রপ্রদান ও গুরু-ইষ্ট চিনাইয়া দিতেন। তৎপরে দীক্ষার্থীর পূজা, দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া শুভাশিস প্রদান করিতেন। সামর্থ্যশালী সন্তানগণ প্রাচীন ভক্তগণের উপদেশানুযায়ী মায়ের জন্য বস্ত্র, ফল-মিষ্টান্নাদিও যথাসাধ্য যোগাড় করিয়া আনিতেন। যাঁহার অন্তরের যেরূপ সাধ, তিনি সেইরূপ খরচ-পত্রাদি করিতেন। ঐ বিষয়ে মায়ের কোন নির্দেশ থাকিত না এবং গরীব অসমর্থদিগকে বেশী খরচ করিতে নিষেধই করিতেন। এমন কি, বিনা খরচেও দীক্ষা হইত। ভক্তি, আত্মসমর্পণই তো আসল পূজা, দক্ষিণা।

মায়ের জনৈক সন্তান—শিক্ষক। তিনি তাঁহার একটি প্রিয় ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ছাত্রটির বয়স বেশী নহে, কিশোর —যৌবন দেখা দিয়াছে কি না দিয়াছে। স্বভাব চরিত্র ভাল, ভক্তিমান, সুশীল; মাস্টার মহাশয় খুব ভালবাসেন, চেহারাও সুন্দর। মাকে দর্শন করিতে গিয়া সে মায়ের কৃপাপ্রার্থী হইল। মা তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন, তাহার অভীষ্ট পূরণে অগ্রসর হইয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। ছেলেটির বয়স কম বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ ছিল বলিয়াই হউক, মা তাহাকে দীক্ষান্তে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমাকে নাম দিলাম, ভক্তিভরে জপ করো, অধিকার হোক, পরে বীজ পাবে।' ভক্তিমান শিষ্য কিছুকাল পরে বীজমন্ত্র লাভ করিয়াছিল। পরবর্তী কালে ক্রমশঃ ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর তিনি হিমালয়ে বাস ও সাধনভজনে মানবজন্ম সার্থক করিয়া অন্তে মাতৃলোকে চিরপ্রস্থান করেন।

জয়রামবাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরের অধিবাসী একটি নিম্নবংশোদ্ভব যুবক শ্রীশ্রীমায়ের মহিমার কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। তখনকার সামাজিক বিচারে উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের নিকট তাহারা নিম্ন-জাতি বলিয়া পরিচিত ও অস্পৃশ্য বিবেচিত হইলেও, তাহাদের পরিবার সম্ভ্রান্ত সম্মানিত ও ধনী এবং ঐ অঞ্চলে খ্যাতিমান। যুবককে বিদ্বান বুদ্ধিমান কর্মদক্ষ বলিয়া অনেকে জানে, চিনে। তিনি মায়ের জনৈক সন্ন্যাসী সন্তানের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে নিজের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা মায়ের শ্রীচরণসমীপে নিবেদন করিলেন। মা তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও ভক্তিভাবের কথা জানিয়া প্রীত হইলেন এবং তাঁহার মনোভিলাষও পূর্ণ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু জয়রামবাটী অঞ্চলের লোক এই সকল কথা জানিলে ভীষণ সামাজিক আন্দোলন ও হইচই হইবার সম্ভাবনা। আরও আশঙ্কার কথা যে, এই দিকে তাঁহার পরিচিত বিশেষতঃ তাঁহাদের স্বজাতীয় লোকও রহিয়াছে। তাঁহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিবে, লোক জড় হইবে। এমতাবস্থায় কি করা যায়- একদিকে ভক্তের আকাঙ্ক্ষাপূরণ, অন্য দিকে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ—ভীষণ সঙ্কট। অনেক আলোচনার পর শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিক্রমে ব্যবস্থা হইল, তিনি রাত্রে আসিয়া অল্প দূরে কোথাও আত্মীয় বাড়ীতে থাকিয়া ভোরবেলাই মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহার আলাপী সাধুটি রাত্রে মায়ের

বাড়ীতেই অবস্থান করিবেন। ভোরবেলা তিনি আসিবামাত্রই সাধুটি তাঁহাকে মায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত করিলে তৎক্ষণাৎ মা তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তদনুসারে সব ব্যবস্থা ঠিক হইল এবং নির্দিষ্ট দিনে তিনি প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র মা তাঁহাকে কৃপা করিলেন। তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ, জীবন সার্থক হইল। অপর কেহ কিছুই টের পাইল না—জানিল না। যাঁহারা দুই-একজন টের পাইলেন তাঁহারা মায়ের অদ্ভুত লীলা সর্বদাই দেখেন, কাজেই ইহা তাঁহাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় ছিল না।

যদিও সেই ভক্তটির অন্তরে নিজের জাতিকুলের জন্য সঙ্কোচ-সংশয় ছিল, কিন্তু মায়ের ব্যবহার, স্নেহ আদর প্রদর্শন, উপস্থিত অন্যান্য সন্তানদের তুল্য সমদৃষ্টি মুহূর্তেই তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচ নিঃসংশয় করিল। তাঁহার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইল। মায়ের হাতে প্রসাদ পাইয়া পূর্ণমনোরথ সন্তান তাঁহার পদধূলি ও স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া সহর্ষে বিদায় লইলেন।

একটি পিতৃমাতৃহীন বালক বহু দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়া মানুষ হইয়াছে, আবার অল্প বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অঙ্গ বিকল, ভাল করিয়া চলিতে পারে না, কথা বলিতে কষ্ট হয়—অস্পষ্ট উচ্চারণ, জিহ্বায় কথা জড়াইয়া যায়, উচ্চকুলে জন্ম হইলেও লেখাপড়া শিক্ষা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। পূর্ব সুকৃতির ফলে জনৈক ভক্তের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তিনি তাঁহার অন্তরের ভক্তিভাবের পুষ্টি করেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা কীর্তন করিয়া। কিছুকাল পরে ঠাকুরের লীলা-স্থান দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ ও ঠাকুরের সন্তান-গণের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হওয়ায় চেষ্টা-চরিত্র করিয়া পাথেয় সংগ্রহপূর্বক বহুদূরবর্তী আসাম-অঞ্চলে নিজ বাসস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীশ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান দুই-তিনজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হওয়ায় সে মায়ের অপার স্নেহের কথাও শুনিয়াছিল। কলিকাতা আসিবার পর সে জানিতে পারিল—মা উদ্বোধনে আছেন, মাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার মতো দুরবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে উদ্বোধনে মাকে দর্শন করা কঠিন ব্যাপার। সে নিরাশ না হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-মার চরণে প্রার্থনা ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। অচিরেই তাহার শুভদিন আসিয়া উপস্থিত, সে মাকে দর্শনের অনুমতি পাইল। মার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা অশ্রুর আকারে প্রবাহিত হইয়া আজ মায়ের নিকট আত্মপ্রকাশ করিল। মা তাহাকে স্নেহাদর প্রদর্শন ও সান্ত্বনা প্রদান করিলে সে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা কোন প্রকারে জড়-ভাঙ্গা-স্বরে বিগলিত হৃদয়ে নিবেদন করিল। মা তাহাকে বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করায় সে উৎফুল্ল হইয়া তাহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা কৃপালাভের প্রার্থনা জানাইলে মাও সস্মিত বদনে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তাহার দুঃখের জীবনে হইল সুখের সঞ্চার এবং ক্রমে ক্রমে অন্তরে ও বাহিরে সমৃদ্ধি দেখা দিল। সুদিন আসিয়াছে, তাহার ভবভাবনা নাই, কৃপাময়ীর কৃপায় খাওয়া পরা থাকার তো অভাব নাই-ই, অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশের প্রবল আগ্রহ, সাধনভজননিষ্ঠা দেখা দিল এবং ক্রমে ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক হইল।

মায়ের আর একটি সন্তান কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণানন্তর দীর্ঘকাল সাধনভজনে রত থাকিয়াও অন্তরে শান্তি পাইতেছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি বিশ্বাস, ঠাকুরের সন্তানগণের বিশেষতঃ পূজনীয় শ্রীম-র সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় এবং শ্রীমও তাঁহাকে

বিশেষ স্নেহ করিতেন। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহার জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। শেষে নিরুপায় হইয়া কষ্ট করিয়া জয়রামবাটীতে গিয়া তিনি মায়ের চরণে শরণাপন্ন হইলেন। মা তাঁহার পূর্ব দীক্ষার কথা শুনিয়া পুনরায় দীক্ষা দিতে প্রথমে অস্বীকার করিলেও পরে তাঁহার আগ্রহ ও অস্বস্তির কথা জানিয়া কৃপাপূর্বক পুনরায় দীক্ষা দিলেন। মায়ের দর্শন, কৃপা ও স্নেহাদর লাভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। সে বহু দিনের কথা, তিনি জয়রামবাটী ও কামারপুকুরে ঠাকুরের সময়ের লোক ও অনেক স্মৃতি দর্শনে বিশেষ পুলকিত হন। তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল—অকূলে কূল পাইলেন এবং তখন হইতে সুনিয়ন্ত্রিত সুনির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে সাধনভজনে অগ্রসর হইয়া পরবর্তী কালে অধ্যাত্মরাজ্যের খুব উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তাঁহার জীবন ও কর্ম বহুলোকের দুঃখের জীবনে সুখের সন্ধান দিয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। কুল-গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণানন্তর পুনরায় মায়ের নিকট যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, মা তাঁহাদের পূর্বগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে এবং যাহাতে তাঁহাদের সামাজিক রীতি-বৃত্তি-পাওনা বিলোপ না হয়, তাঁহাদের সম্মানাদি বজায় থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে বলিতেন। মা সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা যথাসাধ্য মানিয়াই চলিতেন এবং শাস্ত্রে ও শাস্ত্রীয় ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। কুলগুরু পুরোহিত পাণ্ডা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের প্রতি তাঁহার অতিশয় সম্মানজনক ব্যবহার ও যথারীতি ভক্তিভরে দক্ষিণা প্রণামী দেওয়া সর্বদাই দেখা যাইত। [ক্রমশঃ]

সমুদ্রে প্রতিমা বিসর্জন

'বৈভব'

জুহুর সমুদ্রতটে জোয়ার আসছে
পরের ঢেউএর রেখা আগের থেকে আগিয়ে যাচ্ছে।
পশ্চিম আকাশ মেঘে মাখা,
ডোববার আগেই যেন সূর্য ডুবে গেছে।
সমুদ্রের জোয়ার এগিয়ে আসছে—সজোরে, সশব্দে।
সূর্য ডোবেনি, তবু মনে হচ্ছে—ডুবে গেছে।

বিজয়া দশমী, বিদায়ের বাজনা বাজছে,
প্রতিমা নিয়ে ছেলেরা নাচছে, ঘুরছে, দেরি করছে।
আর পারল না, এবার ডুবিয়ে দিল ;
জোয়ার আরও ডুবিয়ে দিল।
ডুবে গেল প্রতিমা,—সূর্যও।
এবার সত্যি অন্ধকার !

জয়রামবাটী

শ্রীস্বদেশ বসু

যাঁর বিভায় বিভাসিত রবি তারা চন্দ্র কোটী কোটী
এলেম শেষে তাঁর লীলাভূমি—কলিতীর্থ জয়রামবাটী।
টাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে—কি মিষ্টি !
শিউলী চাঁপা টগর বেলা মালতী
যূথিকা মল্লিকা জবা হেনা দোপাটি
আম জাম জামরুল আর সোনার ধানে ভরা মাটী—
পুণ্যস্পর্শ আমোদরেব বাঁকা টানে ঘেরা জয়রামবাটী
উত্তাল জীবনতরঙ্গে তাঁর করুণার রাঙ্গা ফুল হয়ে ফুটি।

তোমায় আঁকড়ে ধরে মাগো তোমারি নিত্য স্মরণ
মোহনার নদী মিশে হারায় সাগরে যেমন,
রাত কাটে দিন কাটে বাসনার শতেক জ্বলন—
তোমার পরশ মাগো পাই তবু সদা অতুলন।
সকল মঙ্গলরূপা কল্যাণী, শরণের যোগ্যা তুমি
পরিত্রাণ কর, সর্ব-অভীষ্টদায়িনী তোমারে প্রণমি।

সারদা প্রণাম

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

তম-কুহেলীর আঁধার ভেদিয়া আজি এসেছ জ্যোতির্ময়ী।
স্বরূপ-বিভায় উজলিয়া ধরা দাঁড়ালে জগত-জননী অয়ি !
জগত-জননী জগত-ধাত্রী বিশ্বপালিনী সারদামাতা !
তোমার করুণা তোমার মহিমা তুলনা তাহার মিলিবে কোথা
তুমিই ব্রহ্ম, পরমা প্রকৃতি, সারদে জগত-পালিকে !
তুমি অসুর-শক্তি নাশিতে ধরো মা সংহারবেশ কালিকে
দুর্গতিহরা দুর্গা তুমি মা, দুর্গত ধরা ডাকিছে কাতরে
তোমারে মাগো !
নারায়ণ সাথে সারদা-লক্ষ্মী সবার হৃদয়ে
জাগো মা জাগো।

মাতৃ-সঙ্গীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[জয়-জয়ন্তী—একতাল]

পরার্থপরতা হ'য়ে বিশ্বমাতা
মা সারদারূপে আসিল এবার।
এ তিন ভুবনে কখনো তো আর
হয়নি প্রকাশ এতো করুণার ॥

কাঙ্গালে তারিতে কাঙ্গালিনী-বেশে
পতিত কাঙ্গালে কোলে করে হেসে
পর পাপতাপ নিয়ে ভালবেসে
পাপ-আগুনে দহে দেহ আপনার ॥

"ঠাকুর ও আমাতে কোনো ভেদ নাই"
নিজ মুখে মাতা কহিলেন তাই
"দেখ্ চেয়ে দেখ্, তুই আমি এক"
ঠাকুর "নরেনে" বলেন একথাই।

রামকৃষ্ণরূপ মাতা সারদার
বিবেকানন্দরূপও তো তাঁহার
জয় রামকৃষ্ণ ! জয় মহামায়ী !!
স্বামীজীর জয় !!! উঠে অনিবার ॥

শ্রীশ্রীমায়ের অনুধ্যান

শ্রীমতী মীরা মিত্র

শ্রীশ্রীমা বলেছেন—'যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।'

তাই নিজ অক্ষমতা সত্ত্বেও ভগবতীস্বরূপা শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সামান্যতম আলোচনায় বা অনুধ্যানে প্রয়াসী হয়েছি।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী তথা জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীর চারিত্রিক মহিমা ভাষায় রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। সে কেবলমাত্র অন্তরে অন্তরে উপলব্ধির বস্তু। তবু যদি মাকে কেবলমাত্র অতি উচ্চ আদর্শের নারী-মূর্তির প্রতীক বলে মনে করি, তাহলে দেখি তাঁর সমস্ত জীবন—আবির্ভাব হতে লীলাবসান পর্যন্ত—আমাদের কাছে প্রতি মুহূর্তের পথপ্রদর্শনকারী

আলোক-বর্তিকা। তাঁকে কন্যারূপে জায়ারূপে বা বিশ্বজননীরূপে— যে ভাবেই দেখিনা কেন, সর্বত্রই তিনি নারীজাতির প্রমূর্ত আদর্শ।

যখন আমরা মাকে তাঁর পিতৃগৃহে ছোট বালিকারূপে দেখি, কি তাঁর স্নেহ-কোমল মূর্তি! মাতাপিতার পরিশ্রম-লাঘবের জন্য বালিকা সারদার কি আপ্রাণ চেষ্টা! সুতো কাটছেন, গরুকে জাব দিচ্ছেন, বুক জলে দাঁড়িয়ে দলঘাস কেটে আনছেন—আবার সেই বালিকার মধ্যেই করুণারূপিণী জগজ্জননীর প্রকাশ দেখা যায়।

ক্ষুধার্তের হাহাকারে বিচলিত পিতা যখন বুভুক্ষুদের অন্ন যোগানোর ব্যবস্থা করলেন, ক্ষুধার আধিক্য এবং সংখ্যাধিক্যের দরুন খিচুড়ি শীতল হবার সময় নেই ; ক্ষুদ্র বালিকার প্রখর দৃষ্টি এড়ালো না এই দৃশ্য। তখন ছোট দুটি হাত দিয়ে হাতপাখার সাহায্যে গরম খিচুড়ি শীতল করবার সে কি আকুল প্রচেষ্টা! দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্তদের জন্য তপ্ত খিচুড়ি শীতল করতে সময় দেওয়াটা যেন অনন্তকাল বলে বোধ হয় বালিকা সারদার। সে অসীম স্নেহ-করুণার মিশ্রণে খিচুড়িও তখন অমৃতের চেয়ে সুস্বাদু হয়ে উঠে।

জগজ্জননী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এবারে দীনবেশে এসে মুটে মজুর কাঙালের সেবা করে গেলেন আপন শ্রীহস্তে। কেন? না—জগৎকে শেখাবার জন্য।

এবারে শ্রীশ্রীমাকে আমরা দেখি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিদ্যারূপিণী সহধর্মিণী তথা লীলাসঙ্গিনীরূপে। দক্ষিণেশ্বরে কল্যাণী জায়ারূপে মায়ের যে ছবিটি দেখতে পাই, তাতে তাঁর মধ্যে স্বামীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার আনন্দই সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এই সম্বন্ধ সম্পূর্ণ জাগতিক কামনা বাসনা শূন্য। কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না।

মায়ের তারুণ্যের দীপ্তি যেন প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো স্নিগ্ধতা আছে উগ্রতা নেই—দীপ্তি আছে, দহন নেই। যথার্থ সহধর্মিণী, স্বামীর যথার্থ মনোবৃত্ত্যনুসারিণী।

যথার্থ নির্বাসনা, ভোগরহিতা মাকে এইখানে দেখা যায়—কি সংযম, কি তিতিক্ষা! সে কি সহজে ধারণায় আসে?

দিনের পর দিন মাসের পর মাস স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী হয়েও স্বামীরই অনুরূপ তাঁর অলৌকিক দিব্যভাবের বিরাম ছিল না— কোনও মানবীর পক্ষে এ কি সম্ভব? ওই সময়ের কথা স্মরণ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব সংযম ও পবিত্রতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

আবার চলে যাই মায়ের কিশোরী বধূ-জীবনে। পরবর্তী কালে কথাপ্রসঙ্গে সঙ্গিনীদের কাছে মায়ের উক্তি— কামারপুকুরে ঠাকুরের কাছে অবস্থানকালীন মনের অবস্থা প্রসঙ্গে : সব সময় হৃদয়ে আনন্দের ঘট পূর্ণ রয়েছে অনুভব হতো।

কিশোরী বধূর এই নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন নিসর্গাতীত দিব্য আনন্দানুভব বাস্তবিকই অমানবীয়।

প্রসঙ্গক্রমে মা নিজেই বলেছেন, "মেয়েদের কাছে কামারপুকুরে আর এখানেও খালি শুনতুম ছেলের মা না হলে কোন কাজই সে মেয়েমানুষ করতে পারে না।··· আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলুম। ঐ সব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে দুঃখু হতো—তাইতো, একটা ছেলেও আমার হবে না? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঐ কথাটা একবার মনে পড়ে। যেদিন মনে হওয়া— কাউকে কিছু বলিনি—ঠাকুর আপনা হতে বললেন, 'তোমার ভাবনা কিসের? তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব, মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষ পায় না। পরে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে'।"

দেশ-কাল-পাত্রানুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার শ্রীশ্রীমায়ের ব্যক্তিত্বের একটি পরম বৈশিষ্ট্য। যেমন পানিহাটী মহোৎসবে, মা ঠাকুরের সঙ্গে গেলেন না তাঁর সঙ্গিনীদের যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও। ঠাকুরও মৌখিক অসম্মতি জানাননি। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী মা, তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় পরমহংস স্বামীর মর্যাদা যাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়, তার জন্য নিজের একবিন্দু ইচ্ছাকেও প্রশ্রয় দেননি। তাইতো ঠাকুর বলেছেন—"ও কি যে সে! ও সারদা সরস্বতী জ্ঞানদায়িনী মহাবুদ্ধিমতী।"

আবার যখন মাড়োয়ারী ভক্ত ঠাকুরের সেবার জন্য প্রচুর টাকা মায়ের কাছে গচ্ছিত রাখতে চাইলেন, তখন মা ঠাকুরকে বলছেন—"আমি নিলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হয়।"

বাহ্যিক জাগতিক সম্বন্ধশূন্য এই দম্পতির হৃদয়ে ছিল গভীর একাত্মবোধ।

এখন আমরা বিশ্বজননীর আসনে আপন দিব্য মহিমায় সমাসীন শ্রীশ্রীমায়ের একটু অনুধ্যান করব।

কি আশ্চর্য সমদর্শিতা, কি অপার স্নেহ! সন্ন্যাসী গৃহী সৎ অসৎ পশুপাখি—এমনকি পিঁপড়েটারও মা হয়ে সকলকে সমভাবে আপন স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিচ্ছেন—তিনি যে সকলেরই মা! তাই ডাকাত আমজদ থেকে ব্রহ্মজ্ঞানী শরৎ মহারাজ পর্যন্ত মায়ের একই কোলটিতে বসার অধিকার পেয়েছেন। আর সন্তানের উদ্ধারের জন্য কি তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা! যে জন্য নিজের দেহকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে গভীর নিশীথে ঘুম ছেড়ে উঠে, কেবলমাত্র সন্তানের কল্যাণের জন্য লক্ষ লক্ষ জপ করে যাচ্ছেন।

পরবর্তী কালে জয়রামবাটীতে কি পরিবেশেই না জীবন কাটাতে হয়েছে মাকে! পাগলী ভ্রাতৃবধূ, অবুঝ রাধুর কি উৎপাতই না তাঁকে বছরের পর বছর হাসিমুখে সইতে হয়েছে! তবু শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁরা জগজ্জননীর স্নেহাঞ্চলের আশ্রয় থেকে এতটুকু বঞ্চিত হননি। ব্রহ্মময়ী একই কালে স্নেহাসক্তা অথচ নির্লিপ্তা। অসচ্ছলতার মধ্যেও যেমন দীনতাবোধ নেই, আবার সম্পদের মধ্যেও নেই ঐশ্বর্যবোধ।

এই তো আমাদের মা! কতো দূরে—কিন্তু কতো কাছে! অসীম ধরা দিলো সসীম হয়ে, দেবী ধরা দিলেন মানবী হয়ে। স্নেহ দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, করুণা দিয়ে, শান্তি দিয়ে সকল সন্তানের হৃদয়কে আশ্চর্য আশ্বাসে ভরিয়ে দিলেন মা। বললেন—"সব সময় জানবে তোমাদের একজন মা আছেন, কোন ভয় নেই।"

চিরকালের মা আমাদের, তুমি মা! তোমাকে এ ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়ে ভক্তিভরে আবাহন করি—প্রার্থনা করি: মাগো, তোমার ধৈর্য, তোমার ক্ষমা, তোমার সংযম, তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার স্নেহ, তোমার নির্লিপ্ততা এবং সর্বাবস্থায় তোমার আশ্চর্য তৃপ্তিবোধ—তোমার অনন্ত গুণরাজির কণামাত্রও কৃপা করে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করো; এই স্বার্থদ্বন্দ্ব দুঃখ ভরা কুটিল পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম আঘাতও যেন অম্লান বদনে সহ্য করতে পারি। জয় মা!

সুপুত্রে কুপুত্রে মাতা প্রসবে পায় সমান ব্যথা,
এ কি মা দারুণ কথা—নাই ব্যথা কুপুত্র বলে।
যা হবার হবে রে ভাই, মা ব'লে ডাকি সবাই,
দেখি মা কেমন ক'রে থাকতে পারে ছেলে ভুলে।

—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন

ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় পর্বঃ নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

[পূর্বানুবৃত্তি]

(১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌরুষ রবীন্দ্রনাথকে সব থেকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। তিনি বিদেশী শাসকজাতির নিকট কোনও দিন মাথা নত করেন নি। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপরাজেয় পৌরুষ অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার মনে হয় তার থেকেও সার্থকগুণ তাঁর ছিল, যা তাঁকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছিল। তা হল তাঁর দয়া বা মমতাবোধ। সাধারণ মানুষ এ বিষয় ভুল করে নি। তাঁর অধ্যাপকবৃন্দ তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিদ্বারা ভূষিত করেছিলেন; কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁর নাম দিয়েছিল 'দয়ার সাগর'। তাঁর করুণা, তাঁর মমত্ববোধই তাকে সেই প্রচণ্ড শক্তি দিয়েছিল, যা একক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সেবায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সব থেকে ব্যাপক আন্দোলন ছিল ধর্মসম্পর্কিত আন্দোলন। তিনি তার ধারে কাছেও যান নি। মানবসেবাকেই তাঁর মুখ্যব্রত বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের মানুষের সেবা করতে চেয়েছিলেন দুই ভাবে। প্রথম, সাধারণভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি এমন একটি আদর্শ শিক্ষণরীতি প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন যাতে প্রকৃত শিক্ষার পথ প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়ত, তিনি নারীর উন্নয়ন আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা নিয়ে নারীজাতির উন্নতিসাধন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে সমাজ দুটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, একটি পুরুষজাতি ও অপরটি নারীজাতি। পুরুষের প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার চাপে যুগ যুগ ধরে নারীকে পঙ্গু করে রাখার যে বিধি-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা নারীজাতিকে একান্তই অধঃপতিত করেছিল। তাদের উন্নতি না হলে সমাজ পঙ্গুই থেকে যায়। তাই তিনি এ বিষয় ব্রতী হয়েছিলেন। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণবোধ ও নারীজাতির দুর্দশায় অনুকম্পাবোধ—উভয়ই এখানে ক্রিয়াশীল ছিল।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিশেষ বিষয় দ্বিতীয়টি হলেও প্রথমটি অর্থাৎ শিক্ষারীতি-সংস্কারও তার সঙ্গে জড়িত। তাই প্রথমটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই আলোচনা প্রথমে সেরে নেবার প্রস্তাব করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণায় শিক্ষার দুটি দিক আছে। প্রথম, জ্ঞান অর্জন এবং দ্বিতীয়, নিজের চিন্তাকে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা। তাঁর আরও ধারণা ছিল, বাঙালীর পক্ষে মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করাই প্রশস্ত। তা ব'লে তিনি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ব'লে নিজেও ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর ধারণায় ইংরাজী ভাষা শিখতে হবে যাতে পাশ্চাত্য জাতির অর্জিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দরজা আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়।

আর বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন শিক্ষার্থীর মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাকে পরিবর্ধিত করবার জন্য। তাঁর শিক্ষা-নীতি এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি হতে গড়ে উঠেছিল।

সেকালে শিক্ষার্থী যুবকের দুটি পথ খোলা ছিল। এক, হিন্দুকলেজে ভর্তি হয়ে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করা এবং তার সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতির অর্জিত জ্ঞানের সহিত পরিচিত হওয়া। দ্বিতীয় পথ হল সংস্কৃত কলেজে পড়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ করে পণ্ডিত হওয়া। তখন এই দুটি প্রতিষ্ঠানই ছিল উচ্চশিক্ষার মূল বাহন। প্রথমটি দেশের সমাজের প্রগতিশীল নেতারা স্থাপন করেন এবং দ্বিতীয়টি সরকার স্থাপন করেন। কিন্তু এই দুটি রীতির কোনটির দ্বারাই একক-ভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয় না। যিনি ইংরাজী শিক্ষার পথ নির্বাচন করবেন, তাঁর পাশ্চাত্যবিদ্যা নাগালের মধ্যে আসবে এবং ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি হবে; কিন্তু মাতৃভাষায় নিজের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জিত হবে না। অপরপক্ষে যিনি সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করবেন পশ্চিমের বিদ্যা তাঁর নাগালের বাহিরে রয়ে যাবে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী কালে রামমোহনের সময় শিক্ষানীতি নিয়ে যে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার কথা আর একবার স্মরণ করতে পারি। রক্ষণপন্থীরা চেয়েছিলেন সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচলিত থাকুক। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রগতি-শীলরা চেয়েছিলেন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হক। বিদ্যাসাগর এই দুই বিরোধী রীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছিল; কারণ তিনি এই বিরোধের সমন্বয় করতে পেরেছিলেন মনে হয়।

একই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা তাঁকে পীড়িত করেছিল। সেযুগে বাংলা গদ্য লেখ্য ভাষা গড়ে ওঠে নি। বাংলা কাব্যসাহিত্য প্রাচীন কাল হতেই সমৃদ্ধ, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্য বলে কিছু ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাংলা গদ্যরচনায় উৎসাহ দেওয়া হয় দুই তরফ হতে। যে সমস্ত ব্রিটিশ কর্মচারী এদেশে শাসনকার্যে নিয়োগের জন্য আসতেন তাঁদের বাংলা ভাষা শিখতে হত। তাই সরকার মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকে দিয়ে একাধিক বাংলা পুস্তক রচনা করান। একই সময় মিশনারীদের ব্যবহারের জন্য কেরি সাহেবের উৎসাহ পেয়ে রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত' রচনা করেন। তারপর রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লেখেন। এঁরাই ছিলেন এ বিষয় পথিকৃৎ; কিন্তু তখনও বাংলা গদ্যসাহিত্য ভালভাবে গড়ে ওঠে নি।

এই পরিবেশে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা গদ্যরচনার শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, সংস্কৃত সাহিত্য অতি সমৃদ্ধ এবং তার শব্দভাণ্ডার বিপুল। প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে পুষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও তিনি বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ, সংস্কৃতে অধিকার অর্জন দুঃসাধ্য, ব্যাকরণকে আয়ত্ত না করলে তা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে ব্যাকরণ-শিক্ষণরীতি ছিল একান্ত নীরস। সেই কারণে তিনি সুসংবদ্ধভাবে সাজানো বাংলায় লিখিত একটি ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এর থেকেই 'ব্যাকরণকৌমুদী'র জন্ম।

শুধু তাই নয়, বাংলা গদ্যসাহিত্যকে শক্তিশালী করবার জন্য এবং একটি উচ্চমানের গদ্যসাহিত্যের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানোর জন্য তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনারও ভার গ্রহণ করেছিলেন। একেবারে শিশু হতে শুরু

করে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বিভিন্ন স্তরের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'শকুন্তলা উপাখ্যান' ও 'সীতার বনবাস' উল্লেখযোগ্য।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর একটি নিজস্ব মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি পাই তাঁর ইংরাজীতে লেখা এক চিঠির মধ্যে। একটি বিতর্ক প্রসঙ্গেই এই চিঠিখানি লিখিত হয়। মোয়াট সাহেব তখন 'এডুকেশন কমিটি'র সম্পাদক এবং বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময় বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যাল্যানটাইন সাহেবের ওপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়। পরিদর্শনের পর তিনি পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর তাদের কতকগুলি গ্রহণ করতে অসম্মত হন। এই প্রসঙ্গেই মোয়াট সাহেবের সহিত তাঁর পত্র বিনিময় শুরু হয়। সেই সময় মোয়াট সাহেবকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত চিন্তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশের বাংলা অনুবাদ এই :

"আমি যদি শিক্ষার্থীদের প্রথমে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শিক্ষা দিই এবং তারপর ইংরাজীর সাহায্যে তাদের মনে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চারিত করি এবং এই কাজে যদি 'এডুকেশন কমিটি' হতে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং উৎসাহ পাই, তা হলে আপনাকে কথা দিচ্ছি যে কয়েক বছরের মধ্যেই আমি এমন একদল ছাত্র গড়ে তুলব যারা শিখবার এবং শিক্ষা দেবার ক্ষমতার গুণে, যে ছাত্রগণ আপনার স্বদেশের এবং ভারতের কলেজে তাদের পারদর্শিতা দেখিয়েছে, তাদের থেকে অধিকতর যোগ্যতার সহিত দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করবে।" (মোয়াটকে লিখিত ৫।১০।৫৮ তারিখের চিঠি)

মনে হয় এই মনীষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সংস্কৃত শিক্ষার পথ সহজ হওয়ায় এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর স্থাপিত উচ্চতর বাংলা গদ্যরচনা-রীতির সহিত পরিচিত হওয়ায়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় যে পথে বিদ্যাসাগর দেশের উন্নতি সাধন করতে চেয়েছিলেন তা হল নারী-উন্নয়ন আন্দোলন। আগেই বলা হয়েছে এর প্রেরণা তাঁর নিজস্ব করুণাবোধ। পুরুষ পরিচালিত সমাজে নারীজাতির প্রতি নির্লজ্জ অবিচারের ফলে তাদের দুর্দশা চোখে দেখে, তাঁর হৃদয় অনুকম্পায় ভরে গিয়েছিল। তা-ই তাঁকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়েছিল নারীজাতির উন্নয়ন আন্দোলনে সব থেকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে। এ বিষয় তাঁর মনে কতখানি ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল, তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'বিধবা বিবাহ' শীর্ষক পুস্তিকার ভূমিকা হতে। তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

"অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া রহিয়াছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। * * * হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি

জন্মগ্রহণ না করে।"

এই বিষয়টিই বর্তমান আলোচনার বিশেষ বিষয়। এখন তার মধ্যে প্রবেশ করা যেতে পারে।

(২)

এই আলোচনা বিদ্যাসাগরের আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আরম্ভ করা যেতে পারে। তা দেখাবে নারীজাতির প্রতি অবিচার তাঁর মনকে কতখানি পীড়া দিয়েছিল। সেটি তাঁর 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। তিনি বলছেন :

"স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্বপ্রদেশেই সদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশত: স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।"

এই অবিচার বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়ে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাই একক চেষ্টায় তিনি নারীজাতির উন্নয়ন আন্দোলনে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেমে পড়েছিলেন। এই আন্দোলনের জন্য তাঁর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন নারীজাতির দুর্দশার কারণ পুরুষ-জাতির স্বার্থপরতা এবং নারীজাতির দুর্বলতা। দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে সম্ভব করেছিল। তাই তিনি ঠিক করলেন, নারীজাতিকে শিক্ষিত করে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবেন। এই ভাবেই সমস্যাটির মূলে কুঠারাঘাত সম্ভব। তারপর দ্বিতীয় দফায় তিনি চাইলেন নারীদের যে সব অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সেই অধিকার জয় করে দেবেন। সুতরাং এই আন্দোলনের দুটি শাখা। একটি নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, তাদের বিধবাবিবাহে অধিকার স্থাপনের ব্যবস্থা ও পুরুষের বহু-বিবাহ-প্রথা রহিত করার ব্যবস্থা। আমরা প্রথমে নারী-শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচনা করব।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে যে নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, তা নয়। তা হয়েছিল দুই তরফ হতে। ক্রিশ্চান মিশনারীদের পক্ষ হতে যেমন হয়েছিল, তেমন হিন্দুসমাজের পক্ষ হতে হয়েছিল। আমরা দেখি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মিশনারীদের উদ্যোগে The Female Juvenile Society স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করা। Female Society for Native Female Education কলিকাতায় মেয়েদের জন্য ৮টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। রাজা রাধাকান্ত দেবের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই সকল চেষ্টা দানা বাঁধে নি, কারণ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে একটি প্রবল কুসংস্কার ছিল।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সার্থক চেষ্টা বাংলা দেশে ঘটে জে ই ডি বীটন ও বিদ্যাসাগরের যৌথ উদ্যোগে। বীটন তখন ছিলেন ভারত সরকারের কাউনসিল-এর আইন বিষয়ক সভ্য (Law Member)। তিনি সরকারের এডুকেশন কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে হেদোর ধারে (বর্তমান আজাদ হিন্দ্ বাগ) নেটিভ ফিমেল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বীটন হন পরিচালক সমিতির সভাপতি এবং বিদ্যাসাগর

সম্পাদক। পরে বীটন-এর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে তার নাম রাখা হয় Bethune School। তা-ই বাংলা উচ্চারণে বিকৃত হয়ে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের কর্মকুশলতা বিদ্যালয়টিকে শীঘ্রই উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। মেয়েদের স্কুলে আনবার জন্য যে ঘোড়ায় টানা গাড়ীর ব্যবস্থা হয় বিদ্যাসাগর তার গায়ে মন্ত্র এই নির্দেশটি লিখে দেন: 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি-যত্নতঃ'। উদ্দেশ্য, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া মেয়েদেরও সযত্নে শিক্ষা দেবার নির্দেশ প্রাচীন শাস্ত্রে ছিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর নিযুক্ত হন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট শিক্ষানবীশ অবস্থায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁর চরিত্রগুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবাংলার বিদ্যালয়-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তখন কেউ জানত না, এই সূত্রেই পরে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যে তিনি সরকারী পদে ইস্তফা দেবার সংকল্প গ্রহণ করবেন। সে কাহিনী যথাসময় আসবে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন কাজের মানুষ। তিনি সরকারী রীতিতে মন্থর গতিতে কাজ করতে পছন্দ করতেন না। তাই সরকারের অনুদানের অপেক্ষায় না থেকে তিনি ১৮৫৭-এর নভেম্বর হতে ১৮৫৮-এর মে-র মধ্যে দক্ষিণবাংলায় বিভিন্ন জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেগুলি এই ভাবে ছড়ান ছিল:

হুগলী জেলা—২০ বর্ধমান জেলা—১১

মেদিনীপুর জেলা—৩ নদীয়া জেলা—১

তাদের পরিচালনার ব্যয় বাবদ তিনি নিজ তহবিল হতে ৩,৪৩৯৲ টাকা ব্যয় করেন। যখন তিনি এই টাকা সরকারের কাছে ফিরে চান, তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক লেগে যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে এক কর্মতৎপর মানুষের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বন্দ্ব আর কি!

বিতর্কটি সংঘটিত হয় এইভাবে। উড সাহেবের প্রস্তাবমত সরকারের শিক্ষাবিভাগের বিন্যাসের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আগে এডুকেশন কমিটি শিক্ষাব্যবস্থা দেখতেন। এখন উচ্চশিক্ষার জন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং শিক্ষাবিভাগের পক্ষ হতে শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য 'ডিরেকটার অফ পাবলিক ইনসট্রাকশন' পদটি সৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য এডুকেশন কমিটি উঠে যায়।

যিনি নূতন ডিরেকটার হয়ে আসেন তাঁর নাম ডব্লিউ গর্ডন ইয়ং। তিনি আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে বিদ্যাসাগরের তড়িৎগতিতে নব নব বিদ্যালয় স্থাপনে আপত্তি জানান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটি তিক্ততার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য যে অগ্রিম টাকা দিয়েছিলেন তা যখন ফেরত চান, তা মঞ্জুর করতে ইয়ং অস্বীকার করেন। বিদ্যাসাগরও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেকটারদের নিকট আবেদন করেন। তাঁরা যে টাকা বিদ্যাসাগর খরচ করেছিলেন তা ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন; কিন্তু ভবিষ্যতের অনুদান বন্ধ করে দেন। এই দ্বিতীয় নির্দেশের পিছনে শাসকজাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও যুক্তি ছিল বলে মনে হয় না।

এর ফলে বিদ্যাসাগর সরকারী কর্মচারী হিসাবে দেশসেবায় আর উৎসাহ পেলেন না। তিনি ঠিক করলেন অধ্যক্ষ তথা পরিদর্শকের পদে ইস্তফা দেবেন। দিলেনও। পদত্যাগের কারণ

হিসাবে তিনি দুটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। সেই কারণ দুটি তাঁর গর্ডন ইয়ংকে লিখিত ৫ই অগস্ট ১৮৫৮ তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত আছে। প্রথম উল্লেখ করলেন, সরকারী কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তার প্রাসঙ্গিক অংশের একটি অনুবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"আরও যে সব ছোট কারণ আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে তাদের মধ্যে আছে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার অভাব এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব যা এই বিভাগের প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন কর্মচারীর থাকা উচিত।"

স্পষ্টই বোঝা যায় শেষের কারণটি গর্ডন ইয়ং-এর আচরণ এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ স্থাপিত হয়েছে। উপর মহলে তার প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র ধরনের। গর্ডন ইয়ং পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে সম্মত হলেন কিন্তু চাইলেন 'ছোট কারণ' হিসাবে পত্রে যা লিখিত হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হলেন না; কারণ, তাঁর মতে এখানে একটি নীতির প্রশ্ন এসে পড়ে। যা সত্য তাঁর মতে তা প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তিনি জানালেন, সে অংশটি তিনি প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

তখন পত্রখানি লেফটেনান্ট গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের নিকট স্থাপিত হল। তিনি উভয় সংকটে পড়লেন। একদিকে বিদ্যাসাগরকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, অপর দিকে শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ এখানে জড়িত। তিনি নিজে শাসক; সুতরাং সেই দিকেই তাঁর মন ঝুঁকল। তিনি বিদ্যাসাগরকে অংশটি বাদ দিতে অনুরোধ করলেন। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় চলল। কিন্তু লেঃ গভর্নরের চাপও তাঁকে, যা তিনি ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করেছিলেন তা হতে, নিবৃত্ত করতে পারল না। তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ভদ্রভাবে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। 'বীরসিংহের সিংহশিশু' সরকারের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধির নিকট নতিস্বীকার করলেন না।

পত্রখানি দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, তা তাঁর অজেয় পৌরুষের পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতারও পরিচয় এতে পাওয়া যায়। অতি ভদ্রভাষায় তিনি এই প্রত্যাখ্যান পত্র রচনা করেছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করা হল। চিঠিখানির তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮। তিনি প্রথমে লিখছেন :

"পরিণত চিন্তার পর আমি দেখছি সঙ্গতি বা শিষ্টাচার রক্ষা করে পদত্যাগ পত্রটির যে অংশ আপনার নিকট আপত্তিকর মনে হয়েছে তা তুলে নিতে পারি না। এ কথা সত্য যে স্বাস্থ্যহানি আমাকে পদত্যাগে প্রণোদিত করবার অন্যতম মূল কারণ। কিন্তু আমি বিবেকের অনুমোদন নিয়ে বলতে পারি না যে তাই একমাত্র কারণ। তা যদি হত তা হলে আমি দীর্ঘ ছুটির দরখাস্ত করে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে নিতে পারতাম।"

পত্রটি শেষ করেছেন এই ভাবে :

"পত্রের আপত্তিকর অংশ সম্ভবত আপনাকে কিছু অসুবিধায় ফেলতে পারে জেনে আমি যে গভীর অনুশোচনা বোধ করছি তার তুলনা হয় না; অপরপক্ষে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে যে সামান্যতম অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাটে ফেলেছি তা ভাবতে যে পরিমাণ অস্বস্তি বোধ করি তা প্রকাশের ভাষা নাই।"

নারীশিক্ষায় প্রগতি দেখে তিনি যে কত আনন্দিত হতেন তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একটি ঘটনা হতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয়, তখন মহিলাদের জন্ম তার দরজা খোলা রাখা ছিল না। নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে এবং জনমতের চাপে ২৭ এপ্রিল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে গৃহীত সিনেটের একটি প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষার দ্বার মহিলাদের জন্ম উন্মুক্ত হয়। কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু নামে দুই ভগিনী এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর চন্দ্রমুখী বসু এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন।

এটি নিশ্চিত নারী-উন্নয়নের সপক্ষে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাতে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তিনি ক্যাসল কোম্পানীর একখণ্ড সচিত্র শেকসপীয়ার গ্রন্থাবলী তাঁকে উপহার দেন। তাতে তিনি স্বহস্তে যে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন তা তাঁর মনের অকৃত্রিম আবেগের সুন্দর পরিচয় দেয়। তার বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় :

শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসুকে
যিনি প্রথম বাঙালী মহিলা হয়ে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
মাস্টার অফ আর্টস উপাধি অর্জন করেছেন।
তাঁর অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

(৩)

পুরুষ পরিচালিত সমাজে পুরুষের বিপত্নীক হবার পর বিবাহের অধিকার স্বীকৃত, এমন কি বহু-বিবাহও স্বীকৃত ; কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে তা একেবারে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বৈধব্য ঘটলে অনেক নারীর ভাগ্যে সহমরণ ঘটত। সরকারের নির্দেশে সম্প্রতি হিন্দু-সমাজ সে কলঙ্ক হতে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই অন্যায্য বিদ্যাসাগরের ন্যায়বোধকে আঘাত করেছিল। আরও বড় কথা, তাঁর কোমল হৃদয়কে বিধবাদের ওপর যে নিগ্রহ পরিচালিত হত তা অত্যন্ত পীড়া দিত। সেই কারণে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার স্থাপনের জন্ম সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর পরিপাটি মন এ বিষয় একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে আন্দোলনে নামতে চেয়েছিল। তার প্রয়োজনও ছিল। প্রথমত সমাজের রক্ষণশীল অংশের বাধা আছে। দ্বিতীয়ত পিতামাতা জীবিত ; তাঁদের দিক হতেও আপত্তি ওঠবার সম্ভাবনা আছে। সে আপত্তি খণ্ডন করার প্রয়োজন আছে। তৃতীয়ত সরকারের এ বিষয় হস্তক্ষেপ সহজলভ্য করবার জন্ম শাস্ত্রের অনুমোদনের প্রমাণ দরকার। তা না হলে মানবিকতার দিক হতে এই প্রবর্তনামূলক ব্যবস্থা বিদেশী সরকারের সহানুভূতি উদ্রেক করলেও সক্রিয় সহযোগিতা পাবে না। এই সব দিক বিবেচনা করেই তিনি ধীরে ধীরে একের পর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন।

প্রথমেই তাঁর ইচ্ছার অনুকূলে জনমত গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসে 'বিধবা বিবাহ' নাম দিয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিপাদ্য বিষয় করে একটি পুস্তিকা লেখেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড)'-এ লিখেছেন যে এই পুস্তিকাখানি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে কয়েকদিনের মধ্যে ১৫,০০০ কপি বিক্রয় হয়ে যায়। কাজেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারকার্যে তার ভূমিকা খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। আরও সৌভাগ্যের কথা, সেকালের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তা সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয় তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' যে কবিতাটি

লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

বিধবার বিয়ে হবে, এ ত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্মের ফল।
বিবাদি হয়েছে এবে যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল।

রচনায় স্পষ্টভাবে বিদ্যাসাগরের লেখনীর শক্তির উল্লেখ আছে। বিধবাবিবাহে বাধা যে অধর্ম তাও উল্লিখিত হয়েছে। যারা বাধা দেয় তারা যে খল, এমন তিরস্কারসূচক কথাও প্রয়োগ করা হয়েছে। মনে হয় সমাজের নীতিবোধ ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল।

তারপর তিনি আন্দোলনে নামবার আগে তাঁর সংকল্পের কথা পিতামাতাকে জানিয়ে তাঁদের সম্মতি আদায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পিতার কাছ হতেই বাধা পাবার সম্ভাবনা বেশী ছিল; কারণ তিনি প্রাচীন পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। তাই সোজা পিতার কাছেই তিনি প্রথম যান এবং সোজাসুজি বলেন যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে তিনি আন্দোলনে নামতে চান এবং এ বিষয় তাঁর সম্মতি চান। পিতা নাকি প্রথমেই তাঁকে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি যদি সম্মতি না দেন তা হলে পুত্র কি করবেন। পুত্রের উত্তরও হয়েছিল সুস্পষ্ট এবং সোজাসুজি। তিনি বলেছিলেন যে পিতার সম্মতি না পেলে পিতার জীবনকাল পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলনে নামবেন। পিতা সে উত্তর শুনে খুসী হয়েছিলেন মনে হয়, কারণ তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন এবং কাজে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। এই কাহিনী আমরা বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে পাই।

এবার মার কাছে সম্মতি নেবার পালা। তাঁর কোমল হৃদয় বিধবাদের দুর্দশায় ঐকান্তিক বেদনাবোধ করত, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি সোজাসুজি সম্মতি দিলেন; কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে পিতার সম্মতি নাও মিলতে পারে। তিনি ত জানতেন না যে পিতার সম্মতি আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই যখন সে কথা জানলেন তখন তাঁর বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রইল না।

এইবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল শাস্ত্র হতে অনুমোদনসূচক বিধান আবিষ্কার করা। মনে হয় মনুর ধর্মশাস্ত্রে যে বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল তা নয়। নীচে উদ্ধৃত শ্লোকটি তার প্রমাণ দেবে :

যা পত্যা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
৯।১৭৫

তার অর্থ হল, যে-নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে বা বিধবা হয়ে নিজের ইচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করে তার পুত্রকে পৌনর্ভব বলা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে পতি-পরিত্যক্তা এবং বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে মনে হয়।

আমার ধারণা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের প্রস্তাবের সপক্ষে আরও সবল যুক্তি সংগ্রহের জন্য স্পষ্টভাবে প্রবর্তক শাস্ত্রের নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে এইরূপ সমর্থক বচনের সন্ধান করেছিলেন। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নাকি সমস্ত অবসর সময় এবং এমন কি ছুটির পরেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত কলেজের পুস্তকাগারের পুঁথি খুঁজে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন। অবশেষে তিনি পুরস্কৃত হলেন। পরাশর সংহিতার এই শ্লোকটি তিনি আবিষ্কার করলেন :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

সুতরাং এইভাবে বাধাগুলি দূর হয়ে গেল। পথ প্রস্তুত হল, অস্ত্রও হাতে এল। এখন তাঁর

ধারণা হল সরকারের নিকট বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের অনুকূলে আইন পাশ করবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা যেতে পারে।'

যে আবেদনের পত্রটি সরকারের নিকট স্থাপিত হল তা সরকারের আইন সভার নিকট বাংলা প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষ হতে স্থাপিত হচ্ছে বলা হল। তাতে বলা হল বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালন প্রথা 'নিষ্ঠুর ও স্বভাববিরুদ্ধ এবং নৈতিক জীবনের প্রতিকূল এবং অন্যভাবে সমাজের নানা ক্ষতিকর কুফলে পর্যবসিত।' অতিরিক্তভাবে বলা হল এই নিষেধসূচক 'রীতি শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত নয় এবং হিন্দু আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যার সহিত সংগতি রক্ষা করে না।' এই আবেদন পত্রে সকল প্রগতিশীল হিন্দু নেতাই স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রেমচাঁদ বড়াল, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্র লাল সরকার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

যে বিদেশী জাতির তত্ত্বাবধানে সরকার তখন পরিচালিত বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তাঁদের কোনও প্রতিকূল সংস্কার ছিল না। কাজেই যখন তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে বিধবাবিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থক বাণী আছে, মানবিকতা-বোধে পরিচালিত হয়ে তাঁরা আইন সভায় আগ্রহের সহিত বিধবাবিবাহকে বৈধ বলে গ্রহণ করে এক বিল স্থাপন করলেন। আইন সভার অন্যতম সভ্য জে পি গ্রাণ্ট, তার সমর্থনে যে উক্তি করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন এই প্রস্তাবিত আইন 'কোনও মানুষের প্রবর্তিত রীতিতে বাধা দেবে না; অপর পক্ষে একশ্রেণীর মানুষকে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে এমন প্রতিবেশী পরিবারদের ওপর নির্যাতন ও দুর্নীতি আরোপ করতে বাধা দেবে।'

এই ভাবে ২৬শে জুলাই ১৮৫৬ তারিখে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ আইন পাশ করে সরকার হিন্দু বিধবার বিবাহ বিধিভূত বলে ঘোষণা করলেন। এ শুধু বিদ্যাসাগরের একক অভিযানের জয় নয়, সকল প্রগতিপন্থীর জয়। আশ্চর্যের কথা রক্ষণপন্থীরা বিরোধিতা করলেও দেশের সাধারণ মানুষ এই নূতন ব্যবস্থাকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

তার সুন্দর প্রমাণ মিলে যায় শান্তিপুরের তাঁতি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। তারা উৎকৃষ্ট তাঁতশিল্পী বলে দেশময় বিখ্যাত। তারা আইন পাশ হবার জন্য অপেক্ষা করে নি। তার আগেই বিদ্যাসাগর সাড়ি নামে এক সাড়ি বার করে তার পাড়ে এই কবিতাটি বুনে দিয়েছিল:

> বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
> সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবার হবে বিয়ে।
> কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন,
> দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
> বিধবা রমণীর বিয়ে লেগে যাবে ধুম।

সুতরাং বোঝা যায় নবজাগরণের ঢেউ কেবল শিক্ষিত সমাজে সীমিত ছিল না তার স্পর্শ সাধারণ মানুষও, পেটে-খাওয়া মানুষও পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগর শুধু আইন পাশ করে ক্ষান্ত হন নি, একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনেরও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর অনুজ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তখন বিপত্নীক হয়েছিলেন। উভয়েই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি একজন বিধবাকে বিবাহ করাতে সম্মত করান। কন্যা নির্বাচিত হন এক কুমারী (virgin) বিধবা, নাম কালীমতী দেবী। এই বিবাহের তাৎপর্য গভীর, তাই তার প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর সেদিক হতে কোনও ত্রুটি রাখেন নি।

তিনি নিজে কন্যাপক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিবাহের স্থান নির্ধারিত হয় ১২ নং সুকিয়া স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। নিমন্ত্রণ পত্র কন্যার বিধবা মাতার পক্ষ হতে সংস্কৃতে রচিত হয়। বিদ্যাসাগরের একটি বড় তৃপ্তির কারণ হয়েছিল এই দেখে যে অনেক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হয়ে সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রথম বিধবাবিবাহ কলিকাতার নাগরিক জীবনের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বর আসবার সময় রাস্তার দুধার কৌতূহলী দর্শকে ভরে গিয়েছিল। চলাচলের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য পুলিশ প্রহরীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল :

"রাজবর্ত্ম লোকসমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন।"

এর কয়েক বৎসর পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র পিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করতে উদ্যত হন। এই নিয়ে পরিবারের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। তাঁর অনুজ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র, বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন নারায়ণচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ করবার সংকল্প ত্যাগ করতে বলেন। তিনি তা বলেন নি। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর শম্ভুচন্দ্রের চিঠির যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে, কেন সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি, তার কারণ দিয়েছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি তাঁর চরিত্রের উপর সুন্দর আলোকপাত করে। তাই সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

"আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"

(৪)

সেকালে বাংলাদেশে বহুবিবাহ-প্রথা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তার সঙ্গে কৌলীন্য-প্রথা জড়িত। তাই এ বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা বলে নিলে এই কুপ্রথা কেন ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বোঝা যাবে।

বাংলাদেশে এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ফলে বৈদিক যজ্ঞবিধি জানে এমন ব্রাহ্মণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। রাজা আদিশূর এই সমস্যা সমাধানের জন্য কান্যকুব্জ হতে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আনেন। তাঁদেরই বংশধরগণ বর্তমানে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ কুলাচার রক্ষার জন্য কতকগুলি বিধি নিষেধ আরোপ করেন।

কৌলীন্য-প্রথা চালু রাখতে প্রথম দিকে কোনও অসুবিধা হয় নি। কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে দেখা গেল কিছু কিছু পরিবার নানা অবাঞ্ছনীয় কাজে নিজেদের লিপ্ত করেছেন। দেবীবর ঘটক নামে এক সমাজনেতা বিষয়টি ভাল চোখে দেখলেন না। তিনি তখন আচারের শুদ্ধতার ভিত্তিতে কুলীন পরিবারগুলিকে কতকগুলি উপশাখায় ভাগ করলেন এবং এই ব্যবস্থা করলেন যে বিবাহ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর উপশাখার

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রথাই মেল বন্ধন নামে পরিচিত।

এর ফল হল মারাত্মক। একই উপশাখার মধ্যে পাত্র পাওয়া দুর্লভ হয়ে পড়ল। অথচ কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়, সমাজ শাসন অনুসারে তা একান্তই বাধ্যতামূলক। কাজেই একই পাত্র বহু কন্যার কুমারীত্ব খণ্ডন করবার জন্য নির্বাচিত হতে লাগল। পাত্র শিশু হক, বৃদ্ধ হক, মেয়েকে নিয়ে ঘর করুক বা নাই করুক, সে প্রশ্ন অবান্তর, বিবাহ করে কন্যার কুমারীত্ব খণ্ডন করলেই পিতার কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায়। ফলে যা পরিস্থিতি হল তা একান্তই অবাঞ্ছনীয়, বিবাহিত মেয়ে পিতৃগৃহে একরকম বিধবার জীবনই যাপন করতে লাগল।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন "কুলীনরা অর্থের জন্যই বিবাহ করে, বিবাহ যে দায়িত্ব আনে তা বহন করবার কোনও উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। ফলে তাদের পত্নীরা নামে মাত্র বিবাহিত হয়, বিবাহিত জীবনের কোনও সুখভোগের আশা তাদের থাকে না। ফলে তাদের মনে যে ভালবাসার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে হৃদয়ে শুকিয়ে যায়, অথবা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দোষে এবং কামনার তাড়নায় তারা দুর্নীতিস্পৃষ্ট হয়।"

এই শ্রেণীর মেয়েদের সমস্যা বিধবাদের সমস্যার সঙ্গে তুলনীয়। কাজেই বিধবাবিবাহ রীতি প্রচলিত হবার পর জনমত বহুবিবাহ প্রথার বিপক্ষে গড়ে উঠতে লাগল। বিদ্যাসাগর তখন এই প্রথা রহিত করবার সপক্ষে আন্দোলনে নামলেন। প্রথমত জনমত গঠনের জন্য তিনি প্রচার পুস্তিকা লিখলেন। তারপর তিনি সরকারের নিকট স্থাপনের জন্য একটি আবেদন পত্র রচনা করে তাতে ২১,০০০ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। আবেদন পত্রের তারিখ হল ১লা ফেব্রুআরি, ১৮৬৬। তাতে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নদীয়ার মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই আন্দোলন শুধু কলিকাতায় সীমাবদ্ধ থাকে নি; ঢাকা শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বের ভার নিয়েছিলেন। বোঝা যায় নবজাগরণের হাওয়া পূর্ববঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের মনের কথা ভাষা পেয়েছিল রামচন্দ্র চক্রবর্তী নামে ঢাকার এক কবির কবিতায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি সেনাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাইনা গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি শরষাণ কর গো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।

কবিতাটির অর্থবোধ করতে হলে তার পরিবেশের সঙ্গে কিছু পরিচিত হয়ে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন সিপাই বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার সোজাসুজি গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের রাণী ভিক্টোরিয়া আমাদের সম্রাজ্ঞী হয়েছেন। ক্যাম্বেল তখন ছিলেন বাংলার লেঃ গভর্নর। এখন কবিতাটি বোঝা সহজ হবে। বক্তব্য হল, রাসবিহারীর সাহায্যে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে কুলীন নারীগণ নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবেন।

কিন্তু এ আন্দোলন সফল হয় নি। সম্ভবত

তার প্রধান কারণ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন। কোম্পানীর আমলে সরকার আইন করে হিন্দু-সমাজ সংস্কারের যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, মহারাণীর আমলে সে নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সম্ভবত সিপাই যুদ্ধের পর ভারত সরকার নূতন করে ঝুঁকি নিতে সাহস করেন নি। এই দাবী পূরণ করতে হিন্দু নারীদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। জনমত ও অর্থনীতির চাপে বহুবিবাহ-প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দুকোড পাশ হওয়ায় পুরুষের বহু-বিবাহের অধিকার লোপ হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্তি, দুর্ভাগ্যের সময় মহিলাদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তার চিন্তা। অকালে স্বামী মারা গেলে বা বার্ধক্যে তাদের অর্থকষ্ট হতে মুক্ত রাখবার জন্য তিনি পারিবারিক পেনসনের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে তাঁর চেষ্টায় 'হিন্দু ফ্যামিলি এন্যুয়িটি ফাণ্ড' স্থাপিত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তার প্রথম ট্রাস্টি ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরাট মানুষ ছিলেন। তাঁর অনেক কীর্তি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অকারণে তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' আখ্যায় ভূষিত করেন নি। তাঁর সকল কীর্তির মধ্যে আমার মনে হয় নারীজাতির উন্নয়নের চেষ্টা তাঁর জীবনে সব থেকে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই দেখি তিনি নানা ভাবে নারীজাতির সেবা করে এসেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা তাঁর জীবনের সব থেকে মহৎ কর্ম। নারীজাতির অধঃপতিত দশা হতে তাকে উন্নীত করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তাঁর হৃদয়বত্তা এবং সংবেদনশীলতা। অন্যের সেখানে দৃষ্টি পড়ে নি, অথচ তাঁর পড়েছিল; তার কারণ তিনি তাঁদের থেকে হৃদয়বত্তা-গুণে অধিক ভূষিত ছিলেন। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীমাতৃ-স্মরণে

শ্রীমতী আশা রায়

ওই মুক্ত-কুন্তলা অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা দেবী-মানবীর অনন্তকরুণাভরা স্থির আয়তদৃষ্টি! মনে হয় যেন যুগযুগান্তের অনাগত অগণিত সন্তানদের জন্য মঙ্গলাশিস বর্ষিত হচ্ছে অশেষ বাৎসল্যময়ী মাতৃমূর্তির স্নেহ-অপাঙ্গ হতে। ওই মমতাময়ী কল্যাণময়ী দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বিশ্বজননীর সেই চিরন্তনী আশীর্বাণী :

'মোর আশীর্বাদ আর ভালবাসা
সকলেরই তরে আছে।
যারা আসে নাই, যাহারা আসিবে
আর যারা আসিয়াছে ॥'

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে মা ভগবতী জীব-কল্যাণে পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হন :

নিত্যা সেই ভগবতী জন্ম নাহি যার।
পুনঃ পুনঃ জন্ম ধরি পালেন সংসার ॥

কিন্তু একি অভূতপূর্ব আবির্ভাব! লজ্জাপটাবৃতা সরলা পল্লীবধূ, কে তাঁকে চিনতে পেরেছিল? চিনেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। বলেছিলেন 'ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।' আর চিনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্তানগণ। স্বামীজী চিঠিতে লিখছেন—'মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখন কেহই পার না। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হয় না, মা ঠাকুরুন ভারতে পুনরায় সেই

শক্তি জাগাতে এসেছেন, ক্রমে সব বুঝবে।…যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।'

তাঁর পুণ্য আবির্ভাব-তিথির প্রাক্লগ্নে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর মহিমা স্মরণ করে এত কথা মনে ভিড় করে আসে যে ভাষা কূল পায় না। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথায় বলি:

সৌম্যাঽসৌম্যতরাশেষ-সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে মন যখন বিধ্বস্ত অশান্ত দিশেহারা তখন পাই আশার আলো, পথের সন্ধান—মাতৃ-অনুধ্যানে। অপার করুণাময়ী করুণাধারায় সিঞ্চিত করে সবাইকে কোলে টেনে নিয়ে শ্রেয়ের পথ দেখিয়ে গেছেন। সে-করুণায়—সে-স্নেহে ছিল না কোন দ্বিধা, কোনও বৈষম্য। বলেছেন "আমি সৎ-এরও মা, অসৎ-এরও মা। স্বামী সারদানন্দ তাঁর সন্তান, মুসলমান ডাকাত আমজদও। ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে মাকেই তাকে পরিষ্কার করে কোলে নিতে হয়।

আজ আমরা অবাক হ'য়ে ভাবি সেইকালে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-ঘরের কন্যা ও বধূ হয়ে ভক্ত সন্তানের জাতিগত বর্ণগত ভেদের ঠাঁই ছিল না তাঁর মনে। স্বামীজী লিখছেন 'শ্রীমা এখানে (কলিকাতায়) আছেন। ইওরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ভাবিতে পার, মা তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে খাইয়াছিলেন। ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?' এখনকার দিনে আমরা তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার কঠোরতা অনুধাবন করতে পারি না। সেই যুগে শ্রীশ্রীমা বিদেশিনীদের চিবুকে হাত দিয়ে চুম্বন এবং প্রসারিত হস্তে হস্ত ধারণ করে তাদের 'এস' ব'লে সাদরে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তিনি সমাজবিধি কি ভাঙতে এসেছিলেন? না—তিনি গড়তে এসেছিলেন, গড়েই গেছেন। আজ আমাদের মধ্য থেকে এই ঘৃণা বা স্পর্শদোষ-দুষ্টতা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়েছে, এ তাঁরই শিক্ষার ফল।

পূজনীয়া গৌরীমা তাঁর মানসকন্যা দুর্গামাকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে উৎসাহী ছিলেন না, কিন্তু শ্রীশ্রীমা যখন বললেন, 'আমার মেয়ে কিন্তু ইংরেজীও পড়বে', তাঁর কথা গৌরীমা শিরোধার্য করে নিয়ে বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে, মা।' সেইকালে যখন স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল না তখন বোসপাড়া লেনে তিনি স্বহস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজো করে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ঐ বিদ্যালয়কে বরাবর প্রীতির চক্ষে দেখতেন। বিদ্যালয়ের মেয়েরা তাঁর কাছে এলে পড়াশুনার কথা আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন। একবার দুটি মাদ্রাজী ছাত্রী এলে তারা ইংরেজী জানে শুনে বাংলা কথার ইংরেজী করিয়ে শুনলেন। শ্রীশ্রীমার পালিতা কন্যা ও ভাইঝি রাধুদিদি বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে বিবাহের পরে স্কুলে যাওয়ায় আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীমার নির্দেশে তা বন্ধ হয়নি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন 'ও জ্ঞান দিতে এসেছে।' আজ যে দেশের মেয়েদের মধ্যে এই জ্ঞানলাভের প্রসারতা এ তাঁরই শিক্ষার ফল। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, 'মা ঠাকরুনকে অবলম্বন করে আবার গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।'

স্বামীজী আমেরিকা যাবেন সংকল্প প্রায় স্থির করেও নিশ্চিত হতে মায়ের মত ও আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি দিলেন। প্রিয় সন্তানকে সাগরপারে দূর বিদেশে যেতে মত দিতে মায়ের মন বেদনায় ভরে উঠলেও ছেলে তাঁর কালাপানি পার হলে জাতিচ্যুত হবে একথা মনেও এল না। তিনি বুঝলেন এর প্রয়োজন আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বলেছিলেন, তিনি জ্ঞানদাত্রী মহাবুদ্ধিমতী। তিনি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে উত্তর দিলেন। সে

চিঠি পেয়ে স্বামীজী আশ্বস্ত হয়ে উল্লাসে বলে উঠলেন— 'আঃ এতক্ষণে সব ঠিক হল, মারও ইচ্ছা আমি যাই।'

স্বামী প্রেমানন্দ লিখেছেন— 'মাকে কে বুঝেছে ?··· ঐশ্বর্যের লেশ নেই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল ; ·· কিন্তু মার ?— তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি!— জয় মা! জয় মা! জয় মহাশক্তিময়ী মা!··· যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে - সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন — অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা!—আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত "বাজিয়ে বাছাই করে" লোক নিতেন! ·· আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখ্‌ছি?— অদ্ভুত! অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন—সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন,—আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা!'

তিনি আরও লিখেছিলেন—'তোমরা দেখে ত এলে ?— রাজরাজেশ্বরী, সাধ করে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়্‌ছেন।— এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন! ··অত কষ্ট কচ্ছেন, গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য— অপরিসীম করুণা— সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!···জয় মা! জয় মা!'

ভক্ত গিরিশচন্দ্র আবেগভরে বলেছিলেন— 'ভগবান ঠিক আমাদেরই মত মানুষ হয়ে জন্মান এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজ করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি, সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।'

তাঁর এই বিশ্বব্যাপী মাতৃত্ব থেকে কেউ বঞ্চিত হত না। জনৈক ভক্তকে মা পূজার সময় কাপড় কিনতে দিলে ভক্ত দেশী মোটা কাপড় আনায় কারুর পছন্দ হল না এবং ফেরত দিয়ে মিহিকাপড় আনতে বলায় ভক্তটি বললেন, 'ওসব ত বিলিতি হবে?' শ্রীশ্রীমা শুনে মৃদু হেসে বললেন, 'বাবা তারাও ত আমার ছেলে।' স্বামীজীর শিষ্যা শ্রীমতী ম্যাকলাউড শ্রীশ্রীমার স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ ও আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন 'আমি তাঁকে দেখেছি —পবিত্রতাস্বরূপিণী মা।' ভগিনী নিবেদিতা মাকে লিখছেন—'ভালবাসায় ভরা মা আমার! তোমার সেই ভালবাসায় আমাদের মত উচ্ছ্বাস আর উগ্রতা নেই, এজগতের ভালবাসাও তা নয়, স্নিগ্ধ শান্তির মত তা সকলের কল্যাণ নিয়ে আসে, লীলাচঞ্চল সোনালী আলোর আভা যেন।' বিদেশিনীরা তাঁর স্নেহকোমল ব্যবহার ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদের আবেগ উচ্ছ্বাস এইভাবে ব্যক্ত করেছেন।

উদ্বোধনে এক ভক্ত মেয়ের শিশু-সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের কাছে শুয়ে কম্বল নোংরা করে ফেলে। কম্বলটি ধুতে নিয়ে যাবার সময় মেয়েটি আপত্তি করলে, মা বললেন 'কেন ধোব না, ওকি আমার পর?' ভক্ত শিষ্যদের এঁটো পরিষ্কার করতেন, এতে কেউ আপত্তি জানিয়ে বললেন— 'তুমি বামুনের মেয়ে আবার গুরু—এরা তোমার শিষ্য। তুমি এঁটো নাও কেন?' শ্রীমার সহজ উত্তর— 'আমি যে মা গো!' শ্রীমার ভাইঝি নলিনীদিদি বলেছিলেন, 'মা গো! ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!' শ্রীমা শুনে বললেন, 'সব যে আমার, ছত্রিশ কোথা?'

দেবী হয়ে মানবীরূপে নিজেকে আবৃত করে রাখলেও বিজলী ঝলকের ন্যায় চকিতে তাঁর দেবীত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত। ভক্ত জিজ্ঞেস করছেন, 'মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান হন তবে আপনি কে?'

কিছুমাত্র ইতস্তত না করে মা উত্তর দিলেন, 'আমি আর কে, আমিও ভগবতী।' ভাশুরপুত্র শিবুদাদা মার স্নেহের পাত্র। তার কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তিনিই কালী। লজ্জাশীলা সদা-নম্রা মৃদুভাষিণী হয়েও উন্মত্ত হরিশের মত্ততা দমন করতে তাঁর নিজমূর্তি ধারণের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন। শ্রীমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী সুরবালা দেবী অপ্রকৃতিস্থা ছিলেন। উদ্বোধনে একদিন তিনি বিড বিড করে মাকে কটূক্তি করে চলেছেন। পূজাশেষে মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কত মুনি-ঋষি তপস্যা করেও আমায় পায় না, আর তোরা পেয়ে হারালি।' সুরবালা দেবী সারারাত শ্রীমাকে গাল দিয়েছেন 'ঠাকুরঝি মরুক, ঠাকুরঝি মরুক।' প্রভাতে সেকথার উল্লেখ করে মা বললেন, 'ছোট বউ জানে না আমি মৃত্যুঞ্জয়।' জয়রামবাটীর পাচিকা ব্রাহ্মণীর অধিক রাত্রে অশুচিস্পর্শ হয়েছে; অত রাত্রে বৃদ্ধার স্নান সহ্য হবে না, আবার শুধু গঙ্গাজলস্পর্শতেও মন উঠছে না। পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীমা বললেন, 'তবে আমায় স্পর্শ কর।'

শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুরে শেষ রোগশয্যায় শ্রীমাকে বলেছিলেন—'দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে, তুমি তাদের দেখো', আর নিজ দেহ ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এ আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে। শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।' জীবোদ্ধারে নিজেকে উৎসর্গ করে, অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করেও, শ্রীশ্রীমা সে-দায় পালন করে গেছেন। উত্তরকালে তিনি বলতেন, 'আমার কাছে ঠাকুর পিঁপড়ের সার ঠেলে দিয়েছেন; আমার কত ছেলেকে দেখতে হচ্ছে।'

লজ্জাশীলা সেবাপরায়ণা মিষ্টভাষিণীর মৃদু ব্যবহারে তাঁর দেবীত্বকে অনেকেই বুঝতে পারত না। উদ্বোধনে পানিবসন্ত হলে শীতলা দেবীর এক সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীমার চিকিৎসা করতে নিত্য আসতেন। শ্রীমা প্রত্যহ গলবস্ত্র হয়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতেন। জয়রামবাটীর পাচিকা ব্রাহ্মণীকে শ্রীমা মাসীমা বলতেন, বিজয়া দশমীতে তার আপত্তি সত্ত্বেও তাকে তিনি প্রণাম করেছেন। এমনি ছিল তাঁর ঔদার্য ও বিনয়-নম্র ব্যবহার। আর অসীম ছিল তাঁর ক্ষমা ও ধৈর্য। শেষজীবনে পিতৃকুলের আত্মীয়দের নিয়ে তিনি বাস করতেন। একটী ভ্রাতৃবধূ পাগল, ভাইঝিরা কেউ অবুঝ, রুগ্ন, কারও শুচিবাই; ভ্রাতাদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ঈর্ষা মনোমালিন্য সর্বোপরি অনটন, কিন্তু তিনি জাগতিক সুখদুঃখের ঊর্ধ্বে ধীর স্থির অচঞ্চল, একাধারে জননী গৃহিণী ও সন্ন্যাসিনী। যেন মনে হয় লোকশিক্ষা ও আদর্শ স্থাপনের জন্য মহামায়ীরই সৃষ্ট ঐ দুঃসহ পরিবেশ।

কতভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর আচরণ ও এক একটি বাক্যের অনুধ্যানে একটা আদর্শ জীবন গড়ে উঠতে পারে।

লীলাসংবরণের কদিন আগে বিষাদে বিচলিত ভক্তমেয়েকে রোগক্ষীণকণ্ঠে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'তবে একটি কথা বলি - যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' আমাদের প্রতি এই তাঁর অন্তিম বাণী।

আয়াহি বরদে শুভদে দেবি সারদে

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈদিক যুগে নারী পুরুষের সহিত সমভাবে শিক্ষিতা হইতেন, ব্রহ্মচর্য ব্রতধারণ করিয়া উপনয়ন সংস্কারোত্তর বেদপাঠাদি সর্বকর্মে সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন, এমন কি ব্রহ্মবাদিনী পর্যন্ত হইতেন, ইহার বহু দৃষ্টান্ত বর্তমান। পৌরাণিক যুগেও নারীগণ ধর্ম বিজ্ঞান দর্শনাদি সর্বক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইতেন, তাহারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। লোপামুদ্রা বিশ্ববারা ঘোষা সুলভা গার্গী মৈত্রেয়ী বাচক্নবী প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ সকল হিন্দুর নিকটই ব্রহ্মজ্ঞা বলিয়া পরিচিতা। ভারতের নারীর আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী এবং হিন্দুর নিকট তাঁহারা চির-আরাধ্যা। ঐতিহাসিক যুগেও চিতোরের রাণী পদ্মিনী, মেবারের রাণী মীরাবাঈ, ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী দুর্গাবতী, সুলতানা রিজিয়া, চাঁদ বিবি প্রমুখ অসংখ্য নারী স্বদেশপ্রীতি বীরত্ব রাজনৈতিক প্রতিভা ধর্মনিষ্ঠা কর্মদক্ষতাদি নানাবিধ গুণে ভূষিতা ছিলেন এবং চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন।

ভারতে বহু শক্তিপীঠ চতুর্দিকে। তীর্থস্থানে মঠে মন্দিরে ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতীকে পূজা বহুল প্রচলিত। প্রান্তরে কান্তারে পর্বতে উপত্যকায় বহু শক্তিপূজার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই ভারতে বৎসরের প্রায় প্রতি মাসেই মাতৃপূজার সমারোহ সর্বজনবিদিত।

আবার এই ভারতেই কালের বিচিত্র গতিতে নারীজাতির অশেষ লাঞ্ছনা ও অবমাননা দেখা দিল। নারীকে অবহেলা ও হেয়জ্ঞান করায় নারী ও পুরুষ উভয়েই অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। 'নারী নরকের দ্বার'—এই উক্তি ভারতেই প্রতিধ্বনিত হইল। নারীর প্রতি পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলির ন্যায় ব্যবহার প্রযুক্ত হইল। অবরোধ-প্রথা প্রবর্তিত হইল, কারণ ইহাই নাকি নারীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। নারীর বিদ্যার্জন নীতি-বিগর্হিত পরিগণিত হইল। যে-দেশে নারীকে শক্তি-স্বরূপিণী বলা হইয়াছিল, প্রত্যেক নারীই জগজ্জননীর অংশ বা জীবন্ত বিগ্রহ বলা হইয়াছিল, সেই দেশেই পুরুষেরা যথেচ্ছ সমাজবিধি প্রবর্তন করিয়া সমাজে নারীর সর্ব-প্রকার অবদানের সুযোগ সমূলে উৎপাটন করিল। পরিণাম জাতির সর্বাঙ্গীণ অধঃপতন।

এই পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হইলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। নারীজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য এক আদর্শ নারী-চরিত্রের প্রয়োজন জানিয়াই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা সারদা দেবীকে এই ধরাতলে আনিলেন। দশপ্রহরণ-ধারিণী দনুজদলনীরূপে নয়, ত্রিলোকপালিনী মাতৃ-মূর্তিতে, মাতৃস্নেহের পীযূষধারা সমভাবে সর্বজীবে বিতরণকল্পে অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী।

'বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর এই মাটিতে—
জয়রামবাটীতে, জয়রামবাটীতে।'

নারীজীবনের আদর্শ স্থাপন করিতেই এইবার অবতরণ, তাই দেখি চিন্ময়ী শক্তি-স্বরূপিণী মানব-দেহে কোমলতা দয়া ধৃতি লজ্জা বিনয় ধৈর্য ক্ষমা সেবা তুষ্টি সংযম পবিত্রতা আদি অসংখ্য সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃতা। ভগিনী নিবেদিতার কথায়— 'শ্রীমা সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভারতীয় নারী-আদর্শের শেষ কথা।'

ভারতাত্মার তপ্তশ্বাস, হাহাকার ও আকুল ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিয়াছিল, তাই তিনি

অনন্ত করুণায় সশক্তিক অবতীর্ণ হইলেন ভূভার হরণের জন্য। ভারতের আশু প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিপথে চালিত, বলদর্পী পাশ্চাত্যের পদলেহনকারী, আত্মশক্তিতে আস্থা-হীন, ঋষিদিগের বাণীতে বিশ্বাসহীন, জড়ের মোহে দিশেহারা, ভোগসর্বস্ব ও ইহসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতে গা-ভাসাইয়া-দেওয়া ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ সংস্কার ও পরিবর্তন—আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল এক মহীয়সী শক্তিময়ী নারীর, যিনি ভারতকে— তথা জগৎকে —বিশুদ্ধ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষাদান করিবেন। স্বয়ং জগজ্জননী নারীবিগ্রহে অবতীর্ণা হইলেন সেই দুরূহ কার্য সম্পাদনে।

শ্রীমার শ্রীমুখের বাণী, 'বাবা জান তো, ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'

'ভোগলোলুপ ও ইহলোক-সর্বস্ব দেহাত্মবাদী মানবসমাজকে উচ্চতর অনুভূতির রাজ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীভগবতীর এই যুগে মাতৃমূর্তিতে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল। তাই অপূর্ব চেতনবিগ্রহে ভারতে অবতীর্ণা হইয়া ধন্য করিলেন ভারতাত্মাকে।'

শ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণের পরেও বলিয়াছেন চিন্ময়দেহে দেখা দিয়া, ' না তুমি থাক, অনেক কাজ বাকী আছে।' কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে রোগশয্যায় শায়িত ঠাকুর মাকে বলিয়া-ছিলেন, 'তোমায় অনেক কিছু করতে হবে।' আরও বলেন ঠাকুর, 'স্তাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।' ঠাকুরের আরও সব কথা, 'এ (নিজ শরীর দেখিয়ে) আর কি করেছে ? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।' 'শুধু কি আমারই দায় ? তোমারও দায়।' ঠাকুর মায়ের উপর বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে বলেন,

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।'

একবার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রশ্নে গৌরীমাতা বলেন,

'রাই হতে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী !
লোকের বিপদ হলে ডাকে মধুসূদন বলে,
তোমার বিপদ হলে পরে বাঁশীতে বল,
"রাই কিশোরী"।'

স্বামী বিবেকানন্দের কথা : 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তি-হীন কেন ?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাক্‌রানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।··· রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ ! শক্তির কৃপা না হ'লে কি ঘোড়ার ডিম হবে !'

শ্রীশ্রীমা সকলেরই মা—এই তাঁহার পরিচয়। আমজদেরও মা, শরতেরও (স্বামী সারদানন্দ, মা। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই মা। পাপীতাপীরও যেমন মা, শুদ্ধসত্ত্ব সন্তানেরও তেমনই মা। চোর ডাকতেরও মা আবার অনাঘ্রাত কুসুমসদৃশ পবিত্র দেবশিশু-প্রতিম নিষ্পাপ সন্তানেরও মা। শুধু তাহাই নয়— জীবজন্তু পর্যন্ত এই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত নয়। সকল জীবেরই মা। লজ্জাপটাবৃতা অবগুণ্ঠিতা চেতন মাতৃবিগ্রহের চতুর্দিকে মাতৃস্নেহের সে-দ্যুতি আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়া সকলেরই প্রাণ-মন অভিভূত করিত, কেহই বাদ

পড়িত না। তেলোভেলোর বাগদি পাইক ও বাগদিনী সাক্ষাৎ-মাত্রেই স্নেহ ও মমতায় বিগলিত হইয়া পড়ে—এমনই মহিমা মায়ের। সন্তান কখনও মাকে সঙ্কোচ করে না, মাতৃক্রোড় তাহার নিশ্চিত আশ্রয় সর্বকালে সর্বাবস্থায়। বহু দূর-দূরান্তর হইতে মাতৃসান্নিধ্যে অপরিচিত পরিবেশে মাতৃদর্শন-মানসে পূর্বে কোনও সংবাদ না দিয়া কোনও সন্তান একক বা সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত—কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে ভাবিয়া দ্বিধাজড়িত পদে ইতস্ততঃ করিয়া মাতৃসান্নিধ্য লাভ করিবামাত্র সকল দ্বিধাসঙ্কোচ চলিয়া গেল এবং যেন বহু পরিচিত মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এইরূপ বোধ করিতে থাকিল এবং চালচলন ও ব্যবহার স্বচ্ছন্দ হইল—যেমন মায়ের নিকটে হইয়া থাকে।

'মা হওয়া কি মুখের কথা,
(কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা),
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।'
'কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখন ত।'

সাধক রামপ্রসাদের এই সার্থক আকুতি শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী সান্নিধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপপরিগ্রহ করিত প্রত্যেকটি সন্তান-হৃদয়ে।

শ্রীমা তদানীন্তন গ্রাম্য সঙ্কীর্ণ আচার-বিচারের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াও প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক বিধানের বিরোধিতা না করিলেও, নানাভাবে নিজ সমাজ-গণ্ডির মধ্যেই পূর্ণ উদারতার উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'ভক্তের জাতি নাই। সকল ভক্তই একজাতি।' এবং তাহাই পঞ্চম সন্তান আদিমূলমের ব্যাপারে প্রমাণিত হয়। মাদ্রাজের বালক আদিমূলম্ মাতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষায় মায়ের বাসস্থানের সম্মুখে বসিয়া থাকিত। মায়ের নির্দেশে সেবক আদিমূলম্‌কে মাতৃসকাশে লইয়া যায়। এবং যাইতে হইল ঠাকুরঘরের মধ্য দিয়া—অন্য পথ ছিল না। মা বালককে দীক্ষা দিয়া মহামন্ত্র দান করেন। এখানেই শেষ না হইয়া শ্রীশ্রীমা বালকের হাতে একবাটি প্রসাদ দিয়া তাহা উপস্থিত ভক্তগণকে বিতরণ করিতে পাঠাইয়া দেন। এই ঘটনা মাদ্রাজে ঘটে, যেখানে পঞ্চমকে ঘৃণ্য পশুরও অধম বিবেচনা করা হইত।

শ্রীশ্রীমা ভাইদের সংসারে শতপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও বিচিত্র-চরিত্র আত্মীয়বর্গ লইয়া যেরূপ নির্লিপ্তভাবে অথচ সকল দিক বিবেচনা করিয়া, সকলের মন রক্ষা করিয়া, সকলের অত্যাচার অন্যায় আবদার অম্লানবদনে নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। বলিতে পারা যায় মায়ের ছিল খ্যাপার হাটবাজার। কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ী সদা আনন্দে বিরাজ করিয়াছেন এবং সকল অন্যায় আবদার অত্যাচার সহ্য করিয়া সকলকেই সমান স্নেহে পালন করিয়াছেন। ঠাকুরের উপদেশ—যে সয় সেই রয়—যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন—শুধু মাত্র কথার কথা না থাকিয়া শ্রীমায়ের নিজ দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবে রূপায়িত দেখা যায়। সুতরাং শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনবেদপাঠে সংসারী মানুষের সমুচিত শিক্ষালাভ হইবে—সংসার-জীবনের প্রকৃত আদর্শ-লাভের সন্ধান মিলিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের সংসারে পরিচিত, অপরিচিত, রক্তসম্পর্করহিত স্ত্রীপুরুষ মায়ের দর্শনপ্রার্থী, আশ্রয়প্রার্থী, মাতৃস্নেহের কাঙ্গাল হইয়া ছুটিয়া আসিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু পবিত্রতাস্বরূপিণী মায়ের সান্নিধ্যে সবাই যেন, ভ্রাতাভগ্নী—মাতৃ-ক্রোড়ের শিশু। কি পবিত্র ভাবই না বিরাজ করিত মাতৃসান্নিধ্যে! কি অপরিসীম অপার্থিব দিব্যভাব! ঠাকুরের নিকট জ্ঞানী গুণী ধর্মপ্রাণ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন শুদ্ধসত্ত্ব সব ভক্ত আসিত;

কিন্তু মায়ের অবারিত দ্বার। মনে হয় আপামর সাধারণের জন্য সংসারমরু মাঝে সুশীতল মরুদ্যান। আসিয়া শীতল পানীয় গ্রহণ পূর্বক তৃষ্ণা নিবারণ কর, সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ে ক্লান্ত দেহমন সুস্থ কর, পথের সম্বল কিছু সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মরুযাত্রা আরম্ভ কর।

তদানীন্তন সামাজিক রীতি অনুযায়ী শ্রীমা বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন নাই। স্বকীয় চেষ্টায় কিছুটা শিক্ষা করিয়া পরে রামায়ণাদি পাঠে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীজাতির বিদ্যার্জনে উৎসাহ দিতেন। অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত নারীজাতির বিদ্যার্জন দ্বারা প্রগতির পথিকৃৎ ভগিনী নিবেদিতার নারী-শিক্ষা-প্রকল্প মায়ের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা লাভে ধন্য ও সার্থক হয়। শ্রীমা বালিকাদিগের ত্যাগপূত জীবন যাপনেরও সমর্থন করিতেন। বাল্যবিবাহ তিনি আদৌ সমর্থন করিতেন না।

শ্রীশ্রীমায়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের কত উক্তিই না মনে পড়ে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহাদের কয়টিরই বা উল্লেখ করা চলে! স্বামীজীর কথা :

'দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব তবে আমার নাম।... দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, "কো রামঃ?" দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন, যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।'

স্বামী প্রেমানন্দ এক পত্রে লিখেন, 'মাকে কে বুঝেছে?...ঐশ্বর্যের লেশ নেই! ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল; কিন্তু মার?—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত! এ কি মহাশক্তি! জয় মা! জয় মা! জয় মহাশক্তিময়ী মা!... যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে— সব মার নিকট চালান দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন।— অনন্তশক্তি— অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস— স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি! তিনিও কত "বাজিয়ে বাছাই করে" লোক নিতেন!... আর এখানে— মার এখানে কি দেখছিস? অদ্ভুত, অদ্ভুত! সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন— সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন— আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে! মা! মা! জয় মা!!'

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ সাধু নাগ মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের করুণা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।'

সরলা, আধুনিক শিক্ষাবিহীনা ও আভিজাত্য-শূন্যা মাকে চিনিতে পারা সত্যই দুরূহ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'ছাই চাপা বেরাল।' আবার ঠাকুরই বলিয়াছেন, 'ও সারদা, সরস্বতী— জ্ঞান দিতে এসেছে।' আবার বলিয়াছিলেন, 'ও জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী। ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা— ৺ভবতারিণীর সহিত অভিন্না—শ্রীমা একাধারে দেবী ও মানবী। দেবী হইলেও জগদ্বাসী তাঁহাকে পাইয়াছিল মমতাময়ী জননীরূপেই। জগতের যত যশস্বী পুরুষপ্রবর সকলেই মাতৃভক্ত, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মেসিডনিয়ার সম্রাট দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের নিকট, যখন রাজকার্যে অবাধ হস্তক্ষেপ হেতু তাঁহার মাতা ফিলিপ্পার বিরুদ্ধে রাজপুরুষেরা নালিশ করে, তখন তাঁহার উত্তর প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: 'ইহারা জানে না আমার মায়ের এক বিন্দু অশ্রু এইরূপ শত সহস্র নালিশ ধুইয়া দিতে পারে।' এইরূপ কতই না ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে! মাতৃভক্তিতেই তাঁহারা বড় হইয়াছিলেন। জগজ্জননীর অংশরূপিণী গর্ভধারিণীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করায় যদি এইরূপ উন্নয়নকারী শক্তি সংগৃহীত হয়, তবে সর্বারাধ্যা মহাশক্তির সাক্ষাৎ

জগন্মাতার আরাধনা-ভক্তি-শ্রদ্ধায় কিনা হইতে পারে!

'ষড়দর্শনে না পায় দরশন' যাঁহার, দেবতা মুনি ঋষি যাঁহাকে মনবুদ্ধির অতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মশক্তি মহামায়ার সম্বন্ধে কিছু বলা বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবার চেষ্টার সমতুল্য, সন্দেহ নাই। চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখিয়া শিশুরা যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় তেমনি এই হৃদয়-মুকুরে জগজ্জননী মহাশক্তির যতটুকু প্রতিফলন তাহাতেই প্রাণমন পরিপূর্ণ। সীমিত মনবুদ্ধি দ্বারা সেই মনবুদ্ধির পারের ভাগবতীসত্তাকে আর বেশী কি বুঝিব? তবে তাঁহার কৃপা হইলে সকলই সম্ভব। কবি গাহিয়াছেন—'পঙ্কে বন্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।' তাঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—অঘটনও ঘটে!

এমন করুণাময়ী মা অবতীর্ণা হইয়া আমাদিগকে মাতৃভাবের প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন মাকে ভুলিয়া না যাই। সাধক রামপ্রসাদের সাথে সুর মিলাইয়া যেন বলিতে পারি—

'ধাতু-পাষাণ-মাটির মূর্তি
কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি—বসাও
হৃদিপদ্মাসনে॥
ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি মন তাও
জান না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি গড়িয়ে করলি
উপাসনা॥'

আত্মকেন্দ্রিক আত্মসর্বস্ব ভোগৈষণা-প্রমত্ত অব্যবস্থিতচিত্ত মোহান্ধ তোমার সন্তানগণকে শ্রেয়ের পথ দেখাও, মা! সংযমহীন আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লও, মা করুণাময়ী! আমাদিগকে মানুষ কর, মা! অহেতুক-কৃপাময়ী, তোমার কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

'(ও মা) দীনতারিণী তারা!
দিনে দিনে দিন কেটে গেল মাগো
কতদিন আর রব তোমা ছাড়া॥
পাঠালি যদি মা এ ভব সংসারে
(কেন) চির পরাধীন করিলি আমারে।
পরাধীনতার সহে না যাতনা
নে মা কোলে তুলে ওমা দুখহরা॥'

সমালোচনা

মূর্তিবন্দী মহাত্মা: মনকুমার সেন। **প্রকাশক:** আনন্দ ভবন, ১৮ আনন্দগড, কলকাতা ৭০০-০৫৬। (১৯৭৪), পৃষ্ঠা ১১৩, মূল্য চার টাকা।

মূর্তিবন্দী মহাত্মা শ্রীমনকুমার সেনের তেরোটি প্রবন্ধের সংগ্রহ। নামেই প্রকাশ, রচনাগুলি মহাত্মা গান্ধী-কেন্দ্রিক।

লেখাগুলির বৈশিষ্ট্য: প্রথমত, এগুলিতে মহাত্মাজীকে একটি বৃহৎ ও উদার পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখা হয়েছে। শ্রীচৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসাধক হিসাবে মহাত্মাজীকে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন লেখক। তাঁর মতে বেদান্তের বৈপ্লবিক ও ব্যবহারিক সম্ভাবনাকে একটি দিকে সত্য করে তোলার জন্যই মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব।

দ্বিতীয়ত, এগুলিতে মহাত্মাজীর বাণীর সঙ্গে তাঁর জীবনকে মিলিয়ে বোঝার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহাত্মাজীর নিজের বিষয়ে নিজের একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেখক—'ব্যবহারিক আদর্শবাদী'। নানাভাবে বলেছেন যে, মহাত্মাজী ছিলেন আচরণনিষ্ঠ জননায়ক, জীবনব্রত নায়ক, তাঁর জীবন প্রয়োগসিদ্ধ। তাঁর

জীবনদর্শন প্রয়োগবাদী ও নিয়ত গতিশীল। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তুলে ধরেছেন —সর্বোদয়ের তত্ত্ব; চিন্তা-কর্ম-আচরণে সত্য-প্রেম-সেবার তাৎপর্য; অহিংসার গুরুত্ব; জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদের সম্পর্ক।

তৃতীয়ত, লেখক চেয়েছেন মহাত্মাজীর উত্তর-কাল তাঁকে বিচার করুক, তাঁকে নিয়ে বিতর্ক করুক, তাঁর সমালোচনা করুক, কিন্তু অন্ধ ভক্তি বা অন্ধ বিদ্বেষ— যা একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ— যেন না করে। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে মহাত্মা গান্ধীর বাণী ও সাধনার সুফল ফলানোর জন্যই তিনি আন্তরিকভাবে চান— মহাত্মাজীকে মূর্তিবন্দী না করে তাঁর জীবন ও দর্শনের শ্রদ্ধাশীল ও তন্নিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞান-সম্মত বিচার।

খোলা মন নিয়ে যে-কেউ এই বইটি পড়বেন তিনিই হৃদয়ে লেখকের সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক আবেদনের স্পর্শ অনুভব করবেন।

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিধর্ম-দর্পণ (বৌদ্ধদর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা) প্রথম খণ্ড : শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী। পরিবেশক : বড়ুয়া চৌধুরী এণ্ড কোং, ২৬ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (১৩৮১), পৃষ্ঠা ১১৮, মূল্য পাঁচ টাকা।

বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ক অনেক পুস্তক-পুস্তিকা ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের 'পরমার্থতঃ বিশিষ্ট ধর্ম— অভিধর্ম' বিষয়ক গম্ভীর জ্ঞানপূর্ণ পুস্তকের বাংলা ভাষায় একান্ত অভাব ছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার সমুদ্রের মত বিশাল ও গম্ভীর অভিধর্ম-দর্শনকে তাঁর সার্থক সৃষ্টি 'অভিধর্ম-দর্পণ' গ্রন্থে প্রাঞ্জল রচনাভঙ্গীতে পরমনিষ্ঠার সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বৌদ্ধতত্ত্বজিজ্ঞাসু বাঙালী পাঠক-পাঠিকার কাছে বইটি নিঃসন্দেহে সমাদৃত হবে।

অভিধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়— চিত্ত ও চৈতসিক, চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণীবিন্যাস, রূপ ও ভৌতিক বস্তুর বিশ্লেষণ ও নির্বাণ-বর্ণনা। সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় অনূদিত বা আলোচিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে দার্শনিক পারিভাষিক শব্দগুলির প্রাঞ্জল সহজবোধ্য প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা নেই বললেই চলে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় যথা, হিন্দী ভাষায় বহু পালি মূল গ্রন্থের অনুবাদ ও বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধদর্শনের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে ও সেই প্রসঙ্গে অনেক পারিভাষিক পালি ও মহাযানে ব্যবহৃত দার্শনিক শব্দরাশির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কয়েকটি ক্ষুদ্র আকারের বৌদ্ধদর্শন বিষয়ক আলোচনা-গ্রন্থ থাকলেও, স্বর্গত পণ্ডিত অনন্তকুমার তর্কতীর্থ মহাশয়ের 'বৈভাষিক দর্শন'-গ্রন্থখানি ছাড়া গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার কোন গ্রন্থই নাই।*

লেখক অভিধর্মের এই প্রবেশিকা গ্রন্থে পারিভাষিক কঠিন দার্শনিক শব্দগুলির সরল ও সহজবোধ্য বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা সার্থক কিনা তা পৌনঃপুনিক আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারাই নির্ধারিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লেখক তাৎপর্যপূর্ণ বৌদ্ধদার্শনিক শব্দ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ'

* ফেব্রুআরি ১৯৭৫-এ এই সমালোচনা পাইবার পর জুন ১৯৭৫-এ অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ কৃত বাংলাভাষায় 'ক্ষণভঙ্গবাদ' নামক বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৯৬৩ সালে 'মাধ্যমক-কারিকা'র ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় উক্ত অধ্যাপক মহোদয় কৃত সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ ফার্মা কে. এল. মুখার্জি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।—সঃ

-এর সহজবোধ্য বিশ্লেষণ 'কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা' করেছেন (পৃঃ ১২), কিন্তু ইহাকে 'কার্য-কারণ-প্রবাহ' বলাই কি সমধিক যুক্তিযুক্ত নয়? লেখক নিজেও ভবচক্রের মূলকারণ অবিদ্যার ব্যাখ্যায় 'নদীর প্রবাহের মত কার্যকারণধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে,' এরূপ ব্যাখ্যাও করেছেন (পৃঃ ৪)। 'শৃঙ্খলা' শব্দে যেন আমরা একটি আবদ্ধতার আভাস দেখতে পাই।

গ্রন্থটিতে গম্ভীর অভিধর্মের অকপট ও আন্তরিক আলোচনায় শুধুমাত্র সাধারণ পাঠক-বর্গের নয়, বিদগ্ধমণ্ডলীরও উপকার হবে। লেখকের এই প্রয়াস সকলেরই প্রশংসা ও সমাদর লাভ করবে, এই আশা করি ও এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আরও আশা করবো শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় অদূর ভবিষ্যতে 'অভিধর্ম-দর্পণের' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ ক'রে ও বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা-গ্রন্থ ও অভিধর্ম কোষকারিকা প্রভৃতির প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রকাশ ক'রে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও ভবদুঃখনিরোধকামী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদার্হ হবেন। লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শ্রীভজগোবিন্দ ঘোষ
কিউরেটর, এশিয়াটিক সোসাইটি,
কলিকাতা

যুগে যুগে যার আসা : স্বামী সত্যানন্দ। প্রকাশক ও পরিবেশক : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা ৩৬, পৃঃ ২০৬, মূল্য সাত টাকা।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন : 'আমার মনে হয় আজকালকার দিনে জীবনরচিত লেখা হয় না। পঞ্চাশ বছর পরে মর্লের লেখা গ্লাডস্টোনের জীবনীও কেবল তথ্যমূলক গ্রন্থে পরিণত হবে। এইসব বিষয়ে বিজ্ঞানের আদর্শ সাহিত্যকে নষ্ট করেছে এবং আমরা কেবল পুঞ্জীভূত তথ্য সংগ্রহের কাজে নিজেদের প্রয়াসকে সীমাবদ্ধ রাখছি।'

আজন্ম সাধক স্বামী সত্যানন্দজী তাঁর রচনায় তথ্যকে মোটেই উপেক্ষা করেননি; কিন্তু প্রাধান্য লাভ করেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবমূর্তি। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবময় জীবনের ও সাধনমার্গের এই অপূর্ব আলেখ্য পাঠককে নিয়ে যাবে এক অতীন্দ্রিয় জগতে, যে জগৎটি আলোর, যেখানে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাম নিমেষেই যায় স্তব্ধ হয়ে, শান্ত হয়ে··অন্তরশিখাটি শুধু অভূতপূর্ব আনন্দে কম্পিত হতে থাকে।

স্বামীজীর ভাষা অনবদ্য। এই অতুলনীয় ভাষায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মনোজগতের যে ছবি পাঠকের নয়ন-সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো আকৃষ্ট না হয়ে পারে না—'সূক্ষ্মলোকের কথা—ভাবলোকের কথা, দিব্যলোকের কথা – আমরা স্থূললোকে স্থূলভাবে চাই পেতে, আর সেই অসম্ভব সম্ভব না হলেই হয় না। বিশ্বাস—হয় অপ্রত্যয়·· স্থূলের ক্ষুধাই, জড়ের আকর্ষণই এর প্রধান কারণ। আবার সব প্রত্যক্ষ, সব প্রত্যয় মনেরই খেলা-মাত্র···অবতারদের জীবন--সাধারণ জীবন নয়··· তাই এঁদের জীবনে জড়িয়ে থাকে অপ্রাকৃত অনেক কিছু, আর সেটি মেনে নেবার মত দৃষ্টি-ভঙ্গীরও হয় অভাব।' (পৃঃ ১২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য দর্শনাদি ভ্রমমাত্র - যুক্তি-বলে হলধারী যখন তা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন, তখন তাঁর বুক ভেসে গেল কান্নায়— 'সহসা দেখেন মেঝে থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে—চিন্ময় সে ধোঁয়া, আর তার ভেতর গৌরবর্ণ সৌম্য শ্মশ্রুল এক মুখ, জীবন্ত চিন্ময়—সেখান থেকে এক বাণী শুনলেন— "ভাবমুখে থাক্"—তিনবার এই কথা বলার পর ঐ শ্রীমূর্তি কুয়াসায়

গলে গেল—আর ঐ কুয়াসাও গেল সরে— মন এক শান্তিনিথরে সান্ত্বনায় গেল ভরে … '। (পৃ: ৩৮)

'একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়' —আকাশে যিনি মুক্ত তিনিই নীড়ে ফিরেন লীলাবিলাস-মানসে। শ্যামামায়ের দুলাল শুধু সাধুর রাজা নন, তিনি ভক্তেরও রাজা। তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করে শ্রেয়ের সন্ধান পেয়ে অভীষ্ট পথে চলে গেছেন বহু সাধু-সন্ত।'…কিন্তু যদি ডাক দেন নারায়ণ স্বয়ং তাঁর পাঞ্চজন্যে, আঁধার আত্মা জ্যোতির সমুদ্রে নিজেকে না হারিয়েই ত পারে না।' (পৃ: ১২৯) সেই আহ্বানে ছুটে এসেছেন ভক্তেরা— চিহ্নিত ভক্তেরা— লীলা-সহচরেরা। তাঁরা এসেছেন, হারিয়ে ফেলেছেন নিজেদের শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমসাগরে। তাঁর পদতলে বসে প্রস্তুত করেছেন নিজেদের—তাঁরই পতাকা বহনের উপযুক্ত করে। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে'—তাঁদের যাত্রা হয়েছে শুরু। বিস্ময় উল্কার মত ছুটে চলেছেন 'শিব জ্ঞানে জীব সেবার'-ব্রত উদ্‌যাপনে। বনের বেদান্তকে তাঁরাই নিয়ে এসেছেন ঘরে। সূচনা হয়েছে সত্য-যুগের।

পুস্তকখানির নিবেদনে শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় যথার্থই লিখেছেন, 'যে লোহা পরশমণির ক্ষণসান্নিধ্য লাভ করেছে তাকে যদি পরশমণির পরিচয় দিতে হয়—তা'হলে কথায় নয়—নয়নের জলে।' নয়নজলে নিবেদিত পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু তা কালজয়ী। ভক্তিরসপিপাসু পাঠকের নিকট তা চির আনন্দের খনি।

পরিশিষ্ট অংশ দুটিও মূল্যবান— (ক) শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ-কথিত বিশ্বজনীন গল্পগুলি শুধু মাত্র শুষ্ক নীতিকথা নয়— এইগুলি বিশ্বসাহিত্যের স্বর্ণমুকুট। এই অমূল্য সাহিত্যরাজি সমাজদেহে আর সমাজমনে অনন্তকাল ধরে পুষ্টি বৃদ্ধি ধৃতি শান্তি ও আনন্দ বিতরণ করবে; (খ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দিক্‌পাল দার্শনিকগণের মনোগ্রাহী আলোচনায় এই অংশটি সমৃদ্ধ। তুলনামূলক আলোচনার প্রশস্ত ক্ষেত্রে পাঠক নূতন চিন্তার খোরাক ও গবেষক নূতন আলোকের সন্ধান পেতে পারেন।

সর্বশেষে এই চমৎকার পুস্তকখানির পরিবেশনার কিছু কিছু ত্রুটির উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পরবর্তী সংস্করণ ত্রুটিশূন্য হলে আনন্দের কারণ হবে। কোন কোন অধ্যায়ে একাধিক বিষয়ের বা একাধিক ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা যুক্তিযুক্ত হয়নি। প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে সুখপাঠ্য হয়। শিরোনামায় (ছেচল্লিশ হতে উনপঞ্চাশ) ছোট হরফ ব্যবহার করায় সমতা রক্ষা হয়নি। প্রায় প্রতি অধ্যায়ের নীচে একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্লক দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে সব অধ্যায়ের নীচেই ব্লক দিলে আরও সুন্দর হবে। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। **শ্রীধনেশ মহলানবীশ**

সর্বৌষধি শিবাম্বু : শ্রীশান্তিলাল ভট্টাচার্য (সম্পাদক ও প্রকাশক), ৩১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা ৬ ; পৃ: ৬০, মূল্য তিন টাকা।

একাধারে লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীশান্তিলাল ভট্টাচার্য এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির একটি অধুনা-বিস্মৃত ধারাকে পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকে যোগাসন ও প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু প্রধান প্রতি-পাদ্য বিষয় স্বমূত্র সেবন ও প্রয়োগে জরার অবসান ও প্রায় সকল প্রকার দুঃসাধ্য রোগের চিকিৎসা। লেখকের ও কয়েকজন চিকিৎসাবিদ অনুলেখকের মতে ক্যান্সার, কুষ্ঠ, যক্ষা, হাঁপানি, বহুমূত্র, মূত্র-কোষের রোগ, একজিমা ও যাবতীয় চর্মরোগ,

শরীরে বিষক্রিয়া, অর্শ, জরায়ুসংক্রান্ত রোগ এমনকি বিরলকেশতা পর্যন্ত এই ঔষধ (স্বমূত্র) কয়েকদিন বা কয়েকমাস সেবন ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। নজীর হিসাবে পুস্তকে কয়েকটি আয়ুর্বেদ সংহিতার নামোল্লেখ আছে, এবং "ভাব প্রকাশ" হইতে একটি শ্লোক ও "ডামরতন্ত্র" হইতে শতাধিক শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

প্রধান নজীর "ডামরতন্ত্রে" মারণ, উচাটন, বশীকরণ, শূন্যে স্বেচ্ছায় বিচরণ ও চিরায়ু লাভের অনেক উপায় বর্ণিত আছে যাহার সত্যতার বিষয় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এই তন্ত্রকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। শিবাম্বু (অর্থাৎ স্বমূত্র) ব্যবহারের বিধি ও মাত্রা সম্বন্ধে কোনও নজীর উপস্থিত করা হয় নাই। অবশ্য লেখক কয়েকজন চিকিৎসকের, বিখ্যাত লোকের ও রোগীর মতামত এই বিধির সপক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং মনে করেন যে সাধু, বাউল, তান্ত্রিক সাধক প্রভৃতি অনেক অগৃহী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চিকিৎসা এখনও প্রচলিত ও ফলপ্রদ।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, স্বাভাবিক অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণা ভিন্ন, স্বমূত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। রোগীর মল হইতে তরলসার (phage) সেবন ও নিজের পূতিরক্ত হইতে রূপান্তরিত নির্যাস (auto-vaccine) ব্যবহার বহুদিন যাবৎ এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অঙ্গ। খুব সম্ভবতঃ শেষোক্ত মতের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিবার ইচ্ছায় লেখক নরমূত্রের মধ্যে hormone এবং antibiotic উপস্থিত থাকার সম্ভাবনার কথা বার বার বলিয়াছেন। যদি লেখকের এই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়, তিনি নিশ্চয় পথনির্দেশকভাবে এই প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদের পাত্র।

মানবশরীর মূত্রের জলীয় অংশ বা অন্য কোনো রাসায়নিক উপাদান বিশ্লিষ্ট অবস্থায় নিশ্চয় পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। মূত্রের কোনো উপাদানের রোগনাশক শক্তি থাকাও নিশ্চয় সম্ভব। কিন্তু যে-বস্তুকে শরীর মল হিসাবে নিষ্কাশিত করিয়াছে, অবিকৃত অবস্থায় তাহার পুনর্গ্রহণের কোনও উপকারিতা থাকার কোনও সম্ভাবনার চিন্তা বিজ্ঞান- বা স্বাভাবিক যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পুস্তকের ভূমিকায় ডাঃ ডি সি রাহা বি-এ, এম-ডি-এইচ লিখিয়াছেন ৩৪০০ ভাগ মূত্রে ১৪৫৯ ভাগ দেহের পুষ্টি রক্ষার বিশেষ উপযোগী উপাদান ইউরিয়া আছে। তথ্যটি একটি মারাত্মক ভুল। নরমূত্রে ১ হইতে ৩ শতাংশ ইউরিয়া থাকে, কয়েকক্ষেত্রে কিছু তারতম্য থাকে কিন্তু ১৪ শতাংশের বেশী হইলে উহা কঠিন রোগের পরিচায়ক। মূত্রের উপকারিতা যতই থাকুক, ইউরিয়া নিঃসন্দেহে শরীরের মল ও ত্যাজ্য। ইহার কোনো উপকারিতা থাকিলে শরীর সারা জীবন ধরিয়া ইউরিয়া নিষ্কাশন করিত না এবং শতকরা ৪২ ভাগ ইউরিয়ার দ্রবণ অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়।

অধ্যাপক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

Reflections on the Teachings of Sri Ramakrishna: Sri R. C. Roy. লেখক কর্তৃক 'শরৎ-তারা', ৫৯ প্রফুল্লচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৩০ হইতে প্রকাশিত; (১৯৭৪), পৃঃ ২৫৩, মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকাতেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে জানিয়েছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবন ও দিব্যবাণীর ওপর নতুন আলোকসম্পাত করার উদ্দেশ্যে বইটি লেখা হয় নি। তিনি বলেছেন যে, ঠাকুরের শ্রীপদে শরণার্থীরূপে লেখকের প্রারম্ভিক অধ্যয়ন ও অনুভূতির ফলশ্রুতি আলোচ্য গ্রন্থটি। বস্তুত, যদিও বইটিতে স্বল্পকলেবরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও দর্শন সম্পর্কে

সরল অবিকৃত বিবরণ ও ব্যাখ্যা আছে, মূলত এটি এক যুক্তিবাদী সতর্ক সন্ধানীর জীবন-জিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরান্বেষণের প্রত্যয়ান্বিত প্রতিবেদন। অনেক জায়গায় মনে হয় স্বগত-ভাষণের মতো স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-উন্মোচন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুধ্যানে লেখক যে আলোকময় আশ্রয় পেয়েছেন তারই সংবেদনশীল সন্ধান তিনি দিয়েছেন এই গ্রন্থে; যে-পরমান্নের আস্বাদনে তিনি পরমানন্দ লাভ করেছেন তাঁরই মতো সংসারী, সংশয়বিদ্ধ মানুষকে তিনি তার শরিক করতে চেয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করার মতো তিনি প্রধানত পরমহংসদেবের সুভাষিতাবলী সংকলন ও পরিবেশণ করেছেন। পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার কোন দাবি তিনি করেন নি; বিন্দুতে অমৃতসিন্ধুকে প্রতিফলিত করার দুরূহ প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন নিবেদিত বিনম্রচিত্তে। এ-প্রয়াসকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাই।

গ্রন্থকারের মানসিকতা স্পষ্টতই আধুনিক পরিশীলিত বিদগ্ধ। প্রথমে এক বিখ্যাত বাঙালী সাহিত্যিকের গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা-বর্ণনা পাঠ করে তিনি আকৃষ্ট হন। পরে, মনে হয়, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' হয় প্রধানত তাঁর অনুপ্রেরণা ও অনুধাবনের উৎস। উপাদান সংগ্রহের পরিধি আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা সীমিত হলেও লেখকের অভিনিবেশের গভীরতা ও প্রখরতা এবং বিচার-বিশ্লেষণের দক্ষতা প্রশংসার যোগ্য। তাঁর ইংরেজী ভাষা শুধু ঝরঝরে নয় ঝকঝকে; কিন্তু যথাযথ, সুসংযত—বাহুল্যবর্জিত ও চাতুর্যমুক্ত। সবচেয়ে যা ভাল লাগল তা লেখকের নিরহঙ্কার বিনয়াবনত অধ্যাত্মপিপাসুর ভাবটি। যে কোন গ্রন্থে যা প্রায় অপরিহার্য সেই লেখক-পরিচিতি পর্যন্ত বইটিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নিজের প্রতিষ্ঠা বা পণ্ডিতম্মন্যতার কোন প্রত্যক্ষ, এমন কি পরোক্ষ, আস্ফালন বইটির কোথাও একটুও অনুপ্রবেশ করতে পারে নি, যদিও তাঁর রচনায়, অন্তঃসলিলার মতো, তাঁর উচ্চকোটির দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদ্যাবত্তা অন্তর্নিহিত।

গ্রন্থটিকে শ্রীরায় তেরোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন এবং সেগুলির নাম দিয়েছেন, যথাক্রমে: পূর্বাভাষ: প্রেরিত পুরুষ ও তাঁর প্রয়োজন, ঈশ্বর, বিশ্বাস, ভালবাসা, জ্ঞান, কর্ম, ঈশ্বর ও জগৎ, সংসার ও সংসারী, গুরু, অবতার, অধ্যাত্ম-সাধনা, 'যত মত তত পথ', এবং সিদ্ধান্ত: যুক্তিনির্ভর যুগের ধর্ম। এইভাবে বিষয়-বিভাগে, ব্যঞ্জনা যাই থাক এবং কিছুটা পুনরাবৃত্তি অনিবার্য হলেও, মোটের ওপর, আলোচনার পারম্পর্য পরিস্ফুট হয়েছে এবং প্রধান আলোকসঙ্কেতগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের সহায়ক হয়েছে।

লেখকের প্রতিপাদ্য বক্তব্য: আজকের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের যুগে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন পরমহংসদেব এবং তিনি যে সত্যের আলোক দিয়ে গেছেন তা এ-যুগের সকল মানুষের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। বর্তমান কালে 'অবতারবরিষ্ঠে'র বাণীর প্রধান আবেদন এই যে, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি এবং তজ্জনিত বিভেদ-বিরোধ পরিহার করে তিনি সকল ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছবার একটি সরল সমর্থ ও সর্বজনীন ব্যাখ্যার ঠিকানা দিয়েছেন এবং নানা মতের নানা পথেও যে এই এক অভিন্ন ঠিকানায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় তা তিনি নিজে আচরণ করে শিক্ষা দেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার অনুশীলনে প্রাগ্রসর পাঠকের কাছে বইটি হয়তো তেমন মৌলিক বা মূল্যবান বোলে বোধ হবে না; মনে হতে পারে যে বিস্তৃততর ও গভীরতর গবেষণা এবং সূক্ষ্মতর বিচারের অবকাশ ছিল। বেদান্ত, ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি কোন কোন বিষয়ে ঠাকুরের মতামত সম্বন্ধে লেখকের সিদ্ধান্তকে

অতিসরলীকরণ বোলে মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। তাহলেও বলি, শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতকথার চর্চা ও চর্যা যতো হয় ততোই ভাল। 'আরো ভাল হতো আরো ভাল হতো' বলা নিরর্থক। তবে একটা কথা না জানিয়ে পারছি না : বইটিতে গ্রন্থপঞ্জী ও শব্দসূচী থাকা উচিত ছিল। মুদ্রণ, মোটের ওপর সুরুচির পরিচায়ক হলেও, প্রচ্ছদটি আরো সুন্দর হতে পারতো ; এবং, ঠাকুরের একটি ছবি থাকলে গ্রন্থটি আরো আকর্ষক হতো। যাই হোক, বইটি জনসাধারণের কাছে সমাদৃত হবে আশা করি।

বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য

বাংলাদেশে বাগেরহাট বরিশাল ঢাকা দিনাজপুর নারায়ণগঞ্জ এবং শ্রীহট্ট কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসার অতিরিক্ত দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুঁড়ো দুধ, শিশুখাদ্য এবং বস্ত্রাদি বিতরিত হয়।

ভারতে সেবাকার্য

বন্যাত্রাণ :

পাটনা জেলার মানেরে রাঁচি (মোরাবাদী) শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশনের বন্যাত্রাণ কার্য অব্যাহত থাকে। বন্যাপীড়িতদের জন্য ৭৫টি ত্রিপলের কুটির নির্মিত হইয়াছে এবং খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়াছে।

ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণ :

রাজকোট শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন জামনগর জেলার জামখামভালিয়া তালুকে এবং পোরবন্দরে ও উহার আশেপাশে ঘূর্ণিবাত্যায় পীড়িতদের মধ্যে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে। গত নভেম্বর মাসে পাঁচ শত পশমের কম্বল বিতরিত হয়।

কার্যবিবরণী

রায়পুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪ বর্ষদ্বয়ের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত প্রার্থনা ও ভজন ; প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা ; জন্মাষ্টমী, তুলসী-জয়ন্তী রামনবমী আদি উৎসবানুষ্ঠান ; শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি তিন সপ্তাহব্যাপী নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহাসমারোহে পালন এবং ঐ উপলক্ষে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে বিতর্ক ভাষণ আবৃত্তি আদি বহুবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণের আহ্বানে আশ্রমের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ দূর দূর স্থানেও ধর্মসভায় ভাষণ দেন। ঐরূপ ভাষণের সংখ্যা ছিল ১৯৭২-৭৩-এ ১০৮ এবং ১৯৭৩-৭৪-এ ১৩৩। আশ্রমের অন্তেবাসিগণের জন্যও স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির নিয়মিত অধ্যাপনা হয়।

প্রকাশন : ১৯৬৩ সালে প্রবর্তিত 'বিবেক জ্যোতি' ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশন অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার : ৩১।৮।৭৪ তারিখে বিবেকানন্দ স্মৃতি গ্রন্থালয়টির পুস্তক-সংখ্যা ছিল, ১৮,২৭৩ এবং সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৬০। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৯,৩৩৩ ও ২৩,৯৪১। নিঃশুল্ক পাঠাগারের দৈনিক পাঠক-সংখ্যা গড়ে ১৫১।

বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন : বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিদ্যার্থী ভবনে ২০টি

আসন আছে। বিদ্যার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

বিবেকানন্দ ধর্মার্থ ঔষধালয়: এ্যালোপ্যাথি বিভাগে দন্ত চক্ষু স্ত্রী-রোগ ইত্যাদির ৯টি স্বতন্ত্র বিভাগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বীক্ষণাগারে রক্ত-মল-মূত্রাদির যথারীতি পরীক্ষা করা হয়। নির্ধন রোগীদের ঔষধাদি বিনা পয়সায় দেওয়া হয়। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট ৫৩,১৬৪ জন রোগীর বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়. তন্মধ্যে ১৬,২৭৯ জন নূতন। ১৯৭৩-৭৪-এ উক্ত সংখ্যাদ্বয় ছিল যথাক্রমে ৬৫,০৩১ ও ১২,১৫৬।

হোমিওপ্যাথি বিভাগের চিকিৎসাও নিঃশুল্ক। ১৯৭২-৭৩-এ মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১৮,৭২৯, তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ছিল ৩,৭৪০ এবং ১৯৭৩-৭৪-এ উক্ত সংখ্যাদ্বয় ছিল যথাক্রমে ২০,৩৭৩ ও ৩,১৩০।

পঞ্চায়তী রাজ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: আশ্রমের তত্ত্বাবধানে প্রান্তীয় শাসনের পক্ষ হইতে উক্ত কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়। ইহাতে গ্রাম সরপঞ্চ, উপ-সরপঞ্চ, পঞ্চ আদির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বিক্রয় বিভাগ: উপরে বর্ণিত কার্যাবলী ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পুস্তকাদি যাহাতে স্থানীয় জনসাধারণ আশ্রম হইতেই পাইতে পারেন তাহার জন্য একটি পুস্তকাদি বিক্রয়ের কেন্দ্রও পরিচালিত হয়।

জনসাধারণ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া আশ্রমের সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক-ভজনে যোগদান করিতে আসেন, কিন্তু স্বল্প-পরিসর নাটমন্দিরে তাঁহাদিগের সকলের স্থান সংকুলান হয় না। এই কারণে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং গত ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৯ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ উক্ত মন্দিরের শিলান্যাস করেন। মন্দির নির্মাণ কল্পে ৩১।৭।৭৪ তারিখ পর্যন্ত দান হিসাবে পাওয়া গিয়াছে, ১,৮২,৬৫৩ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ৭৭,৬৬৮ টাকা। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সহৃদয় দেশবাসীর নিকট ৩,২৫,০০০ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন।

উৎসব

আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটিরে গত ২৯শে অগস্ট শুক্রবার অপরাহ্ণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। পরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা ভাষণ দেন। সমাপ্তি সংগীতের পর সন্ধ্যায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

ঘাটশীলা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে প্রতিবারের মত এবারেও শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

খিদিরপুর সুরবিতান কর্তৃক গত ১০ই কার্তিক ভগিনী নিবেদিতার শুভ জন্মদিবস ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালিত হয়। ভাষণ দেন সংস্থাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু।

পরলোকে বিভূতিভূষণ ঘোষ

বিগত ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮০, বুধবার বেলা ১টা ২৫ মিনিটে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মন্ত্রশিষ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী, বিভূতিভূষণ ঘোষ

মহাশয় প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে তাঁহার বাঁকুড়াস্থিত বাসভবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের নাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১২৯১ সালের ১৩ই আষাঢ় বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা বিনোদ-বিহারী একজন ধর্মপরায়ণ আইনজীবী ছিলেন; সরলা ধর্মপ্রাণা মাতা রোহিণীবালা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর দর্শন লাভে ধন্য হন। বিভূতিবাবু বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের আদি ছাত্রগণের অন্যতম ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় "ল কলেজে" ভর্তি হইয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উক্তি তাঁহার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করায় তিনি ওকালতি পড়া বন্ধ করেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তদানীন্তন বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতার সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতা-নিবাসী ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের সহিত বিভূতিবাবু সর্বপ্রথম বেলুড় মঠে গিয়াছিলেন এবং পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং স্বামী সদানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষগণের পুণ্য সংস্পর্শে আসেন।

তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দুইটি ঘটনা: জয়রামবাটীতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে সর্বপ্রথম দর্শন ও ১৯১২ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জয়রাম-বাটীতেই শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষালাভ। শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত গৃহস্থ সন্তানগণের মধ্যে বিভূতিবাবুর একটি বিশিষ্ট স্থান বিদ্যমান। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীতে বিভূতিবাবুর নাম ও তাঁহার সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ একাধিক স্থানে দেখা যায়।

এই স্বাধীনচেতা আত্মবিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তিটি কখনও কাহারও নিকট কোন কারণে মাথা অবনত করেন নাই। দেশের ও দশের উন্নতি-সাধন এবং মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবের কার্যে ও চিন্তায় তিনি সর্বদা নিরত থাকিতেন।

গার্হস্থ্য জীবনের প্রথম ভাগে তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রায় দশ বৎসর শিক্ষকতার কার্য করিয়া পরে স্বাধীন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

পরলোক গমনের কিছুদিন পূর্ব হইতেই বেশীর ভাগ সময় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার নাম জপ করিতেন। শেষ মুহূর্তে দেওয়ালে রক্ষিত শ্রীশ্রীমার আবক্ষ মূর্তির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সজ্ঞানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' উৎসর্গী-কৃত একটি জীবন এইভাবে শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে লীন হইল।

পরলোকে অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়

গত ১৫ই কার্তিক ১৩৮২, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায় ৯১ বৎসর বয়সে সামান্য রোগভোগান্তে বোল-পুরস্থ নিজ ভবনে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীমায়ের অভয় অঙ্কে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

তিনি সুগায়ক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোষ্ঠী উদ্বোধনে ফাল্গুন, ১৩৪২-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।]　　১লা আশ্বিন। (১৩০৬ সাল)　　[১৭শ সংখ্যা।]

আমার

তিব্বত ভ্রমণের

আর এক পরিচ্ছেদ।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

ইতিমধ্যে দুই একটি ঘটনা ঘটিত, তাহাতে আমাদের বড় কৌতূহল ও আমোদ বোধ হইত, কারণ তাহাতে ভুটিয়াদের আচার ব্যবহার জানিবার কতক সাহায্য হইত। একদিন ২০।২৫ টী ছোট বড় মাঝারী বালিকা যুবতী আসিয়া উপস্থিত। তারা হাত দেখাইতে চায়। এই এক আমাদের দেশের—শুধু আমাদের দেশের কেন—অনেক দেশেরই লোকের বিশ্বাস—হাতে ফলাফল সব লেখা আছে। কে জানে, ইহার মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে কি না। আমরা কেহই হাত দেখিতে জানিতাম না, সুতরাং কি করিয়া হাত দেখিব? আমাদের আলেখিয়াবন্ধুগণ আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, এই ব্রহ্মচারীজী সমুদয় জানেন। এইরূপে খানিক রহস্য করিয়া পশ্চাৎ বলিতে লাগিল—যদি গাঁজা আনিতে পার, তবে হাত দেখিব। তারা প্রথমে বলিল, গাঁজা কোথা পাইব। এইরূপে অনেকবার অস্বীকার করার পর তারা কেহ কেহ কিছু কিছু গাঁজা আনিয়া দিল, তখন আলেখিয়াবন্ধুগণ স্বার্থসিদ্ধি করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা কি স্ত্রীলোকের অঙ্গ স্পর্শ করি যে, তোমাদের হাত দেখিব? এইরূপে তাহারা তাহাদিগকে ভাগাইল।

আর এক দিনের কথা—একটা লোক আসিয়া নানান কথা কহিতেছে। জিজ্ঞাসিতেছে, তোমরা কে? তোমাদের বাড়ী কোথা? তোমাদের বাপ মা কে?—সাতগুষ্টির খবর। সাধুর ওসব বলিতে নাই, কাজেই বলিতেছি না। সে ব্যক্তি শেষে একটু চটিয়া বলিতে লাগিল, তোমরা ইংরাজের চর—তিব্বতীয়েরা তোমাদিগকে জব্দ করিবে। এইরূপে নানাপ্রকারে বিরক্ত করিতেছে, আমাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিল—দেখ, অমন করত, তোমাকে, তোমার স্ত্রীকে ও তোমার পরিবারস্থ সকলকে যাদু করিয়া ফেলিব। একথা শুনিয়া সে যেন একটু রাগিয়া গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমরা মনে করিলাম, বুঝি খুব রাগ করিয়াছে। খানিকক্ষণ বাদে দেখি, সে লোকটা তার স্ত্রীর সঙ্গে আসিয়া হাজির। হাতে খানিক গাঁজা। অতি কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন তাহার পরিবারের ভিতর কাহাকেও যাদু করা না হয়। আমরা মনে

---

* অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

মনে হাসিয়া অস্থির। বাঙ্গালীরা যাদু জানে। যাদু সংসারের সকলেই জানে! বল, বুদ্ধি বা ধর্ম কোন বিষয়ে চমকিয়া দিতে পারিলেই যাদু করিতে পারা যায়।

আর ছাংরুতে থাকিবার আবশ্যক নাই। সময়—গত বৎসর জুলাই মাসের প্রথম। পাধান তার সব বখ্‌রা ও লোকজন আগে প্রেরণ করিল। বখ্‌রা বড ধীরে ধীরে চলে কিনা! পাধান ঘোড়ায় যাইবে—আমাদের একদিন আগে যাইতে বলিল। আমরা কাযে কাযেই সব জিনিষ পত্র দাওয়া সিংএর ঘাডে চাপাইয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। এইবারে পথ বড় কঠিন। চডাই ওৎরাই ত আছেই তার উপর পথ অতি কদর্য,—পথ নাই বলিলেই চলে। অতি কষ্টে স্বষ্টে চলিতে হয়। আবার এমন মুস্কিল যে, প্রায় সব স্থানেই পথ খডের দিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এক এক স্থানে এত সরু যে, মনে হয় খডে পডিয়া গেলাম। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে। কোথায় একেবারে পথ নাই, একটা গাছ ডিঙাইয়াই বা যাইতে হইল। কোথাও বহু বিস্তৃত শিলাখণ্ড-সকল কোথাও বা নীচে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যনদী খরবেগে প্রবাহিত হইয়া যুগপৎ ভয় বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এখনও বরফের কোন চিহ্ন নাই। কোথাও কচিৎ এক আধজন লোক বখ্‌রা লইয়া যাইতেছে। পথ একরূপ জনশূন্য বলাই বাহুল্য। এই জনশূন্য পথে আমরা পাঁচ জনে অপেক্ষাকৃত অগ্র পশ্চাৎ চলিতেছি। পথে একজন লোক অযাচিত হইয়াই কিছু ছাতু দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ দেশের আহারই একরূপ ছাতু ও চা। সেই ছাতু কিঞ্চিৎ লবণ-সংযোগে খাওয়া গেল। এখন তাহাই অমৃত। বহুক্ষণ চলার পর, প্রায় বোধ হয়, ১২টার সময় (প্রাতে বাহির হইয়াছিলাম) পাধানের কথিত টিক্চ গ্রামে পঁহুছিলাম। গ্রামটী অবশ্যই খুব ছোট—ভুটিয়াদের বাস। সেই স্থানে গিয়া থাকিবার একটু স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। সব বাড়ীর লোক বলে, পাধানের বাডী যাও। আবার কেহ বলিল, পাধান এখন গ্রামে নাই। মোট কথা কেহই স্থান দিল না। সাধারণতঃ, আতিথেয় হইলেও সকলে সমান হয় না। গ্রামের দুই চারিটী বৃদ্ধ গ্রামটীর একটু বাহির দিকে আমাদিগকে লইয়া আসিয়া একটা চালা দেখাইয়া দিয়া বলিল, এইটী আমাদের দেবস্থান, এই খানে থাক। আমরা তাহাদের পরামর্শ মন্দ ভাবিলাম না। বেশ প্রশস্ত জায়গা ফাঁকায়। সেই স্থানটী সম্ভবমত পরিষ্কার করিয়া সকলে আপনাপন আসন রচনা করিলাম।

দেব-স্থানটীর একটু বর্ণনা করি। একধারে খোলা একখানা চালা; বাহিরে একটা লম্বা বাঁশ খাটানো তাহার উপর নানা রঙ্গের লম্বা লাল সাদা নেকড়া ঝুলান রহিয়াছে। ভিতরের এক অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া নির্মিত। মেজের ছোট ফালিটী যেন দেবতার উদ্দেশেই বিশেষ-ভাবে উৎসর্গীকৃত। দেবতা একটী লম্বা খাঁজ কাটা, তার উপর দিকে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড cross-wise লাগান। এই দেবতাকে লইয়া আমাদিগকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি।

প্রথমেই ভিক্ষার যোগাড় চাই। যদিও গুড় পাপড়ি আছে, তথাপি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে তাহা খরচ করিব না, কারণ কতদিন যে যাইতে আসিতে লাগিবে, তাহার ত কিছু স্থির নাই। কাযেই আমাদের দাওয়া সিংকে গ্রামে পাঠাইলাম। বলিয়া দিলাম যাহা পারিস্, লইয়া আয়। সে গিয়া অনেক কষ্টে কিছু ময়দা সংগ্রহ করিল। আমাদের আলোখিয়াবন্ধুগণ অন্য কিছু না পাইলে নানা প্রকার বন্য শাক সংগ্রহ করিয়া ভোজন করিত। যত প্রকার শাক খাইত, তন্মধ্যে

ফাকর নামক শাক অপেক্ষাকৃত ভাল। আজ তাহারা বলিল, আপনাদিগকে বিছুটি শাক খাওয়াইব। এখানকার বিছুটি কিছু বড বড, তাহাই একরূপ রন্ধন কবিল। বলা বাহুল্য, খাইতে উহা বড ভাল লাগিল না। জ্বালানি কাষ্ঠ বড পাওয়া যায় না। তবে একজন ভুটিয়া অনেক পরিমাণে শুষ্ক কাঁটা গাছ ও কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। আলেখিয়ারা নিজেদেব কাছে কিছু কিছু নানা রকম জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হয়ত চাট্টি ডাল, অথবা ছাতু অথবা ময়দা কিম্বা একটু নুন কি কোন রকম মশলা প্রভৃতি। এই সকল এখন অনেক কাযে লাগিয়া গেল। একরূপ খাওয়া হইল। রাত্রে ধুনি জ্বালা হইল। বড ঠাণ্ডা—রাত্রে যা কিছু জামা কি গায়ের কাপড ছিল, তার উপর ধুনির উত্তাপ—তাতে পথক্লেশ—আরামে নিদ্রাদেবীর সেবা করা গেল।

প্রাতে উঠিয়া আবার আহারাদির আয়োজন, রুটি তৈয়ারী হইতেছে। আমাদের দাওয়া সিং আর তিন চারিজন গ্রামবাসী আসিয়া তাস খেলা আরম্ভ করিয়াছে। আমরা ধুনির পাশে বসিয়া রুটি সেকা দেখিতেছি ও নানাবিধ কথা কহিতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি—যুবক—নিজের সম্মুখদেশে প্রস্তরখণ্ড সকল সজোরে নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিয়া হাজির। কি ব্যাপার? আকার যেন কত বোতল মদ খাইলে হয়, সেইরূপ। প্রথমে আসিয়াই খেলার উপকরণ একধারে ছুঁডিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর প্রত্যেক বালককে তুলিয়া তুলিয়া ঠেলিয়া ফেলিতে লাগিল। প্রথম মনে করিলাম এই ব্যক্তি বুঝি ইহাদের আত্মীয়। চাসবাস কি কোন গৃহকর্ম না করিয়া বসিয়া তাস খেলিতেছে, তজ্জন্য বিরক্ত। কিন্তু পরিশেষে অন্যরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমাদের দাওয়া সিংএর এক আধখানা ছাল ও অন্যান্য জিনিষ সাম্‌নে ছিল ছুঁডিয়া ফেলিয়া দিল। আমার জুতো জোডাটী—কি দৈবের চক্র—এই যে স্থানটী দেবতার স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, সেই দিকে ছিল, তাহাও ছুঁডিয়া একধারে টানিয়া ফেলিল। তখন ক্রমশঃ অনুমান হইতে লাগিল, লোকটা হয়ত পাগল, নয়ত মাথা ভয়ানক গরম হইয়াছে। আবার পাথর ছুঁডিতেছে, সৌভাগ্যক্রমে কাহার দিকে নহে। ক্রমশঃ সেই দেবস্থানটীর উপর গডাগডি দিতে লাগিল। কখন প্রণাম করিতেছে, কখন উঠিতেছে, নানারূপ ভাবভঙ্গী। এদিকে গ্রামবাসীগণ ক্রমশঃ আসিয়া জুটিতেছে। ক্রমশঃ অনুমান হইল, ইহাকে দেবতা ভর করিয়াছে। অনেকগুলি লোক জমিয়াছে। ক্রমশঃ দেবতা উঠিয়া মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে গানের সুরে 'তোম লোককো হিঁয়া রয়নেকো কোন্ হুকুম দিয়া, কোন্ হুকুম দিয়া' এইরূপ বারবার চীৎকার করিতে লাগিল। মঙ্গলপুরী আমাদের দিক্ হইতে হিন্দীতে উত্তর করিতে লাগিল। দেবতার এই কয়েকটী অনুযোগ, (১) এখানে কাহার হুকুমে আমরা অবস্থান করিতেছি? (২) এখানে গাঁজা খাওয়া হইয়াছে কেন? (আলেখিয়াগণ গঞ্জিকাদেবীর সেবা চূড়ান্তরূপেই করিয়াছিলেন।)। (৩) এখানে জুয়াখেলা হইতেছে কেন? (উহারা বাজি রাখিয়া খেলিতেছিল কি না, আমরা লক্ষ্য করি নাই।) প্রথম প্রশ্নটী বারবার জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল।

মঙ্গলপুরী।—আমরা গ্রামবাসীর হুকুমে এখানে রহিয়াছি।

দেবতা।—(গ্রামবাসীদিগের দিকে সক্রোধদৃষ্টিতে) কাহারা হুকুম দিয়াছিল, নাম কর ত?

ম।—আমরা এখানে নূতন আসিয়াছি, কাহারও নাম জানি না।

দে।—তোমাদের কোন্ দেবতা?

ম।—দেবতা ত সবই এক।

দে।—না, তোমাদের দেবতা ও আমাদের দেবতা পৃথক্।

আবার মাঝে মাঝে গড়াগড়ি, প্রণাম—পাথর ছোঁড়া প্রভৃতি। আমাদের আলেখিয়ারা ভরসা দিতেছে, যদি আমাদের কাছে আসে, ত তাহাদের চিম্‌টা দ্বারা তাহাকে উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিবে। তাহাদেরও কিন্তু ভিতরে ভয় হইয়াছিল। কারণ, গ্রামবাসীরা অবশ্যই দেবতার পক্ষ হইবে। সৌভাগ্যক্রমে দেবতা কিন্তু কাছে আসিতেছে না, কিন্তু এমন পাথর ছুঁড়িতেছে যে, প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হইতেছে, বুঝি গায়ে পাথর লাগিল। এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসিয়া আমাদের উনান হইতে ছাই লইয়া তাহার গায়ে মন্ত্র পড়িয়া পড়িয়া দিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটু শান্ত হয়, আবার ঝিঁকি মারিয়া উঠে। শেষে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। সব কথা ভাল স্মরণ নাই। কেবল একটী কথা মনে আছে।

দেবতা।—এ কাহার রাজ্য ?

গ্রামবাসী।—এ লাসার রাজ্য।

ইতিমধ্যে মহাজনতা হইয়াছে। গ্রামবাসী সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আমরা স্তব্ধ। দেবতার জন্য কিছু ভয় নাই। তবে প্রস্তর-খণ্ড যদি গায়ে লাগে, এই জন্য ভয় হইতেছে, ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড। আর এক ব্যক্তি এইরূপে আবিষ্ট হইয়া হাজির। সে ত আসিয়াই বলপূর্ব্বক এ ব্যক্তির বুকের উপর বসিয়া জোর করিয়া ইহাকে হেঁচ্‌ড়াইতে হেঁচ্‌ড়াইতে গ্রামের দিকে লইয়া গেল। ইতিমধ্যে আমাদের রুটি সেকা চলিতেছে। প্রায় শেষ হইল। গ্রাম-বাসী প্রায় সব চলিয়া গেল। দুচারিজন বৃদ্ধ আমাদিগকে শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগের পরামর্শ দিল। আমরাও সেই রুটিগুলি খাইয়া পাধানের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে দেখিলাম, দূরে পাধানের ঘোড়া দেখা যাইতেছে। পাধান আসিয়া উপস্থিত হইল, আমরাও তথা হইতে রওনা হইলাম।

আবার চলিতে লাগিলাম। উপস্থিত দেবতার বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পাধান বলিল, এ কিছু নয়, অজ্ঞ লোকের কুসংস্কার। যাহাই হউক, আমরা এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত কি করিব ? মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করুন। কিন্তু আলমোরায় আর একবার এইরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছিলাম। তাহাতে যে লোকটীর উপর ভর হইয়াছিল, তাহাকে যে পাইতেছে, সেই মারিতেছে। আমাদের মধ্যে একজন গিয়া তবে ছাড়াইয়া দেন। শুনিলাম—এরূপ দেবতা (বা ভূত, কারণ, দেবতা বা ভূতে ইহারা বড় প্রভেদ করে না।) ভর অনেককেই করিয়া থাকে। অনেকস্থলে এরূপ আবিষ্ট ব্যক্তিকে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ করাইলেও কিছু কষ্ট বোধ করে না, বা তাহাদের গায়ে কোন দাগ হয় না, ইহা আমি বিশ্বাসযোগ্য স্থল হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু কোন কোন স্থলে এইরূপ অবস্থায় গরমলৌহস্পর্শ কাহারও কাহারও মৃত্যুরও কারণ হইয়াছে, শুনিয়াছি। যাহা হউক, ভূতের কথা আর বাড়াইয়া কায নাই। [ক্রমশঃ]

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৭৭তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮১ হইতে পৌষ, ১৩৮২)

অন্যান্য :

চিত্রসূচী ঃ